চার্বাকচর্চা
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

চার্বাকচর্চা

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
বাঙলায় চার্বাকচর্চার দুই পথিকৃৎ
স্মরণে

লেখকের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বই

দর্শন পড়ার ভূমিকা

মননের মূর্তি

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ইতিহাসবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা

মার্কসবাদ ও ভারতবিদ্যা

প্রবন্ধসংগ্রহ

তক্কাতক্কি করতে হলে

বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা

মার্কসবাদ জিজ্ঞাসা

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব

Studies on the Cārvāka/Lokāyata

Brahmabandhar Upadhyay : Restless Patriot and Theologian

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক বা লোকায়তমতের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এমন আপসহীন বস্তুবাদী, ঈশ্বর-পরলোক-পরকালে অবিশ্বাসী একটি দর্শন ভারতের মাটিতেই জন্মেছিল। কিন্তু খ্রি. বারো শতকের পর সেই দর্শনের সূত্রগ্রন্থ ও ভাষ্যগুলি কী করে যেন হারিয়ে গেল। তবু নানা হাত-ফেরতা উৎস থেকে ঐ দর্শনের মূল বক্তব্য পুনর্গঠন করা যায়। ১৯৯০-এর দশক থেকে আমি সেই পুনর্গঠনের চেষ্টাই করেছি। আশা করি, চার্বাকদর্শন সম্পর্কে প্রচলিত বহু ভুল ধারণা কাটাতে বইটি সাহায্য করবে।

প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও, পাঠক-পাঠিকার সুবিধের জন্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অন্যান্য অধ্যায়েরও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কিছু পুনরুক্তি ইচ্ছে করেই রাখা আছে।

বইটির প্রথম সাতটি অধ্যায়ে আছে চার্বাকদর্শনের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা। অধ্যায় ৮ থেকে ৩০ পর্যন্ত চার্বাকচর্চার প্রতিটি প্রধান উৎস খুঁটিয়ে বিচার করা হয়েছে। শেষ তিনটি অধ্যায়ে চার্বাকদের নামে প্রচলিত তিনটি শ্লোকের শুদ্ধ পাঠ নির্ধারণ করা হলো। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' যে চার্বাকবচন নয়, অপপ্রচার মাত্র—তাও এর থেকে প্রমাণ হবে।

চার্বাকচর্চার কাজ শুরু করেছিলুম গত শতকের শেষ দিকে। নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা লেখাগুলো জড়ো করে আর অনেকটাই নতুন করে লিখে অবশেষে এই বই বেরুচ্ছে।

এ কাজে সাহায্য দরকার পড়েছিল অনেক রকমের। নানা তথ্য জোগানে তৎপর ছিলেন দুই বন্ধু, এলি ফ্রাঙ্কো ও কারিন প্রেইসেনডানৎস্। জাপান থেকে তাঁর লেখার

প্রতিলিপি পাঠিয়ে বাধিত করেছেন মামোরু নামাই। কোথাও আটকে গেলে সব মুশকিল আসান করেছেন মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিব্বতী রচনার অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় আনুকূল্য করে বাধিত করেছেন সঞ্জিতকুমার সাধুখাঁ। কিছু সংশয়ের নিরসন করেছেন সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. আর. দেশপাণ্ডে ও নগীনদাস জীবনলাল শাহ।

বাঙলায় চার্বাকচর্চার বহু হদিশ দিয়েছেন সর্বগবেষকসহায়, অশোক উপাধ্যায়। কাজের শুরু থেকে নানা পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়ার জন্যে বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য (প্রয়াত), সুকুমারী ভট্টাচার্য ও সুনীতিকুমার পাঠকের কাছে অশেষ ঋণী।

এ বই-এর অনেক অধ্যায়ই নতুন করে লিখতে ও কপি করতে হয়েছে। হাসিমুখে সে-কাজ করেছেন অঞ্জন বেরা, অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, রিঙ্কু চৌধুরী, শ্যামল ও শ্যামল চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অস্মিতা চৌধুরী, জয়দীপ ঘোষ ও সুকল্প চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া সর্বদাই পাশে থেকেছেন অমিতাভ ভট্টাচার্য আর সিদ্ধার্থ দত্ত। এঁরা দুজন ছাড়াও প্রুফ দেখে দিয়েছেন অয়ন ঘোষ, নবেন্দু রায়, পিয়ালি গুপ্ত, প্রদ্যুৎকুমার দত্ত, মলয়েন্দু দিন্দা ও শুভেন্দু সরকার।

সবশেষে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেগুলি হলো : দ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা; জৈনভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, লডনূঁ (রাজস্থান); দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ; বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়; ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, পুণে; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, আর লালভাঈ দৌলতভাঈ ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, আমেদাবাদ। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-র প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, মধুসূদন বেদান্তশাস্ত্রী আর দুই কর্মী, মিঠু রক্ষিত ও লক্ষ্মণ দে, সব আবদার মিটিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এঁদের ধার শোধ করা যায় না, শুধু স্বীকারটুকুই করা যায়।

৩ মোহনলাল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪
<lokayata_rkb@yahoo.com>

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৭ নভেম্বর ২০০৯

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদ : গোড়ার কথা

চার্বাক বলে একজন দার্শনিক ভারতে ছিলেন, তাঁর কথাবার্তা চালচলন আর কারুর সঙ্গে মিলত না— এইরকম একটা ধারণা নিয়ে বিস্তর লোক, এমনকি ছাত্র-অধ্যাপকও, জীবন কাটিয়ে দেন। পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বইগুলিতে এই ধরণের কথাই লেখা থাকে। গত পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শন নিয়ে গবেষণা কত এগিয়ে গেছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক কেন, এদেশের পেশাদার দর্শন-ব্যবসায়ীরাও তার খবর রাখেন বলে মনে হয় না।

চার্বাকমত নিয়ে আলোচনার সময়ে তিনটি বিষয় বিশেষ করে বোঝার আছে।

১. এটি শুধু বেদপ্রামাণ্যর বিরোধী নয়, যে-কোনো ধর্মমতের বিরোধী দর্শন। শুধু বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নয়, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সব ধর্মের বিরুদ্ধেই তার লড়াই। সুতরাং তার বিরুদ্ধে সব ধর্মমতই এককাট্টা। মূল বিরোধিতার জায়গা হলো : অবিনশ্বর আত্মা আর তার পুনর্জন্ম অস্বীকার।

২. ধর্মমত ছাড়াও জ্ঞানতত্ত্বর দিক দিয়ে বিতর্কর প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায় : প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন্ (বা কোন্ কোন্) প্রমাণ (=যথার্থ জ্ঞানের উপায়) মানা হবে। চার্বাক-বিরোধীরা চার্বাকদের প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী বলে শনাক্ত করেছেন। অর্থাৎ চার্বাকরা নাকি একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানেন না। অথচ ঘটনা এই যে, লৌকিক ক্ষেত্রে চার্বাকরা অনুমানকে মানতে গররাজি ছিলেন না— যদি সে-অনুমান প্রত্যক্ষপূর্বক হয়। কিন্তু যেসব অলৌকিক বিষয়— ঈশ্বর, পরলোক, সর্বজ্ঞ পুরুষ ইত্যাদি— অনুমানের সাহায্যে বা আপ্তবাক্যর দোহাই পেড়ে লোকের কাছে হাজির করা হয়, তেমন অপ্রত্যক্ষ বিষয় মানতে তাঁদের আপত্তি ছিল। পুরন্দর নামে এক চার্বাকপন্থী দার্শনিক খুব স্পষ্ট ভাষায় সে-কথা বলেছেন; *সর্বমতসংগ্রহ* নামে একটি বইতে চার্বাকদর্শন প্রসঙ্গে এই ধারণাটি পরিষ্কার করে বলা আছে; নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট নিজেও সে-কথা পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। চার্বাকরা যে প্রত্যক্ষ

ছাড়া আর কোনো প্রমাণ স্বীকার করতেন না— এই ধারণা প্রচার করার সময়ে চার্বাক-বিরোধীরা কোনো প্রামাণ্য চার্বাকসূত্র উদ্ধৃত করেন নি; বরং ভর্তৃহরি-র *বাক্যপদীয়* থেকে এক বা একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। ভর্তৃহরি এমনকি প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করতেন না : 'শব্দ' অর্থাৎ বেদবাক্যই তাঁর কাছে একমাত্র গ্রাহ্য প্রমাণ। এমন এক দার্শনিকের ধারণাকে চার্বাক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করাকে দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কী বলা যায়?

৩. নীতিবিদ্যার একটি দিকও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। প্রথমে জৈনদের রচনায়, পরে ব্রাহ্মণ্য রচনাতেও (মূলত কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীহর্ষ প্রমুখ বৈদান্তিকদের নাটকে ও কাব্যে) চার্বাকদের লাগামছাড়া ইহসুখবাদী (হেডনিস্ট) বলে দেখানো হয়। শান্তরক্ষিত, কমলশীল প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকরা কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য করেন নি; শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের লেখাতেও চার্বাকখণ্ডন প্রসঙ্গে যৌন শিথিলতার কথা আসে না। এমনকি জৈন আচার্য প্রভাচন্দ্রও এ বিষয়ে নীরব।

যে-কোনো দর্শনকে হেয় করার জন্যে শঙ্করাচার্য একটিমাত্র তোপ দাগেন— আলোচ্য দর্শনটি অবৈদিক, অস্মার্ত, অর্থাৎ মনু, পরাশর প্রমুখের ধর্মশাস্ত্রর সঙ্গে তার মিল নেই। বৌদ্ধ-জৈনরা তো এর ফলে বাতিল হয়ে যানই, সাংখ্যকেও এই একই অস্ত্রে ঘায়েল করা হয়। তেমনি ঈশ্বর না মানলেও, দেহছাড়া আত্মা, পরলোক, পুনর্জন্ম ইত্যাদি না-মানার দায়ে চার্বাকদের একঘরে করেছেন সবাই মিলে। এ ব্যাপারে বেদপন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ-জৈনরাও সামিল।

ওপরে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হলো, তার মধ্যে একমাত্র প্রথমটিই সত্যি, বাকি দুটি অপপ্রচার মাত্র। বিশেষ করে তৃতীয়টির ক্ষেত্রে এও বলা যায় যে, শুধু চার্বাক নয়, সাংখ্য প্রসঙ্গেও এই ইন্দ্রিয়সুখভোগের অভিযোগ তোলা হয়েছিল— যদিও তার পক্ষে কোনো সাক্ষ্য হাজির করা হয় নি। অপপ্রচার করতে গেলে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়ই। তাই 'যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ'-এর পরে মূল শ্লোকে ছিল 'নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ'— সেটিকে পাল্‌টে সায়ণ-মাধব লিখে দিলেন : 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'। সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়।

চার্বাকমত তথা বস্তুবাদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। এই দর্শনটিকে যতদূর পর্যন্ত নিঃসংশয়ে পুনর্গঠন করা যায় তার থেকে আমরা বলতে পারি : এটি খুবই প্রাচীন দর্শন। অজিত কেশকম্বলীকে ভারতের প্রথম বস্তুবাদী বলে ধরা যায়। তিনি ছিলেন বুদ্ধ-রই সমসাময়িক। তার পরে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতক থেকে খ্রিস্টীয় দশ শতকের মধ্যে আর পাঁচজনমাত্র বস্তুবাদী দার্শনিকের নাম পাওয়া গেছে : অবিদ্ধকর্ণ, উদ্ভটভট্ট (ভট্টোদ্ভট), কম্বলাশ্বতর, পুরন্দর ও ভাবিবিক্ত।[১] এই পনেরো শ বছর জুড়ে ভারতের দর্শন জগতে অনেক টালমাটাল ঘটে যায়। অতি

সূক্ষ্ম তর্ক, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ— এই সবই চলতে থাকে। একদিকে বৌদ্ধ ভাববাদী (যোগাচার ও মধ্যমক), অদ্বৈত বৈদান্তিক (শঙ্করাচার্য থেকে শ্রীহর্ষ) ইত্যাদি সম্প্রদায় বস্তুজগতের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করলেন, অন্যদিকে মীমাংসক ও ন্যায়-বৈশেষিকরা কোমর বাঁধলেন জগতের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। খ্রিস্টপূর্ব ছ থেকে বারো শতকে, এই উত্তাল বিতর্ক পর্বে চার্বাকরা চলে যান এক প্রান্তে। বিবদমান দুই পক্ষ, চূড়ান্ত ভাববাদী আর বাস্তববাদী (রিয়ালিস্ট), কিন্তু বস্তুবাদী নন। দুপক্ষই চার্বাকদের বিরুদ্ধে মাঝে মধ্যে দু-চারটি বাণ ছেড়েছেন। ভাববাদী বৌদ্ধদের লেখা থেকে বোঝা যায় : চার্বাকরাও তার জবাব দিতে কসুর করেন নি। শান্তরক্ষিত, কমলশীল-এর কাছে চার্বাক অন্যতম প্রতিপক্ষ। দেহাত্মবাদ খণ্ডনে জৈন আচার্য প্রভাচন্দ্র-র ক্লান্তি নেই। জয়ন্তভট্ট-র টীকাকার চক্রধর-ও চার্বাকমত খণ্ডনে উৎসাহী।

তবু ঘটনা এই যে বারো শতকের পরে ভারতের দুই প্রাচীন দার্শনিক মত, সাংখ্য আর চার্বাক, একেবারেই পেছনে পড়ে যায়— তখন থেকে মূল মঞ্চে থাকে (অন্তত উত্তর ভারতে) বৈদান্তিক ও নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়। বৌদ্ধরাও তখন নিজ বাসভূমে পরবাসী, জৈনরা দুটি বিচ্ছিন্ন ধর্মসম্প্রদায় মাত্র (দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর)। যা কিছু লড়াই সবই হয় আস্তিক বা বেদপন্থী দর্শনগুলির মধ্যে।

তার মানে এই নয় যে, ভারতে আর কোনো চার্বাকপন্থী ছিলেন না। কিন্তু কোনো শক্তিশালী দার্শনিক সম্প্রদায় হিসেবে তাঁরা আর নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। দর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মমত (শৈব, পাশুপত, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকদের নানা উপসম্প্রদায়) ভারতের মনন-জগতে এক দীর্ঘস্থায়ী ধুলোর ঝড় তুলেছিল। সাংখ্য ও চার্বাকমত সেখানে চাপা পড়ে যায়। বাঙলায় এমনকি প্রাচীন ন্যায়েরও কোনো চর্চা ছিল না।

কিছুকাল আগে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, আজকের দিনে চার্বাকমতের বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে 'মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের কারণ নেই'।[২] ঐতিহাসিক কারণেই অতীতে তা সফল হয় নি; ধর্মীয় আইনকর্তারা সেটিকে চেপে দিতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে আমরা যোগ করতে পারি : আধুনিক (দ্বান্দ্বিক) বস্তুবাদের চোখ দিয়ে দেখলে চার্বাকদর্শনকে নিতান্তই অপরিণত বলে মনে হবে। চতুর্ভূত (মাটি, জল, আগুন আর বাতাস)-এর ধারণাটি আধুনিক বিজ্ঞান বাতিল করে দিয়েছে। তার জায়গায় এসেছে পরমাণু তথা মৌল কণার তত্ত্ব; প্রমাণ হয়েছে বস্তু ও শক্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এখন যদি কেউ নিজেকে 'আদি ও অকৃত্রিম চার্বাকপন্থী' বলে ঘোষণা করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন আধুনিক বস্তুবাদীরাই।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে কোনো যোগ না-রেখে চলতে পারেন ভাববাদীরা। এই মুহূর্তে কেউ যদি নিজেকে শূন্যবাদী বা মায়াবাদী বলেন তাতে কেউ বাধা দেবেন না। ব্যাবহারিক জগৎ সম্পর্কে কোনো নতুন ধারণাই তাঁর ধর্তব্যর মধ্যে আসে না।

কোনো বস্তুবাদীর পক্ষে কিন্তু এমন অবস্থান নেওয়া অসম্ভব। সচেতন বা অচেতন বস্তুবাদই প্রকৃতিবিজ্ঞানের ভিত, আর বিজ্ঞানই পারে বস্তুবাদকে যথার্থ জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে।

তবে একটি কথা কখনোই ভোলা যায় না। ভারতের মতো সুপ্রাচীন সভ্যতার দেশে চার্বাকদর্শনের মতো একটি আপসহীন অধর্মীয় ইহলোকসর্বস্ব দর্শন যে গড়ে উঠেছিল এটাই এক বিরাট ঘটনা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, চার্বাকরা হয়তো একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না, সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি আর ন্যায়দর্শনের স্বভাব-এর ধারণায় একই বক্তব্যের রেশ রয়ে গেছে।[৩] কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঐ দুটি দর্শনই বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে ধর্মশাস্ত্রীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এমন হতে পারে এ ছিল তাঁদের মুক্তিপণ। মুখে বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে কাজে তাঁরা নিজেদের মতই বলেছিলেন।

চার্বাকদর্শনের সবচেয়ে বড় মহিমা এই যে, কোথাও কোনোভাবে দর্শনচর্চার অনুমোদিত দিকটি মানা হয় নি। দর্শন পড়লে মোক্ষলাভ হবে— এমন কথা তাঁরা মানতে রাজি হন নি, বরং মোক্ষর ধারণাটিকেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে এক অসমসাহসিক বীরত্ব আছে যা বুঝতে বিপ্লবী মনোভাব লাগে। সে-মনোভাব যাঁদের নেই চার্বাকদর্শন তাঁদের কাছে একটি অবাঞ্ছিত উৎপাতমাত্র। প্রতিটি বিপ্লবীরই মনে রাখা উচিত : সত্যিকারের বিপ্লবী কখনও নিজের মতবিরুদ্ধ কথা বলে পিঠ বাঁচান না; সমস্ত সনাতনী ধ্যানধারণা, ধর্মীয় প্রথা ও লোকাচারের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েও নির্দ্বিধায়, অকপটে নিজের বক্তব্য জানান; কোণঠাসা বা একঘরে হয়ে পড়ার ভয়ে নীতিবিরোধী কোনো আপসে যান না। দর্শনের ইতিহাসে চার্বাকমত সেই বীরত্বের অধিকারী।

---

১. কমলশীল, চক্রধর, বাদিদেব সূরি ও শান্তরক্ষিত-এর রচনায় এঁদের নাম পাওয়া যায়। বিশদ বিবরণের জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৭ দ্র.।

২. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩), বারো।

৩. ঐ, ১০৮-৩০ দ্র.।

পরিশিষ্ট

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎসগুলির একটি কালপঞ্জি ও বর্ণ-অনুযায়ী* নামপঞ্জি নিচে দেওয়া হলো। সব লেখক ও রচনার সময় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। বহুক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগুলি অনুমাননির্ভর।

কালপঞ্জি

খ্রিপূ ৪০০	*সামঞ্ঞ-ফল-সুত্ত*	৮০০/১১০০	প্রভাচন্দ্র
	সূত্র-কৃতাঙ্গ-সূত্র	৯০০	শালিকনাথমিশ্র
খ্রিপূ ৪০০-		৯০০	জয়ন্তভট্ট
৪০০ খ্রি.	*মহাভারত, রামায়ণ*	৯০০	শঙ্করাচার্য
১০০-৩৫০	*বিষ্ণুপুরাণ*	৯০০	বিদ্যানন্দ বা
২৭৫-৩২৫	*মৎস্যপুরাণ*		বিদ্যানন্দী
৪০০	বাৎস্যায়ন, *কামসূত্র*	৯০০	শীলাঙ্ক
৪০০-৫০০	*বিষ্ণুধর্মোত্তর-মহাপুরাণ*	৯০০/১০০০	ভাস্কর
৫০০-৬০০	ভাববিবেক	৯০০/১০০০	সিদ্ধর্ষি
৬০০/৭০০	ধর্মকীর্তি	৯৫০-১২০০	*দেবীভাগবত পুরাণ*
৬০০/৭০০	জিনভদ্র	১০০০	ভাসর্বজ্ঞ
৬০০-৭০০	চন্দ্রকীর্তি	১০০০	বাচস্পতিমিশ্র
৭০০	*পদ্মপুরাণ*, সৃষ্টিখণ্ড	১০০০	*পদ্মপুরাণ*, উত্তরখণ্ড
৭০০	*মাঠরবৃত্তি*	১০০০	উৎপলভট্ট
	(*সাংখ্যকারিকা*-র ব্যাখ্যা)	১০০০	পুষ্পদন্ত
৭০০	ব্যোমশিব	১০০০	সোমদেব সূরি
৭০০	পুরন্দর	১০০০	অনন্তবীর্য
৭০০	অবিদ্ধকর্ণ	১১০০	উদয়নাচার্য
৭০০-৮০০	কম্বলাশ্বতর	১১০০	চক্রধর
৮০০	জয়রাশিভট্ট	১১০০	অভয়দেব সূরি
৮০০	অকলঙ্ক	১১০০	কৃষ্ণমিশ্র
৮০০	ভাবিবিক্ত	১১০০	জ্ঞানশ্রীভদ্র
৮০০	কর্ণকগোমী	১১০০	বাদিরাজ সূরি
৮০০	শান্তরক্ষিত	১১০০	প্রভাচন্দ্র
৮০০	কমলশীল	১১০০/১২০০	ডল্লন/ডহ্লণ
৮০০	হরিভদ্র	১১০০/১২০০	বাদিদেব সূরি
৮০০/৯০০	উদ্ভটভট্ট		

* বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-র মধ্যে কোনো তফাত করা হয় নি।

১২০০	হেমচন্দ্র	১৫০০	মাধব সরস্বতী
১২০০	শ্রীহর্ষ	১৬০০	সদানন্দ যোগীন্দ্র (যতি)
১৪০০	সায়ণ-মাধব	১৬০০	মধুসূদন সরস্বতী
১৪০০	রাজশেখর	১৭০০	নীলকণ্ঠ
১৫০০	গুণরত্ন	১৭০০	সদানন্দ কাশ্মীরক
১৫০০	শ্রীধর	১৭০০	চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

নামপঞ্জি

নাম	সময়
অকলঙ্ক	৮০০
অনন্তবীর্য	১০০০
অবিদ্ধকর্ণ	৭০০
অভয়দেব সূরি	১১০০
উদয়নাচার্য	১১০০
উদ্ভটভট্ট	৮০০/৯০০
উৎপলভট্ট	১০০০
কমলশীল	৮০০
কম্বলাশ্বতর	৭০০-৮০০
কর্ণকগোমী	৮০০
কৃষ্ণমিশ্র	১১০০
গুণরত্ন	১৫০০
চক্রধর	১১০০
চন্দ্রকীর্তি	৬০০-৭০০
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য	১৭০০
জয়ন্তভট্ট	৯০০
জয়রাশিভট্ট	৮০০
জিনভদ্র	৬০০/৭০০
জ্ঞানশ্রীভদ্র	১১০০
ডল্লন/ডাহ্লণ	১১০০/১২০০
দেবীভাগবত পুরাণ	৯৫০-১২০০
ধর্মকীর্তি	৬০০/৭০০
নীলকণ্ঠ	১৭০০
পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড	১০০০
পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড	৭০০
পুরন্দর	৭০০
পুষ্পদন্ত	১০০০
প্রভাচন্দ্র	৮০০/১১০০
বাচস্পতিমিশ্র	১০০০
বাৎস্যায়ন, কামসূত্র	৪০০
বাদিদেব সূরি	১১০০/১২০০
বাদিরাজ সূরি	১১০০
বিদ্যানন্দ বা বিদ্যানন্দী	৯০০
বিষ্ণুপুরাণ	১০০-৩৫০
বিষ্ণুধর্মোত্তর-মহাপুরাণ	৪০০-৫০০
ব্যোমশিব	৭০০
ভাববিবেক	৫০০-৬০০
ভাবিবিক্ত	৮০০
ভাসর্বজ্ঞ	১০০০
ভাস্কর	৯০০/১০০০
মৎস্যপুরাণ	২৭৫-৩২৫
মধুসূদন সরস্বতী	১৬০০
মহাভারত	খ্রিপূ ৪০০-৪০০ খ্রি
মাঠরবৃত্তি (*সাংখ্যকারিকা*-র ব্যাখ্যা)	৭০০
মাধব সরস্বতী	১৫০০
রাজশেখর	১৪০০
রামায়ণ	৪০০
শঙ্করাচার্য	৯০০
শান্তরক্ষিত	৮০০
শালিকনাথমিশ্র	৯০০
শীলাঙ্ক	৯০০
শ্রীধর	১৫০০
শ্রীহর্ষ	১২০০
সদানন্দ কাশ্মীরক	১৭০০
সদানন্দ যোগীন্দ্র (যতি)	১৬০০
সামঞ্ঞ-ফল-সুত্ত	খ্রিপূ ৪০০
সূত্র-কৃতাঙ্গ-সূত্র	খ্রিপূ ৪০০
সায়ণ-মাধব	১৪০০
সিদ্ধর্ষি	৯০০/১০০০
সোমদেব সূরি	১০০০
হরিভদ্র	৮০০
হেমচন্দ্র	১২০০

অধ্যায় ২

চার্বাকচর্চার ধারা : রচনা-সমীক্ষা

চার্বাক-এর পরিচয় দিতে গিয়ে কিছুকাল আগে এক পণ্ডিত বেশ ব্যাজারভাবে লেখেন :

> চার্বাক (আনুমানিক ৮০০ খ্রিপূ (!)) : প্রাচীন ভারতের এক ইহসুখবাদী (হেডনিস্ট) চিন্তাবিদ্। তিনি ছিলেন খোলাখুলি ধর্মবিরোধী এবং কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেন নি। একটি রাজনৈতিক দলের সভ্যরা গুহ্য কোনো কারণে এখন তাঁর ভাবনাচিন্তাকে লোকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।[১]

বোঝাই যায়, মার্কসবাদীরাই শেষ কথাটির চাঁদমারি। কিন্তু চার্বাককে তুলে ধরার ব্যাপারে যদি কাউকে দোষী করতে হয়, তবে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হবে তিনি— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শুনতে যতই অবাক লাগুক, ঘটনা তা-ই।

সর্বদর্শনসংগ্রহ প্রকাশ

চার্বাক/লোকায়ত সম্বন্ধে জানার সবচেয়ে পরিচিত উৎস : সায়ণ-মাধব-এর *সর্বদর্শনসংগ্রহ*। তার প্রথম অধ্যায়েই চার্বাকমতের সারসঙ্কলন করা হয়েছে। বইটি নিজের উদ্যোগে সম্পাদনা করেন বিদ্যাসাগর।[২] তার থেকেই লোকে— এদেশে ও বিদেশে— প্রাচীন ভারতের আপসহীন নিরীশ্বরবাদী বেদবিরোধী বস্তুবাদী এই দর্শনের কথা জানতে পারলেন। তার আগে এ বিষয়ে পণ্ডিতদেরও জ্ঞান ছিল নামমাত্র: হেনরি টমাস কোলব্রুক-এর কিছু মন্তব্যই ছিল একমাত্র সম্বল। চার্বাক সম্বন্ধে কোলব্রুক-এর জানার একমাত্র উৎস ছিল সাংখ্য ও বেদান্তসূত্র-র কটি ভাষ্য। কিন্তু এই দর্শনটি যে 'খোলাখুলি বস্তুবাদ', undisguised materialism তা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধে হয় নি। আরিস্তোতল-এর অনুগামী মেসেন-এর দিকাইআরকুস/ ডিসিয়ারকাস (দিকাইআরখস)-এর সঙ্গে তিনি এর মিল দেখতে পান।[৩] এ ছাড়া

হেমচন্দ্র-র *অ-চি*-তে* 'বার্হস্পত্য বা নাস্তিক' ও 'চার্বাক বা লোকায়ত'-র উল্লেখ থেকে কোলব্রুক সিদ্ধান্ত করেন : এ দুটি দর্শন "নিরীশ্বরবাদ বলে কথিত, যেহেতু পরকাল ও ঈশ্বরকে এরা অস্বীকার করে"।[৪] তারপর *স-দ-স*-র সূত্র ধরেই পুরোদমে চার্বাকচর্চা শুরু হলো। এর দায়দায়িত্ব তাই বিদ্যাসাগরের ওপরেই পরোক্ষে এসে পড়ে।[৫]

আশ্চর্যর বিষয়, বিদ্যাসাগরের কোনো জীবনীকার/গবেষক কাজটির গুরুত্ব বোঝেন নি। বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত সংস্কৃত বই-এর তালিকায় প্রথমেই অবশ্য *স-দ-স*-র নাম থাকে। প্রকাশের সময়টা দেওয়া হয় একটু অদ্ভুতভাবে : ১৮৫৩-৫৮। আসল ঘটনা এইরকম : দ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-র বিবলিওথেকা ইন্ডিকা বলে একটি গ্রন্থমালা আছে। বিদ্যাসাগর নিজেই প্রস্তাব করেন : এই গ্রন্থমালায় তিনি *স-দ-স* বইটি সম্পাদনা করে ছাপাতে চান, নইলে মূল্যবান কাজটি হারিয়ে যাবে। সোসাইটি-র কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হন। তারপরে ঐ গ্রন্থমালার ৬৩ ও ১৪২ সংখ্যক গ্রন্থভাগ (fascicule) হিসেবে ১৮০ পৃষ্ঠার বইটি দুভাগে, ১৮৫৩ ও ১৮৫৮-য় ছেপে বেরয়। ১৯৮৬-তে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।[৬]

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময়ে (১৮৫১-৫৮), নানা কাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর এই দামি কাজটিও করেছিলেন। মনে রাখা দরকার, ১৮৫৫-র গোড়া থেকে তিনি বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। সেই নিয়ে কাগজে-কলমে বিতর্ক, আইন করার ব্যবস্থা, তার জন্যে আবেদনপত্রে সই জোগাড়, আইন পাশ হওয়ার পর কালীমতী দেবী ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-র প্রথম বিধবা বিবাহ— এ সবই চলছিল। তবু, এত ঝামেলার মধ্যেও, বিদ্যাসাগর যে *স-দ-স* সম্পাদনার কাজ শেষ করেছিলেন— এও দেখবার।

সম্পাদনা ও অনুবাদ

স-দ-স-র লেখক সায়ণ-মাধব বা মাধবাচার্য নিজে ছিলেন বৈদান্তিক, শঙ্করাচার্য-র অনুগামী। প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন বিজয়নগরের (এখন কর্ণাটকের অন্তর্ভুক্ত) রাজা বুক্কবীর-এর মুখ্যমন্ত্রী। বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে 'বিদ্যারণ্য' নাম নিয়ে শৃঙ্গেরী পীঠ (শাঙ্কর মঠ)-এ শেষ জীবন কাটান। কেউ কেউ বলেন, বেদব্যাখ্যার সঙ্কলক সায়ণ আর মাধব ছিলেন দুই ভাই। কেউ বা বলেন, দাদার নামে এটি সায়ণ-এরই লেখা। যা-ই হোক, চোদ্দো শতকে দক্ষিণ ভারতে যে ষোলোটি দর্শনের কথা জানা ছিল, *স-দ-স*-য় তার সবকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে। চার্বাক দিয়ে শুরু, আর সব দর্শনের যা শিরোমণি হয়ে গেছে (মাধবের মতে) সেই শাঙ্কর বেদান্ত (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য-র অদ্বৈতবাদী বেদান্ত) দিয়ে বইটি শেষ।[৭]

* সংক্ষেপসূচি ও রচনাপঞ্জি দ্র.।

বইটির পুঁথি উত্তর ভারতে সহজে পাওয়া যেত না; বাঙলার পণ্ডিতসমাজে এর কোনো চলই ছিল না। কলকাতায় একটি পুঁথি প্রথম জোগাড় করেন হোরেস হেম্যান উইলসন। তাঁর একটি রচনায় তিনি এটি ব্যবহারও করেছিলেন।[৮] আর একটি পুঁথি ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি-র সংগ্রহে।[৯] আদতে এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পত্তি। সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালায় বইটি পড়ে বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন : কলকাতার ঐ দুটি পুঁথি থেকেই *স-দ-স*-র সম্পাদনা করা যাবে। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলেন : দুটি পাঠে বেশ কিছু ফারাক আছে; আরও পুঁথির সঙ্গে না মেলালে চলবে না। সারা বাঙলায় আর কোনো পুঁথি পাওয়া গেল না। শেষে বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ফিট্স্এডওয়ার্ড হল্ তিনটি পুঁথি পাঠিয়ে দেন। মোট এই পাঁচটি পুঁথি দেখে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের দুজন অধ্যাপকের (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি) সাহায্যে বিদ্যাসাগর সম্পাদনার কাজ শেষ করেন। ভূমিকার তারিখ : ২০ জানুয়ারি ১৮৫৮। এটিই হলো *স-দ-স*-র সর্বাদি সংস্করণ, *editio princeps*।

বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন বিখ্যাত সংস্কৃতবিদ্ ই. বি. কাওয়েল। ইনি বেশ ভালো বাঙলা জানতেন, বলতে ও লিখতেও পারতেন, মুকুন্দ চক্রবর্তীর *চণ্ডীমঙ্গল*-এর কিছু অংশ ইংরিজিতে তর্জমাও করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, *স-দ-স* বেরনোর পর কলকাতার 'বিদ্বান্ হিন্দুদের মধ্যে' বেশ আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল।[১০] সে-আগ্রহ দেখা গিয়েছিল ইওরোপ-এও, বিশেষ করে চার্বাকদর্শন নিয়ে। *স-দ-স*-র চার্বাকদর্শন অধ্যায়টির একটি জার্মান তর্জমা বেরল জার্মান প্রাচ্য সমিতির পত্রিকায় (১৮৬০)।[১১] আধুনিক ভাষায় এটিই *স-দ-স*-র কোনো অধ্যায়ের প্রথম অনুবাদ। ইংরিজিতে এই অধ্যায়টি প্রথম আংশিক তর্জমা করেন জে. [জন] মিউঅর (১৮৬১)।[১২] *স-দ-স* ছাড়াও *বি-পু* ও *রামায়ণ* থেকে চার্বাক তথা ভারতীয় বস্তুবাদের নিদর্শন হিসেবে আরও কিছু শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত/অনুবাদ করেন। এই লেখাটিকেই চার্বাক/লোকায়ত চর্চার— বিশেষ করে প্রাচীন ভারতে স্বাধীন চিন্তা নিয়ে প্রথম বিদগ্ধ আলোচনা বলা যায়। এর পরের বছরেই কাওয়েল একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায় ও *নৈ-চ* (সর্গ ১৭)-র প্রাসঙ্গিক অংশের ইংরিজি অনুবাদ করে দেন (১৮৬২)।[১৩] বলা বাহুল্য, *স-দ-স*-র ক্ষেত্রে দুজনেই বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত সংস্করণটি ব্যবহার করেছিলেন।

এরপর *স-দ-স*-র চার্বাক ও পঞ্চরাত্র-দর্শন বিষয়ক দুটি অধ্যায়ের ফরাসি তর্জমা করলেন সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৭৯)।* কাওয়েল-ও চার্বাকসমেত আরও কয়েকটি

---

* যে যে নামের পাশে * চিহ্ন দেওয়া আছে, সেগুলি আমি নিজের চোখে দেখি নি। মূলত পটার (১৯৯৫) থেকে তথ্য জোগাড় করেছি। পটার কিন্তু সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নন। টী. ১৬ দ্র.।

অধ্যায়ের ইংরিজি অনুবাদ বার করতে থাকেন বারাণসীর *দ পণ্ডিত* পত্রিকায় (১৮৭৪-৭৮)। প্রথম অধ্যায়টি পড়ে বেশ চমকে যান ফ্রিডরিশ মাক্স্ ম্যুলর : 'মৃদুস্বভাব হিন্দু' এইভাবে বেদের মহিমাকে উড়িয়ে দিয়েছে।[১৪] তাঁর হিবার্ট বক্তৃতামালায় (১৮৭৮) কাওয়েল-এর অনুবাদ থেকে একটি বড় অংশ তিনি উদ্ধৃত করেন।

কাওয়েল ও এ.ই. গাফ-এর মিলিত চেষ্টায় পুরো *স-দ-স*-র ইংরিজি তর্জমা বই হয়ে বেরল ১৮৯২-এ। দুবছরের মধ্যে তার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। বইটির এত চাহিদা বাড়ে যে তার চতুর্থ সংস্করণ (১৯০৪)-এর একটি শস্তা পুনর্মুদ্রণ বার করতে হয় (১৯১৪)।

ইতালি-র ভারতবিদ্‌রা এই সময়ে ভারতীয় বস্তুবাদ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেন। জার্মানিতেও লেখাপত্র বেরতে থাকে। রুশ ভাষায় এ নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন ফিওদর চেরবাটস্কয় (থিওডোর চেরবাট্স্কি), ১৯২৭-এ।[১৫] তাঁরও মূল অবলম্বন ছিল বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত *স-দ-স* এবং সমকালীন ইওরোপীয় ভারতবিদ্‌দের রচনা।

মূল *স-দ-স* পরে বহুবার ছাপা হয়েছে। তারানাথ তর্কবাচস্পতি এটি বার করেন ১৭৯৩ শকাব্দে (কাওয়েল বলেছেন, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে)।[১৬] জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৯) ও মহেশচন্দ্র পাল (১৯৫০ সংবৎ = ১৮৯৩ খ্রি)-ও বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত পাঠই পুনর্মুদ্রণ করেন। সংস্করণ হিসেবে এগুলি মূল্যহীন, কারণ নতুন কোনো পুঁথি আর দেখা হয় নি। তবে মহেশচন্দ্র পালের সংস্করণে বাঙলা হরফে মূলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদও ছিল।

শেষ অধ্যায় উদ্ধার

এতকাল *স-দ-স*-র যত পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল তার কোনোটিতেই শেষ অধ্যায় (শাঙ্কর বেদান্ত দর্শন)-টি ছিল না। অধ্যায় ১৫-র শেষে লেখা ছিল : "এর পরে সর্বদর্শনের শিরোমণীভূত শাঙ্করদর্শন অন্যত্র লেখা হয়েছে, এখানে তা উপেক্ষা করা হলো।" পুণার আনন্দাশ্রম থেকে *স-দ-স*-র যে প্রথম সংস্করণটি বেরয় (১৮২৮ শক = ১৯০৬ খ্রি), তাতেও এই অধ্যায়টি ছিল না। কাওয়েল *স-দ-স*-র বেশ কয়েকটি পুঁথি দেখেছিলেন। তার সবকটিই, তাঁর বিবেচনায়, একটি দুষ্পাঠ্য তেলুগু পুঁথির অনুলিপি। পুণার ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা-সংশোধন-মন্দির থেকে বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যংকর নিজের লেখা টীকা *দর্শনাঙ্কুর* সমেত *স-দ-স*-র একটি সুষ্ঠু সংস্করণ বার করেন (১৯২৪)। নতুন পাওয়া একটি পুঁথি ('ডি', D বলে চিহ্নিত) থেকে শাঙ্করদর্শন অধ্যায়টি এতেই প্রথম যোগ হলো। এরপরে আনন্দাশ্রম থেকে বিনায়ক গণেশ আপটে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯২৮) বার করলেন। কাশীর দুটি ও পুণার একটি পুঁথি থেকে শেষ অধ্যায়টির আরও নির্দিষ্ট পাঠ পাওয়া গেল।

এই সংস্করণের ভূমিকায় আপটে একটি অদ্ভুত কথা বলেছেন : আনন্দাশ্রম-এর প্রথম সংস্করণটিতেই নাকি *স-দ-স*, শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, পৃথিবীতে প্রথম ছাপা হলো, বঙ্গদেশে কোনো একদিন তা ছাপা হয়েছিল, সে-কথা তিনি শুনেছিলেন মাত্র। তারপর এটি আর কখনও সম্পাদিত হয় নি। এদেশে *স-দ-স*-র অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও প্রচার প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। অথচ, আপটে নিজেই বলেছেন, এর মধ্যে ইংরিজি ও মরাঠীতে বইটির অনুবাদ হয়ে গেছে। আমরা আগেই দেখেছি, কলকাতা থেকে বইটি অন্তত চারবার ছাপা হয়েছে, বাঙলা অনুবাদও বেরিয়ে গেছে।

অভ্যংকর ও আপটে দুজনেই কলকাতায় ছাপা একটি বইকে 'আদর্শ-পুস্তক'-এর তালিকায় উল্লেখ করেছেন (যথাক্রমে 'বি', B ও 'ভ' বলে চিহ্নিত), কিন্তু তার সম্পাদক/প্রকাশকের নাম দেন নি। অনুমান করি, তাঁরা বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত সংস্করণটির কথাই বলতে চেয়েছেন।

নবরূপে বাঙলায়

বিদ্যাসাগর শুধু সংস্কৃত বইটি সম্পাদনা করেই ক্ষান্ত হলেন না। তার বাঙলা তর্জমারও ব্যবস্থা করলেন। এর দায়িত্ব তিনি দেন তাঁরই অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে। জয়নারায়ণ নিজেই সে-কথা লিখেছেন :

> বিশ্ববিখ্যাত, অসামান্য ধীসম্পন্ন, বিবিধ বিদ্যাসমুদ্র শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন [১৮৫১-১৮৫৮] তৎকালে তিনি আমাকে ঐ পঞ্চদশ দর্শন ও শাঙ্কর দর্শনের স্থূলমর্ম্ম সকল বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত করিয়া প্রচারিত করিতে কহেন। তিনি যৎকালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তৎকালে আমার নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ আছে। তাঁহার প্রবর্ত্তানুসারে আমি এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হই।[১৭]

এইভাবে "*সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*। /কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক/ শ্রীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক/বাঙ্গালা ভাষায়/সঙ্কলিত।" বেরল ১৯২১ সংবতে (১৮৬৪ খ্রি)। জয়নারায়ণ অবশ্য পুরো বইটি একাই সঙ্কলন করেন নি। "বিজ্ঞাপন"-এ তিনি জানিয়েছেন :

> ...আমার অধিক অবকাশ না থাকাতে মদীয় ছাত্র শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে কিয়দংশ লিখিতে ভার অর্পণ করি।... ইনি এই পুস্তকের কিয়দংশ লিখিয়া আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব করিয়াছেন।

এ ব্যাপারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য একটু অন্য কথা বলেছেন।[১৮] তাঁর মতে, "সে-যুগের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তি" জয়নারায়ণ কাজটি হাতে নিলেও, "ঐ বিবেকবান

বিদ্বান অচিরেই দেখতে পেলেন, সেটি তাঁর সাধ্যের অতীত। চার্বাকদর্শন তিনি ঠিকই অনুবাদ করলেন। কিন্তু তার পরের দুটি দর্শন, বৌদ্ধ ও আর্হত [= জৈন], তাঁর পক্ষে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াল; হতাশ হয়ে তিনি কাজটি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আরও সাহসী একজন ছিলেন। ইনি পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, তখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। সাহসভরে তিনি গোটা বইটিই অনুবাদ করলেন আর বার করলেন নিজের নামেই। তাঁর গুরু ঐ অনুবাদ সম্পর্কে একটি ভূমিকা লিখে দেন। মহেশচন্দ্রকে বইটি দিয়েছিল খ্যাতি, আর, আমি বলব, প্রচুর অর্থ।"

হরপ্রসাদের কথার পুরোটা ঠিক নয়। ১৮৮৯-এ 'তৃতীয়বার মুদ্রিত' সংস্করণটি আমি দেখেছি। সেটি জয়নারায়ণের নামেই বেরিয়েছে; "বিজ্ঞাপন"-এ তিনি মহেশচন্দ্রর নাম করেছেন। তবে এর কতটা তাঁর নিজের লেখা, আর কতটা তাঁর ছাত্রর— আজ আর তা বলা সম্ভব নয়। *নব্যভারত* পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "[মহেশচন্দ্র] সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়া স্বীয় গুরুদেবের নামে তাহা প্রচারপূর্ব্বক গভীর গুরুভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।"[১৯]

এটি আবার আগের কোনো বিবরণের সঙ্গেই মেলে না। যা-ই হোক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জীবনে *স-দ-স*-র প্রভাব বড় কম ছিল না। "চার্বাকদের বিবরণে শ্লোক-অংশটি", তিনি লিখেছেন, "আমি আপন করে নিলাম! কৌতূহলের তাড়নায় চার্বাকদের সম্পর্কে আরও অন্যান্য সূত্রেরও খোঁজ করলাম...।" এইভাবেই তাঁর লোকায়ত-চর্চার সূত্রপাত। প্রথমে বাঙলায়, পরে মূল সংস্কৃত-য় বইটি পড়ে তিনি রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে যান। এরই পরিণাম তাঁর ইংরিজি প্রবন্ধ "লোকায়ত" (১৯২৫)। পরে এটি একাধিকবার ছাপা হয়েছে।[২০]

চার্বাক প্রসঙ্গে দুই বিজ্ঞানী

জয়নারায়ণের *স-দ-স* পড়ে মুগ্ধ হন আর-একজন বিদ্বান্। বিজ্ঞানী ও স্বদেশী-প্রচারক হিসেবেই তাঁর পরিচয়। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯০৯-এ তিনি লেখেন :

> ভারত যে শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি যথেষ্টই বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল। এমন কি মহর্ষি কপিল ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই, কেন না ইহা সহজে প্রমাণ হয় না। কপিল তথাপি বেদের দোহাই দিয়াছেন। যাহা হউক, ষড়দর্শন ও উপনিষদে বেদ অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র হিন্দুজাতির মুখ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাকমুনি শ্রুতিও অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন...।[২১]

এরপরে জয়নরারায়ণের *স-দ-স* থেকে প্রায় দুপাতা উদ্ধৃত করে প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, "সেই সময় স্বাধীন চিন্তা কতদূর উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল তাহা চার্ব্বাকদর্শন আলোচনা করিলেই বোঝা যায়।"

চার্বাকের কথা তুলেছেন আর একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, প্রফুল্লচন্দ্ররই ছাত্রতুল্য : মেঘনাদ সাহা। বেদ নিয়ে বিতর্কর সময়ে (১৯৩৯) তিনি লেখেন :

> [অনিলবরণ রায়] কি জানেন না যে লোকায়ত মতে
>
> ত্রয়ঃ বেদকর্ত্তারঃ ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ।
>
> অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যাহারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করা দুরূহ; শুধু কতকগুলি ভণ্ড লোকে বেদের অর্থ না জানিয়াও বেদের দোহাই দিয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই...।[২২]

উদ্ধৃতিতে একটু ভুল আছে (হওয়া উচিত : ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো...), কিন্তু বক্তব্য পরিষ্কার।

বাঙলায় চার্বাকচর্চা : উনিশ শতক

স-দ-স-র চার্বাকদর্শন-অধ্যায়ের প্রথম বাঙলা অনুবাদক হিসেবে নাম পাওয়া যাচ্ছে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর* (১৮৬৭)। পুরো বইটির মূলসমেত বাঙলা তর্জমা বার করেন মহেশচন্দ্র পাল (সংবৎ ১৯৫০ = ১৮৯৩ খ্রি। অনুবাদকের নাম নেই)। প্রকাশ করা হয়েছিল নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা থেকে।[২৩] চার্বাক সম্বন্ধে এঁদের মনোভাব কী হবে তা এর থেকেই আন্দাজ করা যায়। তর্জমার শেষে একটি পাদটীকায় বলা ছিল : "এই সকল দর্শনশাস্ত্র জনসমাজে অপ্রকাশিত থাকাই কর্ত্তব্য।"

বাঙলায় চার্বাকদর্শন নিয়ে প্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৪)।[২৪] *স-দ-স*-ই তার মূল ভিত্তি। পরে এটি তাঁর *নানা প্রবন্ধ* (১৮৮৫) বইতেও সঙ্কলিত হয়।[২৫] লেখাটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ বেণীমাধব বড়ুয়া (১৯২১)।[২৬] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে-যুগে একটা বড় কাজ করেছিলেন, সন্দেহ নেই।

চার্বাক নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আলাদা করে কিছু লেখেন নি। কিন্তু *বঙ্গদর্শন* পর্বে, সাংখ্যদর্শন ও অন্যান্য আলোচনা প্রসঙ্গে চার্বাকের কথা তাঁর লেখাতেও এসেছে। সমকালীন ইওরোপীয় দর্শনের গতিপ্রকৃতি দেখে তিনি গর্বভরে লিখেছেন :

> অনেকে দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, দর্শনশাস্ত্র দুই তিন সহস্র বৎসরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই চার্ব্বাকের মতে আসিয়া পড়িতেছে। ধন্য আর্য্যবুদ্ধি! যাহা এত কালে হ্যুম, মিল, বেন [Hume, Mill, Bain] প্রভৃতির দ্বারা

> সংস্থাপিত হইয়াছে— দুই সহস্রাধিক বৎসর পূৰ্ব্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। (...)
>
> পাঠক আবার দেখিবেন যে, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। যেমন, চাৰ্ব্বাকের প্রত্যক্ষবাদে, মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের সাদৃশ্য দেখা গিয়াছে।[২৭]

পরে অবশ্য বঙ্কিমের মতামত প্রায় পুরোপুরি ঘুরে যায়। তবু *ধৰ্ম্মতত্ত্ব* (পরিচ্ছেদ ১১)-য় তিনি বেদ-এর বিরুদ্ধে 'ত্রিবিধ বিপ্লব'-এর কথা বলেছিলেন : ১. চার্বাক, ২. শাক্যসিংহ (= বুদ্ধ), ও ৩. ব্রহ্মবাদী দার্শনিককুল (= উপনিষদ্‌গুলির লেখকবৃন্দ)। তাঁর মনে হয়েছিল : "সেই [ত্রিবিধ] বিপ্লবের ফলে আশিয়া [এশিয়া] প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত।"

বঙ্কিম যে *স-দ-স* পড়েছিলেন তা বোঝা যায় মীমাংসা-সাংখ্য বিরোধের বিবরণ থেকে (১৮৭৫)।[২৮]

চার্বাক, হেতুবাদ ও আধুনিক দর্শন

১৯০৯-এ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন "ভারতের নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত।"[২৯] *স-দ-স* ছাড়াও আরও বেশ কিছু সূত্র তিনি উল্লেখ করেন। প্রবন্ধটির ষষ্ঠ অধ্যায় ছিল চার্বাকদর্শন। তিনি শুধু নাস্তিক্যবাদেরই পরিচয় দেন নি, ভারতীয় চিন্তায় যুক্তিবাদের পুরো ধারাটিই তুলে ধরেছেন। আলাদা পুস্তিকা হিসেবে এটি আবার ছাপা উচিত।

এর দু-বছর পরে, *বঙ্গদর্শন*-এই "চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ভূপেন্দ্রনাথ দে।[৩০] উপসংহারে তিনি জানান :

> চাৰ্ব্বাক এবং ঐ মতাবলম্বী দর্শনকারগণের মতসমূহ মানবসমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, ইহলোক দুঃখময় নহে এবং সুখ পরিত্যজ্য [পরিত্যাজ্য] নহে। তাঁহারা শিখাইয়াছেন শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিই প্রধান। তাঁহারা অনুমানের মূল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, নৈয়ায়িকদিগকে উক্ত মূলের প্রকৃত বলাবল বুঝিতে ও তাহা দৃঢ় করিতে সমর্থ করিয়াছেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন, প্রমাণ ও যুক্তিবল দ্বারা বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপণের দিকে মানব মনকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

বোঝা যায়, শুধু নির্বিকার বিদ্যাচর্চার তাগিদে ভূপেন্দ্রনাথ দে চার্বাক পড়েন নি, তাঁর পক্ষপাতও ছিল সেইদিকে। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ ও -জ্যেষ্ঠ। ভূপেন্দ্রনাথ দে এই প্রসঙ্গে ফরাসি বৈজ্ঞানিক লাভোয়াসিএ-র একটি পরীক্ষার উল্লেখ করে বলেন : "জন ষ্টুয়ার্ট মিল, কমটে [কোঁত] প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক

দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী।" বস্তুবাদ আর ধ্রুববাদ (পজিটিভিজম)-কে এক করার এই প্রবণতা ঐ সময়ে আরও কারও কারও লেখায় দেখা যায়।

নতুন পর্যায় : চার্বাকমত সঙ্কলন

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর লেখাদুটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১৮৬৪-১৯৬১)। কেন জানি না, ভূপেন্দ্রনাথ দে-র লেখাটি তাঁর নজরে পড়ে নি। যা-ই হোক, এবার চার্বাক নিয়ে একাগ্র চর্চায় মন দিলেন দক্ষিণারঞ্জন। ইংরিজিতে *চার্বাক ষষ্টি* (১৯২৮) এ বিষয়ে তাঁর প্রথম বই।[৩১] *স-দ-স* ছাড়াও আরও যত সূত্রে লোকায়ত বা বার্হস্পত্য মতের কথা আছে সেগুলি একত্র করাই ছিল দক্ষিণারঞ্জনের লক্ষ্য। এমন ৬০টি শ্লোক ও ১০০টি সূত্র তিনি এখানে সঙ্কলন করেন। সারা জীবন ধরে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, চার্বাক নিয়েও তিনি বাংলা ও ইংরিজিতে অনেক কটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লেখেন। বাংলা লেখাগুলি পরে *চার্বাক দর্শন* (১৯৫৯, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৮২)-এ স্থান পেয়েছে।[৩২]

চার্বাক বিষয়ে দক্ষিণারঞ্জনের আগ্রহও নিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার মধ্যে আটকে ছিল না। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি লোকায়ত-র পক্ষ সমর্থন করেছেন। তাঁর মনে হয়েছিল, আধুনিক ভারতে এই মতকে আবার জাগিয়ে তোলা দরকার। চার্বাক-বিরোধীরা তাঁদের পূর্বপক্ষকে 'বাবদূক' (বাচাল) বলে বিদ্রূপ করেছিলেন। যেন তারই উত্তরে দক্ষিণারঞ্জন বলেছেন :

> এই বাবদূক বহুশ্রুত [= বিদ্বান] চার্ব্বাক সম্প্রদায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই, পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিতেছে। দেশ ও কাল ইহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে পারে নাই। পারিবেও না।[৩৩]

প্রসঙ্গত একটা মজার ব্যাপারও বলে রাখি। *স-দ-স*-র ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জন, মূল সংস্কৃত বই ছাড়াও, জয়নারায়ণের অনুবাদও ব্যবহার করেছেন। "শাস্ত্রে বেদনিন্দা" প্রবন্ধে মাধবাচার্য-র অভিমত প্রসঙ্গে তিনি জয়নারায়ণের 'অনুবাদ'টিই উদ্ধৃত করেন— একটু ভাষা বদলে (যেমন, 'করতঃ'-র জায়গায় 'করাইয়া')। আগেই বলা হয়েছে, জয়নারায়ণ ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। এক জায়গায় তিনি এমন কিছু কথাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন যা *স-দ-স*-র মূলে ছিল না।[৩৪] দক্ষিণারঞ্জন সেটি খেয়াল করেন নি, ফলে ঐ কথাগুলিও মাধবাচার্য-র উক্তি বলেই চলে গেছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও ঐ অংশটি একইভাবে উদ্ধৃত করেছিলেন।[৩৫]

এই ধারায় আরও দুটি রচনার কথা বলা যায়। হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত-য় *চার্বাকদর্শনম্* (১৯৩৫) বলে একটি বই লিখেছিলেন। তার বাঙলা তর্জমা করেন সুধীরমোহন সাংখ্যতীর্থ। প্রাচ্যবাণী-র সার্বজনীন গ্রন্থমালায় (ত্রয়োদশ পুষ্প)

চার্বাক দর্শন নামে একটি পুস্তিকা লেখেন গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী (১৯৫৪)। মূলত *স-দ-স*-র ভিত্তিতে লোকায়তমতকে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থিত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

লোকায়ত : নতুন মূল্যায়ন

মার্কসবাদীদের মধ্যে চার্বাক নিয়ে বোধহয় প্রথম আলোচনা করেন সরোজ আচার্য। ১৯৪৩-এ তিনি এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।[৩৬] পরে তাঁর *মার্কসীয় দর্শন* বই-এও এটি স্থান পেয়েছে।[৩৭] ভাবতে ভালো লাগে, তাঁর প্রবন্ধটি পড়েই "লোকায়ত মত" নিয়ে আরও কিছু লিখতে উদ্বুদ্ধ হন ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৪৩-৪৪)।[৩৮] প্রবন্ধর শুরুতেই তিনি বলেছেন : "...বর্তমানের উপাসক লোকায়তিকদের সাহসের প্রশংসা করি।" আর সুখ— ইহলোকের সুখ— সম্বন্ধে লোকায়তিকদের মনোভাব প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

> লোকায়তিকদের এই চেষ্টা একেবারে বিফলও হয় নাই। পরবর্ত্তী উপনিষৎগুলির মধ্যে বাহ্য আচারাদির ব্যর্থতা যে দেখা যায় (মৎ প্রণীত ভারতের সংস্কৃতি, পৃ. ৪৪-৫০), সর্ব্বমানবের প্রতি যে সমদৃষ্টি দেখা যায় (ঐ, পৃ. ৬৪-৭০) তাহা এইসব সাধকদের সাধনার কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী। প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধেরা ইঁহাদের কম গালি দেন নাই তবু পরবর্তী যুগে তাঁহারাও সুখবাদ প্রচার করিয়াছেন (...)।
>
> মধ্যযুগেও ইঁহাদের প্রতিধ্বনি পাই। কবীর বলেন "সুখ-আলয় এই সংসারে আসিয়া বৃথাই পিপাসিত ফিরিও না।"...
>
> এই সব ভাবের ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তবে আর ইহাকে ব্যর্থ বলি কেমন করিয়া?

ক্ষিতিমোহন ঐ প্রবন্ধর এক জায়গায় লিখেছেন, "ষড়্‌দর্শন সংগ্রহের একখানি অতি পুরাতন সংস্করণ আমার হাতের কাছে রহিয়াছে। তাহা ১৮৫৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত...।" লেখার বা ছাপার ভুলে *সর্বদর্শনসংগ্রহ* হয়ে গেছে *ষড়্‌দর্শনসংগ্রহ*।

মার্কসীয় বিশ্লেষণের বিস্তার

বিদ্যাসাগর ঐ বইটি বার করার প্রায় একশ বছর পরে, ১৯৫৬-য় চার্বাকচর্চা এক নতুন মোড় নেয়। ঐ বছরেই বেরল দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *লোকায়ত দর্শন*। এর পরিবর্ধিত ইংরিজি রূপ *লোকায়ত* বেরয় ১৯৫৯-এ। দেবীপ্রসাদের বইটির দৌলতেই লোকায়ত দর্শন বাংলা তথা ভারতের মার্কসবাদীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত

হয়ে ওঠে। দেবীপ্রসাদের আগ্রহ ছিল বহুমুখী। ভারতের দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে তিনি এরপরে বহু মৌলিক গবেষণা করেন। কিন্তু লোকায়ত বিষয়ে তাঁর আগ্রহ কখনও ফুরিয়ে যায় নি। *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে* (১৯৮৭, এর ইংরিজি ও হিন্দী তর্জমাও বেরিয়েছে) ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সম্পাদিত *চার্বাক/লোকায়ত* (ইংরিজিতে, ১৯৯০) বই দুটিই তার প্রমাণ।

দেবীপ্রসাদের প্রথম বইটিকে জোসেফ নীডহ্যাম, জে.বি.এস.হলডেন প্রমুখের মতোই স্বাগত জানিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। দেবীপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দক্ষিণারঞ্জন সমেত তাঁর সব পূর্বসূরির কাছে। তাঁর প্রথম বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে 'মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্মরণে'। কিন্তু দেবীপ্রসাদ বোধহয় কোনোদিন খেয়াল করেন নি : চার্বাকচর্চার পথটি খুলে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জানলে খুশি হতেন, সন্দেহ নেই।[৩৯]

আরও হালের কিছু কাজ

দেবীপ্রসাদের *লোকায়ত দর্শন* বেরনোর পর চার্বাকচর্চা থেমে যায় নি। "চার্বাকদর্শন" নামে মূল্যবান দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য (১৯৫৮/৫৯)[৪০] ও জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য (১৯৬২)।[৪১] এ ছাড়া ঐ একই নামে দুটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন লতিকা চট্টোপাধ্যায় (১৯৮২) ও হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৩)। দ্বিতীয় বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লোকায়ত-বিরোধীদের চিন্তায় কীভাবে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ কাজ করেছিল তার এক চমৎকার বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যায়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে চার্বাকচর্চার ক্ষেত্রে এটি খুবই মৌলিক অবদান।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরিজিতে একটি ছোটো বই লিখেছেন *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ চার্বাক প্রসঙ্গ নিয়ে (১৯৯৮)।

স-দ-স অনুবাদের ক্ষেত্রেও কয়েকটি কাজের নাম করা যায়। *সাহিত্যপত্র* পত্রিকায় তার অনেককটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন নরনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৮-৫০)। পরে সম্পূর্ণ অনুবাদটি বই হয়ে বেরয় (১৯৫২)। এরকম আর একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (১৩৮৩ ও ১৩৮৬ ব)।

"চার্বাকদর্শন" অধ্যায়ের আলাদা করে একটি সটীক অনুবাদ করেছেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য (১৯৭৪, ১৯৭৬)। 'ভূষণী' ও 'দূষণী'— এই নামে দুটি বাঙলা টীকা সমেত আরও একটি অনুবাদ আলাদা বই হিসেবে বার করেছেন পঞ্চানন শাস্ত্রী (১৯৮৭)।

চার্বাক সূত্রসংগ্রহ : সর্বশেষ পরিস্থিতি

চার্বাকসূত্র সংগ্রহর কাজে দক্ষিণারঞ্জনের পরে অগ্রগতি হলো জাপানি ভারতবিদ মামোরু নামাই-এর হাতে।[৪২] ১৯৭৬-এ ছ-টি ভাগে তিনি চার্বাকসূত্রগুলির নতুন

বিন্যাস করলেন। নামাই-এর কাজটির বৈশিষ্ট্য হলো : সংস্কৃত ছাড়াও তিব্বতী উৎস-র ব্যবহার। তবে সূত্র শব্দটি এখানেও একটু গোলমেলে। তার কারণ : এমন কিছু বাক্য সঙ্কলিত হয়েছে যেগুলি কোনো ভাষ্য বা টীকা থেকে উদ্ধৃত বলে মনে হয়। ২০০২-এ সম্ভাব্য সূত্র, টীকা-ভাষ্য থেকে উদ্ধৃতি আর চার্বাকদের নামে প্রচলিত শ্লোকগুলির ইংরিজি অনুবাদ সমেত আমি একটি সঙ্কলন প্রকাশ করি।[৪৩] সেখানে দক্ষিণারঞ্জন, নামাই ও আমার সঙ্কলনের একটি অনুক্রম (কনকর্‌ডান্‌স্)-ও দেওয়া আছে। প্রথম দুজন বিদ্বান্ যেগুলিকে খাঁটি চার্বাকবচন বলে ধরে নিয়েছিলেন, সেগুলি সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল। ফলে আমার সঙ্কলনটিতে যেমন কিছু আগে অসঙ্কলিত বচন আছে, তেমনি বহুদিন ধরে স্বীকৃত কিছু বচন বাতিলের দলেও পড়েছে। বিশেষ করে *কামসূত্র*-র কয়েকটি তথাকথিত সূত্রকে আমি চার্বাকবচন বলে মানতে পারি নি। তার যথাযোগ্য কারণ ঐ প্রবন্ধে হাজির করা হয়েছে (এই বই-এর অধ্যায় ৬-এ সে বিষয়ে একটি আলাদা আলোচনা আছে)।

অন্যান্য ভাষায় চার্বাকচর্চা

ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও নিশ্চয়ই লোকায়ত নিয়ে আলোচনা হয়। হিন্দী ও মরাঠীতে এ নিয়ে বেশ কিছু লেখাপত্র বেরিয়েছে। তার কিছু কিছু দেখার সুযোগও হয়েছে। গোপীনাথ কবিরাজ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বান্‌ও ইংরিজিতে এ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতের বাইরে, ইতালি ও জার্মানিতে চার্বাক নিয়ে প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র ইত্যাদি লেখা হয়েছে। পিজ্জাগাল্লি, সুআলি, তুচ্চি, ইআকবি, হিল্লেব্রান্ট, রুবেন ও ফ্রাউভালনের-এর নাম প্রথমেই মনে আসে। পটার-এর রচনাপঞ্জি-তে তার কিছু খবর পাওয়া যায়।[৪৪]

উপসংহার

রচনা-সমীক্ষা আপাতত এখানেই শেষ। আমার জানার বাইরে নিশ্চয়ই আরও কিছু কাজ রয়ে গেল।

সব মিলিয়ে ছবিটা দাঁড়ায় এইরকম :

চার্বাক/লোকায়ত বিষয়ে প্রথমে যে-আলোচনা হয়েছিল (১৮৫৩ বা ৫৮-র আগে পর্যন্ত) তাতে মালমশলা ছিল খুবই কম। কিন্তু দর্শনটির তাৎপর্য বুঝতে কারুরই ভুল হয় নি। *স-দ-স* বেরনোর পর থেকেই বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত। এখনও অবশ্য মৌলিক সূত্র বিশেষ পাওয়া যায় নি। তাই মতভেদের জায়গা অনেক। যেমন, 'চার্বাক' বলতে একটিই সম্প্রদায় বোঝায়, নাকি 'ধূর্ত' 'সুশিক্ষিত' ইত্যাদি একাধিক সম্প্রদায় ছিল?[৪৫] তেমনি *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* বইটি কি কোনো বস্তুবাদী লোকায়তিকের লেখা, না সর্বসংশয়বাদীর কাজ? এ নিয়েও পণ্ডিতরা একমত হতে পারেন নি।[৪৬]

অন্যান্য দর্শন-আলোচনার ক্ষেত্রে যা হয়, লোকায়ত-র বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। দেখা যায়, একদল নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে শুধু ব্যাখ্যা করছেন, কোনো মতামত দিচ্ছেন না। আর একদল তার পক্ষে বা বিপক্ষে কোমর বেঁধে নেমেছেন। সব মিলিয়ে ছবিটি কিন্তু বেশ রঙদার : সায়েব ভারতবিদ্, প্রথাগত ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিত, দর্শনের আপাত পক্ষপাতহীন অধ্যাপক, উৎসুক মার্কসবাদী, শৌখিন গবেষক— এমন বহু ধরণের লোক যোগ দিয়েছেন চার্বাকচর্চায়।

শুনলে হয়তো অনেকেই অবাক হবেন, কিন্তু ঘটনা এই যে, সুবিখ্যাত *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-র পুঁথি আবিষ্কার হয়েছে এই সেদিন, প্রথম ছেপে বেরিয়েছে ১৯০৯-এ।[৪৭] ভবিষ্যতে চার্বাক/লোকায়ত-র কোনো একটি মূল সূত্র ও ভাষ্যগ্রন্থ আবিষ্কার হবে— এমন আশা করা তাই অন্যায় নয় (যদিও দেবীপ্রসাদ গোড়া থেকেই এ ব্যাপারে হতাশ ছিলেন)। তখন আরও স্পষ্ট হবে চার্বাকদর্শনের প্রকৃত রূপ।

---

১. মনোমোহন ঘোষ, ২১৮ (বঙ্কিমচন্দ্রর ধর্মতত্ত্ব-র ইংরিজি তর্জমা)।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৫৩-৫৮), [দুটি গ্রন্থভাগে]।

৩. কোলব্রুক (১৮৩৭), ১ : ২৪০, ৩০৪, ৪০২-০৫।

৪. কোলব্রুক, ২ : ২১৯— কোলব্রুক-এর হিন্দুদর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির ফরাসি তর্জমা করেন জি. পোতিএ (১৮৩৩)।

জার্মান ভারতবিদ আলব্রেশ্‌ট্‌ ভেবের, চার্বাক তথা ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রথমে (১৮৫২) যা লিখেছিলেন তার একমাত্র সম্বল ছিল কোলব্রুক-এর প্রবন্ধাবলি (ভেবের (১৯৬১), ২৩৫)। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৫) যুক্ত পাদটীকায় (২৪৭ নং) ভেবের বিশেষ করে বিদ্যাসাগর সম্পাদিত *স-দ-স* এবং ফিট্‌স্‌এডওয়ার্ড হল্‌-এর *রচনাপঞ্জি* (১৮৫৯)-র উল্লেখ করেন।

৫. "The [Chārvāka] system is continually alluded to in different philosophical treatises, but it is only by the recent publication, in our [Asiatic] Society's Bibliotheca, of Mādhavāchārya's *Sarva-darśana-saṅgraha* that the want which Colebrooke regretted has in any way been supplied." কাওয়েল (১৮৬২), ৩৭১।

৬. বইটি অফসেট-এ ছাপা, তাই বিদ্যাসাগরের গৃহীত পাঠ অবিকল পাওয়া যায়। কিন্তু গোড়ায় Dr. Chandan Roy Chaudhury/General Secretary [The Asiatic Society]-র স্বাক্ষরিত ভূমিকা-টি বড়ই অস্বস্তির কারণ হয়েছে। তেরো পঙ্‌ক্তির একটি লেখায় কমপক্ষে সাতটি ভুল আছে— তার সবকটিকেই ছাপার দোষ বলে কাটানো যায় না।

৭. বিদ্যাসাগর যে কটি পুঁথি পেয়েছিলেন তার কোনোটিতেই শেষে ঐ অধ্যায়টি ছিল না। অভ্যংকর-সম্পা. সংস্করণে (১৯২৪) প্রথম সেটি যোগ হয়।

৮. উইলসন (১৮২৮), ৪ টী. ১০-১১, ১৮ [*রচনাসংগ্রহ* (১৮৬২), ১ : ৫ টী. ১, ১৪, ২২]।

৯. এশিয়াটিক সোসাইটি-র পুঁথিসংগ্রহে I. F. 52 সংখ্যক। এটি কোনো পুরনো পুঁথি নয়, আধুনিক মোটা কাগজে ইন্ডিয়ান কালিতে, পেশাদার লিপিকরকে দিয়ে করানো চমৎকার অনুলিপি। হরফ নাগরী, কোথাও কোথাও বাঙলা হরফে ভুল শোধরানো আছে। বইটিও পুঁথির আকারে নয়, আলাদা আলাদা হলুদ ও সাদা কাগজে (১৮.৬"×১২") লিখে আরও কয়েকটি ছোটো বই (*তত্ত্বমুক্তাবলী, আত্মোপদেশবিধি* ইত্যাদি)-এর সঙ্গে একত্র বাঁধানো। গোড়ায় সিল আছে : 'কিতাব কালিজ ফোর্ট বলিবম', তলায় লেখা : Asiatic Society of Bengal Library College of Fort William, 1825. দর্শন নং 1।

সংস্কৃত কলেজের পুঁথিটি তুলোট কাগজে (৮"×৬") লেখা, মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭, প্রতি পাতায় ৪-৭ পঙ্‌ক্তি, হরফ নাগরী। চেহারায় বেশ পুরনো মনে হয়, অনুলিপির কোনো তারিখ দেওয়া নেই। কিছু জায়গায় ছেঁড়া। পুরনো পুঁথিসংখ্যা ৪৬১, নতুন সংখ্যা দ (ন্যায়) ২৫৯। এই পুঁথিরও কয়েক জায়গায় কলম দিয়ে বাঙলা হরফে কিছু ভুল শোধরানো আছে (বিদ্যাসাগরের হাতের লেখা?)।

১০. *স-দ-স*, ইংরিজি তর্জমা (১৮৯২), ১৯১৪ সং., পাঁচ।

১১. (১৮৬০), ৫১৭-২৬। অনুবাদকের নাম নেই। কাওয়েল অবশ্য অনুবাদটি পড়ে তুষ্ট হতে পারেন নি [(১৮৬২), ৩৭১ দ্র.]। ১৯০৮-এ *স-দ-স*-র পূর্ণাঙ্গ জার্মান অনুবাদ পাওয়া যায় পাউল ডয়সেন-এর একটি বইতে। দ্য ভালে পুস্যাঁ-র মতে, এটি কাওয়েল-এর অনুবাদের কাছে অনেকখানি ঋণী, যদিও তার উল্লেখ নেই (হেস্টিংস, ৮ : ৪৯৩ টী. ১)। "বস্তুবাদ (ভারতীয়)" নিবন্ধে দ্য ভালে পুস্যাঁ *স-দ-স*-র বিদ্যাসাগর-সম্পা. সংস্করণ ও পুণা (আনন্দাশ্রম) সংস্করণের উল্লেখ করেছেন। ঐ, ৪৯৩।

১২. (১৮৬১), ৩ : ২৯৯-৩১৪। *C/L*, ৩৫১-৬৮।

১৩. (১৮৬২), ৩৭৫-৮২, ৩৮৩-৮৮।

১৪. মাক্স ম্যুলর (১৮৭৮/১৯০১), ১৪৩।

১৫. চেরবাটস্কয় (১৯৬৯)-এর অন্তর্ভূত। *C/L*, ৪৩২-৪০।

১৬. কলকাতা সংস্কৃত কলেজ-এর গ্রন্থাগারে এই সংস্করণটির একটি কপি আছে। সংগ্রহণসংখ্যা ২৮৬, তারিখ ১২।৯। [১৮] ৭২, পুরনো গ্রন্থসংখ্যা L/K 130, নতুন : ন্যা ১০৬৫। এ ছাড়া কাওয়েল (১৯১৪), ভূমিকা, পাঁচ দ্র.। পটার-এর গ্রন্থপঞ্জিতে (৩১৫, অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ৫৪২৮) এর যে প্রকাশ সাল দেওয়া আছে (১৮৫১) তা স্পষ্টতই ভুল। তাহলে এটিই সর্বাদি সংস্করণ হতো।

১৭. *স-দ-স* (১৮৮৯), "বিজ্ঞাপন।" পাঁচ।

১৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯২৫), *C/L*, ৩৭৭।

১৯. নব্যভারত (কার্ত্তিক ১২৯৬ ব), ৩৪৭। গোপিকামোহন ভট্টাচার্য (১৯৬১), ৫৭-য় উদ্ধৃত।

২০. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পা. (১৯৭৮), ২ : ২৫-৩১; *C/L*, ৩৭৭-৮৩-তে পুনর্মুদ্রিত।
২১. প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৯২৭), ৬-৮ দ্র.।
২২. মেঘনাদ সাহা (১৮৮৭ শক), ১৩০।
২৩. আখ্যাপত্রটি এইরকম : ওঁ/নমঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়।/সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ।/নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-সন্কারিণী [তথৈব] সভা হইতে/শ্রীল শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ ভগবান্ সান্দ্রানন্দ আচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে/চতুর্ব্বেদান্তর্গত "অষ্টোত্তর-শতোপনিষৎ" "পঞ্চদশী" "বেদান্তসার"/ "গায়ত্রী" এবং "ষড়দর্শনাদি" [তথৈব] বিবিধশাস্ত্র প্রকাশক/শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক/সম্পাদিত ও প্রকাশিত।/(উপনিষৎ কার্য্যালয়। ১৪১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। কলিকাতা।)/কলিকাতা। ৩৯ নং সিমলা ষ্ট্রীট; সান্দ্রানন্দ ষ্টীম মেসিন-প্রেসে/শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত/সংবৎ ১৯৫০, আশ্বিন। (All rights reserved) [১৮৯৩ খ্রি]।

ঐ ধর্ম্ম-সঞ্চারিণী সভা থেকে সানুবাদ বহু ধর্মগ্রন্থ বেরিয়েছিল। সত্যব্রত সামশ্রমী ও রমেশচন্দ্র দত্ত-র সঙ্গে সঙ্গে মহেশচন্দ্র পালকেও বঙ্কিম তাই 'ধন্যবাদের পাত্র' বলেছিলেন (*রচনাসংগ্রহ* (১৯৭৩), ১ : ২, ১১১৩)।
২৪. *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১২৮১।
২৫. কোনো অজানা কারণে *নানা প্রবন্ধ*-র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৩৭) এই প্রবন্ধটি বাদ পড়ে গেছে।
২৬. "Thanks to modern research, we are now in a position to be able to fully appreciate the teachings of Epicurus. And it was Bacon who was the first to define an Atheist as one who thinks. In India it was Raj Krishna Mukhopadhyaya who in his 'Miscellaneous Essays' (Bibidha [sic] prabandha) attempted to appreciate the value of what he calls the philosophy of Cārvāka". বড়ুয়া (১৯২১), ২৯০।

নিরীশ্বরবাদী সম্পর্কে বেকন কোথায় একথা লিখেছেন তা আমার জানা নেই। মনে হয়, কুসংস্কারের তুলনায় নিরীশ্বরবাদের উপকারিতা বিষয়ে তাঁর উক্তির সূত্রেই বড়ুয়া এমন বলেছেন। বেকন লিখেছিলেন : "Atheism leaves a man to sense, to philosophy, to natural piety, to laws, to reputation; all which may be guides to an outward moral virtue, though religion were not..." (১৬২৫), ৪৭ (এটির হদিশ দেওয়ার জন্য অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ)।
২৭. "জ্ঞান", রচনাসংগ্রহ, ১ : ১, ২৭৫-৭৬। *রচনাসংগ্রহ*, ১ : ২, ৮৫০।
২৮. সাংখ্যদর্শন, পরিচ্ছেদ ৪ (*রচনাসংগ্রহ*, ১ : ১, ২৯২-৯৩)।
২৯. *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়, ১৩১৬ ব), ১১-১২, ১১৩-২৫, ১৮৯-৯৪।
৩০. ঐ (১৩১৮ ব), ৪৭৩-৮৪।
৩১. *Charvaka-Shashti*, জনৈক গগন দেও [দেব] গিরি এই বইটি (ও তার সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের *A Short History of Indian Materialism*, etc.) নিজের নামে

ছেপে বার করে দিয়েছেন। ভেতরের হিন্দী ভূমিকায় ('দো শব্দ', এগারো) মূল লেখকের নাম থাকলেও আখ্যাপত্রে শুধু এই কুন্তীলকের নাম! দক্ষিণারঞ্জনের *চার্বাক দর্শন* বইটির সূত্রসংগ্রহ অংশটি ঠিক একইভাবে আত্মসাৎ করেছেন সর্বানন্দ পাঠক [(১৯৬৫), ১৩৬-৪০]। তাতে বিভ্রান্ত হয়েছেন মামোরু নামাই (১৯৭৬)। দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত ৫৪টি সূত্রকে তিনি সর্বানন্দ পাঠকের কৃতিত্ব বলে ধরে নিয়েছেন (২৯)।

৩২. দক্ষিণারঞ্জনের কয়েকটি ইংরিজি রচনা : "The Chārvāka Philosophy (MATERIALISM)" in : Sarvepalli Radhakrishnan et al (eds.), *History of Philosophy Eastern and Western*, Volume one, London : George Allen and Unwin, 1952, Chapter VII, 133-38 (বাঙলা তর্জমা : *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, কলকাতা : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৬৬ ব. [১৯৫৯ খ্রি] ১৫০ ইং; *A Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism*, Calcutta: Bookland, 1930, 1957. (ফ্রাউভালনের, খণ্ড ২-এর (১৯৫৬) গ্রন্থপঞ্জিতে এই বইটির প্রথম সংস্করণের উল্লেখ আছে (৩৩৮)। *C/L*-এও দক্ষিণারঞ্জনের এই পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (৩৯৪-৪৩১); *Charvaka Philosophy*, Calcutta : Purogami Prakasani, 1967 (Rabindra Bharati University reprint, 1996)।

৩৩. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ৫৬।

৩৪. জয়নারায়ণ লিখেছিলেন :

"অনেকানেক প্রধান পণ্ডিতেরা অসাধারণ ধীসম্পন্ন হইয়াও বহু ধন ব্যয় ও শরীরায়াস স্বীকার পূর্ব্বক বেদনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে আপাততঃ বোধ হইতে পারে অবশ্যই পরলোক থাকিবে; বস্তুত পরলোক নেই। ...বেদে লিখিত আছে পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু কোন ফলই দৃষ্ট হইতেছে না। এক স্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয় হইলে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানে কহিতেছে, সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক না, যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ে হোম করে তাহার প্রদত্ত আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। এইরূপে বেদে অনেক বাক্যের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় বারংবার এক কথার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যখন এই সমস্ত দোষ দেখা যাইতেছে, তখন কি প্রকারে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে?" ("বিজ্ঞাপন", ৩-৪)।

এই অংশটি মূল *স-দ-স*-য় নেই। *ন্যায়সূত্র* (২।১।৫৭-৬০) ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্য-য় বেদপ্রামাণ্যে আস্থাহীনদের যেসব মত উল্লেখ করা হয়েছে (খণ্ডনের উদ্দেশ্যে), জয়নারায়ণ সেগুলোই এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছেন! দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ((১৯৮২), ৮৮-৮৯)-তেও তা চলে এসেছে 'মাধবাচার্য্য'-র নামে।

৩৫. (১৯২৭), ৭-৮ দ্র.।

৩৬. *পূর্ব্বাশা* (অগ্রহায়ণ ১৩৫০), ১৬১-৬৯।

৩৭. *রচনাবলী,* খণ্ড ১ : ৬১-৭০ দ্র.। *মার্কসীয় দর্শন*-এর প্রথম সংস্করণে (১৯৪৩) এটি ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণের "চার্ব্বাক দর্শন" অংশটি মূলত *পূর্ব্বাশা*-য় প্রকাশিত রচনাটিরই সাধু বাঙলায় রূপান্তর।

৩৮. *পূর্ব্বাশা* (পৌষ ১৩৫০), ২৩৩-২৪৬।

৩৯. দেবীপ্রসাদ ব্যবহার করতেন *স-দ-স*-র দ্বিতীয় আনন্দাশ্রম সংস্করণ ও কাওয়েল-গফ-এর ইংরিজি তর্জমা।

৪০. *দর্শন,* ১৩৬৫। এর ইংরিজি তর্জমা পাওয়া যাবে *C/L,* ৪৫২-৭৩-এ। রচনাটি শুরু হয়েছে প্রথাগত গণপতি-বন্দনা দিয়ে, আর প্রচলিত সব ধারণারই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে। কোথাও কোনো অভিনবত্ব নেই।

৪১. শারদীয় *স্বাধীনতা,* ১৯৬২-র "চার্বাকদর্শন" প্রবন্ধের গোড়াতেই জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য বলেছেন, "চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে বহু পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। আলোচনা করিয়াও তৃপ্ত হই নাই।" এটি ছাড়া *পরিচয়*-এ একটি লেখা (১৩৬৩ ব) ছাড়া তাঁর আর কোনো লেখার সন্ধান এখনও পাই নি। কেউ জানালে বাধিত হব।

৪২. নামাই (১৯৭৬), ২৯-৭৪।

৪৩. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০২), ৫৯৭-৬৪০।

৪৪. পটার (১৯৯৫), ১ : ১, ২, "চার্বাক" দ্র.।

৪৫. দক্ষিণারঞ্জন এই বর্গভাগ সমর্থন করতেন ((১৯৮২), ১৩৪, ১৯৬ ইঃ দ্র.)। দেবীপ্রসাদ ছিলেন এই ধারণার বিরোধী ((১৯৯৩), ৬৬-৬৯)।

৪৬. সুখলালজী, পরীখ, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, এ. এল. ব্যাশাম প্রমুখ জয়রাশিকে লোকায়তিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ভাল্টের রুবেন, কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তা মনে করেন নি। দেবীপ্রসাদ (১৯৬৪), ২২১-২৩; ফ্রাঙ্কো (১৯৮৭), ৩-৮ দ্র.। ফ্রাঙ্কো ও প্রেইসেনডান্‌ৎস্ (১৯৯৮) এখনও সেই মতই পোষণ করেন।

৪৭. শামশাস্ত্রী সম্পা., ১৯০৯, সংশোধিত সং., ১৯১৯।

পরিশিষ্ট

বাঙলায় চার্বাক বিষয়ে যে কটি আলোচনার খবর পেয়েছি তার একটি তালিকা এখানে (পৃ. ২৬-২৭) দেওয়া হলো। এর বেশির ভাগই পুরনো পত্রিকার পাতা থেকে উদ্ধার করেছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। তবে পাঠকের অবগতির জন্যে বলে রাখা ভালো : এগুলির প্রায় সবই মূলত *স-দ-স*-র ভিত্তিতেই লেখা; কোনো নতুন সন্ধান বা চিন্তার আভাস নেই। তা ছাড়া লেখকরা প্রায় সকলেই কমবেশি চার্বাক-বিরোধী। তবে এতজন প্রথাগত পণ্ডিত যে চার্বাক/লোকায়ত নিয়ে নানা সময়ে আদৌ লিখেছিলেন—এ-ও এক আশ্চর্য ঘটনা। একেই বোধহয় বলে বিপরীতের টান।

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা	প্রকাশকাল	পৃষ্ঠা
অজ্ঞাত	চার্ব্বাকের নিরীশ্বরবাদ	*সঙ্গিনী* ১।৬	আষাঢ়, ১২৯৭	১০৮-১০
কেশবচন্দ্র গুপ্ত	চার্ব্বাক দর্শন	*অর্চ্চনা* ৭।১	ফাল্গুন, ১৩১৬	২৮-৩০
পান্নালাল বসু	মহাপুরুষ চার্ব্বাক (প্রতিবাদ)	*অর্চ্চনা* ৭।২	চৈত্র, ১৩১৬	৬২-৬৪
ফণীন্দ্রনাথ রায়	চার্ব্বাকে ব্রাহ্মণ	*অর্চ্চনা* ৭।৪	জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭	১১৬-২০
ভূপেন্দ্রনাথ দে	চার্ব্বাক বা লোকায়ত দর্শন	*বঙ্গদর্শন* ১১।৮	অগ্রহায়ণ, ১৩১৮	৪৭৩-৮৪
রমেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী	চার্ব্বাকের দেহাত্মবাদ খণ্ডন	*বীরভূমি* (নবপর্য্যায়)	ভাদ্র, ১৩২০	২৮৯-৯৫
হরিপদ কাব্য-স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ	চার্ব্বাক দর্শন	*নারায়ণ* ১।১।৪	ফাল্গুন, ১৩২১	৩৩১-৩৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন	সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ : চার্ব্বাক দর্শন	*ভারত-ভারতী ভারতবর্ষ* ২।২।৪	চৈত্র, ১৩২১	৪৪৬-৫১
পীতাম্বর তর্কালঙ্কার	বার্হস্পত্য দর্শন বা নাস্তিবাদ	*মানসী* ৭।১।৬	শ্রাবণ, ১৩২২	৬১৫-৩৬
চূণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	লোকায়ত দর্শন	*সাহিত্য সংবাদ* [হাওড়া]	শ্রাবণ, ১৩২৩	৪৬-৪৮
যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায়	চার্ব্বাক দর্শন ও তাহার সমালোচনা	*ভারতবর্ষ* ৪।১।৬	অগ্রহায়ণ, ১৩২৩	৮০৩-১৩
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	বার্হস্পত্য-সূত্রম্	*ভারতী* ৪২।১০	মাঘ, ১৩২৫	৭৬৭-৭৪
অধ্যাপক নলিনীকান্ত সেনগুপ্ত	চার্ব্বাক দর্শন	*উদ্বোধন* ২১।৫	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬	২৮২-৮৮
জ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী	চার্ব্বাক দর্শন	*নব্যভারত*	ভাদ্র, ১৩২৮	২৬৯-৭৭
প্রিয়গোবিন্দ দত্ত	চার্ব্বাক দর্শন	*পরিচারিকা*	কার্ত্তিক, ১৩২৯	৩৪১-৪৯
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	বার্হস্পত্য দর্শন	*অলকা* [বারাণসী] ১।৯	কার্ত্তিক, ১৩২৯	৪৯৫-৫০১
অজ্ঞাত	আর্য্যদর্শন-সংগ্রহ : চার্ব্বাক দর্শন	*কালের হাওয়া* ২।১২	ভাদ্র, ১৩৩৩	১০৩-০৪
সতীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	চার্ব্বাক দর্শনের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস	*প্রবাসী* ২৮।২।৩	পৌষ, ১৩৩৫	৩৪৩-৪৬
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী	লোকায়ত মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	*বিশ্ববাণী* ৩।৯	পৌষ, ১৩৩৬	৬৫৮-৬২
কালীপদ চৌধুরী বেদান্তরত্ন	চার্ব্বাক দর্শন	*মাধবী* [মেদিনীপুর] ১১।৯	ফাল্গুন, ১৩৪০	২৭৫-৭৭
অজ্ঞাত	[চার্ব্বাক দর্শনের ধারাবাহিক অনুবাদ]	*শ্রীশ্রী নিতাই সুন্দর* [মাসিক]	বৈশাখ, ১৩৪৩	
সুধীরমোহন সাংখ্যতীর্থ	চার্বাক দর্শনম্		১৩৪২-৪৩	
অপূর্বকৃষ্ণ বসু	চার্বাকবাদ	*বঙ্গশ্রী* ৪।১।৬	আষাঢ়, ১৩৪৩	৮৪৯-৫৩
বটকৃষ্ণ ঘোষ	লোকায়ত	*শ্রীভারতী*	চৈত্র, ১৩৪৮	৪২১-৩০
সরোজ আচার্য	চার্ব্বাক দর্শন	*পূর্ব্বাশা* ৭।৩	অগ্রহায়ণ, ১৩৫০	১৬১-৬৯
ক্ষিতিমোহন সেন	লোকায়ত মত	*পূর্ব্বাশা* ৭।৪	পৌষ, ১৩৫০	২৩৩-৪৬
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী	বার্হস্পত্য দর্শন : 'চার্ব্বাক-পঞ্চাশিকা'	*ভারতবর্ষ* ৩২।১।১	আষাঢ়, ১৩৫১	১৫-১৬

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা	প্রকাশকাল	পৃষ্ঠা
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	চার্বাক দর্শন	*পরিচয়* ১৭।১।৫	অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪	৩৯৭-৪১১
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী	চার্ব্বাক দর্শন	দ্বন্দ্ব ১।৯	ফাল্গুন, ১৩৫৪	৭০৯-১৬
"	দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ	দ্বন্দ্ব ১।১০	চৈত্র, ১৩৫৪	৭৮৯-৯৭
"	আত্মানুসন্ধান	দ্বন্দ্ব ১।১১	বৈশাখ, ১৩৫৫	৮৬৯-৭৮
"	প্রজ্ঞাপরিমিতি	দ্বন্দ্ব ১।১২	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫	৯৪৯-৫৫
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	চার্বাক দর্শন	*নতুন সাহিত্য* ২।৭	কার্তিক, ১৩৫৮	১৬-১৯
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	চার্ব্বাক [নাটক]	*উত্তরা* [কাশীধাম]	ফাল্গুন, ১৩৫৮- বৈশাখ, ১৩৫৯	৩৪৯-৫৮ ৩৯৫-৪০৪ ৪৪৩-৪৫৩
জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য	চার্বাক দর্শনের ঐতিহাসিক ভূমিকা	*পরিচয়*	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩	৭৪-৮১
কালিদাস দত্ত	চার্বাক ও চার্বাকবাদ	*সোমপ্রকাশ* [বারুইপুর]	চৈত্র, ১৩৬৪- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫	১৭৭-৮৩
অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য	চার্বাক দর্শন	*দর্শন* ৬।৩-৪	১৩৬৫	
ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য	চার্বাক দর্শন ও জন্মান্তর নিরাস	*উদ্বোধন* ৬২।১১-১২	অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩৬৭	৬১৭-২১ ৬৯৩-৯৭
জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য	চার্বাক দর্শন	শারদীয় *স্বাধীনতা*	১৩৬৯ (১৯৬২)	১৪২-৪৪

অধ্যায় ৩

ভারতে বস্তুবাদ : কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ

ভারতে বস্তুবাদের ইতিহাস খুব মোটা দাগে পুনর্গঠন করা সম্ভব। ভারতের আদি-বস্তুবাদী হিসেবে (এবং ভারতের তথা বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক হিসেবেও) উদ্দালক আরুণির নাম করা হয়েছে।[১] ইনি সম্ভবত খ্রিপূ সাত শতকের লোক। *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*-এ এঁর বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বস্তুবাদী চিন্তার প্রমাণ মেলে। তারও আগে, *ঋগ্‌বেদ*-এর দশম মণ্ডলে দেখা যায় সংশয়বাদের ছোঁয়া।

খ্রিপূ পাঁচ শতকে আমরা পাচ্ছি অজিত কেসকম্বল বা কেশকম্বলীকে। বৌদ্ধ ও জৈন রচনায় এঁর কথা আছে।[২] ইনি অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস করতেন না, পৃথিবীর সবকিছুকে চারটি ভূত— আগুন, বাতাস, মাটি ও জল— এদের মিলনে তৈরি বলে মনে করতেন। দক্ষিণাদান ও তথাকথিত ধর্মকর্মেও এঁর বিশ্বাস ছিল না, পরলোকেও না। এঁকে আমরা আরও স্পষ্ট বস্তুবাদী বলে ধরতে পারি।

জৈন ধর্মগ্রন্থ *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র*-য় বস্তুবাদের দুটি ধারার কথা বলা হয়— তজ্জীবতচ্ছরীরবাদ (যা আত্মা তা-ই দেহ— এই মতবাদ, অর্থাৎ দেহছাড়া অক্ষয় আত্মা বলে কিছু নেই) আর ভূতবাদ (সবকিছুই পঞ্চভূতে গড়া)।[৩] অজিত-এর মতবাদে কিন্তু দুটিকেই একত্র পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো আলাদা দুটি ধারা হিসেবে দুটি চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল, পরে মিলে গেছে।

অজিত কেসকম্বল-এর পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন রচনায় পায়াসি (পএসি) বলে এক রাজার কথা পাওয়া যায়।[৪] ইনিও নানা পরীক্ষার পর স্থির করেন : দেহছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই। এই মতকে ভুল বলে প্রমাণ করেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু কস্‌সপ (কাশ্যপ), আর জৈনদের মতে, তাঁদের ধর্মগুরু কেসি। পায়াসিও হার মানেন। দুটি উৎসে দুই আলাদা নাম থেকেই বোঝা যায় : পায়াসি আদতে একটি কাল্পনিক চরিত্র। বৌদ্ধ ও জৈনরা নিজেদের ধ্যান-ধারণাকে বড় করে দেখানোর জন্যে একই গল্পকে ব্যবহার করেছেন। খ্রি আট শতকে জৈন আচার্য হরিভদ্র-ও গল্পটি অন্যভাবে লিখেছেন।[৫] তাতে পায়াসি বা কোনো রাজার নাম-গন্ধ নেই।

এরপরেই *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এ বস্তুবাদী দর্শনের কথা আসে, যদিও তার কোনো নাম দেওয়া হয় নি।[৬] খ্রি পাঁচ শতক থেকে 'লোকায়ত' শব্দটি পাওয়া যায়— প্রথমে পালি রচনায়, পরে সংস্কৃত-য়। এখান থেকেই সমস্যার শুরু।

'লোকায়ত' শব্দর আদি অর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ নিয়ে আলোচনার আগে একটি কথা বলে নেওয়া ভালো। খ্রি আট থেকে বারো শতকের মধ্যে নানা নামে একই দর্শনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে : অসুরমত, লোকায়ত, চার্বাক, বার্হস্পত্য (= বৃহস্পতির তৈরি), নাস্তিকমত, দেহাত্মবাদ, ভূত-চৈতন্যবাদ, স্বভাববাদ। এর কয়েকটির অর্থ স্পষ্ট। যেমন *সূ-কৃ-সূ*-য় যাকে তজ্জীবতচ্ছরীরবাদ বলা হয়েছে, দেহাত্মবাদ তারই অন্য নাম, পঞ্চভূতবাদ-ই ভূতচৈতন্যবাদ। বাকি নাম কটির তাৎপর্য অত স্পষ্ট নয়। তাই এক-এক করে সবকটি নামের ইতিহাস ও তাৎপর্য জানা দরকার।

লোকায়ত

ভারতে বস্তুবাদ-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকায়ত' শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয়। কিন্তু এর অর্থ সর্বদা এক থাকে নি। ব্যুৎপত্তির দিক থেকে দেখলে 'লোকায়ত' মানে যা লোকের মধ্যে আয়ত, বা বিস্তৃত। কিন্তু শুধু এইটুকু থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ভারতে বহুলোক বস্তুবাদ-এর অনুগামী ছিলেন— ইতিহাসের কোনো পর্বে এমন কোনো নজির নেই। লোকায়ত শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণমতে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ, প্রথমার একবচনে লোকায়তম্। পালি-তে বলে : লোকায়তং, প্রাকৃতে লোগায়ত বা লোগায়য় বা লোয়ায়ত। বিশেষ্য হিসেবে গোটা বৈদিক সাহিত্যে (চারবেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্) শব্দটি পাওয়া যায় না। এর পরোক্ষ উল্লেখ আছে পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী* (৪।২।৬০) ও *গণপাঠ* ২৩-এ, আর প্রত্যক্ষ উল্লেখ *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* (১।২।১০)-য়।

তার মানে, খ্রিপূ চার শতকের আগেই এই সমাসবদ্ধ পদটি তৈরি হয়েছিল। এর অনুগামীদের বলা হতো : লৌকায়তিক। এ ছাড়া শব্দটি পাওয়া গেছে পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য* (*অষ্টাধ্যায়ী*, ৭।৩।৪৫ প্রসঙ্গে)-য় আর *কাশিকাবৃত্তি*, *পদমঞ্জরী* (*ন্যাস*) ইত্যাদি টীকাগ্রন্থে (*অষ্টাধ্যায়ী*, ১।৩।৩৬ প্রসঙ্গে)। *রামায়ণ*, *মহাভারত*-এ একবার করে 'লোকায়তিক' ও 'লোকায়ত শাস্ত্র'-র কথা আছে। *হরিবংশ*-তেও শব্দটি একবার পাওয়া যায়, কিন্তু সেটি *মহাভারত*-এর চরণটিরই পুনরুক্তি। প্রামাণিক সংস্করণে ঐ চরণটি (পুরো অংশটিই) বাদ পড়েছে।[৭]

পালি তিপিটক ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে (যেমন, *শার্দূলকর্ণাবদান*, *সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র*, *লঙ্কাবতারসূত্র*, খ্রি এক থেকে চার শতকের মধ্যে) 'লোকায়তিক'-এর কথা প্রায়ই আসে। তিপিটক-এর অট্‌ঠকথা (= অর্থকথা, টীকা)-য়, পালি অভিধানে 'লোকায়তং'-এর একটিই অর্থ দেওয়া আছে : 'বিতণ্ডসত্থং' (বিতণ্ডাশাস্ত্র)।[৮] নিজের মত

স্থাপন না-করে, শুধু পরের মত খণ্ডন করাকে বলে 'বিতণ্ডা'। অনেক ক্ষেত্রেই শব্দটি দিয়ে এঁড়ে তর্ক বোঝায়। এই অর্থটি বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রেও ভালোভাবে খাপ খায়। *রামায়ণ*-এও লোকায়তিক ব্রাহ্মণ বলতে তার্কিক বোঝানো হয়েছে, বস্তুবাদী নয়।[৯] বৌদ্ধ মহাযানী রচনায় কোনো কোনো আধুনিক বিদ্বান্ বস্তুবাদ অর্থে শব্দটি ধরেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আপত্তিও উঠেছে।[১০]

খ্রি চার শতকে বাৎস্যায়ন-এর *কামসূত্র*-য় 'লৌকায়তিকাঃ' শব্দটি পাওয়া গেছে (১।২।২৫-৩০)। সেখানে লৌকায়তিক মত বলতে নিঃসন্দেহে ধর্ম আচরণের বিরোধী ও পরকালে অবিশ্বাসী দর্শন বোঝায়। তার মানে এই নয় যে, বস্তুবাদী দর্শনের পরিচয় এখানেই প্রথম পাওয়া গেল। *রামায়ণ*-এর জাবালি উপাখ্যানে ও *মহাভারত*-এর শান্তিপর্বে পঞ্চশিখ-জনক সংবাদ-এও তার পরিচয় আছে।[১১] কিন্তু সেখানে কোথাও 'লোকায়ত' শব্দটি ঐ দর্শনের সূত্রে ব্যবহার করা হয় নি।

এরপর থেকে ধর্মকীর্তি, চন্দ্রকীর্তি, ভাববিবেক, বাণভট্ট প্রভৃতি বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য লেখকদের রচনায় বস্তুবাদ-এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'লোকায়ত' নামটি আসে। অর্থাৎ খ্রি ছ শতকে বস্তুবাদ = লোকায়ত এই সমীকরণটি চালু হয়ে গেছে। শান্তরক্ষিত ও শঙ্করাচার্য শুধু 'লোকায়ত' বলেই এই দর্শনটির উল্লেখ করেন। 'চার্বাক' শব্দটিই বরং তাঁদের লেখায় নেই। পুরাণগুলির মধ্যে *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ*-এই বস্তুবাদ অর্থে 'লোকায়ত' শব্দটি আসে।[১২]

পুরাণের গল্প থেকেই বস্তুবাদী দর্শনকে বার্হস্পত্য অর্থাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির গড়া— এই নামান্তর পাওয়া যাচ্ছে। তার কথায় পরে আসছি। ঘটনা দাঁড়াল খ্রি আট শতক থেকেই লোকায়ত = বার্হস্পত্য = চার্বাক বস্তুবাদ— এমন সমীকরণ চালু ছিল।

নাস্তিক

নাস্তিক শব্দটিও বৈদিক নয়, ব্যুৎপত্তিও কিছুটা অদ্ভুত। তবে শব্দটি খ্রিপূ চার শতকের আগেই তৈরি হয়েছিল। *অষ্টাধ্যায়ী* (৪।৪।৬০)-মতে অস্তি, নাস্তি ও দিষ্ট (ভাগ্য) থেকে তিনটি শব্দ তৈরি হয়, এগুলিতে যার মতি আছে তা বোঝাতে। পাণিনি-র ভাষ্যকাররা 'আস্তিক' বলতে বোঝেন : পরকাল আছে— এই যার বিশ্বাস, 'নাস্তিক' বলতে : যিনি মনে করেন পরকাল নেই। অর্থাৎ নাস্তিক নিরীশ্বরবাদী নয়, পরলোকে অবিশ্বাসী।[১৩]

অন্যদিকে, খ্রি দুই শতকে *মনুসংহিতা* (২।১১)-য় বলা হয়েছে : নাস্তিক = বেদনিন্দক। তার মানে, নাস্তিক বলতে শুধু বস্তুবাদী বোঝায় না, জৈন ও বৌদ্ধরাও এর মধ্যে পড়েন। পরলোকে অবিশ্বাসী ধরলে কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরা এর আওতায় পড়তেন না। বৌদ্ধ ও জৈনরা আবার বস্তুবাদীদের 'নাস্তিক' বলেন; পরলোক ও আত্মায় অবিশ্বাসী— এই অর্থে।[১৪] যাবতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেই নাস্তিকদের নিন্দে করা হয়।

বার্হস্পত্য

আগেই বলা হয়েছে, নামটি পুরাণের সূত্রে এসেছে। *পদ্মপুরাণ* ও *বিষ্ণুপুরাণ*-ই এর সবচেয়ে পরিচিত উৎস।[১৫] *হরিবংশ*-তেও বৃহস্পতির নামে একই গল্প একটু অন্যভাবে আছে। অসুরদের ঠকানোর জন্যে দেবগুরু বৃহস্পতি তাদের বোঝালেন : দেহ-ই আত্মা, এ ছাড়া কোনো অবিনাশী আত্মা নেই। এই গল্পটি নানা রূপে পুরাণে এসেছে। পরে অন্যান্য পুরাণেও (*মৎস্য, দেবীভাগবত*) বস্তুবাদী দর্শনের কথা আসে। এর পেছনে সম্ভবত *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* (৮।৭-৮), ও *মৈত্রী উপনিষদ্* (৭।৮-৯)-এর দুটি গল্প কাজ করেছে। এর জন্যেই চার্বাকমতকে 'অসুরমত' বলা হয়।

পুরাণকাররা সর্বদা বৌদ্ধ, জৈন ও বস্তুবাদী মতকে আলাদা করতে পারতেন না। একটি পুরাণে বলা হয়েছে : জৈনরা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানে না। একমাত্র *বি-ধ-ম-পু* বাদে আর কোথাও বিস্তৃতভাবে বস্তুবাদ-এর প্রসঙ্গ আসে নি। যতদূর দেখেছি, *পদ্মপুরাণ*-উত্তরখণ্ড ও *দেবীভাগবত পুরাণ*-এ এই 'চার্বাক' নামটি এসেছে।

চার্বাক

মহাভারত-এর আগে 'চার্বাক' নামটি কোথাও পাওয়া যায় নি। শব্দটির ব্যুৎপত্তিও নিশ্চিত নয়। 'চর্বন' থেকে চার্বাক-এর উৎপত্তি নেহাতই মনগড়া। চারু + বাক্ — এমন একটা ব্যুৎপত্তি প্রস্তাব করা হয়েছে, ঠিকই। কিন্তু বাক্-এর হসন্তটা কেন উড়ে গেল তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

'চারু' শব্দটিও সমান গোলমেলে। বিশেষণ হিসেবে এর অর্থ 'শোভন', 'সুন্দর'। ভাববাদী সমালোচকরা বোধহয় এতে একটু অস্বস্তিতে পড়েন। তাঁদের ব্যাখ্যা এইরকম : আপাত-মনোরম বচন দিয়ে লোককে ভোলানো হতো, তার জন্যেই এই দর্শনের নাম চার্বাক। খ্রি আট শতকের আগে বস্তুবাদী দর্শনের নামান্তর হিসেবে চার্বাক নামটি পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে দেবগুরু বৃহস্পতির আর-এক নাম : চারু। তার থেকেও, 'বৃহস্পতির বচন' অর্থে চারুবাক এই সমাসবদ্ধ পদটি চালু হয়ে থাকতে পারে (বার্হস্পত্য নামটির প্রসঙ্গে তা আলোচনা করা হয়েছে)।

মনে রাখতে হবে : *মহাভারত*-এর চার্বাক ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী, কিন্তু দেহাত্মবাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।[১৬] সে একজন রাক্ষস, তপস্যা করে স্বয়ং ব্রহ্মার কাছ থেকে একটি বরও সে আদায় করেছিল। তাকে দেখানো হয়েছে দুর্যোধনের বন্ধু হিসেবে। পরে, কোনো এক অজানা কারণে (হয়তো বা ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের সূত্রে) তার নামটি নাস্তিক / লোকায়ত / বার্হস্পত্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। *মহাভারত*-এর গল্পটি ছিল ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে। পরে 'চার্বাক' হয়ে দাঁড়ায় এক অবৈদিক দর্শনের নাম।

প্রাচীন ভারতের দেহাত্মবাদীরা নিজেদের কী বলতেন তা ঠাওর করা শক্ত। বৃহস্পতি-/বার্হস্পত্যসূত্র-কে লোকায়তসূত্র বা চার্বাকসূত্র নামেও উল্লেখ করা হয়। তার পাশাপাশি 'পৌরন্দরসূত্র' নামটিও পাওয়া যাচ্ছে। আর-একটি বই-এ আছে 'পৌরংদরিয় বিত্তি' (= পৌরন্দরীয়-বৃত্তি)-র কথা।[১৭] মনে হয় পুরন্দর নামে কোনো বিদ্বান্ চার্বাকসূত্র ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত সূত্র রচনা করেছিলেন (বা সঙ্কলন করেছিলেন), আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর নিজেরই লেখা একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য (= বৃত্তি)। একটি পুঁথির পাতার পাশে পুরন্দরকে 'চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা' বলা হয়েছে।[১৮] সম্ভবত এই বৃত্তি থেকেই একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন কমলশীল।[১৯] পুরন্দর সেখানে 'চার্বাক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন দেহাত্মবাদীরা তাহলে নিজেদের 'চার্বাক' বলেও পরিচয় দিতেন। লোকায়ত-র পাশাপাশি চার্বাক নামটি বিরুদ্ধ পক্ষ (জৈন, বৌদ্ধ, ও ব্রাহ্মণ্য লেখকরা)-ও ব্যবহার করেন। বহুবচনে 'চার্বাকাঃ' বলতে বোঝায় 'চার্বাকপন্থীরা'।

স্বভাব

এই শব্দটির ইতিহাস সবচেয়ে জটিল। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* (১।২)-এ প্রথম জগৎকারণ হিসেবে ছটি মতের উল্লেখ করা হয়েছে : কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতানি (চার বা পাঁচটি ভূত— জল, মাটি, আগুন, বাতাস, ও ব্যোম বা আকাশ), আর পুরুষ (= আত্মা)। এর মধ্যে উনশেষটির সঙ্গেই ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ-এর যোগ থাকার কথা। কিন্তু *মহাভারত*-এই দেখা যায় : স্বভাবকে ভূতচিন্তকদের মত বলে ধরা হচ্ছে।[২০]

মহাভারত-এর শান্তিপর্বে দর্শন নিয়ে বিস্তর আলোচনা আছে। সেখানে স্বভাব, কাল, দৈব (= নিয়তি, দিষ্ট)— এসব মতের কথাও আসে, কিন্তু প্রাধান্য পেয়েছে সাংখ্যদর্শন (যদিও তার সঙ্গে *সাংখ্যকারিকা* ও তারও পরবর্তী সাংখ্যমত পুরোপুরি মেলে না)।[২১] স্বভাব, কাল ইত্যাদি মতবাদ তার আগেই 'লুপ্ত দর্শন' হয়ে গিয়েছিল।[২২]

'স্বভাব'-এর প্রসঙ্গ আমাদের আনতে হচ্ছে একটিই কারণে : শঙ্করাচার্য ও উৎপল ভট্ট (বা ভট্টোৎপল) লোকায়ত আর স্বভাব-এর ধারণাকে এক করে দিয়েছেন। তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় *সর্ব-সিদ্ধান্ত-সংগ্রহ* (লেখক ও রচনাকাল জানা যায় না, তবে ন শতকের পরে লেখা) ও সায়ণ-মাধব-এর *সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ*-য়।[২৩]

'স্বভাব' বলতে বোঝায় বস্তুর নিজস্ব ভাব অর্থাৎ প্রকৃতি। কাঁটা কেন তীক্ষ্ণ, জল কেন ঠান্ডা, ময়ূরের পালকে কেন বহু রঙের চন্দ্রকচিহ্ন দেখা যায়? এর উত্তরে স্বভাববাদীরা বলেন, কারণ একটাই : এগুলোই তাদের স্বভাব। এইভাবেই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকার করে তার পাল্টা ধারণা হিসেবে স্বভাব-এর কথা এসেছে। হয়তো এই সূত্রেই, নিরীশ্বরবাদীর মত হিসেবে, বস্তুবাদের সঙ্গে স্বভাববাদও যুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু *মহাভারত*-এরই অন্যত্র দুই অসুর রাজা, বলি ও প্রহ্লাদ-এর মুখ

দিয়ে যথাক্রমে কাল ও স্বভাব-এর মহিমা প্রচার করা হয়েছে।[২৪] দু-এরই মূল কথা হলো : মানুষের উদ্যোগে কিছু হওয়ার নয়, কাল/স্বভাব-ই যা করার তা করে। এ হলো এক ধরণের নির্লিপ্তিবাদ (স্টোইসিজম)।

তার মানে স্বভাব কথাটি কখনও বিশেষ অর্থে, কখনও বা সাধারণ অর্থে বসে। সাংখ্যদর্শন-এর 'প্রকৃতি'-র সঙ্গেও কখনও কখনও এটি মিলে যায়। *সূ-কৃ-সূ*-র ব্যাখ্যা করতে এসে শীলাঙ্ক ঠাওর করতে পারেন নি : পঞ্চভূতবাদী বলতে কাদের বোঝায়। তিনি তাই একই সঙ্গে 'লোকায়তিক বা সাংখ্য' লিখে দিয়েছেন।[২৫] অন্যদিকে বৌদ্ধদের রচনায় স্বভাব বলতে বোঝায় অহেতুবাদ, অর্থাৎ কোনো ঘটনার পেছনে নির্দিষ্ট কোনো কারণ থাকে না, হঠাৎই সবকিছু ঘটে যায়।[২৬] এর সঙ্গে আকস্মিকতাবাদ বা যদৃচ্ছাবাদ-এর কোনো ফারাক নেই। নাগার্জুন ও শান্তরক্ষিত স্বভাব ও কালের ধারণা খণ্ডন করেছেন, কিন্তু এই দুটি ধারণাকে লোকায়ত-র সঙ্গে এক করেন নি। শান্তরক্ষিত তো দুটি আলাদা অধ্যায়ে (৪ ও ২২) স্বভাব ও লোকায়ত-মত পরীক্ষা করেছেন।[২৭] দু-এর মধ্যে মিলের কোনো জায়গা নেই। একটি অহেতুবাদী মত, অন্যটি স্বভাবকেই জগতের নিয়ম বলে মনে করে, কার্যকারণ সম্পর্ককে আদৌ অস্বীকার করে না (অমলানন্দ নামে এক বৈদান্তিক যদৃচ্ছা আর স্বভাব-এর মধ্যে এই তফাত-ই করেছেন)।[২৮]

তাহলে প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদী চিন্তা পুনর্গঠন করতে হলে প্রধান কাজ হলো: প্রতিটি পারিভাষিক শব্দকে তার আদি ও পরিবর্তিত অর্থে বোঝা। আর দ্বিতীয় কাজ হলো : সেই বোঝার উদ্দেশ্যে, সমস্ত উৎসকে যতদূর সম্ভব কালপরম্পরায় সাজানো। একমাত্র এই উপায়েই বিভিন্ন টুকরো উদ্ধৃতি থেকে লোকায়ত-দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করা যাবে। 'লোকায়ত' বা 'স্বভাব' শব্দটি দেখলেই তাকে বস্তুবাদের সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়। কোথায় কোন্ অর্থে শব্দটি বসেছে তা ভালোভাবে বিচার করা দরকার। *মহাভারত*-এর টীকাকার, নীলকণ্ঠ এই কাজটিই করেন নি। তাই অদ্ভুত সব মতবাদও চার্বাকদর্শনের ঘাড়ে চেপেছে।[২৯]

---

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯১), ২ : ৮৯-১৪৮।

২. মললসেকর সম্পা., ১ : ৩২৫-২৭ দ্র.।

৩. *সূ-কৃ-সূ*, ১৮৫, ১৮৮।

৪. "পায়াসিসুত্ত", *দীঘনিকায়*, ২৩৬-৬৫; "রায়পসেণইজ্জং"।

৫. হরিভদ্র, *সমরাইচ্চ কহা*, ১৬৩-৮১।

জ্যোসেপ্পে তুচ্চি দেখিয়েছেন, "পায়াসিসুত্ত", "রায়পসেনিয়" ও *সমরাইচ্চ কহা*-র কাহিনী পরস্পরের কাছ থেকে ধার করা নয়, অতীতের বাস্তব মতবাদগুলি নানাভাবে নেওয়া। তুচ্চি, *C/L*, ৩৮৯।

৬. *রামায়ণ,* প্রামাণিক সং., অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০।২-১৭; *মহাভারত,* প্রামাণিক সং., শান্তিপর্ব, ২১১।২২-৩০।
৭. *রামায়ণ,* অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৪।৩২; *মহাভারত,* ৬৪।৩৭; *হরিবংশ,* বঙ্গবাসী সং., ৬৭। ৩০; ঐ, পুণা প্রামাণিক সং., পরিশিষ্ট ৪২খ, চরণ ২৫২০।
৮. মোগ্‌গল্লান, *অভিধানপ্পদীপিকা,* ১১২ কখ, ১৯।
৯. অযোধ্যাকাণ্ড, ৯৪।৩২।
১০. যেমন, *লঙ্কাবতারসূত্র*-র ইংরিজি তর্জমায় ডি. টি. সুজুকি সর্বদাই 'লোকায়ত'-কে 'মেটেরিয়ালিজম' লিখেছেন। এতে আপত্তি করেছেন কে. এন. জয়তিল্লেকে (৫২)।
১১. টী. ৭ দ্র.।
১২. *বি-ধ-ম-পু,* ১।১০৮।১৮-১৯; ৭০ ক।
১৩. *কাশিকাবৃত্তি, ন্যাস ও পদমঞ্জরী,* ১ : ৪৩৮-৩৯ দ্র.।
১৪. *সমরাইচ্চ কহা,* ১৬৪; আর্যশূর, *জাতকমালা,* ২৩।৫৭, ১৫১।
১৫. এই বই-এর অধ্যায় ১২ দ্র.।
১৬. *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, ৩৯।২৩-৪৭ দ্র.।
১৭. বাদিদেব সূরি, *স্যা-বা-র,* ২৬৫; পুষ্পদন্ত, *মহাপুরাণ,* ৩২৮।
১৮. ধনপাল, *ভবিসয়ত্তকহা,* ভূমিকা, ৪২ দ্র.।
১৯. *ত-স-প,* ৫২৮।
২০. *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, ২২৪।৫০ গঘ।
২১. জনস্টন (১৯৩৭), ৬৮-৭০ দ্র.।
২২. র‍্যান্‌ড্‌ল্‌, ১৬ টী. ৩।
২৩. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌,* ৪।৩।৬-এর শঙ্করভাষ্য; বরাহমিহির-এর *বৃহৎসংহিতা,* ১।৭-এর উৎপলভট্ট রচিত টীকা; *স-সি-স,* ২।৪-৫, ৩।২, ৫-৬; সায়ণ-মাধব, *স-দ-স,* ১৩।
২৪. *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, অধ্যায় ১৭১, ২১৫, ২১৭ দ্র.।
২৫. *সূ-কৃ-সূ,* ১৮৮।
২৬. নামাই (১৯৮৭), ১১৮-২৬। বৌদ্ধদের নিজস্ব পরিভাষায় 'স্বভাব' বলতে বোঝায় তাদাত্ম্য, identity, যেমন বট আর গাছ।
২৭. *ত-স,* ৭৮-৮৫, ৬৩৩-৭০।
২৮. *কল্পতরু-পরিমল* (*ব্র-সূ-ভা,* ২।১।৩০ প্রসঙ্গে), *ব্রহ্মসূত্র-শাঙ্করভাষ্যম্‌,* ৪৮১। এ ছাড়া *স-দ-স*-য় চার্বাককে যদৃচ্ছাবাদ-বিরোধী বলেই দেখানো হয় (১৩)।
২৯. আদিপর্ব, ৬৪।৩৭। নীলকণ্ঠ লোকায়তিক-এর অর্থ করেছেন : লোকরঞ্জনপর। বনপর্ব, ৩৩।১১ প্রসঙ্গে তিনি দিষ্টবাদ (= নিয়তিবাদ)-কে চার্বাকমত বলে ধরে নেন। আর *হরিবংশ,* ভবিষ্যপর্ব, ৬৭।৩০-এর টীকায় তিনি লোকায়ত-র অধিষ্ঠাতৃদেবতার কল্পনা করেছেন।

অধ্যায় ৪

ভারতে বস্তুবাদ : চার্বাক-এর আগে

আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে, অন্য নামে বা কোনো নাম ছাড়াই ভারতে বস্তুবাদের একটি 'প্রাগ্-ইতিহাস' আছে। এবার আমরা তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

রাধাকৃষ্ণণ ও ফ্রাউভালনের দুজনেই একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন : (বিষয় হিসেবে) দর্শন যতখানি প্রাচীন, বস্তুবাদও ততখানিই।[১] অন্য কথায়, দর্শনের ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয় বস্তুবাদ।

এর মধ্যে অন্য একটা ইঙ্গিতও থাকে। সেটি হলো : আদিম মানুষ চিন্তা করতে শুরু করে বস্তুবাদী ধরণে; কিন্তু যত তার জ্ঞান বাড়ে, উপলব্ধির উন্নতি হয়, ততই সে ঝোঁকে ভাববাদের দিকে। তার মানে, বস্তুবাদকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। এটি নেহাতই অপরিণত ভাবনার ফসল।

ঘটনা কি তা-ই? এখনও পর্যন্ত যা লিখিত সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে তার থেকে বরং দেখা যায় : বস্তুবাদ এখানে গড়ে উঠেছিল ভাববাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে। দেহ-ছাড়া অক্ষয় আত্মা বলে একটা কিছু আছে, দেহের মৃত্যু হলেও সেই আত্মা অজর অমর, সুখ-দুঃখ কর্মফল সবই ভোগ করে সেই আত্মা— এই হলো ভাববাদের ভিত। পুনর্জন্মর চাকা থেকে বেরনোকে বলে 'মুক্তি' বা 'মোক্ষ'। দু-এরই মানে এক : জন্ম-জন্মান্তর হলো আত্মার পক্ষে এক বন্ধন, সেই পাশ থেকে ছাড়া পাওয়ার নাম মুক্তি। প্রথমে বলা হতো মানুষের জীবনের তিনটি 'বর্গ' বা ভাগের কথা : ধর্ম, অর্থ আর কাম। পরে তার সঙ্গে যোগ করা হলো আরও একটি : মোক্ষ। মোক্ষ লাভ করাই হলো মানুষের 'পুরুষার্থ' (= লক্ষ্য)। তার জন্যে ধর্ম-আচরণ, অর্থাৎ যাগযজ্ঞ, ব্রাহ্মণকে দান-খয়রাত ইত্যাদি করতে হয়। এর ফলে পুণ্য জমতে থাকে। আর সেই জমানো পুণ্যই নিয়ে যায় মুক্তির দিকে। বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে (*মনুসংহিতা* ইত্যাদি) মানুষকে যা যা করতে বলা হয়েছে সেই মতো চললে মুক্তিও হবে তাড়াতাড়ি।

তাহলে দর্শনচর্চা করে কী লাভ? দার্শনিকরা বললেন, দর্শন হলো মোক্ষশাস্ত্র। ধর্ম, অর্থ আর কাম-এর জন্যে যেমন আলাদা আলাদা শাস্ত্র আছে (ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র,

কামশাস্ত্র), মোক্ষ-র জন্যে তেমনি আছে দর্শন। তার চর্চা করলে মোক্ষলাভ হয়। তবে যে-কোনো দর্শন জানলেই মোক্ষলাভ হবে না। সে-দর্শনকে হতে হবে বেদ-অনুসারী। 'সবার ওপরে বেদই সত্য'— এ কথা যে-দর্শন মানে না, তাকে মোক্ষশাস্ত্র বলেও স্বীকার করা হবে না। বেদ কোনো মানুষ বা ঈশ্বরের রচনা কিনা— এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে, ঈশ্বর না-মানলেও কোনো ক্ষতি নেই (সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে, এমনকি ন্যায়সূত্র-এও, ঈশ্বর বলে কিছু নেই) কিন্তু বেদ-ই যে সবচেয়ে বড় প্রমাণ (= যথার্থ জ্ঞানের উপায়)— এইটে না-মানলে চলবে না।

এর জন্যেই প্রশ্ন উঠেছে : ইওরোপে যাকে 'ফিলোজফি' বলে, ভারতে 'দর্শন' কি তার সঠিক প্রতিশব্দ?[২] খ্রিস্টপূর্ব যুগে প্রাচীন গ্রিস ও রোম-এ 'প্রজ্ঞাপ্রেম' (ফিলোসোফিআ-র আক্ষরিক অর্থ) আর ধর্মতত্ত্ব এভাবে মিশে যায় নি। প্রকৃতি ও তার অংশ হিসাবে মানুষ— এ-ই হলো *ফিলোসোফিআ*-র এলাকা। কীভাবে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যায়; কোন্ অনুমান গ্রাহ্য, কোন্‌টি অগ্রাহ্য— এ-ই ছিল মূল বিষয়। অধিবিদ্যা (মেটাফিজিক্স্), যুক্তিবিদ্যা (লজিক)— তারই শাস্ত্র। ধর্ম আর জ্ঞানতত্ত্ব (এপিস্‌টেমোলজি) কখনোই এক হয়ে যায় নি। বেদ-এর মতো কোনো বই গ্রিক-রোমানদের ছিল না, পুরোহিতদের বিধানই ছিল শেষ কথা। অক্ষয় আত্মা, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য-র ধারণা অবশ্যই ছিল, কিন্তু দর্শন পড়লে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে— এমন কেউ ভাবেন নি।

আবার ভারতের কথায় ফেরা যাক। এখানে ভাববাদের যে কটি মূল নীতি— অশরীরী আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম আর বেদপ্রামাণ্য— তার সবকিছুকে অস্বীকার করেই দেখা যায় বস্তুবাদী প্রতিবাদ। লিখিত সূত্র থেকে দেখা যাচ্ছে : বেদ ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটা ধর্মমত, আর দার্শনিকরা হাজির করছেন 'আত্মা' সংক্রান্ত কিছু ধারণা; আর এই দু-এরই বিরোধিতা করছেন কিছু ব্যক্তি। তাঁদের বয়ানে সেই বিরোধী মত জানার কোনো উপায় নেই। ভাববাদীরা যেভাবে সেটিকে হাজির করেছেন, সেইটুকুই আমাদের সম্বল। তবু ভারতে দর্শনের ইতিহাসে গোড়া থেকেই ভাববাদ-বস্তুবাদের সঙ্ঘাত চোখে পড়ে।

ভারতে দার্শনিক চিন্তার প্রথম লিখিত নিদর্শন আছে উপনিষদ্-এ। *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* (৮।৭-৯)-এ বলা হয়েছে : আত্মার স্বরূপ জানার জন্যে দেবতাদের পক্ষ থেকে ইন্দ্র আর অসুরদের পক্ষ থেকে বিরোচন গেলেন প্রজাপতির কাছে। দুজনেই বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করলেন। প্রজাপতি তাঁদের বললেন, চোখের মধ্যে যে-পুরুষকে দেখা যায়, এটিই আত্মা। এটি অমর, অভয়, ব্রহ্ম। ইন্দ্র ও বিরোচন জানতে চাইলেন, জলে আর আয়নায় যা যা দেখা যায়, তার মধ্যে আত্মা কোন্‌টি? প্রজাপতি জানালেন, জল ইত্যাদির মধ্যে দেখা যায় এই আত্মাই। জলভরা শরায় নিজেদের দ্যাখো, তার থেকে যা বুঝতে পারবে না, সেটা আমায় বোলো। দুজনেই জলে

নিজেদের প্রতিরূপ দেখলেন— মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। প্রজাপতিকে তাঁরা সে-কথা জানালেন। তিনি তাঁদের বললেন, ভালো গয়না, পোশাক পরে পরিষ্কার হয়ে জলভরা শরায় নিজেদের দ্যাখো। দুজনেই তা করলেন। প্রজাপতি জানতে চাইলেন, কী দেখছ? উত্তর এল : আমরা যেমন ভালো গয়না, পোশাক পরে পরিষ্কার হয়ে আছি, সেইরকমই দেখছি। প্রজাপতি বললেন, এটিই আত্মা, অমর, অভয়, ব্রহ্ম। ইন্দ্র ও বিরোচন শান্ত হৃদয়ে চলে গেলেন।

প্রজাপতি তাঁদের দেখে (মনে মনে) বললেন : আত্মাকে না-পেয়েই না-বুঝেই ওরা চলে গেল। দেবতাই হোক আর অসুরই হোক, যাদের উপনিষদ্ (গুহ্য, গূঢ় জ্ঞান)[৩] এ-ই হবে, তারা হেরে যাবে। শান্ত হৃদয়ে বিরোচন ফিরে গিয়ে অনুচরদের এই 'উপনিষদ্' বললেন : এখানেই (এই জগতেই) আত্মা পুজো ও সেবা করার যোগ্য। আত্মার সেবা করেই এই ও ঐ দুই লোকই (= ইহলোক ও পরলোক) পাওয়া যায়।

এরপর উপনিষদ্-লেখক মন্তব্য করেছেন : সেই থেকে আজ অবধি যে দান করে না, শ্রদ্ধা করে না, যজ্ঞ করে না তাকে 'আসুর' (= অসুর প্রকৃতির লোক) বলা হয়। তার উপনিষদ্ এই। প্রেত (= মৃত)-এর শরীরকে গন্ধমালা, কাপড়, অলঙ্কার দিয়ে তারা সংস্কার করে, তারা মনে করে (প্রেত) এই দিয়েই ঐ লোক (= পরলোক) জয় করবে।

বিরোচনের মতো ইন্দ্রও নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তা হলো : দেহ-ই কি আত্মা? দেহর বিনাশ আছে, আত্মা তো অবিনাশী। তিনি আবার প্রজাপতির কাছে গেলেন। বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য করে আত্মা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানলাভ করলেন। মোট একশ এক বছর ধরে প্রজাপতির শিষ্য হয়ে তিনি জানতে পারলেন আত্মার পূর্ণ স্বরূপ।

গল্পটি আদৌ খুব নির্ভরযোগ্য নয়। এটি পড়ে মনে হবে : দেহাত্মবাদীরা পরলোক মানেন; মিশরে যে-কায়দায় মৃত রাজারাজড়াদের মমি করে রাখা হতো, সেই কায়দায় তাঁরা শবদেহকে সাজিয়ে রাখতেন। এইটুকুই শুধু দেখবার : অসুর প্রকৃতির লোককে মার্কা মারা হয়েছে অধার্মিক বলে, কারণ তারা দান করে না, ইত্যাদি। তবে বস্তুবাদের মূল সূত্রটি এখানে রয়েছে : দেহছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই, দেহ থাকলে তবেই চেতনা থাকে— এই মতের সমর্থকও প্রাচীন ভারতে ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এই গল্পটির সূত্রে 'অসুর'-এর উৎপত্তি খুঁজেছেন সুমেরীয় সভ্যতায়। সে নিয়ে আপত্তিও উঠেছে।[৪] চার্বাক/লোকায়ত-র সঙ্গে তিনিও অবশ্য বিরোচন-এর ধারণাকে এক করে দেখান নি। তবে ঘটনা এই যে, অশরীরী আত্মার বিরুদ্ধে যে একটি পাল্টা মত ছিল, দেহাত্মবাদী মতের প্রাচীনতা তা দিয়ে প্রমাণ হয়।

অন্যান্য উপনিষদে দেখা যায়, 'আত্মা' বলতে সকলেই দেহছাড়া কোনো সত্তাকে স্বীকার করতেন না। কেউ মনে করতেন, প্রাণই আত্মা; কেউ বলতেন, মনই আত্মা, কেউ বলতেন, ইন্দ্রিয়। কেউ আবার অন্ন-রস-ময় দেহকেই আত্মা বলতেন।[৫] পরবর্তীকালে চার্বাক/লোকায়ত প্রসঙ্গে কেউ কেউ এইসব মতেরও উল্লেখ করেছেন। চারটি ভূত— আগুন, বাতাস, মাটি ও জল— থেকেই বিজ্ঞানঘন (=আত্মা)-র সমুত্থান হয়, দেহের বিনাশের পরে তারও বিনাশ হয়, প্রেত (= আত্মা) বলে কিছু নেই— এই মতেরও উল্লেখ আছে।[৬] চার্বাক/লোকায়ত দর্শনে এই কথাই বলা হয়। প্রাণাত্মবাদী, মন-আত্মবাদী, ইন্দ্রিয়াত্মবাদীরাও এককালে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কথা উপনিষদের বাইরে আর শোনা যায় না।[৭]

তবু এই মতবাদগুলিরও গুরুত্ব আছে। আত্মা অর্থাৎ চেতনাকে জীবিত দেহের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা— এও আদি-বস্তুবাদী চিন্তার নিদর্শন।

তুলনায় কম প্রাচীন *মৈত্রী / মৈত্রায়ণী উপনিষদ্*-এ সমস্ত 'অবৈদিক' (= বেদবাহ্য, বেদবিরোধী) মতকে এক করে নিন্দেমন্দ করা হয়েছে।[৮] মনে হয় জৈন-বৌদ্ধরাই এর লেখকের প্রধান প্রতিপক্ষ, সেই সঙ্গে বস্তুবাদী ছাড়াও কাপালী (= কাপালিক?), বৃথাতর্কবাদী, নৈরাত্ম্যবাদী (যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না) ও নানা পেশার লোককে আক্রমণ করা হয়েছে। বোধহয় এই উপনিষদেই প্রথম বৈদিক-অবৈদিক ভাগাভাগির কথা পাওয়া যায়। আর কোনো উপনিষদে 'অবৈদিক' শব্দটি আসে নি।[৯] বস্তুবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে :

> বৃহস্পতি-ই শুক্র হয়ে ইন্দ্রের অভয় আর অসুরদের ক্ষয়ের জন্য এই অবিদ্যা সৃষ্টি করেন। তা-ই দিয়ে মঙ্গলকে অমঙ্গল আর অমঙ্গলকে মঙ্গল অভিপ্রেত হয়। তারা বলে, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রের যে হিংসাকারী ধর্ম (=পশুবধ) তা-ই সম্যক্ চিন্তা হোক; আমরা সে-চিন্তা করব না। (৭।৯)

বিষ্ণুপুরাণ ও *পদ্মপুরাণ*-এ এই গল্পটি আরও বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।[১০] বৈদিক ধর্মর, অর্থাৎ যাগযজ্ঞে পশুবলির বিরুদ্ধে আপত্তি বৌদ্ধরাই প্রথম তোলেন— এমন না-ও হতে পারে। তাঁদের আগেও হয়তো অহিংসাবাদী লোকজন ছিলেন। চার্বাকদের নামে প্রচলিত শ্লোকেও মাংস খাওয়ার নিন্দে করা হয়েছে (আবার জৈন লেখক গুণরত্ন বলেছেন, চার্বাকরা মদ-মাংসও খায়, ইত্যাদি!)।[১১]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, শুক্র-বৃহস্পতির গল্প ছাড়াও প্রজাপতি ও দেব-অসুরদের গল্পটি এক জায়গায় আনা হয়েছে। সেখানে আর আলাদা করে ইন্দ্র ও বিরোচন-এর কথা নেই। দেবতা ও অসুররা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন : আমরা আত্মকাম (= আত্মাকে জানতে চাই), তার কথা আমাদের বলুন। ব্রহ্মা বহুকাল ধ্যান করে মনে করলেন : অসুরদের আত্মার কথা জানানো ঠিক হবে না, এদের অন্য কিছু

বলতে হবে। সেই মূঢ়দের তিনি অন্য (ভুল) কথা বললেন। তারা তাই উল্টো কথা শিখল। তারা এখন [ওপারে যাওয়ার] নৌকা ডোবায়, অনৃত (=মিথ্যা)-র সুখ্যাতি করে। ইন্দ্রজালের মতো [তারা তাতেই মোহিত হয়ে থাকে]। এর পরে *মৈত্রী উপনিষদ্*-এ সাবধান করে দেওয়া হয়েছে :

> বেদ-এ যা বলা আছে তা-ই সত্য, বিদ্বান্‌রা তাকে আশ্রয় করেই বাঁচবেন। কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষে অবৈদিক (শাস্ত্র) পড়া ঠিক নয়— এই হলো (এর) অর্থ। (৭।১০)

ব্রাহ্মণ্যধর্ম-র লোকে যাতে বিপথে না যায়, তার জন্যেই এসব গল্পের সৃষ্টি— আশা করি, ব্যাখ্যা করে সে-কথা আর বোঝাতে হবে না। শুধু নজর করতে বলব : সে-ধর্ম-র প্রতিপক্ষ হিসেবে এর মধ্যেই একাধিক মতবাদ এসে গেছে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির লোক, বিশেষত শূদ্ররাও বিদ্বান্ হয়ে দেখা দিয়েছেন[১২]— এমন একটা সময়েই বৈদিক মতবাদকে তাদের ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। ধর্মরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণদের স্বার্থরক্ষাও দরকারি হয়ে পড়েছে।

পরবর্তীকালের *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*-এও দেখা যায় : জগৎ-কারণ হিসেবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তত পাঁচটি ধারণা এসে গেছে : কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (= যে দিকে গতি, অনিয়ম) ও ভূতানি (চার বা পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদান)।[১৩] এই সবকটির কথাই *মহাভারত, কামসূত্র, বৃহৎসংহিতা* ইত্যাদি বই-এ মাঝে মাঝে আসে। কিন্তু দর্শনতন্ত্র বলতে তখন সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক, যোগ, বেদান্ত— এই ছটি বৈদিক মতবাদ বোঝায়। কালবাদ, স্বভাববাদ ইত্যাদিকে তাই বলা যায় 'লুপ্ত দর্শন'।[১৪]

চার্বাক/লোকায়ত-র সঙ্গে স্বভাববাদকে অনেকেই এক করে ধরেছেন।[১৫] স্বভাব বলতে বোঝায় বস্তুর নিজের সত্তা। আগুন কেন গরম, কাঁটা কেন তীক্ষ্ণ— এর উত্তরের জন্যে ঈশ্বরের দোহাই পাড়ার দরকার নেই। জল ঠান্ডা, কারণ সেটাই তার স্বভাব। ভূতগুলিকেই যাঁরা জগৎকারণ বলে মনে করতেন, তাঁরাও যে-ভাবেই হোক বস্তুবাদী ছিলেন। কিন্তু স্বভাববাদীদের সঙ্গেই লোকায়তিকদের যোগ দেখানো হয়েছে। *মহাভারত*-এ বলা হয়, 'স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ', যাঁরা ভূতবাদী, স্বভাবই তাঁদের মত।[১৬] কিন্তু স্বভাববাদের ধারাটি এত শত বছর অব্যাহত ছিল, পরে সেটিই চার্বাক / লোকায়ত নামে পরিচিত হয়েছে— এমন মনে করার মতো কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই।

ইহলোক ছাড়া পরলোক (স্বর্গ-নরক) বলে কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতেন না এমন লোকও উপনিষদের যুগে ছিলেন। *কঠ উপনিষদ্*-এ তাঁদের ভয় দেখানোর জন্যে যম বলেন : "এই লোকই (আছে), পর (লোক) নেই— এমন যারা ভাবে

তারা বারবার আমার বশে আসে (=মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম হয়েই চলে, আবার মৃত্যু হয়)।" (১।২।৬)

অবিনাশী আত্মার মতো পরলোক না-মানাও বস্তুবাদের এক প্রধান দিক। পরেও এই কথা নানা জায়গায় পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানেও মনে রাখা দরকার : লোকায়তসূত্র সঙ্কলন করার সময়ে এই ধারাই বিনা ছেদে চলে এসেছিল— এমন বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

খ্রি চার শতকের আগে ব্রাহ্মণ্যধারা থেকে বস্তুবাদের এইটুকু 'প্রাগ্-ইতিহাস' সঙ্কলন করা যায়। *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালি-র কথায়, *মহাভারত*-এর শান্তিপর্ব-য় জনক-পঞ্চশিখ সংবাদেও বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি পাওয়া যাচ্ছে।[১৭] কিন্তু তার কোনো নাম পরিচয় নেই। টীকাকাররা একবাক্যে সেগুলিকে চার্বাকমত বলে শনাক্ত করেছেন। আদতে সেগুলি খ্রিপূ যুগের বস্তুবাদী চিন্তার নিদর্শনও হতে পারে। *মনুসংহিতা*-য় অবৈদিক মতের নিন্দে করা হয়। টীকাকাররা সেখানেও চার্বাক / লোকায়ত-র কথা বলেন।[১৮] কিন্তু মূলে কোথাও 'চার্বাক' বা ঐ জাতীয় শব্দ দেখা যায় না। তবে বৌদ্ধ ও জৈনদের পাশাপাশি দেহাত্মবাদী, পরলোকে-অবিশ্বাসী বেদনিন্দকরাও যে ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'নাস্তিক' বলতে তাঁদেরই বোঝানো হয়।

প্রশ্ন হলো : খ্রি দু শতকে কি 'বৃহস্পতিসূত্র' বা 'লোকায়তসূত্র' সঙ্কলনের কাজ হয়ে গিয়েছিল? সাংখ্যও অনেক প্রাচীন দর্শন, কিন্তু *সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র* বইটি খ্রি চোদ্দো শতকেও ছিল না। সায়ণ-মাধবও সাংখ্য-র মূল বই বলতে বোঝেন : ঈশ্বরকৃষ্ণ-র *সাংখ্যকারিকা*। *মহাভারত* ও *চরকসংহিতা*-য় যে-সাংখ্যমতের কথা আছে, তার মধ্যেও ফারাক বিস্তর।[১৯] অর্থাৎ যুগে যুগে সাংখ্য-র নানা রদবদল হয়েছে। শঙ্করাচার্য-র চোখে সাংখ্যই ছিল প্রধান প্রতিপক্ষ। তাকে হারাতে পারলে সব অবৈদিক দর্শনকে হারানো যায়।[২০] কিন্তু *সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র*-য় দেখা যায়, তার মধ্যে বেদান্ত-র ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২১]

তেমনি লোকায়তিকরাও ন্যায়দর্শন থেকে তাঁদের তর্কপদ্ধতি পেয়েছিলেন কিনা— এও একটি প্রশ্ন। পরবর্তী লোকায়তিকদের মধ্যে অবিদ্ধকর্ণ ও উদ্ভটভট্ট তর্কে খুব পটু ছিলেন। অবিদ্ধকর্ণ নামে একজন নৈয়ায়িকের কথাও পাওয়া যায়। কেউ কেউ মনে করেন, নৈয়ায়িক ও লোকায়তিক অবিদ্ধকর্ণ একই ব্যক্তি। তবে তিনি লোকায়তিক থেকে নৈয়ায়িক হয়েছিলেন, না নৈয়ায়িক থেকে লোকায়তিক— তা নিশ্চিত জানার কোনো উপায় এখনও পর্যন্ত নেই।[২২] লোকায়ত বলতে পালি ঐতিহ্যে বোঝায় : বিতণ্ডসত্থং, বিতণ্ডাশাস্ত্র। ফণিভূষণ তর্কবাগীশও বলেছেন, "...প্রাচীন কালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছি।"[২৩] মনু

প্রভৃতির ধর্মশাস্ত্রে নাস্তিক ও পাষণ্ড-র পাশাপাশি 'হৈতুক' (= হেতুবাদী)-দেরও বিস্তর নিন্দে করা হয়।[২৪] ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির খটাখটি লাগবেই। *ন্যায়সূত্র*-ই যে ভারতের একমাত্র ন্যায়গ্রন্থ ছিল— এমন নয়। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-র এক মলয়লম টীকায় (সম্ভবত খ্রি বারো শতক) ব্রহ্মা, গার্গ্য প্রমুখের ন্যায়শাস্ত্রকে 'লোকায়ত' বলা হয়েছে।[২৫] *মহাভারত*-এও আছে : ন্যায়তন্ত্র অনেক।[২৬] সুতরাং লোকায়তিকদেরও নিজস্ব ন্যায়শাস্ত্র ছিল— এমন অনুমান করাটা ভুল হবে না। *মহাভারত*-এ হৈতুকদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : এরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রামাণ্য বলে মনে করে।[২৭]

তার মানে, 'লোকায়তসূত্র' সঙ্কলনের আগেই বস্তুবাদী মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রমাণশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা যায়। জৈনরা বরং প্রমাণশাস্ত্র গড়েন অনেক পরে, যখন বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য মতবাদ ও বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে তাঁদেরও বিতর্কে নামতে হলো।[২৮]

তাহলে ব্রাহ্মণ্য উৎস বিচার করেই দেখা যাচ্ছে : বস্তুবাদের মূল ধারণাগুলি খ্রি চার শতকের আগেই ভারতে রূপ পেয়েছিল। খ্রি আট শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক দর্শনগুলির লড়াই চলেছিল প্রচুর। তখন থেকে 'চার্বাক' নামটি পাওয়া যাচ্ছে। 'লোকায়ত' শব্দটি তার চেয়ে অনেক প্রাচীন। প্রথমে তার অর্থ ছিল বিতণ্ডাশাস্ত্র, তর্ক-র নিয়মকানুন। লোকায়তিক বলতে বোঝাত তার্কিক (বিপক্ষর মতে, কুতার্কিক)। পরে সেটি হয়ে দাঁড়ায় দেহাত্মবাদ-এর প্রতিশব্দ। আত্মা ও পরলোক অস্বীকার করাই তার সবচেয়ে বড় দিক। তার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে গড়ে উঠল এক প্রমাণশাস্ত্র, যাতে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণকে স্বীকার করা হয় না। বৌদ্ধ ও জৈন সূত্র থেকেও এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যাবে।

সেইসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। লোকায়তসূত্র সঙ্কলনের আগে অবধি বস্তুবাদের যে-পরিচয় আমরা পাচ্ছি, পুরোপুরি একটি দর্শনশাস্ত্র হিসেবে সেটি ঠিক পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় নি। ফ্রাউভালনের তাই লোকায়ত সম্প্রদায়কে প্রাচীনতম বস্তুবাদী মতবাদগুলির *পরিণতি* হিসেবে দেখেছেন।[২৯] অন্য কথায় বলতে গেলে, বস্তুবাদী প্রতিবাদের ধারাটি গড়ে উঠেছিল আলাদা আলাদা উৎস থেকে। যেমন, কেউ কেউ অস্বীকার করেছেন অবিনাশী আত্মাকে, কেউ আপত্তি তুলেছেন পরকাল (স্বর্গ-নরক)-এর ধারণায়, কেউ বা মানতে চান নি বেদের প্রামাণ্যকে (বেদ-এ যা আছে তা-ই সত্য— এই মতকে), যাগযজ্ঞ পশুবলিতেও আপত্তি উঠেছে নানা সূত্র থেকে। বুদ্ধর সময়েই ভারতে এমন বহু অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল যাদের দার্শনিক ধ্যানধারণা বস্তুবাদেরই কাছাকাছি।[৩০] কিন্তু এই সবকটি মতবাদ মিলিয়ে একটি সুসংহত বস্তুবাদী দর্শন গড়ে উঠতে নিশ্চয়ই সময় লেগেছিল অনেক।

এও মনে রাখতে হবে : ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রাচীন ভারতে খুব বড় কথা

ছিল না। মীমাংসা দর্শনের অনুগামীরা আগাগোড়াই একদেববাদ ও বহুদেববাদে অবিশ্বাসী। স্বর্গ মানে ইহলোকেরই সুখ (প্রীতি), ঐ নামে কোনো আলাদা জায়গা নেই— এমন কথাও তাঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন।[৩১] সাংখ্য আর যোগ মিলিয়ে সেশ্বর (ঈশ্বর সমেত) সাংখ্য তৈরি হলেও আদি সাংখ্য পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী।[৩২] প্রাচীন ভারতে ঈশ্বর বা দেবদেবীতে আস্থার চেয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল বেদকে অভ্রান্ত বলে মানার ওপর। বেদ মানলেই হলো, ঈশ্বর না-মানলেও চলবে। ফলে, পরবর্তীকালের লোকায়তসূত্রেও ঈশ্বর না-মানার চেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে বেদ না-মানার ওপর। এর ফলে লোকায়ত দর্শনের মূল লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এইগুলি :

১. ভূতচৈতন্যবাদ (আগুন বাতাস মাটি ও জল— এই দিয়েই পৃথিবীর সব বস্তু— সজীব ও নির্জীব— তৈরি। তার থেকেই চেতনা দেখা দেয়। একে তাই দেহাত্মবাদও বলা হয়, অর্থাৎ দেহছাড়া আত্মা বলে কিছু নেই)।

২. বেদ-অপ্রামাণ্যবাদ (শুধু বেদকে প্রমাণ বলে মানতে অস্বীকার করা নয়, বৈদিক বিধান অনুযায়ী যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ধর্ম-আচরণ করতেও নারাজ হওয়া)।

৩. অনাত্মবাদ (অক্ষয় আত্মা-পরলোক ইত্যাদি কিছুই না মানা। ফলে মোক্ষলাভের ধারণাটিও বাতিল হয়ে যায়)।

৪. পরলোক-বিলোপবাদ (এই পৃথিবীর বাইরে আর কোনো লোক নেই, মৃত্যুর পরে আত্মার পুনর্জন্ম, স্বর্গ-নরকবাস ইত্যাদি সবই ভুয়ো)।

৫. প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদ (যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রত্যক্ষ— নিজের চোখে দেখা, কানে শোনা, ইত্যাদি। যে-অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নয় সেটি গ্রাহ্য নয়; আপ্তবাক্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা)।

এইসব ধারণার মধ্যে একটি যুক্তিপরম্পরা আছে। বস্তুবাদ ছাড়াও অন্যান্য দার্শনিক মতবাদে এর কোনো কোনো দিক স্বীকার করা হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধ ও জৈনরা বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করতেন না, ঈশ্বর বা দেবদেবীতেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। স্বর্গ-র ব্যাপারে মীমাংসকদের মত আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু লোকায়তই একমাত্র দর্শন যাতে ওপরের ঐ পাঁচটি মতবাদকে একত্র করে সমস্ত বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায় থেকে আলাদা একটি দর্শনতন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর জন্যে ন্যায়, বেদান্ত ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য দর্শনবিদ্ আর জৈন (দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর) ও ভাববাদী বৌদ্ধরা (মধ্যমক ও যোগাচার) লোকায়ত-র বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, কিছু কিছু বিষয়ে লোকায়তর সঙ্গে তাঁদের মিলও ছিল। ফলে, এমন অনুমান করা বোধহয় ভুল হবে না যে, আদি-বস্তুবাদী চিন্তাধারা থেকে ভারতের সব সম্প্রদায়ই কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছিলেন; শুধু চার্বাক / লোকায়তরাই সেই আদি-বস্তুবাদকে যুক্তিসঙ্গত রূপ দিয়ে তার বিকাশ ও উন্নতি ঘটান।[৩৩]

---

১. রাধাকৃষ্ণণ, ১ : ২৭৭; ফ্রাউভালনের, ২ : ২১৬।

২. হাল্‌ব্‌ফাস, ২৬৩ ইঃ।

৩. 'উপনিষৎ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ এ-ই। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-র উনশেষ অধ্যায় (১৪)-এর নামই হলো 'ঔপনিষদিকম্'। এখানে শত্রুকে পরাস্ত করার নানা গোপন উপায় (লৌকিক ও অলৌকিক) বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. বস্তুবাদকে 'অসুরমত' বলা হয়েছে। *গীতা* ১৬।৭, ৯ ও শঙ্করভাষ্য দ্র.। দাসগুপ্ত, ৩ : ৫২৩। এ নিয়ে প্রবল আপত্তি তুলেছেন ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ((১৯৭৫), ১৫৩-৫৪ টী. ৪২)।

৫. *তৈত্তিরীয়*, ২।২।১; ঐ, ২।৩।১; *ছান্দোগ্য*, ৫।১।৭; *তৈ.উ.*, ২।১।১।

৬. *বৃহদারণ্যক*, ২।৪।১২ (এ প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্ট, *ন্যা-ম*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা., আহ্নিক ৪, ১ : ৩৮৮ দ্র.)। *বৃ.উ.*, ৪।৫।১৩-য় একই কথা আছে।

৭. *স-বে-সি-সা* ২৩৬-৪৪; *অ-ব্র-সি*, ১০১; সদানন্দ যতি / যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার* (১৩৭০), ১৪৬-৫৫। এ সবেরই উৎস উপনিষৎ (সূত্র ৮ দ্র.) আর শঙ্করাচার্য-র *ব্র-সূ*, ১।১।১-এর ভাষ্য। ন্যায়-বৈশেষিক ঐতিহ্যে, ব্যোমশিবাচার্য ভূতচৈতন্যবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ— এই দুটি মতের কথা বলেছেন (ব্যোমবতী, ১ : ১২৬ দ্র.)। *ন্যা-ম*, আহ্নিক ৭-এও এই দুটি মত খণ্ডন করা হয়েছে (২ : ২১৮-১৯)।

৮. *মৈত্রী (মৈত্রায়ণী) উপনিষদ্*, ৭।১০।

৯. *অষ্টাদশ-উপনিষদঃ*, শব্দসূচি-অংশে 'অবৈদিক' শব্দটির এই একটিই মাত্র উল্লেখ আছে।

১০. *বি-পু*, ৩।১৮; *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, ১৩। বিশদ আলোচনার জন্যে পরে অধ্যায় ১২ দ্র.।

১১. *স-দ-স*, অধ্যায় ১-এর শেষ শ্লোকটি দ্র.। *পদ্মপুরাণ*-এ বলা হয়েছে— "জন্মিয়ামাত্র জীবন সর্ব্বজন্তুর প্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মমাংসোপম অন্য মাংস কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? এই সকল প্রাণী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে যোনি সেবা করে?" (সৃষ্টিখণ্ড, ১৩)।

১২. *মৈত্রী উপনিষদ্*, ৭।৮ দ্র.।

১৩. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ১।২।

১৪. র‍্যান্‌ড্‌ল্‌, ১৬ টী. ৩।

১৫. বরাহমিহির, *বৃ-স*, ১।৭ প্রসঙ্গে উৎপলভট্ট; *বৃ. উ.*, ১।৩।৬-এর শঙ্করভাষ্যে স্বভাব-এর কথা এসেছে। তার টীকায় আনন্দগিরি স্বভাববাদী বলতে লোকায়তিক বুঝেছেন (১০৮২ দ্র.)।

১৬. *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সংস্করণ, ২২৪।৫০। সায়ণ-মাধব-ও চার্বাকদের স্বভাববাদী বলে দেখিয়েছেন (*স-দ-স*, ১৩ দ্র.)।

১৭. *রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড, প্রামাণিক সং., ১০০।২-১৭; *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, ২১১।২২-৩০। এ ছাড়া শান্তিপর্ব, ১৭৯-তে ভরদ্বাজ-ভৃগু সংবাদ দ্র.।

১৮. *মনুস্মৃতি*, ২।১১, ৪।৩০, ৪।১৬৩, ৮।২২ ও টীকাকারদের মন্তব্য দ্র.।

১৯. দাসগুপ্ত, ১ : ২১৩-১৮ দ্র.।

২০. *ব্র-সূ*, ২।১।১২ প্রসঙ্গে।

২১. যেমন *সা-প্র-সূ*, ১।১৯। বেদান্ত-পরিভাষায় আত্মাকে এখানে 'নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব' বলা হয়েছে।

২২. ফ্রাঙ্কো (১৯৯৭), ৯৯, ১৪২।

২৩. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ : চৌদ্দ।

২৪. *মনুস্মৃতি*, ৪।৩০। মেধাতিথি 'হৈতুক'-এর অর্থ করেছেন নাস্তিক, আর *বি-ধ-ম-পু*, ১।১০৮।১৯ থেকে একটি বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন (২ : ৩১৫। এ যাবৎ কেউ এই উদ্ধৃতিটি শনাক্ত করেন নি)। কুল্লূকভট্ট হৈতুক-এর ব্যাখ্যা করেছেন : যারা বেদবিরোধী তর্ক ব্যবহার করে (ঐ, ৩১৬); রাঘবানন্দ, নন্দন, মণিরাম ও গোবিন্দরাজ তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। রামচন্দ্র লিখেছেন : যুক্তির বলে যারা সব জায়গায় সংশয় করে (ঐ)।

২৫. কঙ্গলে, ২ : ৬ টী. ১০। মহামহোপাধ্যায় ত. গণপতি শাস্ত্রী তাঁর সংস্কৃত টীকায় (১৯২৪) এই ব্যাখ্যাই করেছেন (২৭)।

২৬. *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, ২০৩।২০।

২৭. ঐ, অনুশাসনপর্ব, ১৪৭।৫।

২৮. দীক্ষিত (১৯৭১), ১৪৬। ছ রকমের প্রমাণের তত্ত্ব প্রথম হাজির করেন অকলঙ্ক (খ্রি আট শতক)।

২৯. ফ্রাউভালনের, ২ : ২১৯। এলি ফ্রাঙ্কো ও কারিন প্রেইসেনডান্‌ৎস্‌-ও ভারতীয় বস্তুবাদের ইতিহাসকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন : early materialists (অজিত কেসকম্বল) আর classical materialist philosophy (*লোকায়তসূত্র*-র অনুগামী) (*রাটলেজ দর্শন-বিশ্বকোষ*, ৬ : ১৭৮-৮১)।

৩০. দাসগুপ্ত (৩ : ৫২০-২৪) ও ফ্রাউভালনের (২ : ২১৯-২০) বুদ্ধ-র সমকালীন চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে অজিত কেসকম্বল, ককুদ কচ্চায়ন, পূরণ কস্‌সপ ও মক্‌খলি গোসালকে বস্তুবাদী বলে ধরেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র অজিতকেই দেহাত্মবাদী বলা যায়।

৩১. শবরস্বামী, *জৈ-সূ-ভা*, ৪ : ১৩৪৭-৪৮। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে হেমন্তকুমার গাঙ্গুলী (১৯৮৯), ১৪৬-৪৮ দ্র.।

৩২. *সা-প্র-সূ*-র দুটি আলাদা সূত্রে আছে : 'ঈশ্বরের অসিদ্ধতা হেতু' (১।৯২) আর 'প্রমাণের অভাবহেতু তার (ঈশ্বরের) সিদ্ধি হয় না' (৫।১০)। *দেবী চৌধুরাণী*-তে বঙ্কিমচন্দ্র দুটিকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছিলেন। এর থেকেই অনেকে দুটি মিলিয়ে একই সূত্র বলে মনে করেন।

৩৩. দার্শনিক আলোচনার বাইরে বস্তুবাদের আর একটি বড় উৎস হলো ভৌতবিজ্ঞান চর্চা। *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*-এর উদ্দালক-শ্বেতকেতু সংবাদ (৬।১-১৬) তার খুব ভালো দৃষ্টান্ত। এর ভিত্তিতে উদ্দালক আরুণিকে পৃথিবীর প্রথম বস্তুবাদী বলে দাবি করা হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯১), ২ : ৯৮-১৪৮ দ্র.।

অধ্যায় ৫

চার্বাকদর্শন : উৎস-বিচার

এতকাল চার্বাকদর্শন পুনর্গঠনের চেষ্টা হয়েছে অনেকটাই আন্দাজে। তাতে মতভেদের জায়গাও প্রচুর। যতটুকু খবর পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই দর্শনের মূল বক্তব্য ও বিকাশের ধারাটি অনুধাবন করা যায়। তার জন্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে এগোনো দরকার।

এক এক করে কাজগুলির তালিকা করা যাক।

১. অসুরমত, চার্বাক, নাস্তিক, বার্হস্পত্য, লোকায়ত, আর দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ, স্বভাববাদ— এই সবকটি নাম দিয়েই 'বস্তুবাদ' বোঝানো হয়েছে। যেখানে যেখানে এই নামগুলি পাওয়া যায়, আগে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা করতে হবে। তারপর সেটি সাজাতে হবে কাল-অনুযায়ী।

কাজটি সহজ নয়। দর্শনের বই ছাড়াও মহাকাব্য, কাব্য, নাটক— এমন বহু বিচিত্র জায়গায় এসব নাম ছড়িয়ে আছে। আর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে লেখক ও রচনার সময় স্থির করা খুবই কঠিন কাজ।

২. এই আটটি নামের কোনোটিই ব্যবহার করা হয় নি, কিন্তু এই দর্শনের কথাই বলা হয়েছে (যেমন *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়, অধ্যায় ২১১। ২২-৩০)— এমন সব উৎসও একত্র করতে হবে।

৩. তৃতীয় উৎস হলো বিভিন্ন দার্শনিক মতের সার-সঙ্কলনের বই। হরিভদ্র-র *ষ-দ-স*-র একটি সংস্করণের ভূমিকা থেকে এ ধরণের অন্তত তেইশটি সার-সঙ্কলনের কথা জানা যায়। তার সবকটিতেই অবশ্য চার্বাকের কথা আসে নি; বেশ কয়েকটি এখনও ছাপা হয় নি।

৪. লুপ্ত চার্বাকসূত্র-র যে কটি সূত্র বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি জড়ো করা। এটিই সবচেয়ে দরকারি কাজ। বিরোধীপক্ষর লেখায় সূত্র ছাড়াও কিছু শ্লোক পাওয়া যায়। সবকটির পাঠ এক নয়। ফলে নির্বিচারে সবকটিকে মেনে না-নিয়ে (এতকাল তা-ই করা হয়েছে), সব উৎস তুলনা করে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করতে হবে।

মনে রাখা ভালো, সোক্রাতেস-এর আগের দার্শনিকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের টুকরো উদ্ধৃতি থেকেই তাঁদের মত পুনর্গঠন করা হয়েছে। চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রেও দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও মামোরু নামাই সে-চেষ্টা করেছেন।[১] কিন্তু কিছু সূত্র এখনও সঙ্কলিত হয় নি (বোধহয় নজর এড়িয়ে গেছে), 'চার্বাকসূত্র' বলে এমন কিছু উক্তিকে মেনে নেওয়া হয়েছে যেগুলি নিঃসংশয় নয় (যেমন বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*-য় উদ্ধৃত কয়েকটি 'সূত্র')।[২]

৫. চার্বাকসূত্র-র পাশাপাশি 'পৌরন্দরসূত্র'-র কথাও পাওয়া যায়। সেটিরও কোনো সন্ধান মেলে নি। পুরন্দর-এর নামে একটি বৃত্তি-র কথা আছে জৈন কবি পুষ্পদন্ত-র *মহাপুরাণ*-এ।[৩] বৌদ্ধ দর্শনবিদ্ কমলশীল ও জৈন লেখক প্রভাচন্দ্র এমন একাধিক বৃত্তির কথা বলেছেন।[৪] নৈয়ায়িক চক্রধরও এমন দুজন বৃত্তিকারের নাম করেছেন— ভাবিবিক্ত (প্রথাগত মতের অনুসারী, 'চিরন্তনচার্বাক') ও উদ্ভট (অভিনব ব্যাখ্যাকার)।[৫] অর্থাৎ আট শতকের আগে থেকে ন-দশ শতক পর্যন্ত 'লোকায়ত-সূত্র'-র দুই বা তারও বেশি বৃত্তি লেখা হয়েছিল।

চার্বাকদর্শন যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে নি, তারও বিকাশ হয়েছিল অন্যান্য দর্শনের মতো টীকাভাষ্য-পরম্পরায়— এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এইসব বৃত্তি। এগুলি থেকেও কিছু কিছু টুকরো উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। শুধু পরমত-খণ্ডনে নয়, নিজমত-সমর্থনে কী কী যুক্তি দেওয়া হতো— তার চমৎকার নমুনা এগুলিতে আছে। চার্বাক-দর্শনের আলোচনায় এই দিকটি এখনও অবহেলিত।

এই পাঁচ ধরণের উৎস মিলিয়ে কাল-অনুযায়ী সাজিয়ে চার্বাকদর্শনের বিকাশ সম্পর্কে মোটের ওপর একটি ধারণা করা যাবে। কিছু কিছু ব্যাপারে সংশয় থাকবে, কিন্তু মূল বক্তব্য ধরতে খুব অসুবিধে হবে না। বিরোধীপক্ষর লেখা থেকে সোনা আর খাদ আলাদা করার জন্যে আমরা পাঠ-সমালোচনা (টেক্স্ট ক্রিটিসিজম)-র একটি পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি। সেটি হলো : বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন উৎসে যে-কটি সূত্র বা শ্লোক বা বক্তব্য একই চেহারায় (একেবারে একই ভাষায় হলে সবচেয়ে ভালো হয়) পাওয়া যাবে, একমাত্র সেগুলিকেই আমরা খাঁটি বলে ধরব। যেমন, মাটি, জল, আগুন আর বাতাস— এ চারটিই হলো তত্ত্ব (মূল বিষয়)— এই সূত্রটি প্রায় সব উৎসেই একই ভাষায় পাওয়া যায়।[৬] কিছু জৈন রচনায় কিন্তু চার্বাকদের পঞ্চভূতবাদী (ঐ চারটি ভূত ছাড়াও আকাশ বা ব্যোম বা শূন্য) বলা হয়েছে।[৭] গুণরত্ন এঁদের বলেছেন : এক ধরণের চার্বাক ('চার্বাকৈকদেশী')।[৮] এটি ঠিকও হতে পারে, কিন্তু না হওয়াই সম্ভব। ব্রাহ্মণ্য (বৈদিক) ও বৌদ্ধ উৎসে পঞ্চভূতবাদীর কথা নেই। কিন্তু চার্বাকরা যে 'তত্ত্ব' বলতে ভূত ছাড়া আর কিছু (যেমন, আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, বেদপ্রামাণ্য) মানতেন না— বিনা দ্বিধায় এ কথা বলা যায়।

আর, সব উৎসে যদি এক কথা না-পাওয়া যায়? সেখানে কালক্রমই একমাত্র সহায়। পরবর্তী মতের চেয়ে পূর্ববর্তী মতই ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যেমন (ক) 'সেগুলি (=ভূতগুলি) থেকেই চৈতন্য'[৯]— এই সূত্রটি নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যাখ্যাভেদ ছিল। সূত্রে অনেক সময়েই পুরো বাক্য বলা হয় না, ব্যাখ্যায় সেটি পূরণ করা হয় (পূরণসূচক অংশটিকে বলে 'অধ্যাহার')। আট শতকেই এই সূত্রটির দুটি অধ্যাহার চালু ছিল : চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়, আর চৈতন্য জন্মায়।[১০] চক্রধর বলছেন, উদ্ভটভট্ট আবার 'তেভ্যঃ' শব্দটি পঞ্চমী বিভক্তি ('সেগুলি থেকে') না-ধরে এটিকে চতুর্থী বিভক্তি ('সেগুলির জন্যে') বলে ব্যাখ্যা করেন।[১১] অর্থাৎ, ভূতগুলির জন্যে চৈতন্য জন্মায় (বা উপজাত হয়)।

এর থেকে কী সিদ্ধান্ত করা হবে? উদ্ভটভট্ট নিঃসন্দেহে পরের ব্যাখ্যাকার— তাঁকে 'শোধনবাদী' বলা যায়। কিন্তু 'অভিব্যক্তি' আর 'জন্ম'— এর মধ্যে কোন্ মতটি আগের? এর কোনো নিশ্চিত উত্তর দেওয়া যাবে না। তবে, সম্ভাবনা হলো : অভিব্যক্তি-ই ছিল আদি ব্যাখ্যা।

(খ) কোনো কোনো উৎসে চার্বাকের মত বলতে এক কথা বলা হয়, অন্য উৎসে তার থেকে একটু আলাদা। যেমন, কারও মতে, চার্বাকরা বলেন, কামই পুরুষার্থ, অর্থাৎ সুখই জীবনের লক্ষ্য।[১২] অন্য মতে, চার্বাকরা কাম ও অর্থ— দুটিকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন।[১৩] এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। চার্বাকরা আদৌ পুরুষার্থ-র নিরিখে ভাবতেন কিনা— এই প্রশ্নও তোলা যায়।

(গ) দুটি উৎস যেখানে পরস্পর-বিরোধী— সেখানে কী কর্তব্য? কেউ কেউ বলেছেন, চার্বাকরা শুধু প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ (= যথার্থ জ্ঞানের উপায়) বলে স্বীকার করেন, অনুমানও কিছু নয়।[১৪] আবার কেউ কেউ বলছেন, লৌকিক ক্ষেত্রে এঁরা অনুমানকে মানেন (যেমন, ধোঁয়া দেখে আগুন), কারণ তার পেছনে প্রত্যক্ষ আছে; কিন্তু অলৌকিক ব্যাপারে (ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি) অনুমানকে তাঁরা প্রমাণ বলে মানতে রাজি নন।[১৫]

এ ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা ও কালক্রম— দুটিকেই কাজে লাগানো যায়। আট শতকেই দ্বিতীয় মতটির কথা পাওয়া যাচ্ছে। তারপরেও যাঁরা প্রথম মতটিকেই চার্বাকদের একমাত্র মত বলেন (জয়ন্তভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র, হেমচন্দ্র তা-ই বলেছেন)[১৬], তাঁরা বিষয়টিকে বিকৃতভাবে হাজির করেন, বা অজ্ঞতার পরিচয় দেন। এঁদের মধ্যে জয়ন্তভট্ট আবার একই বই-এ লিখেছেন, চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা ঠিক করা যায় না।[১৭] এর থেকে, খুব বেশি হলে চার্বাকদের একাধিক সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা জোরদার হয়, সব চার্বাক-ই এ বিষয়ে একমত ছিলেন তা প্রমাণ হয় না।

আর যেখানে কোনো কোনো উৎসে একটি মত পাওয়া যাচ্ছে (যেমন, চার্বাকরা

অবাধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বলতেন),[১৮] অন্যান্য উৎস একেবারেই নীরব? এখানেও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। যে কটি প্রশ্ন সব উৎসেই উঠেছে, একমাত্র সেগুলিই বিবেচনার যোগ্য। ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে চার্বাকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন জৈন ও ব্রাহ্মণ্য লেখকরা, তা-ও মূলত কাব্যে-নাটকে, দর্শনের বই-এ নয়। বৌদ্ধরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। এ ক্ষেত্রে অভিযোগটি খারিজ করে দেওয়া যায়।

এখানে-ওখানে কিছু সূত্র আর শ্লোকের উদ্ধৃতি, কয়েকজন বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় দু-চারটি বাক্য আর বিরোধীপক্ষর মতামত— স্রেফ এর থেকে কোনো দর্শনের নির্ভুল পরিচয় পাওয়া শক্ত। কিন্তু উপায় নেই। চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রে এইটুকুই আমাদের সম্বল। যা করার এর থেকেই করতে হবে। ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি সূত্র ও ভাষ্যর কোনো পুঁথি আবিষ্কার হয়, তখন হয়তো নিশ্চিত বলা যাবে : আগের পুনর্গঠন কতদূর ঠিক হয়েছিল।

শুধু উদ্ধৃতি জড়ো করেই সোক্রাতেস-পূর্ব গ্রীক দার্শনিকদের মতামত খাড়া করা হয়েছে। সেগুলিও অসম্পূর্ণ, কিন্তু থালেস, হেরাক্লিতাস প্রমুখ দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা অনেকদূর পর্যন্তই পুনর্গঠন করা যায়। হেরাক্লিতাস-এর একটি উক্তি সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন : দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রটি এর মধ্যেই রয়েছে।[১৯] কিছু টুকরো উদ্ধৃতি থেকেও কোনো দর্শনের মূল তত্ত্ব ধরা যেতে পারে। সে-দর্শনের অনেক দিক হয়তো অজানা থেকে যাবে, কিন্তু একেবারে 'উল্‌টা বুঝলি রাম'— এমন অবস্থা হবে না।

চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রে যেটুকু পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়, ঠিকই। তাহলেও ঐ দর্শনের মূল ধাঁচটি তাতেও ধরা পড়ে। এখন দরকার হলো, সব উৎসকে কাল-অনুযায়ী সাজানো, সেগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করে বাছাই করা, আর সবশেষে তার থেকে ঐ দর্শনের সারকথাগুলি সঙ্কলন করা।

এই ঝাড়াই-বাছাই-এর কাজটি এখনও ঠিকমতো করা হয় নি। যিনি যেখানে চার্বাক/লোকায়ত/বৃহস্পতি-সূত্র বা শ্লোক বলে যা কিছু বলেছেন, তার সব-ই এতকাল নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়েছে। একই শ্লোকের যদি একাধিক পাঠ পাওয়া যায়, তবে একটিকে অন্যটির পাঠভেদ বলে মনে করা হয়। দুটিই যেন সমান গ্রাহ্য।

ঘটনা কি তা-ই? মজার ব্যাপার হলো, চার্বাকমতের সূত্র ও শ্লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একই সূত্র ও শ্লোক, নানা পাঠভেদসমেত, বহু জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন, এই বিখ্যাত শ্লোকটি :

> যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।

যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; ধার করেও ঘি খাবে। ছাই-হয়ে-যাওয়া দেহ আবার কোথায় (বা কোথা থেকে) ফিরে আসবে?

অনেকেই ভাবেন চার্বাকদর্শনের সারাৎসার যেন এই শ্লোকেই ধরা আছে। কোথায় শ্লোকটি পাওয়া গেল, কে এটি প্রথম বলেছিলেন— সাধারণ লোকে কেন, দর্শনের অনেক পণ্ডিতও তা জানেন না।

শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায় চোদ্দো শতকে সায়ণ-মাধবের *সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ*-য়।[২০] কিন্তু তার অন্তত ৯০০ বা ১০০০ বছর আগে শ্লোকটি পাওয়া যাচ্ছে *বিষ্ণু-ধর্মোত্তর মহাপুরাণ*-এ। সেখানে শ্লোকটির পাঠ হলো :

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্ নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য শান্তস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[২১]

যতদিন জীবন আছে, সুখে বাঁচবে; মৃত্যুর অগোচর কিছুই নেই। ছাই-হয়ে-যাওয়া মৃত লোক কোথায় (বা কোথা থেকে) আবার ফিরে আসে?

সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ-র আগে আরও অন্তত দশজন আর পরে অন্তত একজন (মাধব সরস্বতী) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন (অংশত বা পুরোপুরি)। তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রথম চরণের দ্বিতীয় পাদটি ইচ্ছেমতো বদলেছেন; বাকিরা সবাই লিখেছেন, "মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই।"[২২] এইভাবে ঝাড়াই-বাছাই করলে স্পষ্ট বোঝা যায় : কোন্‌টি মূল পাঠ আর কোন্‌টি বিকৃত।

---

১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০-০১; নামাই (১৯৭৬), ২৯-৪৪।
২. *কামসূত্র*, ১।২।২৫-৩০।
৩. *স্যা-বা-র*, ২৬৫; *মহাপুরাণ*, ২০।১৮, ১ : ৩২৮।
৪. *ত-স-প*, ২ : ৬৩৩-৩৪; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২।
৫. *গ্রন্থিভঙ্গ*, ২ : ২৫৭।
৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), সূত্র ২; নামাই (১৯৭৬), সূত্র A2।
৭. *সূ-কৃ-সূ*, ২।২।১০ ও শীলাঙ্ক-র বৃত্তি, ১৮৮; *ত-র-দী* (হরিভদ্র-র *ষ-দ-স* সমেত), ৩০০।
৮. *ত-র-দী*, ৩০০।
৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), সূত্র ৩; নামাই (১৯৭৬), সূত্র A4।
১০. টী. ৪ দ্র.।
১১. *গ্রন্থিভঙ্গ*, ২ : ২৫৭।
১২. নীলকণ্ঠ, *গীতাভাষ্য*, ১৬।১১; *অ-ব্র-সি*, ৯৯।
১৩. *প্র-চ*, অঙ্ক ২; *স-দ-স*, ২।

১৪. *ত-কৌ, সাংখ্যকারিকা* ৫-এর টীকা; *ত-বো-বি*, ৭০; *ত-স-প*, ৫২০; *গ্রন্থিভঙ্গ*, ১ : ২০১।
১৫. *ত-স-প*, ৫২৮; *স-ম-স*, ১৫।
১৬. *ন্যা-ম*, ১ : ৪৩; *ভামতী*, *ব্র-সূ-ভা*, ৩।৩।৫৪ প্রসঙ্গে; *অ-ব্য-দ্বা*, ১৩০।
১৭. *ন্যা-ম*, ১ : ৫২।
১৮. এর মূল উৎস কয়েকটি কাব্য ও নাটক, যেমন, *প্র-চ*, অঙ্ক ২; *ত্রি-শ-পু-চ*, ১।৩৪০-৩৪৫; *নৈ-চ*, ১৭।৫০, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৩।
১৯. লেনিন, *সংকলিত রচনা* (ইং), ৩৮ : ৩৪৯।
২০. *স-দ-স*, ১৪, শ্লোক ৭।
২১. *বি-ধ-ম-পু*, ১।১০৮।১৮ গ-ঘ, ১৯ ক-খ।
২২. এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.।

অধ্যায় ৬

চার্বাকসূত্র : পুনর্গঠনের দিকে

পারিভাষিক শব্দ : সূত্র, ভাষ্য ইত্যাদি

ভারতের সব প্রাচীন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারাই তাঁদের যাবতীয় মতামত বলে রাখতেন সূত্র-র আকারে। 'সূত্র' বলতে বোঝায় : অল্প কথায়, নিঃসন্দেহে, সারগর্ভ আর সর্বমুখী কিছু শব্দ যেগুলি অর্থযুক্ত আর নির্দোষ।[১] শুধু দর্শনই নয়, ব্যাকরণ ইত্যাদি শাস্ত্রও এই সূত্র-আকারেই রচনা করা হতো। তার সেরা নিদর্শন পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী*। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-ও মূলত সূত্র-আকারেই লেখা, যদিও তার পাশাপাশি অনেক শ্লোকও আছে। অর্থাৎ, টানা গদ্যে সারা বইটি না-লিখে, গদ্য-পদ্য মিলিয়ে লেখা হয়েছিল।

সূত্র-আকারে রচনার একটি কারণ হলো : মুখস্থ করার সুবিধে। আমাদের পূর্বপুরুষরা পড়ার চেয়ে শোনায়, লিখে রাখার চেয়ে মনে রাখায় বেশি আস্থা রাখতেন। যত সাঁটে মূল কথাগুলো বলা যায় ততই ভালো। এমনও বলা হয়েছে : কোনো সূত্র থেকে আধ মাত্রার কোনো অক্ষর কমাতে পারলে ব্যাকরণবিদ্‌রা ছেলে জন্মানোর আনন্দ পান।[২]

এত সংক্ষেপে বলার অসুবিধেও আছে। অনেক সময়েই সূত্রগুলি হয়ে দাঁড়ায় অসম্পূর্ণ বাক্য। সম্পূর্ণ করতে হলে শেষে আরও দু-একটি শব্দ লাগে। এর পারিভাষিক নাম 'অধ্যাহার' (পরে এর উদাহরণ দেওয়া হবে)। সঠিক অধ্যাহার কী হবে— এই নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। হয়ও। এ ছাড়া, সূত্রকার ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন— এ নিয়েও কালক্রমে একাধিক ব্যাখ্যা দেখা দেয়।

এই ধরণের ব্যাখ্যাগ্রন্থকে বলা হয় *ভাষ্য*। শব্দটি দিয়ে বোঝায় : সূত্ররই পদ নিয়ে, সূত্র অনুযায়ী বাক্যে, সূত্রর পদগুলিকে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করা।[৩] এর সেরা নমুনা : *অষ্টাধ্যায়ী*-র ব্যাখ্যাগ্রন্থ, পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য*। সব ভাষ্যই অবশ্য এই সংজ্ঞার্থ মেনে চলে না। সব দিক দিয়েই পতঞ্জলি ছিলেন সার্থক ভাষ্যকার। সূত্র আর

ভাষ্য— দু-এর ওপরেই আবার *টীকা* ও *টিপ্পনী* লেখা হয়। এগুলি ভাষ্যর মতো অত বিস্তৃত হয় না, খুব সংক্ষেপে কোনো শব্দর / বাক্যর / শ্লোকের মানে বলে দেওয়া থাকে।

এ ছাড়া আরও একটি শব্দ এই প্রসঙ্গে আসে। সেটি হলো : *বৃত্তি*। এর মানে সূত্রর অর্থবিবরণ-ব্যাখ্যা।[৪]

ইংরিজি শব্দ দিয়ে বোঝালে যদি কারও সুবিধে হয়, তবে বলতে পারি : সূত্র হলো aphorism, টিপ্পনী annotation, gloss বা scholium, বৃত্তি short commentary, ভাষ্য commentary, আর টীকা sub-commentary (যেমন শঙ্করাচার্য-র *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-ভাষ্যর ওপর আনন্দগিরি-র টীকা), যদিও commentary অর্থেও 'টীকা' শব্দটি চলে। কার্যকালে অবশ্য টীকা, বৃত্তি ও ভাষ্যর মধ্যে সর্বদা একেবারে জল-অচল ভাগ করা যায় না।

সাংখ্যদর্শন : উৎস বিচার

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতের আস্তিক (অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্য ও / বা পরলোকে বিশ্বাসী) দর্শনপ্রণালী ছটি : সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায় ও বৈশেষিক। এগুলির মধ্যে একমাত্র প্রথমটির কোনো সূত্রগ্রন্থ নেই। *সা-প্র-সূ* নামে যে-বইটি পাওয়া যায় সেটি অনেক পরের রচনা— খ্রিস্টীয় চোদ্দো শতকেরও পরের।[৫] অথচ সাংখ্যই ভারতের সবচেয়ে পুরনো দর্শন। সাংখ্যদর্শনের উৎস বলতে তাই ঈশ্বর-কৃষ্ণ-র *সাংখ্যকারিকা*। এটি কারিকা অর্থাৎ শ্লোকের আকারে লেখা। এ ছাড়া *মহাভারত*-এ ও *চরক-সংহিতা*-য় সাংখ্যমতের কথা পাওয়া যায়। তার সব বিবরণ কিন্তু হুবহু এক নয়।

তবু সব মিলিয়ে সাংখ্য-র মূল কথাগুলো ধরা যায়। এ ছাড়া বাদরায়ণ-এর *ব্রহ্মসূত্র*-য় ও তার যাবতীয় ভাষ্যে সাংখ্য-খণ্ডনের ব্যাপক চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং সাংখ্য বলে যে একটি বহু প্রাচীন দর্শন ছিল, যোগ-এর সঙ্গে মেলবার আগে তার একটি আলাদা রূপও ছিল (যা শুধু নিরীশ্বরবাদীই নয়, অ-বৈদিকও) এতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

ন্যায়দর্শনের পরম্পরা

ন্যায়দর্শনের ক্ষেত্রে সূত্র-ভাষ্য ইত্যাদি মিলিয়ে এক বিরাট আয়োজন। কয়েকশ বছর ধরে বিনা ছেদে ন্যায়চর্চা চলেছে সারা ভারত জুড়ে (নব্যন্যায়-কে বাদ দিয়েই এ কথা বলছি)। তার থেকে তৈরি হয়েছে গৌতম-এর *ন্যায়সূত্র*, তার ভাষ্য লিখেছেন বাৎস্যায়ন (ইনি *কামসূত্র*-কার নন; 'বাৎস্যায়ন' হলো গোত্রনাম। এঁর আসল নাম ছিল পক্ষিলস্বামী)। এর পর, *ন্যায়বার্ত্তিক* লিখেছিলেন উদ্দ্যোতকর। তার *তাৎপর্য-টীকা*

লিখেছেন বাচস্পতিমিশ্র। তার আবার টীকা লিখেছেন উদয়নাচার্য, তার নাম : *পরিশুদ্ধি*। এর সঙ্গে বৈশেষিক-কে ধরলে অন্তত ছাপ্পান্নজন দর্শনবিদ্ ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন নিয়ে নানা ধরণের ছোটো বড় পুঁথি লিখেছেন।[৬]

এত দীর্ঘ চর্চার ইতিহাস সত্ত্বেও ন্যায়দর্শনের সূত্রগুলির সঠিক পাঠ নিয়ে সংশয় কাটে নি, বরং কালে কালে বেড়েছে। বাচস্পতিমিশ্র তাঁর *ন্যায়সূচিনিবন্ধ*-য় সূত্র-সংখ্যা ও পাঠ নির্দিষ্ট করে দেন। এমনকি, সূত্রগুলিতে মোট কটি অক্ষর আছে তাও গুনে গেঁথে রাখেন। তবু তার সঙ্গে তাঁর আগের ও পরের নৈয়ায়িকদের রচনায় উদ্ধৃত সূত্রর বেশ কিছু পাঠভেদ দেখা যায়।[৭]

চার্বাকচর্চা : সূচনাপর্ব

চার্বাক / লোকায়ত-র ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একেবারেই অন্যরকম। আজ অবধি তার কোনো সূত্র-গ্রন্থ, ভাষ্য, বৃত্তি, টীকা বা স্বতন্ত্র কোনো রচনা (ন্যায়-বৈশেষিকের ক্ষেত্রে যেমন জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*) পাওয়া যায় নি। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় : এর অন্তত একটি সূত্র-গ্রন্থ ছিল, একাধিক বৃত্তি / টীকা ছিল (আর কোনো কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদও ছিল)।[৮] কিন্তু তার কিছুই রক্ষা পায় নি। তবে পরস্পরবিরোধী মতের দার্শনিকরা (আস্তিক ও নাস্তিক দুইই) বারবার এই মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। তাই চার্বাক বলে একটি বিশিষ্ট দর্শন যে ভারতে একসময়ে প্রচলিত ছিল— সে-নিয়ে সংশয়ের সুযোগ নেই।[৯] এখনকার দার্শনিক পরিভাষায় এটিকে আমরা 'আপসহীন বস্তুবাদী' বলতে পারি। নানা নামে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে চার্বাক, বার্হস্পত্য আর লোকায়তই প্রধান। খ্রি আট শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে মূলত এই তিনটি নামেই এটিকে উল্লেখ করা হয়।[১০] তার পরেও আঠেরো শতক পর্যন্ত বহু দার্শনিক প্রতিপক্ষ এটি সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। কিন্তু তার সবই চর্বিতচর্বণ মাত্র (সাদা বাঙলায় যাকে বলে : জাবর কাটা)। আট থেকে বারো শতকের মধ্যে, বিপক্ষর লেখায় যে-কটি চার্বাকসূত্র ও ভাষ্য/বৃত্তি/টীকা-র উল্লেখ/উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, পরে তার চেয়ে বেশি কিছু আর পাওয়া যায় নি। মনে হয়, চোদ্দো শতকের আগেই চার্বাকমতের যাবতীয় সূত্রগ্রন্থ ও আনুষঙ্গিক রচনা হারিয়ে গিয়েছিল বা হয়তো পরিকল্পনা করেই নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।[১১]

তবে বিপক্ষর লেখায় বেশ কিছু সূত্র / বৃত্তি / ভাষ্য / টীকা বা উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে। সেগুলি জড়ো করলেও চার্বাকমতের মোটামুটি একটা চেহারা খাড়া করা যায়। বিভিন্ন দার্শনিক মত-সংগ্রহগ্রন্থেও চার্বাকদর্শনের পরিচয় দেওয়া আছে। সেগুলিও ঐ মত পুনর্গঠনের সহায়। এইভাবে, নানা উৎস থেকে উল্লেখ-উদ্ধৃতি মিলিয়ে গ্রিস-এর সোক্রাতেস-পূর্ব দার্শনিকদের মত পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চার্বাকমত : পুনর্গঠনের প্রয়াস

উনিশ শতকের গোড়ায় (১৮২৭) হেনরি টমাস কোলব্রুক যখন চার্বাক নিয়ে লিখেছিলেন তখন তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ উৎস বলতে কিছুই ছিল না। ১৮৫৩-য় সায়ণ-মাধব-এর *সর্বদর্শনসংগ্রহ*-র একটি গ্রন্থখণ্ড, fascicule বেরয়। এটি সম্পাদনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বইটি সম্পূর্ণ আকারে বেরয় ১৮৫৮-য়। এই বইটি দিয়েই আধুনিক বিশ্বে চার্বাকচর্চার সূত্রপাত।[১২] এতেই প্রথম বেশ কয়েকটি চার্বাকসূত্রর উল্লেখ আছে (যদিও অবিকল উদ্ধৃতি নয়)। ক্রমে আরও কিছু বই ছেপে বেরনোর পর এই ধরণের রচনাংশ সঙ্কলনের সুযোগ হলো।

এ কাজে প্রথম হাত দিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৮৯৪-১৯৬১)। *চার্বাক-ষষ্টি* (১৯২৮) নামে ইংরিজি-সংস্কৃত মেশানো বইটিতে তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে চার্বাকমতের সমর্থক একশ-টি সূত্র ও ষাটটি শ্লোক সঙ্কলন করেন।[১৩] ১৯৪৪-এ আবার এর থেকে বাছাই করে তিনি খাড়া করেন পঞ্চাশটি সূত্র ও শ্লোকের একটি সংগ্রহ। 'বার্হস্পত্যদর্শন' নামে সেটি প্রথম বেরিয়েছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকায়। আরও চারটি রচনাংশ সমেত তাঁর *চার্বাকদর্শন* (১৯৫৯) বইটির পরিশিষ্টে 'বার্হস্পত্যসূত্রম্' নামে সেটি ছাপা হয়।[১৪]

১৯৬৫-তে সর্বানন্দ পাঠক তাঁর *চার্বাক দর্শন কী শাস্ত্রীয় সমীক্ষা* বইটিতে এই চুয়ান্নটি সূত্র ও শ্লোক হিন্দী তর্জমা সমেত ছেপে দেন। পাদটীকায় তিনি একবার দক্ষিণারঞ্জনের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এই চুয়ান্নটি সূত্র ও শ্লোক যে দক্ষিণারঞ্জনই একত্র করেছিলেন— সে-কথা কোথাও পরিষ্কার করে বলেন নি।

এর ফলে বিভ্রান্ত হয়েছেন জাপানের অধ্যাপক চিশো মামোরু নামাই। এই রচনাংশ সঙ্কলনের কৃতিত্ব তিনি সর্বানন্দ পাঠককেই দিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সূত্র ও শ্লোকগুলি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সাজান নি। নামাই কিন্তু ১৯৭৬-এ ছটি ভাগে ভাগ করে পঁয়তাল্লিশটি সূত্র, উদ্ধৃতি ও শ্লোক হাজির করেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের সংগ্রহ থেকে তিনি নিয়েছেন ছত্রিশটি আর নতুন যোগ করেছেন নটি। তার কয়েকটি আবার তিব্বতী উৎস থেকে পাওয়া। তবে কেন দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্কলন থেকে আঠেরোটি রচনাংশ বাদ গেল সে-কথা তাঁর প্রবন্ধে (অন্তত তার ইংরিজি সংক্ষিপ্তসারে) বলা নেই। দক্ষিণারঞ্জন শুধু তাঁর উৎসর নাম দিয়েছিলেন, কোন্ সংস্করণ, পৃষ্ঠাসংখ্যা কত, ইত্যাদি কিছুই তার সঙ্গে দেওয়া ছিল না। নামাই-এর কাজ সে-দিক থেকে অনেক বেশি গোছানো— প্রতিটি উদ্ধৃতির উৎস ইত্যাদির খবর তাঁর প্রবন্ধর পাদটীকায় বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।[১৫]

দক্ষিণারঞ্জন লিখেছিলেন :

শ্রম স্বীকার করিলে এরূপ আরও বহু উক্তি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যদি কেহ এই পথ অনুসরণ করিয়া বার্হস্পত্য মত সংগ্রহ করেন এবং যথার্থ দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়া সেই মতগুলি ব্যবহার করেন তবে যে বার্হস্পত্যদর্শনের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।[১৬]

কোনো 'প্রামাণিক গ্রন্থ' অবশ্য এখনও অবধি পাওয়া যায় নি। তবে নামাই-এর কাজের পরেও আরও কিছু রচনাংশর উদ্ধৃতি ও পরোক্ষ উল্লেখের সন্ধান মিলেছে।[১৭] তার ভিত্তিতে, পূর্বসূরিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হারিয়ে-যাওয়া চার্বাকসূত্র, তার বৃত্তি, টীকা, ও অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া উদ্ধৃতিগুলি নতুন করে সঙ্কলনের চেষ্টা করা যায়। কয়েকটি নতুন সূত্র এখানে যোগ হবে (যে-কোনো কারণেই হোক, শাস্ত্রী ও নামাই এগুলি খেয়াল করেন নি, যদিও যেসব বই থেকে এগুলি নেওয়া সেগুলি তাঁদের হাতেও ছিল)। তার পরে মোট তেষট্টিটি (দক্ষিণারঞ্জনের চুয়ান্নটি আর নামাই-এর (নতুন) নটি) রচনাংশের প্রামাণিকতা পুনর্বিচার করা হবে। দক্ষিণারঞ্জন ও নামাই দুজনেই এমন কিছু বাক্যকে খাঁটি চার্বাক-রচনাংশ বলে স্বীকার করেছেন যেগুলি এই বিচারে বাদ পড়বে, কারণ সেগুলির প্রামাণিকতা সংশয়ের অতীত নয়।

চার্বাকদর্শন : পাঁচটি লক্ষণ

প্রথমেই আমরা বিষয় অনুযায়ী সূত্রগুলিকে কয়েকটি ভাগে সাজাতে চাই। যেগুলি হলো :

১. ভূতবাদ।। মাটি, জল, আগুন আর বাতাস এই চারটি উপাদানই একমাত্র বাস্তব। সমস্ত জড় ও জীবের দেহই এগুলির এক বা একাধিক উপাদান দিয়ে তৈরি। এই চারটি উপাদানের এক বিশেষ সমবায়েই দেখা দেয় চেতনা বা চৈতন্য (অন্যান্য দর্শন প্রণালীতে এ ছাড়াও ক্ষেত্রজ্ঞ, চিত্ত, জীব, জ্ঞান, পুরুষ, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ দিয়ে চেতনাকেই বোঝানো হয়েছে)। এই চেতনা কখনোই দেহ ছাড়া থাকতে পারে না। কোনো প্রাণী মারা গেলে, প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনাও শেষ হয়ে যায়। অজর অমর আত্মা বলে কিছু নেই যা নাকি দেহ ছাড়াও আলাদাভাবে থাকতে পারে (যাবতীয় ভাববাদী দার্শনিক এই ধরণের আত্মায় বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধরা এর মধ্যে একটু আলাদা। তাঁরা আত্মাকেও ক্ষণিক বলে মানেন, কিন্তু দেহ ছাড়াও সেটি থাকতে পারে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে এক দেহ থেকে অন্য দেহে চলে যেতে পারে— এও তাঁদের বিশ্বাস)।

২. স্বভাববাদ।। উপনিষদের যুগে, আরও কয়েকটি মতবাদের সঙ্গে, এটিও একটি আলাদা দার্শনিক মত ছিল; ঈশ্বর, নিয়তি, কাল ইত্যাদির বদলে বস্তুর নিজের স্বভাবকেই জগতের বৈচিত্র্যর কারণ বলে ধরা হতো। কালক্রমে অন্তত আংশিকভাবে এটি চার্বাকদর্শনের অঙ্গ হয়ে যায় বা এটিকে সেইমতো ধরা হয় (যদিও এতে সংশয় আছে)।

৩. প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ।। জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রাণী-দেহের বাইরের কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো প্রাণীর ইন্দ্রিয়র (চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়া) সংযোগকেই নিশ্চিত জ্ঞান বলে ধরা হয়। যে-জানার পেছনে এমন কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই তাকে 'প্রমাণ' (= সঠিক জ্ঞানের উপায়) বলে স্বীকার করা হয় না। এই কারণেই, ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা, পুনর্জন্ম, সর্বজ্ঞ পুরুষ— এইসব ধারণা চার্বাকদর্শনে খারিজ, যেহেতু ইন্দ্রিয় দিয়ে এগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কোনো অনুমান বা আপ্তবাক্য (কোনো শাস্ত্রে লেখা আছে বা জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন এমন কথা) যদি প্রত্যক্ষমূলক বা প্রত্যক্ষনির্ভর হয়, চার্বাকদের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু অ-লৌকিক বিষয়ে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে বা বেদ-পুরাণ, অমুক ঋষি, তমুক মুনির বচন বলে কোনো কথা গ্রাহ্য হতে পারে না। চার্বাক-বিরোধীরা প্রায়ই এটিকে বিকৃত করে চার্বাকদের এই মতটিকে প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী— অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, এটি ছাড়া অনুমান, আপ্তবাক্য ইত্যাদি কিছুই প্রমাণ নয়— এমনও মার্কা মেরে থাকেন। এই প্রচার শুধু ভুল নয়, এর পেছনে অন্য মতলবও কাজ করেছে। সেটি পরে দেখানো হবে।

৪. পুনর্জন্ম-ও পরলোক-বিলোপবাদ।। দেহ ছাড়া কোনো ক্ষণিক বা অমর আত্মাকে চার্বাকদর্শনে স্বীকার করা হয় না। আগের তিনটি ধারণা থেকে অনিবার্যভাবে এটি আসে। ফলে জন্মান্তর, কর্মফল, স্বর্গ-নরক, অদৃষ্ট ইত্যাদি সবই বাতিল।

৫. বেদপ্রামাণ্য-নিষেধবাদ।। ঈশ্বর বলে কেউ আছেন— কয়েকটি দর্শন প্রণালীতে এ কথা মানা হয় নি (সাংখ্য, মীমাংসা তো বটেই, *ন্যায়সূত্র*-র কোথাও ঈশ্বরের নামগন্ধ নেই)। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী হলেও সাংখ্য ও মীমাংসাকে 'আস্তিক' বলে ধরা হয়। তার কারণ দুটি : (১) এ দুটি দর্শনে পরলোককে স্বীকার করা হয়েছে, আর (২) বেদকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। বেদ কোনো মানুষের রচনা নয় (এরই নাম অপৌরুষেয়), নাকি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের রচনা (পৌরুষেয়)— এ নিয়ে আস্তিকদর্শনগুলির মধ্যেও বিস্তর তর্কাতর্কি চলত। কিন্তু বেদবাক্যে যে কোনো ভুল থাকতে পারে না— এ ব্যাপারে সব আস্তিকই একমত। এর বিরুদ্ধে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ— এই তিনটি দর্শনই নাস্তিক; পরলোক না-মানার কারণে নয় (বৌদ্ধ ও জৈনরা তা অবশ্যই মানেন), বেদপ্রামাণ্য না-মানার কারণে।

চার্বাকসূত্র : পুনর্গঠনের নতুন প্রয়াস

এবার এই পাঁচটি ভাগে চার্বাকসূত্রগুলিকে হাজির করা যাক। আবার বলে রাখি : যেসব রচনাংশকে খাঁটি চার্বাকসূত্র বলে মনে হয়েছে, প্রথমে শুধু সেইগুলিই দেওয়া হচ্ছে (যেগুলি নিয়ে সন্দেহ আছে, পরে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে)।

প্রতিটি সূত্র-র উৎস নির্দেশের সময়ে প্রথমে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে পুরনো উৎসর নাম; তার পরের উৎসগুলি লেখকের নামের প্রথম অক্ষর ধরে পরপর সাজানো হয়েছে। যেসব সূত্র ও উৎস আগে কেউ উল্লেখ করেন নি, সেগুলির আগে + (যোগ) চিহ্ন দেওয়া আছে।

১. ভূতবাদ

১।১ সুতরাং এখন আমরা তত্ত্ব (= বস্তুজগতের স্বরূপ) ব্যাখ্যা করব। (শাস্ত্রী ১, নামাই A1)

> *ত-উ-সি*, ১ (ফ্রাঙ্কো, ৬৮); *ন্যা-ম*, আহ্নিক ১, ভাগ ১ : ১০০ (*গ্রন্থিভঙ্গ*)।

১।২ তত্ত্বগুলি (হলো) মাটি, জল, আগুন আর বাতাস। (২, A2)

> *ত-উ-সি*, ১ (ফ্রাঙ্কো, ৬৮); *ত-স-প*, ৬৩৩; *ম-অ-প* (তিব্বতী তর্জমা) [নামাই]; *ন্যা-ম*, আহ্নিক ১, ভাগ ১ : ১০০ (*গ্রন্থিভঙ্গ*); *প্র-চ*, অঙ্ক ২, ৪০; *ত-র-দী*, ৩০৭; + *প্র-ক-মা*, ১১৬; ভাস্কর, *ব্র-সূ-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ১৯৬; + *সিদ্ধিত্রয়*, ১৩, ১৭; + *স্যা-বা-র*, ১০৭৫, ১০৮৬; + *ত-শ্লো-বা*, ১। ৯৮, (১।১০৪ প্রসঙ্গে), ২৬-২৮; *শা-ভা* (একটু অন্য ভাষায়), (৩।৩।৫৪ প্রসঙ্গে), ৭৬৫; + *উ-ভ-প্র-ক*, ৬৬৮; *লো-ত-নি* (২।৩ প্রসঙ্গে), ২৪ক।

১।৩ তাদের মিলিত (রূপের) নাম শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। (২, A3)

> *ত-উ-সি*, ১ (ফ্রাঙ্কো, ৬৮); *ত-স-প*, ৬৩৪; *ম-অ-প* [নামাই]; *ত-র-দী*, ৩০৭; *আ-ল-বৃ* (তিব্বতী তর্জমা) [নামাই ৩৮]; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২; + *প্র-ক-মা*, ১১৬; *ব্র-সূ-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ১৯৬; *ন্যা-বি-বি*, ২ : ৯৩; + *ত-শ্লো-বা*, ১। ১০৪, ২৮; + *উ-ভ-প্র-ক*, ৬৬৮; (এই দুটি উৎস-র পাঠ একটু আলাদা : তৎসমুদায়ঃ শারীরেন্দ্রিয়-সংজ্ঞা-বিষয়ঃ; এর মানে দাঁড়াবে : তার মিলিত রূপই শরীর, ইন্দ্রিয়, সংজ্ঞা (নাম বা চেতনা বা বুদ্ধি) ও বিষয়); *লো-ত-নি*, ২৪ক।

১।৪ সেগুলি থেকে চৈতন্য (দেখা দেয়)। (৩, A4)

> *ত-স-প*, ৬৩৩; *ত-র-দী*, ৩০৭; *গ্রন্থিভঙ্গ*, ২ : ২৫৭-৫৮ (*ন্যা-ম*, আহ্নিক ৭ প্রসঙ্গে); *আ-ল-বৃ* (তিব্বতী তর্জমা) [নামাই ৩৮]; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২; + *প্র-ক-মা*, ১১৬; *ব্র-সূ-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ১৯৬; + *সিদ্ধিত্রয়*, ১৩, ১৭; + *স্যা-বা-র*, ১০৭৬, ১০৮১; *ন্যা-বি-বি*, ২ : ৯৩, ১০৬; + *ত-শ্লো-বা*, ১।১০৪, ২৮; *শা-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ৭৬৫; + *উ-ভ-প্র-ক*, ৬৬৮।

১।৫ বিজ্ঞান (চেতনা) হলো কিণ্ব (মদ তৈরির উপাদান, যেমন ভাত, গুড়) ইত্যাদি থেকে মদশক্তি (নেশা ধরানোর ক্ষমতা)-র মতো। (৪, A5)

সি-বি-টী ভাগ, ১ : ২৮৩, ২৯১; *ন্যা-ম*, আহ্নিক ৭, ভাগ ২ : ২১৪, ২১৭ (তু. ২ : ২০১); *আ-ল-বৃ* [নামাই]; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২; *ব্র-সূ-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ১৯৬; + *সিদ্ধিত্রয়*, ১৩, ১৭; + *স্যা-বা-র*, ১০৭৩, ১০৮৬; + *ন্যা-বি-বি*, ভাগ ২ : ৯৩, ১০৭; *শা-ভা*, ৭৬৫ (তাঁর উদ্ধৃতিতে 'মদশক্তিবদ্‌বিজ্ঞানম্'। বাদিদেব সূরি, বাদিরাজ সূরি ও অনন্তবীর্য এই পাঠই উদ্ধৃত করেছেন); *সূ-কৃ-সূ-বৃ* (১।১।১১ প্রসঙ্গে), ১১ (পুঁথির ১৫, ১৬); + *উ-ভ-প্র-ক*, ৬৬৮; + *লো-ত-নি* (২।৩১ প্রসঙ্গে), ২৪ক।

১।৬ চেতনাসমেত শরীরই পুরুষ (= আত্মা)। (৭, A10)

লো-ত-নি (২।৩১ প্রসঙ্গে), ২৪ক; *ত-র-দী*, ৩০০; নীলকণ্ঠ, *গীতাভাষ্য* (১৬।১১ প্রসঙ্গে), ২৬৭৩; মধুসূদন সরস্বতী, *গীতাভাষ্য* (১৬।১১ প্রসঙ্গে), ২৬৭৩ (একটু অন্য ভাষায় ২।১৩ প্রসঙ্গেও); + *ন্যা-বি-বি*, ভাগ ২ : ৯৩; *ব্যোমবতী*, ভাগ ১ : ১৩৭; *শা-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ৭৬৫-৬৬; শ্রীধরস্বামী, *গীতাভাষ্য* (১৬।১১, ১২ প্রসঙ্গে), ২৬৭২; *অ-ব্র-সি*, ৯৯।

১।৭ কায়া (শরীর) থেকেই (চেতনা আসে)। (২২, A9)

ত-উ-সি, ৮৮ ('শরীরাদ্ এব'— এই পাঠ আছে); *ত-স* ও *ত-স-প*, ৬৩৫ ('কায়াদ্ এব'— এই পাঠ আছে)। (তু. *স-দ-কৌ*, ১০৮ : 'কায়া-আকারের পরিণত মাটি ইত্যাদি চারটি ভূত-ই চেতন'); *ন্যা-ম*, আহ্নিক ৭, ভাগ ২ : ২০১।

+ ১।৮ শরীর থাকলে তবেই (চেতনা ইত্যাদি থাকবে)।

+ *শা-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ৭৬৬।

১।৯ জীব (আত্মা)গুলি জলের বুদ্‌বুদের মতো। (A6)

লো-ত-নি, ২৪ক; *সি-বি-টী*, ২৮৩, ২৯১; *ত-র-দী*, ৩০০; *আ-ল-বৃ* [নামাই]; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২; *স্যা-বা-র*, ১০৭৪; [*উ-ভ-প্র-ক*, ৬৬৮]; [*য-তি-চ*, ২৫৩] (তু. *সূ-কৃ-সূ-বৃ*, ১১ (পুঁথির ১৫))।

২. স্বভাববাদ

২।১ জন্মবৈচিত্র্যের বিভিন্নতার কারণেই জগৎও বিচিত্র। (A7)

আ-ল-বৃ [নামাই] (তু. মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর, *গীতাভাষ্য* (১৬।৮ প্রসঙ্গে) : 'স্বাভাবিকম্ এব জগদ্‌বৈচিত্র্যম্...', ২৬৫৮-৫৯)।

২।২ ময়ূরচন্দ্রক (ময়ূরপুচ্ছের ভেতরের চিহ্ন)-এর মতো। (A8)

আ-ল-বৃ [নামাই] (এই দুটি সূত্রকে 'ইতি লোকায়তে সূত্রে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তু. *ন্যা-বি-বি,* ভাগ ২ : ১০৬)।

৩. প্রত্যক্ষপ্রাধান্যবাদ

৩।১ প্রত্যক্ষই প্রমাণ। (২৫, ২০, A13)

ন্যা-ম, আহ্নিক ১, ভাগ ১ : ৪৩ (*গ্রন্থিভঙ্গ*); + *বি-ভা-শ্লো-বৃ,* ভাগ ২ : ৪৩৯; + *সি-বি-টী,* ২৭৭, ২৯৩; *ত-বো-বি,* ১ : ৭০, ৭৩; *ত-স-প,* ৯৪৫; *প্র-চ,* অঙ্ক ২, ৪০; + *প্র-ক-মা,* ১৭৭-৭৮; *ন্যা-কু-চ,* ৩৪৩; + *স্যা-বা-র,* ২৬১, ২৬৫; + *সূ-কৃ-সূ-বৃ* (১।১।১ প্রসঙ্গে), ১০ (পুঁথির ১৫), ১২ (পুঁথির ১৭); + *উ-ভ-প্র-ক,* ৬৬৮; *অ-ব্য-দ্বা,* শ্লোক ৩২, ১৩০। এইটিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত চার্বাকসূত্র। ওপরে যে কটি উৎস দেওয়া হলো তার বাইরে নানা হাতফেরতা বই-এও (যেমন, *মানসোল্লাস, স-দ-স* বা *স-দ-কৌ*-র মতো সঙ্কলনে) এটি পাওয়া যায়।

৩।২ প্রমাণের অগৌণতার কারণেই তার (অনুমানের) থেকে অর্থনিশ্চয় দুর্লভ (= সর্বদা নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না)। (২১, D1)

ন্যা-ম, আহ্নিক ১, ভাগ ১ : ১৭৭, ১৮৩; *ত-বো-বি,* ৭০, ৭২, ৩৫৪; *প্র-বা-স্ব-টী,* ২৫; *প্র-ক-মা,* ১৭৮, ১৮০; ন্যায়ভূষণ, ২১০; *স্যা-বা-র,* ২৬১, ২৬৫; *ব্যোমবতী,* ভাগ ২ : ১৬১।

[কোনো কোনো পাঠে 'প্রমাণের গৌণতা' ইত্যাদিও পাওয়া যায়।]

৪. পুনর্জন্ম-ও পরলোক-বিলোপবাদ

+৪।১ পরলোক অসিদ্ধ— প্রমাণের অভাবে। (তু. *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র,* ১।৯২ : ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, ৫।১০ : প্রমাণাভাবান্ ন তৎসিদ্ধিঃ)।

+*স্যা-বা-র,* ১১০৯।

(তু. *প্র-চ,* অঙ্ক ২, ৪০; *স-দ-কৌ,* ৪; ও *উ-ভ-প্র-ক,* ৬৬৮)।

৪।২ পরলোকবাসী (পরলোকের বাসিন্দা অর্থাৎ আত্মা) না-থাকায় পরলোকের অভাব (= পরলোক নেই)। (১৭, A11)

ত-উ-সি, ৪৫ (ফ্রাঙ্কো, ২২৮); *ত-বো-বি,* ১ : ৭১, ৯১, ৭৩১; *ত-স-প,* ৬৩৩; + *আ-ড,* অঙ্ক ৩, ৬৫; *ন্যা-কু-চ,* ৩৪৩, ৩৪৫; + *প্র-ক-মা,* ১১৬; + *স্যা-বা-র,* ১১০৯; + *য-তি-চ,* ২৬৯।

+৪।৩ পরলোকবাসী চৈতন্য দেহহীন (হয়)— সেই কারণে (সেটি অগ্রাহ্য)।

+ *স্যা-বা-র,* ১১০৯

+৪।৪ অন্য দেশ, অন্য কাল, বা অন্য অবস্থাই পরলোক।

+ *ত-স-প,* ৬৩৭ (কৃষ্ণকান্ত হন্দিকৈ প্রথম এটির উল্লেখ করেছেন (২৩১ পাদটীকা ৩৫))।

+৪।৫ (পূর্ব-) জন্মর স্মৃতি অসিদ্ধ, এক গ্রাম থেকে আসা সকলের স্মৃতিও যেহেতু (এক রকম হয়)।

+*ত-স-প,* ৬৬৫। [৪।৪ ও ৪।৫ অবশ্য কোনো ভাষ্য-র অংশও হতে পারে]

৫. বেদপ্রামাণ্য-নিষেধবাদ

+৫।১ ধর্ম (আচরণ) করা ঠিক নয়। (তু. শাস্ত্রী, ৩৩)।

+ *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৪, ভাগ ১ : ৩৮৮ (তু. *কামসূত্র,* ১।২।২৫ : ৯, A16)।

+৫।২ তার (ধর্মর) উপদেশে বিশ্বাস করা উচিত নয়।

+*ন্যা-ম,* আহ্নিক ৪, ভাগ ১ : ৩৮৮।

এর বাইরেও নিশ্চয়ই আরও কিছু রচনাংশ আছে যেগুলি খাঁটি চার্বাক/লোকায়ত উৎস থেকেই পাওয়া গেছে। কিন্তু সেগুলি সূত্র নয়, কোনো টীকা/বৃত্তি/ভাষ্য-র অংশবিশেষ বা মুখে মুখে চালু ছিল এমন বেশ কিছু শ্লোক। ব্রাহ্মণ্য প্রথা ও আচার নিয়ে সেগুলোয় বিদ্রূপ করা হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে চার্বাকমতের সঙ্গে সেগুলো মেলেও। কিন্তু তার সবকটিই যে চার্বাক/লোকায়তপন্থী কবি/দার্শনিকের রচনা— জোর করে এমন বলা যায় না। অন্য দুটি নাস্তিক সম্প্রদায়— বৌদ্ধ ও জৈন— থেকেও সেগুলি এসে থাকতে পারে।

'বার্হস্পত্যসূত্রম্' : একটি সমীক্ষা

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর সঙ্কলনের ১-৪, ৭, ১৭, ২১, ২২, ২৫ সংখ্যক সূত্রগুলি এখানে নেওয়া হয়েছে। নামাই-ও তা-ই করেছেন। বাদ পড়েছে যে-কটি সেগুলি এবার দেখা যাক।

পুরুষার্থ ও অপবর্গ

দক্ষিণারঞ্জনের সূত্র ৫ ছিল : 'কাম (সুখ)-ই হলো একমাত্র পুরুষার্থ (জীবনের লক্ষ্য)'। নামাই-ও এটি নিয়েছেন (A15)। বাক্যটি পাওয়া যায় সদানন্দ কাশ্মীরক-এর *অ-*

ব্র-সি-তে।[১৮] সেখানে আরও দুটি উক্তিকে (দক্ষিণারঞ্জন ৭, ৮; A10, 12) 'তথা চ বার্হস্পত্যানি সূত্রানি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য উক্তিটি খাঁটি চার্বাকসূত্র তো নয়ই, এমনকি হাতফেরতা উৎস থেকেও পাওয়া নয়। *গীতা*, ১৩।১১-র টীকায় শ্রীধর, মধুসূদন সরস্বতী ও নীলকণ্ঠ একই কথা বলেছেন।[১৯] সমস্যা হলো : দক্ষিণারঞ্জন নিজেই আর-একটি উক্তি সঙ্কলন করেছেন : 'অর্থ ও কাম (এ দুটি হলো) পুরুষার্থ' (সূত্র ২৭)। এটি আছে *প্র-চ*-য়; *স-দ-স*-তেও এর উল্লেখ আছে।[২০]

তাহলে চার্বাকরা পুরুষার্থ বলতে কী বুঝতেন? শুধুই কাম, নাকি কাম আর অর্থ দুই-ই? চার্বাকরা আদৌ পুরুষার্থ-র মতো ব্রাহ্মণ্য ভাবনার নিরিখে চিন্তা করতেন কিনা— তাতেই কিন্তু সন্দেহ আছে। বরং তাঁরা এ নিরিখে ভাবতেন না— এমন হওয়াই স্বাভাবিক। চার্বাক-বিরোধীরা জানতেন না : জীবনের লক্ষ্য বিষয়ে চার্বাকদের মত কী ছিল। প্রচলিত ধারণার বশে চার্বাকদের ওপর যাঁর যা ইচ্ছে তা-ই চাপিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ মনে করছেন : এরা শুধু সুখের সন্ধানী, কেউ আবার তার সঙ্গে অর্থকে জুড়ে দেন। তাই দু-এর কোনো উক্তিকেই চার্বাকসূত্র বলে মানা যায় না।

ঠিক একই কারণে শাস্ত্রীর সূত্র ৮ (নামাই-এর A12)-টিকে চার্বাকসূত্র বলে স্বীকার করা অসম্ভব। শাস্ত্রীর সূত্র ৮ ছিল : 'মরণই অপবর্গ (মুক্তি)'। চার্বাকরা যেমন পুরুষার্থ-র নিরিখে ভাবতেন না তেমনি 'অপবর্গ'-র কথাও তাঁদের কাছে অবান্তর।[২১] যাঁরা পুনর্জন্ম মানেন, তাঁদের কাছে মুক্তি বলতে বোঝায় : আর জন্ম না হওয়া, তবেই সব দুঃখের শেষ হবে। কিন্তু চার্বাকরা জীবনকে অমন দুঃখময় বলে মনে করতেন না, আবার একবারের বেশি দুবার জন্মানোতেও তাঁদের বিশ্বাস ছিল না। হয়তো তাঁদের কেউ কোনো প্রসঙ্গে বলে / লিখে থাকতে পারেন : অপবর্গ আবার কী? মৃত্যুতেই তো সব শেষ, বারবার জন্মমৃত্যু পেরিয়ে, কর্মফলের হিসেব মিললে তবে মুক্তি হবে— এ সবই কথার কথা। তার ভিত্তিতে 'মরণই অপবর্গ' এমন একটি বচন চালু হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এটি কোনো সূত্র নয়।

এই উক্তিটি পাওয়া গেছে *অ-ব্র-সি*-তে; একটু অন্য শব্দ দিয়ে ('মৃত্যুর্ এব অপবর্গঃ') পাওয়া যায় *প্র-চ*-য়। দক্ষিণারঞ্জন এটিকে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন (৩০)। সুতরাং তাঁর ৩০ সংখ্যক সূত্রটিও বাদ পড়ল।[২২]

কামসূত্র-য় লোকায়তমত

এবার শাস্ত্রীর ৯-১৪ (নামাই A16-21) বর্জনের কারণ সংক্ষেপে বলা হবে। এই সবকটি সূত্রই *কামসূত্র* থেকে নেওয়া। ঘটনা এই যে, ধর্ম, কাম, অর্থ— এই তিনটি পুরুষার্থ নিয়ে আলোচনার সময়ে বাৎস্যায়ন তিনটি সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন :

এক. লোকায়তিক, যাঁরা বলেন : ধর্ম আচরণ করবে না। এইটিই হলো শাস্ত্রীর সূত্র ৯।

দুই. অর্থচিন্তক, যাঁরা বলেন : কাম (সুখ) আচরণ করবে না।

তিন. কালচিন্তক, যাঁরা বলেন : অর্থ আচরণ করবে না।[২৩]

বাৎস্যায়ন-এর বিবরণ অনুযায়ী এই তিন সম্প্রদায়ই দ্বিবর্গবাদী বা দুটি করে বর্গর পক্ষপাতী— যথাক্রমে অর্থ ও কাম, ধর্ম ও অর্থ, আর ধর্ম ও কাম।[২৪] বাৎস্যায়ন নিজে ছিলেন ত্রিবর্গবাদী : ধর্ম-অর্থ-কাম— একসঙ্গে তিনেরই আচরণে বিশ্বাসী;[২৫] মোক্ষর কথা তিনি তোলেন নি। আসলে এই আদি তিনবর্গর সঙ্গে মোক্ষকে বোধহয় পরে জোড়া হয়েছিল। *মহাভারত*-এ কোথাও তিনবর্গ আবার কোথাও চারবর্গর কথা পাওয়া যায়।[২৬] যাই হোক, পুরুষার্থ আর জীবনের বর্গ প্রসঙ্গে *কামসূত্র*-য় লোকায়তিকদের কথা এসেছে।

চার্বাকরা একবর্গবাদী, শুধু কামই তাঁদের লক্ষ্য— এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। আবার দেখা গেছে, কেউ কেউ তাঁদের দ্বিবর্গবাদী (কাম ও অর্থ) বলে শনাক্ত করেছেন। এখন, দুটি মতই তো একই সঙ্গে সত্যি হতে পারে না। কেউ কেউ বলতে পারেন : একদল চার্বাক ছিলেন একবর্গবাদী, আর-এক দল দ্বিবর্গবাদী; বা, দ্বিবর্গবাদীরাও কামকেই জীবনের প্রথম ও প্রধান বর্গ বলে মনে করতেন— ত্রিবর্গবাদী হয়েও কৌটিল্য যেমন প্রথম স্থান দিয়েছেন অর্থকে, তার পরে ধর্ম আর কামকে।[২৭] কিন্তু চার্বাকরা যে কী ভাবতেন সে-বিষয়ে এক চিলতে সাক্ষ্য কোথাও পাওয়া যায় না।

শাস্ত্রীর সূত্র ১০ আর ১১ হলো 'কারণ (তার) ফল ভবিষ্যতে (পাওয়া যায়)' আর 'এবং যেহেতু (ঐ ফল) অনিশ্চিতও' (*কামসূত্র*, ১।২।২৬ ও ২৭)। এর পরে এসেছে এই তিনটি বাক্য (শাস্ত্রী, সূত্র ১২, ১৩ ও ১৪) :

১২. কোন্ বুদ্ধিমান লোক (নিজের) হাতের জিনিস পরের হাতে দেয়? (*কামসূত্র*, ১।২।২৮)

১৩. আগামীকাল ময়ূর পাওয়ার চেয়ে আজকের পায়রা ভালো। (১।২।২৯)

১৪. অনিশ্চিত (=সন্দেহজনক) সোনার টাকার চেয়ে নিশ্চিত (=আসল) রুপোর টাকা ভালো। (১।২।৩০)

কামসূত্র-র টীকাকার[২৮] দেখিয়েছেন : ১।২।২৯ (শাস্ত্রী, ১৩)-এর সঙ্গে যোগ হলো ১।২।২৬ (১০)-এর। ধর্মের ফল যে সর্বদা হাতে হাতে পাওয়া যায় না, ভবিষ্যতে পাওয়া যায়— মীমাংসকরা তা নিজেরাই স্বীকার করতেন। যেন তারই খেই ধরে ১।২।২৯ (১৩)-এর বাক্যটি এসেছে। তেমনি ১।২।৩০ (১৪)-এর সঙ্গে যোগ হলো ১।২।২৭ (১১)-এর। শাস্ত্রীর সূত্র ১৩ ও ১৪ আসলে 'লৌকিক ন্যায়',

অর্থাৎ প্রবচন মাত্র।[২৯] এগুলি আদৌ কোনো সূত্র হতে পারে না। ১।২।২৮ (১২)-ও কোনো সূত্র নয়, একটি আলঙ্কারিক প্রশ্ন মাত্র। আসলে কালচিন্তক ও অর্থচিন্তকদের মত বলার সময়ে বাৎস্যায়ন স্বরচিত কিছু বাক্যকে সূত্রর আদলে লিখেছেন। লৌকায়তিকদের ক্ষেত্রেও তার থেকে আলাদা কিছু ঘটে নি। অর্থচিন্তক ও কালচিন্তকদের কোনা সূত্রগ্রন্থ ছিল— এমন কোনো প্রমাণ নেই। তবে সূত্রগুলো এল কোথা থেকে? এর একটিই উত্তর হতে পারে : বাৎস্যায়ন-এর মাথা থেকে। তেমনি লোকায়তিকদের নাম করে ঐ দুটি বাক্য লেখা হলেও, সেগুলি *চার্বাকসূত্র* থেকে হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে— এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বক্তব্যর দিক থেকে চার্বাকমতের সঙ্গে মিল থাকলেও, এগুলিকে খাঁটি চার্বাকসূত্র বলে ধরা যায় না। বরং বলা যায় : 'ধর্ম' অর্থে 'যজ্ঞ' ধরলে (মীমাংসকরা তাই ধরতেন) শাস্ত্রীর সূত্র ১০-১৪-র বক্তব্যে বৌদ্ধ বা জৈনদেরও কোনো আপত্তি হতো না।

প্রসঙ্গ : অনুমান-প্রমাণ

এবার শাস্ত্রীর সূত্র ৬-এর কথায় আসা যাক। সূত্রটি হলো : 'অনুমান প্রমাণ নয়'। বহু জায়গায়— ঠিকমতো বললে, প্রায় সর্বত্র— এটিকে নিশ্চিত চার্বাকমত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে-কথা মানতে অসুবিধে আছে। *ত-স-প*-য় পুরন্দর নামে জনৈক দার্শনিকের রচনা থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে। শাস্ত্রী ও নামাই দুজনেই সেই বাক্যটিকে চার্বাক-রচনাংশ বলে স্বীকার করেছেন (৩৫, D2)। বাক্যটি এই : লোকপ্রসিদ্ধ অনুমানকে চার্বাকরাও মানেন, কিন্তু লৌকিক মার্গ (পথ) পেরিয়ে কেউ কেউ যে অনুমানের কথা বলেন সেটিকে নিষেধ করা হচ্ছে।[৩০] এই বাক্যটি খুব সম্ভবত— প্রায় নিশ্চিতই— পুরন্দর-এর বৃত্তি থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। *পৌরন্দরসূত্র* নামে একটি বই ও *পৌরন্দরীয়* বৃত্তি-র কথা যথাক্রমে বাদিদেব সূরি ও পুপ্‌ফদন্ত (পুষ্পদন্ত)-র রচনায় পাওয়া যায়।[৩১]

এই বাক্যটিতেই চার্বাকদের সঠিক অবস্থান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ, এককথায় সব অনুমানকে নাকচ করা হয় নি; যে-অনুমান লৌকিক বিষয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে পরখ করা গেছে ও যায়— যেমন ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকে, খাবার খেলে খিদে মেটে— তেমন অনুমানে চার্বাকদের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ইহজগতের পথ পেরিয়ে, আত্মা-ঈশ্বর-পরলোক-সর্বজ্ঞপুরুষ— এগুলির সম্বন্ধে তো কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব নয়। এসব অ-লৌকিক বিষয়ে আপ্তবাক্যই একমাত্র আশ্রয়। 'বেদে আছে', বা 'সাক্ষাৎ মনু একথা জানিয়েছেন'— এমন বলে চার্বাকদের মুখ বন্ধ করা যায় নি। তাঁরা চাইতেন : প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই— সে-বিষয়ে বেদেই কিছু বলা থাক বা কোনো ঋষিই কিছু বলে থাকুন, স্রেফ তার ভিত্তিতে সে-কথা মানতে তাঁরা অপারগ ছিলেন।[৩২]

'প্রত্যক্ষই প্রমাণ'— এই সূত্রটির ব্যাখ্যাও করতে হবে এইভাবে : যা কিছু প্রত্যক্ষ করা গেছে বা যায়, একমাত্র সেই সব বিষয়েই নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া সম্ভব। সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি কোনো অনুমান বা আপ্তবাক্য হাজির করা হয়, সেটিও গ্রাহ্য হবে।[৩৩] কিন্তু তার বাইরে, ধর্ম ও মোক্ষ নিয়ে যত কথা বলা হয় তার সবই বাতিল। অনুমান বিষয়ে পুরন্দর, অবিদ্ধকর্ণ, উদ্ভটভট্ট মূলত এই একই আপত্তি তুলেছেন।

বৌদ্ধরা অনুমানকে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন— স্বার্থানুমান আর পরার্থানুমান। চার্বাকরাও তেমনি দু ধরণের অনুমানের কথা বলেছেন— লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষনির্ভর আর তন্ত্র(প্র)সিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রনির্ভর।[৩৪] ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এটিই তাঁদের প্রধান অবদান। কথাটি জানা সত্ত্বেও ভাববাদী দর্শনবিদ্‌রা এই প্রসঙ্গটি সযত্নে এড়িয়ে যান বা পুরন্দর প্রমুখকে শোধনবাদী রূপে দেখাতে চান।[৩৫] ফলে শাস্ত্রীর সূত্র ২৫ মানলেও, সূত্র ২০ ('একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ') মানা যায় না। এটি চার্বাকমতের বিকৃতি।

দেহ ও চেতনা

শাস্ত্রীর সূত্র ১৫ ('শরীর আর ইন্দ্রিয়-র সংঘাত (মিলন)-ই চেতনা, ক্ষেত্রজ্ঞ') নেওয়া হয় নি। (নামাই-ও কোনো কারণে এটি বাদ দিয়েছেন)। তার কারণ একটিই : *ক্ষেত্রজ্ঞ* সাংখ্যদর্শনের পারিভাষিক শব্দ, *গীতা*, অধ্যায় ১৩-য় দেহ-আত্মা বোঝাতে *ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ* ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন সরস্বতী নানা দর্শনসম্প্রদায়ের মতের কথা বলেছেন (১৩।৬-এর ব্যাখ্যায়)। সেখানে নৈয়ায়িকদের মত বলতে *ন্যায়সূত্র*, ১।১।১০ হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু চার্বাক ও বৌদ্ধদের ক্ষেত্রেও যে তাঁদের প্রামাণিক সূত্রগ্রন্থ থেকেই বচন দুটি নেওয়া— এমন কোনো সাক্ষ্য নেই।

শাস্ত্রীয় সূত্র ১৬ হলো : 'কামই প্রাণীদের (উৎপত্তির) কারণ'। এটি নেওয়া হয়েছে শঙ্করাচার্য-র *গীতাভাষ্য* (১৬।৮-এর ব্যাখ্যা) থেকে। শঙ্কর এটিকে 'লোকায়তিকদের দৃষ্টি' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই মতটিকে লোকায়তিকদের ঘাড়ে চাপানোর হেতু নেই। *ঋগ্‌বেদ*-এও একই কথা বলা আছে :

> কামনার হ'ল উদয় অগ্রে, যা হ'ল প্রথম মনের বীজ।
> মনীষী কবিরা পর্যালোচনা করিয়া করিয়া হৃদয় নিজ,
> নিরুপিলা সবে মনীষার বলে উভয়ের সংযোগের ভাব,
> অসৎ হইতে হইল কেমনে সতের প্রথম আবির্ভাব।[৩৬] (১০।১২৯।৪)

মনে রাখতে হবে : 'অসৎ' মানে যা নেই, 'সৎ' মানে যা আছে (বাঙলায় শব্দ দুটির মানে দাঁড়িয়েছে 'অসাধু' আর 'সাধু'; আর এক উৎকট বিশেষ্য তৈরি

হয়েছে : 'সততা', যেটি হওয়া উচিত ছিল 'সত্তা', অর্থাৎ 'সৎ' + 'তা')। সুতরাং এটিকে চার্বাকসূত্র বলে মানার কোনো হেতু নেই। নামাই-ও এটিকে বাদ দিয়েছেন।

শাস্ত্রীর সূত্র ১৮ হলো : "ইহলোকে ও পরলোকে শরীর আলাদা আলাদা হওয়ায় তাদের অন্তর্গত চিত্তও একই সন্তান (= প্রবাহ) হতে পারে না"। এটি কোনো সূত্র নয়, তবে কোনো ভাষ্য/বৃত্তির অংশ হতে পারে। কমলশীল অবশ্য এটিকে সূত্র বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত-র *প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার*-এও বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে।[৩৭] নামাই-ও এটিকে গ্রহণের পক্ষপাতী (তাঁর সূত্র F4)। কিন্তু এটিকে সূত্র বলে ধরতে বাধা আছে। তার কারণ : (এক) সূত্রে এত কথা থাকে না, (দুই) এখানে বৌদ্ধদের পরিভাষায় 'সন্তান' শব্দটি আছে। তবে এটি নিঃসন্দেহে কোনো চার্বাক-উৎস থেকেই পাওয়া, কিন্তু *চার্বাকসূত্র*-র অন্তর্গত নয়।

শাস্ত্রীর সূত্র ১৯ হলো : "ঠিক যতখানি ইন্দ্রিয়র বিষয় হয় ঠিক ততখানিই পুরুষ (= আত্মা)"। বাক্যটি একটি শ্লোকের প্রথম চরণ। নামাই পুরো শ্লোকটিই গ্রহণ করেছেন (B2)। পরের চরণ হলো : "ভদ্রে, বহুশ্রুত (বিদ্বান্) লোকরা যাকে নেকড়ের পা (-এর ছাপ) বলছেন সেটি দ্যাখো।" এর পেছনে এক মজার গল্প আছে। এখুনি সে-আলোচনায় যাচ্ছি না।[৩৮] তবে এইটুকু বলা যায় : চার্বাকমতের অনুকূল এমন বেশ কিছু শ্লোক (আভাণক ও লোকগাথা) একসময়ে ভারতে চালু ছিল। সায়ণ-মাধব তার অনেককটিই উদ্ধৃত করেছেন (যদিও এই শ্লোকটি সেখানে নেই)। এই ধরণের শ্লোকের মধ্যে এইটিই সবচেয়ে পুরনো উৎসে পাওয়া যাচ্ছে। নাগার্জুন-এর *মূলমধ্যমকারিকা*-র টীকায় ভাববিবেক ও চন্দ্রকীর্তি এটি উদ্ধৃত করেছেন। হরিভদ্র ও শীলাঙ্ক-র লেখাতেও এই শ্লোকটি (ও এরই সঙ্গে যুক্ত আর-একটি শ্লোক) উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য তিন ধারাতেই শ্লোকটি খুব পরিচিত ছিল। তবে কালক্রমে কিছু পাঠভেদও দেখা দিয়েছে আর পেছনের গল্পটিও কিছুটা আলাদা হয়ে গেছে। *মহাভারত*-এও শ্লোকটির উল্লেখ আছে।[৩৯]

শাস্ত্রী ২২-ও একটি গ্রাহ্য রচনাংশ (কিন্তু সূত্র নয়), 'কায়া থেকেই'— এই সূত্রটির ব্যাখ্যায় কম্বলাশ্বতর নামে এক চার্বাকপন্থী ভাষ্যকার এই বাক্যটি লিখেছিলেন।

শাস্ত্রী, ২৩-ও কোনো সূত্র নয়। *ত-বো-বি* তে (*সম্মতিতর্কপ্রকরণ*-ব্যাখ্যা) বলা হয়েছে : 'বৃহস্পতির সূত্রগুলি সর্বত্রই আপত্তিস্বরূপ।'[৪০] অনন্তবীর্য কিন্তু এটিকে 'সূক্ত' (অর্থাৎ সুভাষিত) বলেই উল্লেখ করেছেন।[৪১] অথচ অভয়দেব এটিকে চার্বাকদের উক্তি বলে ধরে নেন।

চার্বাকদের সম্পর্কে অভিযোগের আকারে একই কথা বলেছিলেন জয়ন্তভট্ট। তাঁর মতে, চার্বাকরা শুধু নঞর্থক কথাই বলতে পারে, কোনো সদর্থক বক্তব্য তাদের নেই।[৪২] ফলে শাস্ত্রীর সূত্র ২৩ আসলে চার্বাক-বিরোধীদের অভিযোগ, কোনো চার্বাক-উৎস থেকে পাওয়া রচনাংশ নয়— সূত্র তো নয়ই। সূত্র তো আর আত্মসমালোচনার জায়গা নয়।

কৃষ্ণমিশ্র-র চার্বাক

শাস্ত্রীর সূত্র ২৪-৩৪-এই এগারোটি 'সূত্র' নেওয়া হয়েছে কৃষ্ণমিশ্র-র *প্র-চ* থেকে। নামাই অবশ্য এর সবকটিকেই বাদ দিয়েছেন।

কৃষ্ণমিশ্র তাঁর রূপক-নাটকে একাধিক চরিত্রর মুখে নানা কথা বসিয়েছেন। সেগুলি প্রামাণিক না হওয়াই সম্ভব। কাব্য, নাটক ইত্যাদি থেকে কোনো দার্শনিক মতবাদ পুনর্গঠনের চেষ্টা না করাই ভালো। কবি বা নাট্যকার নিজের ইচ্ছেমতো কিছু বক্তব্য যোগ-বিয়োগ করবেন— এমন সম্ভাবনাই বেশি। আরিস্তোফানেস (আনু. ৪৫০-৩৮৫ খ্রিপূ)-এর *মেঘমালা* নাটক থেকে সোক্রাতেস-এর দার্শনিক মতামত বোঝার চেষ্টা করলে ফলটা ঠিক সুবিধের হবে না; বিশেষ করে যখন জানা আছে : সোক্রাতেস-কে হেয় করাই আরিস্তোফানেস-এর লক্ষ্য।

প্র-চ-র ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। শুধু চার্বাক নয়, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়কেও কৃষ্ণমিশ্র খুবই ঘৃণ্য রূপে হাজির করেছেন। নাস্তিক ছাড়াও, কাপালিকদেরও তিনি রেয়াত করেন নি, যদিও, অন্তত রঘুনন্দনের সময় (পনেরো-ষোলো শতক) থেকে, হিন্দুদের মতে তন্ত্রও বেদের মতোই অপৌরুষেয় ও প্রামাণ্য। তবে কৃষ্ণমিশ্র-র কয়েকটি বাক্যর মর্ম নিঃসন্দেহে চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে। যেমন,

- প্রত্যক্ষই প্রমাণ (শাস্ত্রী ২৫, আমার ৩।১)
- মাটি, জল, আগুন আর বাতাসই তত্ত্ব (শাস্ত্রী ২৬, আমার ১।২)
- ভূতগুলি (= মাটি, জল, আগুন আর বাতাস) চেতনাযুক্ত হয় (শাস্ত্রী ২৮, আমার ১।৩)
- পরলোক নেই (শাস্ত্রী ২৯, আমার ৪।১)
- ত্রয়ী (ঋগ্-সাম-যজুর্বেদ) ধূর্তর প্রলাপ (শাস্ত্রী ৩৩, আমার ৫।১)
- (তিন বেদ আর ধূর্তর প্রলাপ— এই দুটিই) স্বর্গ উৎপাদন করে (যদিও বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এ দু-এর মধ্যে) কোনো প্রভেদ নেই (শাস্ত্রী ৩৪)

শাস্ত্রীর সূত্র ২৪ ছিল : 'লোকায়তই শাস্ত্র'। এটিকে কোনো সূত্র বলে মনে করার হেতু নেই। নাটকে চার্বাক তাঁর শিষ্যকে জ্ঞান দিতে শুরু করেন এই বলে। সূত্র ২৭ ছিল : অর্থ আর কাম এই দুই (হলো) পুরুষার্থ। শাস্ত্রী ৫ প্রসঙ্গে আগেই এটি নিয়ে আলোচনা করেছি। সূত্র ৩০ ('মৃত্যুই অপবর্গ')-এর ক্ষেত্রেও একই কথা। সূত্র ৩১ আর ৩২-এ বলা হয়েছে : 'দণ্ডনীতিই বিদ্যা' আর 'চাষবাস, পশুপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি এরই অন্তর্ভূত'।

এই দুটি সূত্রর ভিত্তি হলো অর্থশাস্ত্রকে চার্বাকমতের অন্যতম অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া। কৌটিল্য-র আগেও আরও অনেকে অর্থশাস্ত্র লিখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র-র নামও পাওয়া যায়।[৪৩] কোনো এক অজানা কারণে চার্বাকমতের

প্রতিষ্ঠাতা বলে জনৈক বৃহস্পতির নাম আসে। পুরাণে গল্প অনুযায়ী, অসুরদের ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি অসুরদের গুরু শুক্র সাজেন। আর সেই সেজেই তিনি অসুরদের বেদ-বিরোধী মত শেখান।[৪৪]

বোধহয় এই ধরনের গল্পর খেই ধরেই কৃষ্ণমিশ্র এই 'সূত্র' দুটি রচনা করেছিলেন। বৃহস্পতি-র অর্থশাস্ত্র পাওয়া যায় না, তবে তাঁর ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি) থেকে বহু শ্লোক নানা জায়গায় উদ্ধৃত হয়েছে। *বৃহস্পতিস্মৃতি* আর *বৃহস্পতি-অর্থশাস্ত্র* যদি একই ধারার রচনা হয়, তবে বলতে পারি : *বৃহস্পতিস্মৃতি*-র লেখক ছিলেন ঘোর মনুভক্ত, আর *বৃহস্পতি-অর্থশাস্ত্র*-ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধারাতেই পড়ে।[৪৫] চার্বাকরা মনুকে আদৌ পাত্তা দিতেন না, জাতিভেদও মানতেন না। সুতরাং বার্তা ও দণ্ডনীতি দিয়ে এসব কথা চার্বাকদর্শন প্রসঙ্গে অবান্তর।

শাস্ত্রী, ৩৫ (পুরন্দর থেকে উদ্ধৃত) নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর ৩৬-৩৮— এই তিনটি সূত্র নেওয়া হয়েছে সদানন্দ কাশ্মীরক-এর *অ-ব্র-সি* থেকে। সূত্র তিনটি হলো :

- 'দেখছি', 'শুনছি' ইত্যাদি জ্ঞান হয় বলে মৃত্যু পর্যন্ত যে-ইন্দ্রিয়গুলি টিকে থাকে, সেগুলিই আত্মা।
- অন্য ইন্দ্রিয় না-থাকলেও মন থাকে বলে মনই আত্মা।
- প্রাণই আত্মা।

চার্বাকদের একাধিক শাখা?

সদানন্দ ধরে নিয়েছেন : এই তিনটি 'সূত্র' চার্বাকদের তিনটি আলাদা সম্প্রদায়ের মত। তিনি উল্লেখও করেছেন সেইভাবে : 'কেউ কেউ', 'অপরে' ও 'অন্যে' (বলেন)— যদিও স্পষ্ট করে তিনি চার্বাকের নাম করেন নি।

এই সূত্র তিনটিকে নামাই গ্রহণ করেন নি। আমারও মনে হয় : অদ্বৈত বৈদান্তিকরা (যাঁরা শঙ্করাচার্য-র *শা-ভা*-র অনুগামী) বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকে আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন মত জোগাড় করেছিলেন আর শেষ পর্যন্ত সবকটিকেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন এক-একটি বিরোধী সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। *শা-ভা* (১।১।১ প্রসঙ্গে) থেকেই এর সূচনা। অবজ্ঞাভরে শঙ্কর লিখেছেন : আত্মা যে কী তা (বৈদান্তিক ছাড়া আর) কেউ জানে না। সাধারণ লোক ('প্রাকৃতা জনাঃ') আর লোকায়তিকরা ঠিক করেছে যে দেহই আত্মা; অপরে ঠিক করেছে সচেতন ইন্দ্রিয়গুলিই আত্মা; অন্যেরা ধরে নেয় : মনই আত্মা।— এইভাবে বৌদ্ধ, মীমাংসক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করে তিনি অদ্বৈত বেদান্তর মত বলেছেন।[৪৬]

শঙ্কর-এর টীকাকার ও অনুগামীরা ধরে নিলেন : দেহ, ইন্দ্রিয়, মন— এই তিনটিকে যাঁরা আত্মা বলে মনে করেন তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকায়তিক।

অর্থাৎ লোকায়তিকদের তিনটি আলাদা শাখা আছে। এরই প্রতিধ্বনি করেছেন সদানন্দ কাশ্মীরক।

মজার ব্যাপার হলো : আর-এক সদানন্দ (সদানন্দ যতি বা যোগীন্দ্র বা সরস্বতী) তাঁর *বে-সা* বইটিতে এর সঙ্গে আরও এক দল চার্বাকের কথা বলেছেন। তাঁরা নাকি মনে করতেন : অন্ন-রস-ময় শরীরই আত্মা।[৪৭] এর ফলে চার্বাকদের শাখার সংখ্যা দাঁড়াল চার! শঙ্করাচার্য-র নামে প্রচলিত (যদিও খুব সম্ভবত তাঁর লেখা নয়) *স-বে-সি-সা* বইটিতেও আত্মা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের কথা পাওয়া যায়।[৪৮] সেখানে কিন্তু দেহাত্মবাদী ছাড়া আর কোনো মতকে চার্বাকের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নি।[৪৯] অথচ সেখানেও 'ইন্দ্রিয়ই আত্মা', 'প্রাণই আত্মা', ইত্যাদি ন'টি মতের কথা আছে।[৫০] অন্যত্রও চার্বাকদের দেহাত্মবাদী বলে শনাক্ত করা হয়। শব্দটির মানে খুবই পরিষ্কার : দেহছাড়া আত্মা বলে আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় কোনো কিছু থাকতে পারে না, সপ্রাণ দেহ থাকলে তবেই চেতনার সঞ্চার হয়— এই মতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের বলা হয় : দেহাত্মবাদী। এর সঙ্গে প্রাণ, মন ইত্যাদিকে গুলিয়ে ফেলার কিছু নেই। সদানন্দ কাশ্মীরক কখনোই মূল চার্বাকসূত্র-সঙ্কলনটি চোখে দেখার সুযোগ পান নি। তাঁর জন্মের কয়েক শতক আগেই সেটি হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে গুরুমুখে যেটুকু জানা যায়, চার্বাকদর্শন সম্পর্কে তিনি তার বেশি কিছু জানতেন না। সেই সঙ্গে *বি-পু* আর *প্র-চ* থেকেও তিনি কিছু উপকরণ পেয়ে থাকবেন।[৫১]

অবশ্য শুধু বৈদান্তিকরাই নন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এক দিক্‌পাল, ব্যোমশিবাচার্য-ও একই কথা লিখেছেন। তাঁর *ব্যোমবতী*-তেও একই ধরনের ইন্দ্রিয়-চৈতন্যবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ-এর কথা এসেছে।[৫২] কিন্তু তিনি এই দুটি সম্প্রদায়কে 'চার্বাক' বলে দাগিয়ে দেন নি, শুধু ভূতচৈতন্যবাদকেই লোকায়তমতের সঙ্গে এক করে দেখেছেন।[৫৩]

ফলে শাস্ত্রীর সূত্র ৩৬-৩৮-ও বর্জন করা যায়।

আভাণক ও লোকগাথা

এর পরে সূত্র ৩৯-৫২। এ চোদ্দোটি আদৌ সূত্র আকারে লেখা নয়, এর সবকটিই শ্লোক। দক্ষিণারঞ্জন তাতে আপত্তির কিছু দেখেন নি। তিনি লিখেছেন :

> সূত্রগ্রন্থেও শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বাৎস্যায়ন কামসূত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণ সূত্র ও শ্লোকের সংমিশ্রণে রচিত। মাধবাচার্য তাঁদের সর্বদর্শনসংগ্রহে চার্বাকদর্শন-ও মিশ্ররূপেই দেখাইয়াছেন। সুতরাং অধুনালুপ্ত বার্হস্পত্যদর্শনের মূল গ্রন্থ ঐরূপ সূত্র ও শ্লোকের সমাবেশে রচিত হইয়াছিল— এইরূপ অনুমান করা বিশেষ অন্যায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।[৫৪]

এই চোদ্দোটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম এগারোটি (৩৯-৪৯) নেওয়া হয়েছে সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স* থেকে। সূত্র ৫০ পাওয়া যায় একাধিক টীকাগ্রন্থে, ৫১ আছে জয়রাশিভট্ট-র *ত-উ-সি*-তে, ৫২ আছে কৃষ্ণমিশ্র-র *প্র-চ-য়* ও এক অনামা রচনা, *স-ম-স*-য়। এর কোনোটিই বর্জন করার হেতু নেই, কারণ সূত্র ৫০ বাদে সবকটিতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম, তার যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পরলোক, পুরোহিততন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে। শুধু একটি কথা মনে রাখতে হবে : যজ্ঞ ও পশুবলির বিরোধিতা (সূত্র ৪১ ও ৪৯-এর মূল বক্তব্য) চার্বাকদের একচেটিয়া নয়। বৌদ্ধ ও জৈনরাও এ বিষয়ে তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন। সায়ণ-মাধব তাঁর উদ্ধৃত শ্লোকগুলিকে খোদ বৃহস্পতি-র বচন বলে উল্লেখ করেছেন, আর শ্লোকগুলিকে বলেছেন 'আভাণক' বা 'লোকগাথা'। তবে এর সবকটিকেই আপাতত চার্বাক-রচনাংশ বলে গ্রহণ করতে বাধা নেই। সূত্র ৫০-এ স্বভাববাদের মূল কথাটি বলা আছে। আর ৫১-৫২-য় বৌদ্ধ, জৈন ও বৈদান্তিকদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

তবে সায়ণ-মাধব একটি অন্যায় করেছেন : একই শ্লোকের (সূত্র ৪০ ও ৪৫) দুটি আলাদা পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে তাঁর বই-এর একই অধ্যায়ে। তার একটি প্রকৃত, অন্যটি বিকৃত।[৫৫]

নামাই-এর সঙ্কলন : একটি সমীক্ষা

এবার নামাই-এর সঙ্কলন ও সংযোজনগুলি দেখা যাক। আমার সূত্রসঙ্কলনের (২)-অংশে তাঁর A6, 7 ও 8 গ্রহণ করা হয়েছে। সূত্রসঙ্কলনে তিনি (ও তাঁর আগে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী) দুটি বচন উদ্ধৃত করেছেন :

> লৌকিক মার্গ অনুসরণ করা উচিত (শাস্ত্রী ৫৩, নামাই B1)
> লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে বালক (অবোধ) আর পণ্ডিত সমান (৫৪, B1)

দুটি বচনই উদ্ধৃত হয়েছে *ত-উ-সি* থেকে। কিন্তু এলি ফ্রাঙ্কো দেখিয়েছেন : দুটিই আসলে লৌকিক ন্যায় বা প্রবাদ-এর পর্যায়ে পড়ে। ব্যোমশিব-ও এর একটি বচন দুবার উদ্ধৃত করেছেন সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে।[৫৬] সুতরাং এ দুটিকে বর্জন করাই উচিত।

B2 আসলে শাস্ত্রী, ১৯-এরই পূর্ণ শ্লোকরূপ। আগেই শ্লোকটিকে নিয়ে আলোচনা করেছি। চার্বাক-রচনাংশ হিসেবে এটি মানতে কোনো আপত্তি নেই।

নামাই একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন (B5) গুণরত্ন-র *ত-র-দী* থেকে। তিনি জানতেন না এটি আদপে *বি-ধ-ম-পু*-র দুটি শ্লোকের শেষ ও প্রথম চরণ (১।১০৮। ১৪ গঘ-১৫ কখ)। এইখানেই প্রথম 'যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচো', ইত্যাদি শ্লোকটি পাওয়া যায়। তবে বক্তব্যর দিক থেকে এটিকে চার্বাক-রচনাংশ মনে করা যায়। *বি-ধ-ম-পু*-র আরও দু-একটি শ্লোকও একইভাবে গ্রাহ্য হতে পারে।[৫৭]

F1 উদ্ধৃত হয়েছে *ন্যা-কু-চ* থেকে। এতে বলা হয়েছে :

> ঘট ইত্যাদিতে চৈতন্যর অভিব্যক্তি নেই, তা অন্য কারণের অভাবে;
> ধুলো ইত্যাদিতে যেমন মদশক্তির অভিব্যক্তি নেই।

এটি আসলে 'মদশক্তির মতো' (আমার ১।৪-৫ = শাস্ত্রী ৪ = নামাই A5) সূত্রটিরই ব্যাখ্যা। এমন বাক্যকে চার্বাক-রচনাংশ ধরলে হয়তো ভুল হয় না, কিন্তু তার থেকে একটি সমস্যা তৈরি হয়। পূর্বপক্ষ স্থাপনের সময়ে প্রতিপক্ষ যা যা লিখেছেন তার সব কিছুকেই তাহলে চার্বাক-রচনাংশ বলে স্বীকার করতে হবে। ফলে এ ধরণের ব্যাখ্যামূলক বাক্য— কোনো বৃত্তিকারের নাম করে যেটি উদ্ধৃত হয় নি— আপাতত অগ্রাহ্য করা ভালো। *ন্যা-কু-চ*-র সম্পাদক, পণ্ডিত মহেন্দ্রকুমার ন্যায়শাস্ত্রী অবশ্য বাক্যটিকে প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি বলেই ধরেছেন (যদিও পুঁথিতে নিশ্চয়ই উদ্ধৃতিচিহ্ন ও ইটালিক হরফ ছিল না!)। তবে কোনোমতেই এটি সূত্র নয়— এইটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায়।

F2 ও F3 উদ্ধৃত হয়েছে ভাববিবেক-এর বৃত্তি, *প্রজ্ঞাপ্রদীপ* থেকে।[৫৮] বিষয়টি জটিল। তাই আক্ষরিক অনুবাদ না-দিয়ে সংক্ষেপে তার সারকথাটি বলি। বৌদ্ধরা অমর আত্মায় বিশ্বাস করেন না, কিন্তু জন্মান্তর মানেন। চার্বাকরা এখানে তাতে আপত্তি তুলেছেন। এই একই বক্তব্য *ত-স* এবং *ত-স-প*-য় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।[৫৯] F3-র বাক্যটিও সেখানে আছে। এ দুটিকেও তাই চার্বাক-রচনাংশ বলে ধরতে বাধা নেই।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। 'লোকায়তপরীক্ষা'-অধ্যায়ে শান্তরক্ষিত চার্বাকমত স্থাপন প্রসঙ্গে কুমারিলভট্ট-র *শ্লোকবার্ত্তিক* থেকে তিনটি শ্লোক (আত্মবাদ অধ্যায়, শ্লোক ৬৫-৬৭ = *ত-স,* ১৮৬৪-৬৬) হুবহু উদ্ধৃত করেছিলেন।[৬০] কুমারিল-ই সেগুলির লেখক, নাকি তিনি ও শান্তরক্ষিত দুজনেই অন্য একটি উৎস থেকে শ্লোক তিনটি পেয়েছিলেন— তা বলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও তাই চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে— এমন যে-কোনো বচনকে চার্বাক-রচনাংশ বলে ধরব কিনা— এ সমস্যা থেকে যায়।

চার্বাকসূত্র-র প্রকৃতি

এবার আমার সূত্র-সঙ্কলনে ফেরা যাক। মাত্র ৯+২+২+৫+২ = ২০টি সূত্র-কে তাহলে খাঁটি *চার্বাকসূত্র* বলে মনে করা যায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে : *চার্বাকসূত্র* বলতে কি মাত্র এই কুড়িটিই বোঝাত? এত ছোটো কোনো সূত্রসংগ্রহ তো দেখা যায় না। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে সবচেয়ে ছোটো সূত্রগ্রন্থ পতঞ্জলি-র *যোগসূত্র*। তারও সূত্রসংখ্যা ১৯৬।

উত্তরে বলা যায় : নিশ্চয়ই আরও কিছু চার্বাকসূত্র ছিল। সেগুলি পাওয়ার আর কোনো উপায় আপাতত নেই— যদি না ভারতে বা তার বাইরে কোনো অখ্যাত পুঁথিশালা থেকে ভবিষ্যতে একদিন *চার্বাকসূত্র / পৌরন্দরসূত্র*-র কোনো পুঁথি হঠাৎ আবিষ্কার হয়। ভাস-এর নাট্যচক্র, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, আর্যভটীয়*-র ক্ষেত্রে তা-ই হয়েছিল। প্রথমে মূল বই, তারপর একের পর এক টীকা (বা তার অংশ) খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো আর-একজন রাহুল সাংকৃত্যায়ন ভবিষ্যতে তিব্বতের কোনো বিহার থেকে একটি *চার্বাকসূত্র* উদ্ধার করবেন। আমি আশাবাদী। আর, বলা তো যায় না, সেই সূত্রগুলির সঙ্গে হয়তো একটি বৃত্তিও থাকতে পারে। অবিদ্ধকর্ণ-র বইটির নামও জানা আছে : *তত্ত্বটীকা*।

এত যে কম চার্বাকসূত্র পাচ্ছি তার কারণ : সবই উদ্ধার হয়েছে প্রতিপক্ষর রচনা থেকে। চার্বাকমতের যে যে দিককে তাঁরা খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, শুধু সেই সংক্রান্ত সূত্রগুলিই তাঁরা উদ্ধৃত করেছেন। কোন্ কোন্ সূত্রর ব্যাপারে বৃত্তিকারদের মধ্যে মতভেদ ছিল তারও উল্লেখ আছে। এর বাইরেও নিশ্চয়ই আরও বেশ কিছু সূত্র ছিল। সেখানে হয়তো এখনও-পর্যন্ত-পাওয়া সূত্রগুলির সঙ্গে আরও কিছু কথাও বলা থাকতে পারে।

যেমন, চার্বাকদের সম্পর্কে কৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীহর্ষ অভিযোগ করেছেন : এরা বর্ণাশ্রম মানে না, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করে না (অর্থাৎ মেয়েদের নিচু চোখে দেখে না)।[৬১] এর মধ্যে চার্বাকমতের সামাজিক দিকটিও ধরা পড়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সূত্র ছিল কিনা তা জানার উপায় নেই।

প্রসঙ্গ : ইন্দ্রিয়সুখবাদ

চার্বাকমতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ : তারা যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখের পক্ষপাতী, আহার-বিহার অসংযমকেই প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু এ সম্পর্কে কেউ কোনো চার্বাকসূত্র উদ্ধৃত করেন নি। এই অভিযোগের ভিত্তি হলো একটি আভাণক / লোকগাথা : 'যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে; ধার করে ঘি খাবে। দেহ ছাই হয়ে গেলে, কোথায় (বা, কোথা থেকে) তা ফিরে আসে?'

অন্যত্র (টী. ৫৫ দ্র.) দেখানো হয়েছে : এই শ্লোকের 'ধার করেও ঘি খাবে' অংশটি বিশুদ্ধ জালিয়াতি। সায়ণ-মাধব-এর আগে ও পরে বহুবারই শ্লোকটি (বা তার প্রথম চরণ) উদ্ধৃত হয়েছে; সর্বত্রই বিনা ব্যতিক্রমে, তার জায়গায় আছে 'মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই।' কেউ কেউ শ্লোকটি পুনর্লিখন করেছেন, কিন্তু 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'— এমন চটুল কথা লেখেন নি। মনে রাখতে হবে : সায়ণ-মাধব ছাড়া অন্য যাঁরা এই শ্লোকটি উল্লেখ বা উদ্ধৃত করেছেন তাঁদের কেউই চার্বাকের অনুগামী ছিলেন না, এমনকি মৃদু সমর্থক বা দরদিও নন।

আসলে সুখ বলতে একমাত্র ইন্দ্রিয়সুখই বোঝাবে— এমন তো কোনো কথা নেই। প্রাচীন গ্রীস-এ এপিকিউরাস (খ্রিপূ ৩৪২-২৭০) ছিলেন এক বস্তুবাদী দার্শনিক। তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন : সুখ বলতে তিনি বোঝেন জমিয়ে মাছ খাওয়া নয়, মননচর্চার সুখ।[৬২] তবু এপিকিউর বলতে ইংরিজিতে বোঝায় : খাও, দাও, ফুর্তি করো। অথচ এপিকিউরাস নিজে খুবই সাদাসিধে কায়দায় জীবন কাটাতেন, খেতেন শুধু শুকনো রুটি, উৎসব-পরবের দিনে একটু পনির (চিজ)। বার্ট্রান্ড রাসেল অবশ্য বলেছেন : এর কারণ হলো এপিকিউরাস ছিলেন পেটরোগা।[৬৩] তাই তিনি বিশেষ কিছু খেতে পারতেন না।

ভারতের আদি বস্তুবাদী, বুদ্ধর সমকালীন দার্শনিক, অজিত কেশকম্বলী (পালিতে: কেসকম্বল)-র কথাও ধরা যায়। বিলাসব্যসন দূরের কথা, তিনি রীতিমতো কৃচ্ছ্রসাধনেই অভ্যস্ত ছিলেন। গরমকালে তিনি গায়ে দিতেন কুটকুটে কম্বল। এই ছিল তাঁর একমাত্র পোশাক। এর জন্যেই তার ঐ উপনাম হয়েছিল। অথচ তাঁর অনুগামীদের সম্পর্কেও জৈনদের *সু-কৃ-সূ*-য় লেখা হয়েছে : তারা দেহসুখ নিয়েই মত্ত থাকে।[৬৪]

শুধু বস্তুবাদ নয়, যে-কোনো অবৈদিক মতকেই হেয় করার উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ তোলা হতো। সাংখ্য সম্পর্কেও এমন একটি শ্লোক চালু ছিল। *সাংখ্য-কারিকা*-র বৃত্তিতে মাঠর সেটি উদ্ধৃত করেছেন :

> সর্বদা হাসো, পান করো, খেলা করো, আনন্দ করো, সব বিষয় উপভোগ করো, ভয় কোরো না।
> যদি তোমার কপিলমত জানা থাকে, তাহলে তুমি মোক্ষও পাবে, সুখও পাবে।[৬৫]

জৈন ও বৌদ্ধদের একইভাবে দেখিয়েছেন কৃষ্ণমিশ্র ও জয়ন্তভট্ট (যথাক্রমে *প্র-চ* এবং *আ-ড* নাটকে)।[৬৬] কিন্তু এঁরা কেউই তাঁদের অভিযোগের সাক্ষ্য হিসেবে কোনো প্রামাণিক চার্বাক, সাংখ্য, বৌদ্ধ বা জৈন উৎস থেকে কোনো সূত্র ইত্যাদি উল্লেখ করেন নি।

তাই মনে হয় : ইহসুখবাদ কোনোদিনই চার্বাকমতের অঙ্গ ছিল না। বরং যাঁরা নরকের পাশাপাশি পুণ্যবানদের জন্যে স্বর্গর কল্পনা করেছিলেন তাঁদেরই খাঁটি *হেডনিস্ট* বলা উচিত। স্বর্গসুখ মানে হলো সবরকমের দৈহিক কামনার পরিতৃপ্তি। পরশুরামের বর্ণনায় তা চমৎকার ধরা পড়ে :

> খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলুকুলু বইছে, তার ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙ্গুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সবরকম ফলে আছে, ছেঁড় আরও খাও। জনা-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়ুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ওই হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা

ঘুরে বেড়াচ্ছে, দু দণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু বলবে না, যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।[৬৭]

বিদ্রূপরচনায় একটু অত্যুক্তি থাকেই, এখানেও আছে। কিন্তু স্বর্গসুখ বলতে ধার্মিকরা এইরকমই বোঝেন। ইহকালে যা জুটল না বা জুটবে না, তার উল্টো পিঠে সব-পেয়েছির দেশ বলেই কল্পনা করা হয় স্বর্গকে।

শুধু ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নয়, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামেও স্বর্গ (যে নামেই তাকে ডাকা হোক) একই ধরণের সুখের জায়গা। তবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সে-সুখ সকলের জুটবে না। এখন কষ্ট করলে মরার পরে সুদে-আসলে সব উসুল হয়ে যাবে। স্বর্গ-নরক দুই-ই বাতিল করে দিয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ আর কৃচ্ছ্রসাধনের দুটি প্রান্তকেই চার্বাকরা খারিজ করে দিয়েছিলেন।[৬৮]

অনুমান প্রসঙ্গে : পুনশ্চ

চার্বাকরা কোনো অনুমানকেই মানতেন না— এই ধারণাও যে ভুল— বা তার চেয়ে বেশি, অপপ্রচার— এটিও বোঝা যায় অন্য একটি ঘটনা দিয়ে। এ ব্যাপারে যাঁরা চার্বাকমত নিয়ে মশ্‌করা করেন (বিশেষ করে জয়ন্তভট্ট ও বাচস্পতিমিশ্র), তাঁরা কেউই তাঁদের অভিযোগের সমর্থনে কোনো চার্বাকসূত্র উদ্ধৃত করেন না। বৌদ্ধ কমলশীল ও জৈন শীলাঙ্ক-র মতো তাঁরাও উদ্ধৃত করেন ভর্তৃহরি-র *বা-প* থেকে এক বা একাধিক শ্লোক।[৬৯] আর সেই মতের দায়িত্বটা চাপান চার্বাকের ঘাড়ে। এ হলো জেনে বুঝে লোক ঠকানো। ভর্তৃহরি ছিলেন চূড়ান্ত ভাববাদী। অনুমান কেন, প্রত্যক্ষকেও তিনি প্রমাণ বলে মানতেন না। চার্বাকরা কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান মানতেন, তবে প্রত্যক্ষমূলক না-হলে আপ্তবাক্যকে একেবারেই মানতেন না। আর ভর্তৃহরি-র কাছে বেদ-ই একমাত্র প্রমাণ। চর্মচক্ষু দিয়ে দেখায় তাঁর বিশ্বাস নেই, আগমচক্ষু দিয়ে দেখলে তবেই নাকি সেটা সত্যিকারের দেখা হবে।[৭০]

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলার আছে। 'অনুমান প্রমাণ নয়' এই বচনটি কমলশীল তাঁর *ত-স-প* ছাড়া আরও এক জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। বইটির নাম *ন্যায়বিন্দু-পূর্বপক্ষ-সংক্ষেপ* (বা *-সংক্ষিপ্তি*)। মূল সংস্কৃত বইটি আর পাওয়া যায় না, তবে তিব্বতী অনুবাদ আছে। সেখানে কিন্তু বাক্যটিকে বৈয়াকরণদের উক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে : অনুমান থেকে ভ্রান্তি জন্মায়।[৭১] বৈয়াকরণ বলতে অবশ্যই ভর্তৃহরি ও তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়কে বোঝাবে।

ভর্তৃহরি-র কথাকে চার্বাকমত বলে চালানোর একটাই কারণ আছে। চার্বাকরা কখনোই ভর্তৃহরি-র মতো 'অনুমান' ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেন নি, কিন্তু জয়ন্তভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র প্রমুখ তাঁদের সেইভাবেই হাজির করতে চেয়েছেন। চার্বাকরা যা কোনোদিনই অস্বীকার করেন নি, তাঁদের দিয়ে সেই কথাই অস্বীকার করাতে গেলে

কৌশলের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা উপায় থাকে? জয়ন্তভট্ট থেকে চিরঞ্জীব শর্মা পর্যন্ত সকলেই এই কাজটিই করেছেন।[৭২] বিকৃতি না-বলে একে তঞ্চকতা বললেও অন্যায় হবে না।

চার্বাকসূত্র-র বিশেষত্ব

মাত্র কুড়িটি সূত্রকে খাঁটি বলে ধরা হলো। তবু তার ভিত্তিতেই জোর দিয়ে একটি কথা বলা যায় : দার্শনিক বস্তুবাদের যা মূল বক্তব্য ঐ কটি সূত্রেই তা যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলা আছে।[৭৩]

চার্বাকসূত্র-র বৃত্তিকারদের মধ্যে কোনো কোনো সূত্রর ব্যাখ্যা নিয়ে যে মতভেদ ছিল— আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। তবু ঘটনা এই যে, তাঁরা সকলেই একই সূত্রগ্রন্থর বৃত্তি/টীকা/ভাষ্য লিখেছিলেন। সেই সূত্রসঙ্কলনটি অবশ্য খুবই প্রাচীন। খ্রিস্ট-উত্তর যুগের গোড়ার দিকে— বা খ্রিস্ট-পূর্ব যুগের শেষে— সূত্রগুলি রচিত ও পরে সঙ্কলিত হয়ে থাকবে। তার বৃত্তি/টীকা লিখেছিলেন কম্বলাশ্বতর; পরে আবার বৃত্তি লেখেন পুরন্দর, ভাবিবিক্ত, অবিদ্ধকর্ণ ও উদ্ভটভট্ট।[৭৪] তাঁদের ব্যাখ্যায় যে-সূক্ষ্ম পরিশীলনের ছাপ দেখা যায়,[৭৫] মূল সূত্রগুলির রচনার সময়ে নিশ্চয়ই সেই একই সূক্ষ্মতায় চিন্তা করা হয় নি। দার্শনিক বস্তুবাদের নেহাতই আদি/প্রাথমিক চেহারাই তাতে ধরা ছিল।

সোক্রাতেস-পূর্ব গ্রীক বস্তুবাদী দার্শনিকদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। তফাত এই যে, তাঁরা এক-একটি 'ভূত' বা প্রাকৃতিক উপাদানকে জগতের উৎপত্তির হেতু বলে ধরে নিয়েছিলেন। থালেস (খ্রিপূ ৫৮৫ নাগাদ) যেমন মনে করতেন জল হচ্ছে সব কিছুর আদি; আনাক্‌সিমেনেস (খ্রিপূ ৫৪৬ নাগাদ) মনে করতেন বাতাসই সব কিছুর উৎপত্তির কারণ; হেরাক্লিতাস (খ্রিপূ ৫০০ নাগাদ) মনে করতেন আগুনই সেই মূল উপাদান...। চার্বাকরা কিন্তু এমন আলাদা আলাদা উপাদানকে না-ধরে, চারটি উপাদান, অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন আর বাতাসকে জগতের মূল তত্ত্ব বলে ধরেছিলেন। সূত্রগুলিতে বিনা দ্বিধায় যাবতীয় ভাববাদী ও ঈশ্বরবাদী মতকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রয়োজনে *চার্বাকসূত্র*-কাররা উপমার সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু সাধারণভাবে জগৎ ও জীবন বিষয়ে স্পষ্ট কয়েকটি 'হ্যাঁ' আর 'না' বলাটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।[৭৬] তার মধ্যে কোনো লুকোছাপা নেই; তাঁরা যা বিশ্বাস করতেন আর করতেন না— দুই-ই স্পষ্ট ভাষায়, না-ঘুরিয়ে, না-পেঁচিয়ে বলা হয়েছে।

আদি বস্তুবাদের স্বরূপ

ইংরেজ কথাসাহিত্যিক, উইলিয়ম সমারসেট মম্ (১৮৭৪-১৯৬৫) ছাত্রবয়সে কতকগুলো বিষয়ে মতস্থির করে ফেলেছিলেন। সেগুলি হলো:

ঈশ্বরবিশ্বাস ব্যাপারটা সহজবুদ্ধির বা যুক্তিতর্কর ব্যাপার নয়, বরং [ব্যাপারটা] অনুভবের। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা ততটাই অসম্ভব যতটা অসম্ভব তা অপ্রমাণ করা। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, এরকম একটা ধারণার কোনো প্রয়োজনই আমি দেখি না। পরলোক বলে যে একটা কিছু থাকতে পারে, এটা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ভবিষ্যতের শাস্তির ধারণাটা আমার মনে হয় নিদারুণ আর ভবিষ্যতের পুরস্কারটা বাড়াবাড়ি। আমি এটা খুব ভালো বুঝি যে আমি যখন মারা যাব, আমার বেঁচে থাকাটা পুরোপুরি থেমে যাবে। যেখান থেকে আমি এসেছিলাম সেই মাটিতেই আমি ফিরে যাব। তবুও আমি কল্পনা করতে পারি যে, কোনো এক ভবিষ্যতে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেও পারি; কিন্তু সেটা এখনকার মতোই হবে যখন আমি তাতে বিশ্বাস করি না। সেটা কোনো যুক্তি বা পর্যবেক্ষণের ব্যাপার হবে না, হবে শুধু অনুভবের।

যদি আপনি একবার ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেন, আমি বুঝি না কেন আপনি পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাস করতে ইতস্তত করবেন, আর যদি আপনি একবার অলৌকিককে মেনে নেন, আমি তো বুঝি না কেন আপনি তাতে কোনো সীমা রাখবেন। 'নূতন নিয়ম' (নিউ টেস্টামেন্ট)-এর অলৌকিক ঘটনাবলির মতোই ক্যাথলিক ধর্মর (অলৌকিক) ঘটনাগুলিরও সমান সাক্ষীসাবুদ আছে।

কোনো একটি ধর্মর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যে সব সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়, সেগুলো অন্য যে কোনো ধর্মর সত্যতা প্রমাণের জন্যে উপস্থিত করা সাক্ষ্যগুলোর প্রায় একই ধরণের। এ কথা ভাবতে আমার অবাক লাগে, একজন খ্রিস্টানের অস্বস্তি হয় না যে, যদি তিনি মরক্কোয় জন্মাতেন, তিনি মুসলমান হতেন আর সিংহলে জন্মালে হতেন বৌদ্ধ; আর সে ক্ষেত্রে তাঁর কাছে খ্রিস্টধর্ম ততটাই উদ্ভট ও স্পষ্টতই অসত্য মনে হতো, একজন খ্রিস্টানের কাছ ঐ ধর্মগুলো যতটা (উদ্ভট) মনে হয়।[৭৭]

চার্বাকসূত্র-এও এই ধরণের সহজবুদ্ধি থেকে পাওয়া কিছু সিদ্ধান্ত দেখা যায়। জগৎ ও জীবনের অসংখ্য জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতার কোনো নিদর্শন এখানে নেই। খুব বড় বা ছোটো স্তরে বস্তুর বিন্যাস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির নমুনা এই সূত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। স্বভাববাদ-এর ধারণায় প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে এক ধরণের উপলব্ধির আভাস আছে, কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাপারটি আদৌ তার মধ্যে স্পষ্ট নয়।[৭৮]

তবু এত আদি চেহারাতেও এই আপসহীন বস্তুবাদী দর্শনটি আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শুধু ঈশ্বর নয়, পরকাল, পরজন্ম আর বেদপ্রামাণ্যকে অস্বীকার করার মধ্যে সাহস ও স্বচ্ছবুদ্ধির যে-মিলন দেখা যায়, শুধু ভারতে নয়, আঠেরো শতকের দীপায়ন (এনলাইটেনমেন্ট)-এর আগে বিশ্বদর্শনের ইতিহাসে তার আর কোনো নজির নেই।

১. স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ।।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, 'সূত্র' ১০ দ্র.।

২. 'অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ।' সূত্রটি পাওয়া যায় নাগেশভট্ট-র *পরিভাষেন্দুশেখর*, ১৩৩-এ।

৩. সূত্রস্থং পদমাদায় বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যোবিদো বিদুঃ।।
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভাষ্য' দ্র.। এই অর্থে 'পঞ্জিকা' শব্দটিও ব্যবহার হয়। তার মানে হলো 'গ্রন্থের সমস্তপদব্যাখ্যায়িকা' (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়); "a perpetual commentary which explains and analyses every word", মনিএর-উইলিয়ম্‌স্, *সংস্কৃত-ইংরিজি অভিধান*, 'পঞ্জিকা' দ্র.। পালিতে 'অথ (অট্‌ঠ) কথা' (সংস্কৃত 'অর্থকথা') বলতেও এ ধরণের ভাষ্য/টীকা বোঝায়।

৪. সূত্রস্যার্থবিবরণং বৃত্তিঃ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বৃত্তি' ১০ দ্র.।

৫. *সা-প্র-সূ*-র ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেছিলেন : কালরূপ সূর্য সাংখ্যদর্শনকে খেয়ে ফেলেছে : কোনো রকমে তিনি সেটি আবার খাড়া করেছেন। রিশার্ড গার্বে সম্পা. (১৮৯৫), ১ দ্র.।

৬. পটার, (১৯৯৫)-এ এঁদের রচনার সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে। বাঙলায় *ন্যায়সূত্র* ও *বাৎস্যায়ন-ভাষ্য*-র অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; পাঁচ খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয় ১৩২৪-৩৬ বঙ্গাব্দে। পরেও বইটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এ ছাড়া বাঙলায় *ন্যায়সূত্র*-র অনুবাদ করেছেন মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৮২)। আরও খবরের জন্যে পরের টীকা দ্র.।

৭. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও তাঁর অনুসরণে মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় (শুধু বাঙলা অনুবাদে নয়, *ন্যায়দর্শন, বাৎস্যায়ন*-ভাষ্য-র ইংরিজি তর্জমা, ন্যায় (১৯৮২)-তেও) বাচস্পতিমিশ্র-র নির্ধারিত পাঠই অনুসরণ করেছেন। বিভিন্ন পাঠভেদের জন্যে রুবেন (১৯২৮) দ্র.। *ন্যায়*-এও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ঐ সব পাঠভেদের উল্লেখ করেছেন (৪২৩-৫১ দ্র.)।

৮. 'সেগুলি থেকেই চৈতন্য', এই সূত্রটির সমাপ্তিসূচক ক্রিয়াপদ কী হবে— 'অভিব্যক্ত হয়' না 'উৎপন্ন হয়'— ব্যাখ্যাভেদ ছিল এই নিয়ে। কমলশীল, *ত-স-প*, ৬১৩-৩৪; প্রভাচন্দ্র, *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২; ঐ, *প্র-ক-মা*, ১১৬-য় দুটি অধ্যাহারই দেওয়া আছে। এ ছাড়া শীলাঙ্ক, *সূ-কৃ-সূ-বৃ*, ১০-১১; চক্রধর, *গ্রন্থিভঙ্গ*, ২ : ২৫৭-৫৮; বাদিদেব সূরি, *স্যা-বা-র*, ১০৭৩-৭৪, ১০৮১, ১০৮৬; সায়ণ-মাধব, *স-দ-স*, ২; সোমদেব সূরি, *য-তি-চ*, ২৫৩, ও মাধব সরস্বতী, *স-দ-কৌ*, ১০৮ দ্র.।

৯. টি.ডবলিউ.রিস ডেভিড্‌স্ একদা (১৮৯৯) দাবি করেছিলেন : লোকায়ত বলে কোনো দর্শন ভারতে কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতেই লোকায়ত দর্শনের অস্তিত্বর সপক্ষে এত তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যে এই নিয়ে আর কথা বাড়ানোর

দরকার নেই। তাঁর মৃত্যুর পরেও আরও বহু তথ্য জানা গেছে— অন্তত পাঁচজন বৃত্তিকারের নামও আমাদের হাতে আছে— অবিদ্ধকর্ণ, উদ্ভটভট্ট, কম্বলাশ্বতর, পুরন্দর, ভাবিবিক্ত। এঁদের বিষয়ে জানার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৭ দ্র.।

১০. আরও প্রাচীন কালে বস্তুবাদ বলতে উপনিষদে 'অসুরমত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (*ছান্দোগ্য*, ৮।৭-৯; তু. *গীতা*, ২৬।৭৯); বৌদ্ধরা অজিত কেসকম্বল-র মতকে বলতেন 'উচ্ছেদবাদ' ('মহাবোধিজাতক' (*জাতক*, ৫২৮) দ্র.); আর জৈনরা বলতেন 'তজ্জীবতচ্ছরীরবাদ' (*সূ-কৃ-সূ-বৃ* (১।১।১১ প্রসঙ্গে), ১৩)। এই বই-এর অধ্যায় ৩ দ্র.।

১১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী লিখেছিলেন, "ভোগমুখী ঐহিক ও দৈহিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক শাস্ত্রমতই এই মতের পরিপোষক। এই মত অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে অগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই সম্ভবতঃ পরলোকসর্বস্ব আস্তিকগণের প্রভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে আজ বার্হস্পত্য দর্শনের একখানিমাত্র মূলগ্রন্থ এবং শত্রুর কবলে, এখানে সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত, কয়েকটি অংশমাত্র তাহার পূর্ব বিরাটত্বের পরিচয় দিতেছে" ((১৯৮২), ৬)। চার্বাকমতকে এখানে যেভাবে নির্বিচারে ইহসুখবাদী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তা কিন্তু ঠিক বলে মনে হয় না। এই প্রবন্ধর শেষে বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করা হবে। 'বার্হস্পত্য দর্শনের একখানিমাত্র মূলগ্রন্থ' বলতে দক্ষিণারঞ্জন হয়তো এফ. ডবলিউ. টমাস-সম্পাদিত *বার্হস্পত্য সূত্রম্* অর্থাৎ বার্হস্পত্য *অর্থশাস্ত্রম্* বইটির কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এটি একেবারেই জাল, নানা মতের খিচুড়ি। টমাস নিজেও সে-কথা স্বীকার করেছিলেন (৮)।

অথবা 'বার্হস্পত্য দর্শনের একখানিমাত্র মূলগ্রন্থ' বলতে শাস্ত্রী হয়তো জয়রাশিভট্ট-র *ত-উ-সি*-র কথাও ভেবে থাকতে পারেন। তবে এটি চার্বাক / লোকায়ত দর্শনের বই নয়, একজন সংশয়বাদী তার্কিকের রচনা— এমন হওয়াই বেশি সম্ভব। ভাল্‌টের রুবেন, কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এমনই মনে করতেন। *C/L.*, ৪৯২-৫৩০ দ্র.।

চার্বাকমতের যাবতীয় বই পরিকল্পনা মাফিক ধ্বংস করা হয়েছিল— দক্ষিণারঞ্জন এ কথা অন্যত্রও লিখেছেন :

Just as Plato, one of the spiritualistic thinkers of the West, in his fanatical zeal would have liked to buy up and burn all the works of Demokritos, the father of the western Materialism, so it is probable that these advocates of Vedic authority, in their fanatic zeal, collected and destroyed the original works of Bṛhaspati school of philosophy, the extreme materialistic system of India (*C/L*, ৪২৩)।

১২. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৩১-৩৩ দ্র.। সায়ণ-মাধব দুটি শ্লোকের ক্ষেত্রে দু-রকম পাঠ দিয়েছিলেন। তার থেকে বহু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

১৩. শাস্ত্রী অবশ্য খাঁটি চার্বাক-উৎস ছাড়াও সাংখ্য, ন্যায় ইত্যাদি উৎস থেকেও

বস্তুবাদমূলক বেশ কিছু সূত্র সঙ্কলন করেছিলেন। পরে আচার্য আনন্দ ঝা তাঁর *চার্বাক দর্শন* বইটিতে একইভাবে অ-চার্বাক উৎসগুলি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। ভারতে বস্তুবাদ নিয়ে লিখতে বসে আরও কেউ কেউ চার্বাক ও অ-চার্বাক উৎস কাজে লাগিয়েছেন। মিত্তল দ্র.।

১৪. *চার্বাক-ষষ্টি* (১৯২৮); 'চার্ব্বাক পঞ্চাশিকা', *ভারতবর্ষ*, (আষাঢ় ১৩৫১), ৩২ : ১, ১৫-১৬; *চার্বাক-দর্শন* (১৯৫৯), ১৭৩-৭৬; দ্বিতীয় পরিবর্তিত (মরণোত্তর) সং. (১৯৮২), ২০০-২০৩।

১৫. নামাই (১৯৭৬), ২ : ৩৯-৪৫। পরে এটি তাঁর জাপানি-ইংরিজি প্রবন্ধ সঙ্কলন, *Rinne no ronsho* (পুনর্জন্মর প্রতিষ্ঠা), Osaka : Tōhō Shuppam, 1996-এ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (বইটি এখনও হাতে আসে নি)।

১৬. (১৯৮২), ২০৩।

১৭. পশ্চিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দর্শন-বিশেষজ্ঞ, এলি ফ্রাঙ্কো এখনও নামাই-এর সূত্র-সঙ্কলন থেকেই উদ্ধৃতি দেন ও তার সংখ্যা উল্লেখ করেন। ফ্রাঙ্কো (১৯৯৪) দ্র.।

১৮. *অ-ব্র-সি*, ৯৯।

১৯. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, দামোদর মুখোপাধ্যায়-সম্পা., ২৬৭২-৭৩। নামাই এই উৎসটি উল্লেখ করেন নি, যদিও দক্ষিণারঞ্জন করেছেন।

২০. *প্র-চ*, অঙ্ক ২, ৪০; *স-দ-স*, ১৫-তেও একই কথা আছে।

২১. এই বই-এর অধ্যায় ২১ ও ২৬ দ্র.।

২২. শুধু দক্ষিণারঞ্জন ও নামাই নন, তাঁদের আগে ও পরে বহু দর্শনবিশারদই নির্দ্বিধায় এগুলি স্বীকার করেছেন। বোধহয় পুনরুক্তি হবে বলে নামাই আর *প্র-চ* থেকে ঐ উক্তিটি উল্লেখ করেন নি।

২৩. *কামসূত্র*, বঙ্গবাসী সং., ১।২।২৫-৪৭। নবপত্র সং., ১।২।২১ ইঃ।

২৪. *কামসূত্র*, প্রথম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র হলো : ধর্ম, অর্থ, কামকে নমস্কার, ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ। অর্থাৎ কোনো দেবদেবীকে নমস্কার করে তিনি বই লিখতে শুরু করেন নি। এ ছাড়া *কামসূত্র*, ১।২।৫১ দ্র.।

২৫. সোমদেব সূরি-র *নীতিবাক্যামৃতম্*-এও তিনটি মাত্র বর্গ-র সেবা করতে বলা হয়েছে (সমাংবাত্রিবর্গং সেবেত, বোম্বাই সং., ৫)।

২৬. বিশদ আলোচনার জন্যে কাণে, ২/১ : ৮-১৪ দ্র.। *মহাভারত*-সংক্রান্ত উৎসগুলির খবর এখানে পাওয়া যাবে। মোক্ষ-র ধারণাটি গৃহীত হতে খানিক সময় লেগেছিল বলেই মনে হয়। হিরিয়ান্না (১৯৭৪), ৫০ দ্র.।

২৭. *কৌ-অ* (১৯৬৭), ৮(১৭।৬-৭)।

২৮. *জয়মঙ্গলা*-টীকা, চৌখম্বা সং., ১৯; নবপত্র সং., ৩৬-৩৭।

২৯. জেকব (১৯৮৩), ১ : ৪৪ দ্র.। ১।২।২৯-কে পঞ্চানন তর্করত্ন 'অদ্যকপোতীয় ন্যায়' বলে উল্লেখ করেছেন (বঙ্গবাসী সং., ৪০)।

৩০. ত-*স-প*, *ত-স* শ্লোক ১৪৮১ প্রসঙ্গে, ৫২৮।

৩১. *মহাপুরাণ*, ১: ৩২৮ (২০।২৮।৯৮ ক খ); *স্যা-বা-র*, ২৬৫।

৩২. *স-দ-স*, ১০ দ্র.।

৩৩. চার্বাকমতের-র কথা *মহাভারত*-এও এসেছে। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে : কৃতান্ত (=অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত) ও ঐতিহ্য (=শাস্ত্র)— দু-এরই মূলে থাকে প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ দিয়েই শাস্ত্র বাধা পায়, (প্রত্যক্ষ ছাড়া) কৃতান্তও কোনো প্রমাণ নয়। (অর্থাৎ, আত্মাকে প্রত্যক্ষ জানা যায় না, তাই অনুমান ও শাস্ত্রর আশ্রয় নেওয়া বৃথা)। (শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়, প্রামাণিক সং., ২১১।১৬; প্রচলিত সং., ২১৮।২৯। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদেও তা-ই। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পা., সটীক সং.,-এ ২১৫।৩০)। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ১০ দ্র.। এ ছাড়া *স-ম-স*, ১৫ দ্র.।

৩৪. উদ্ভটভট্ট এই দু-ধরণের হেতুর কথা বলেছেন : লোকপ্রসিদ্ধ (বা লৌকিক) হেতু আর তন্ত্র- (প্র)সিদ্ধ হেতু (*স্যা-বা-র*, ২৬৬-তে উদ্ধৃত)। জয়ন্তভট্ট বলেছেন : উৎপন্নপ্রতীতি আর উৎপাদ্যপ্রতীতি (*ন্যা-ম*, আহ্নিক ২, ভাগ ১ : ১৮৪)। *স্যা-বা-র*-য় যেমন উদ্ভটভট্ট-র নাম করে তাঁর রচনা থেকে একটি পুরো অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হয়েছে, জয়ন্ত তেমন কোনো নাম উল্লেখ করেন নি; তিনি শুধু লিখেছেন, 'সুশিক্ষিততর-রা বলেন'। গৌরীনাথ শাস্ত্রী এটিকে 'এক ধরণের লোকায়তিকদের মত' বলে শনাক্ত করেন (ঐ, সম্পাদকীয় শিরোনাম)। কিন্তু পুরন্দর থেকে উদ্ভটভট্ট সকলেই, দেখা গেছে, এই দু-ধরণের অনুমানের কথা বলেছেন। সুতরাং এটিকে যাবতীয় চার্বাকপন্থী দার্শনিকেরই গৃহীত ও স্বীকৃত মত বলে ধরা উচিত, কোনো একটি বিশেষ উপসম্প্রদায়ের নয়।

বিষয়টি বহুদিন আগেই (১৯৩২) লক্ষ্য করেছিলেন মৈসূর হিরিয়ান্না। *স-দ-স*-য় চার্বাকমতের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "[T]hese statements in all probability *exaggerate the weak points of the* [Cārvāka] *doctrine* and *may even misrepresent its tenets*, Thus it is commonly assumed by the critics that the Cārvākas denounce reasoning as a pramāṇa: but to judge from the reference to it in one Nyāya tratise [*Nyāyamañjarī*, Vizianagram ed. (1895), 124=G. Sastri ed., 184], *they seem to have rejected any such reasoning as was ordinarily thought sufficient by others for establishing the existence of God, of a future life, etc. Such a discrimination in using reason alters the whole complexion of the Cārvāka view*. But this is only a stray hint we get about the truth. What we generally have is a caricature" (১৯৩২/১৯৭৩), ১৮৮। বাঁকা হরফ আমার।

হিরিয়ান্না একটি ব্যাপার খেয়াল করেন নি : কমলশীল ও বাদিদেব সূরি-র লেখাতেও যথাক্রমে পুরন্দর ও উদ্ভটভট্ট-র রচনা থেকে উদ্ধৃতি-তে একই কথা আছে। সুতরাং জয়ন্ত একাই 'a stray hint' দিয়েছেন— ঘটনা এমন নয়।

৩৫. *ত-স-প* বেরনোর (১৯২৬) কিছুকাল পরেই পুরন্দর-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন

সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। "Purandara, evidently a philosopher of the *Cārvāka* school, observes that ordinary inference which we make in our practical life and experience, is not denied by the *Cārvāka-s*. The *Cārvāka* questions that ultimate validity of inference as an instrument of metaphysical thought" (১৯৩৫), ৩৬৮-৬৯।

এ কথা বুঝেও তিনি লেখেন, "The materialists of the *Cārvāka* school and later on Bhartṛhari and Śrīharṣa emphatically denied the possibility of ascertaining this universal connection and consequently the validity of inference as a medium of authentic knowledge" (৩৬৬)। এখানে সর্বাত্মক অনুমান-বিরোধিতার ক্ষেত্রে শুধু চার্বাকদের নাম না করে বৈয়াকরণ ও অদ্বৈত বৈদান্তিকদের কথাও বলা হয়েছে। বেশিরভাগ বই-এ একমাত্র চার্বাকদেরই 'অনুমান-বিরোধী' বলে মার্কা মারা হয়।

পুরন্দর-এর মন্তব্যটি খেয়াল করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-ও (৩ : ৫৩৬, ৫৩৯)। পুরন্দরের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকদের যুক্তির উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন "But this does not properly refute the Cārvāka position that inductive generalizations are only probable, and that therefore (as Purandara says) they acquire some amount of validity by being corroborated by experience and that they have no force in spheres where they cannot be corroborated by perceptual experience" (৫৩৯)। এই দুই বিদ্বানের কেউই কিন্তু 'দু ধরণের হেতু (বা প্রতীতি)'-র ধারণাটির বৈশিষ্ট্য আলাদা করে উল্লেখ করেন নি।

অন্যদিকে ফ্রাউভালনের মনে করেন : দার্শনিক বিতর্কে অনুমান নিয়ে আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠার পর কোনো কোনো লোকায়তিক পুরনো অবস্থানে (=প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নেই) থেকে গেলেন, "but in the majority of cases one decided to discuss the doctrine of inference and to *take it over at least in parts. This desertion of the original attitude led, in no way, to the consequence of the decline of the system. The taking up of foreign thoughts and occupation with them led, on the contrary, to a regular activity and to a blossoming up of a literature richer than hitherto*" (১৯৫৬, ১৯৯৭), ২ : ২২৫। বাঁকা হরফ আমার।

অনুমান সম্পর্কে চার্বাকদের ধারণাকে এখানে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে, আর পরের পর্বকে 'আদি মনোভাব পরিত্যাগ' ও 'বিজাতীয় চিন্তাধারা গ্রহণ' বলেই ধরা হয়েছে— যদিও পুরন্দর, অবিদ্ধকর্ণ ও উদ্ভটভট্ট-র হাতে চার্বাকমতের সমৃদ্ধি ঘটার ব্যাপারটি অস্বীকার করা হয় নি।

ফ্রাউভালনের-এরই প্রতিধ্বনি করে ফ্রাঙ্কো লিখেছেন : দিঙ্নাগ ও ধর্মকীর্তি আসরে নামার পর থেকেই অনুমান প্রসঙ্গে চার্বাকদের অবস্থান নিতে হলো, তা না হলে নাকি তাঁদের 'লাথি মেরে আসর থেকে বিদেয় করে দেওয়া হতো' ('or the Cārvāka would have been kicked out of the philosophical scene' (১৯৯১), ১৫৯)।

আরও হালে ফ্রাঙ্কো ও প্রেইসেনডান্‌ৎস্ একইভাবে পুরন্দর প্রমুখকে 'শোধনবাদী' রূপেই দেখিয়েছেন। (১৯৯৮), ৬ : ১৮০ দ্র.।

৩৬. শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার তর্জমা। রাজশেখর বসু, ১ : ৩২৯-এ উদ্ধৃত। এই বিখ্যাত সূক্তটিকে 'নাসদীয় সূক্ত' বলা হয়। অন্য একটি ছন্দোবদ্ধ অনুবাদের জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৮৪), ১৮৪-৮৫ দ্র.। রমেশচন্দ্র দত্তর গদ্য অনুবাদে : "সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত নিরূপণ করিলেন" (রমেশচন্দ্র দত্ত, ৬১৩)।

গ্রীক পুরাণকথায় অবশ্য পৃথিবী ও পাতালের উদ্ভবের পরে তবে কাম (Eros)-এর উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে : "Verily at the first Chaos came to be, but next wide-bosomed Earth, the ever-sure foundation of all the deathless ones who hold the peaks of snowy Olympus, and dun Tartarus in the depth of the wide-pathed Earth, and Eros (Love), fairest among the deathless gods..." হেসিঅদ, *থেওগনি*, চরণ ১১৬-২০, ৮৭।

৩৭. কমলশীল, *ত-স-প*, ৬৬৩; প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, ১০৫; নামাই (১৯৭৬), ৪৪ টী. ৩১-এ উদ্ধৃত।

৩৮. এই বই-এর অধ্যায় ১৪ দ্র.।

৩৯. *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সং., ১৩২।২খ; প্রচলিত সং., ১৩৪।২ খ. দ্র.। টীকায় নীলকণ্ঠ কিন্তু এর পেছনের কাহিনীটি বলেন নি। আর এক টীকাকার, বাদিরাজ-এর কাছে 'বৃকপদম্'-র জায়গায় লেখা ছিল 'বৃক্ষফলম্'। মনে হয়, লিপিকর গল্পটি জানতেন না, তাই বৃকপদ-এর রহস্য তিনি বুঝতে পারেন নি, নিজের বিবেচনামতো পাঠসংস্কার করে দিয়েছিলেন। বাদিরাজ-ও গম্ভীরভাবে 'বৃক্ষফলম্' পাঠ ধরেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। (প্রামাণিক সং., ৬৯৬-এ উদ্ধৃত)।

৪০. নামাই-এর F5 (শাস্ত্রীর উল্লেখের সময়ে ভুলক্রমে BS 23-র জায়গায় 25 ছাপা হয়েছে)। *ত-বো-বি*, ৬৯।

৪১. *সি-বি-টী*, ২৭৭; *প্রমাণ-পরীক্ষা*, ৬২; *প্র-বা-স্ব-টী*, ২৬।

৪২. *ন্যা-ম*, আহ্নিক ৪, ভাগ ২ : ৩৮৮।

৪৩. *কৌ-অ*, ১।২।৪, ৬।

৪৪. *বি-পু*, ৩।১৮।১-২৯; *প-পু*, ১৩।২৯১-৩৭১; এ ছাড়া *হরিবংশ*, প্রচলিত সং., হরিবংশ পর্ব, অধ্যায় ২৮ (প্রামাণিক সং.-এ এটি বর্জিত হয়েছে)।

৪৫. *বৃহস্পতিস্মৃতি*, ২৭।৩।

৪৬. এই বই-এর অধ্যায় ১২ দ্র.।

৪৭. *বেদান্তসার* (১৯৬৮ সং.), ১৪৬।

৪৮. এই বই-এর অধ্যায় ৩০ দ্র.।

৪৯. শ্লোক ৫৩৬।

৫০. শ্লোক ৫২৩-৫৮৬। *গীতাভাষ্য*-য় (২।১৩ প্রসঙ্গে) মধুসূদন সরস্বতী এইসব কথার উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া যামুন-এর *সিদ্ধিত্রয়*, ১৯-২৪-এ দেহাত্মবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মন-আত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদের কথা আছে।

৫১. এই বই-এর অধ্যায় ২৬ দ্র.। প্রসঙ্গত বলা যায় *আইন-এ-আকবরী*-তে চার্বাকমতের যে বিবরণ আছে সেটিও গুরুমুখ-বা প্রচলিত ধারণা-নির্ভর।

৫২. *ব্যোমবতী*, ভাগ ২ : ১২৬ দ্র.। এই বই-এর অধ্যায় ১৭ দ্র.।

৫৩. ঐ, ভাগ ১: ১৫৫; ভাগ ২: ২৬, ১৩০ দ্র.।

৫৪. *চার্বাক দর্শন*, ২০৩। সায়ণ-মাধব-এর লেখায় চার্বাকদর্শনের মূল কথাগুলি গদ্যে (যদিও হুবহু সূত্র-র ভাষায় নয়) ও পদ্যে লেখা আছে। এর পদ্য-অংশ থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অনুমান করেছিলেন, "There was at least one metrical version of the main contents of this system from which extracts are found quoted in Mādhava's *Sarva-darśana-saṁgraha* and in other places" (৩:৫৩২)।

এই মতের ভিত খুব পোক্ত বলে মনে হয় না। সাংখ্যদর্শনের মূল কথাগুলি সিদ্ধসেন-দিবাকর শ্লোক-আকারে লিখেছিলেন তাঁর *দ্বাত্রিংশদ্ দ্বাত্রিংশিকা*, চতুর্দশী-তে। কিন্তু এ হলো কণাদসূত্রর শ্লোকরূপ, একজন জৈন লেখকের কীর্তি— কোনো ন্যায়-বৈশেষিক মতের লেখকের রচনা নয়।

৫৫. এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.।

৫৬. *ব্যোমবতী*, ২ : ১০৮, ১৭২ দ্র.। ফ্রাঙ্কো (১৯৮৭, ১৯৯৪), ভূমিকা, ৪৩-৪৪।

৫৭. *বি-ধ-ম-পু*, ১।১০৮।১৩, ১৬-১৯। *লো-ত-নি*, ২৫ ক (১।৩৪)-এও এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৫৮. মূল সংস্কৃত বইটি পাওয়া যায় না, তবে তার তিব্বতী তর্জমা আছে। তার থেকে সংস্কৃত রূপটি পুনরুদ্ধার করেছেন ড. রঘুনাথ পাণ্ডেয় (সটীক *মধ্যমকশাস্ত্র*, ১৯৮৮-৮৯)। নামাই-এর উল্লিখিত সূত্রটি আছে *মধ্যমকশাস্ত্র*-য় (১৬।২ প্রসঙ্গে)। ২ : ৩-এ পাণ্ডেয় যেভাবে রচনাটির সংস্কৃত রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-র পুনরুদ্ধারের কিছু তফাত আছে। (১৯৯৭), ১১৫-১৬।

৫৯. *ত-স-প*, ৬৩৫। ফ্রাঙ্কো জানিয়েছেন, রত্নকীর্তি থেকে মোক্ষকরগুপ্ত অবধি বহু বৌদ্ধ বিদ্বান্ এই যুক্তিটির মোকাবিলা করেছেন। (১৯৯৭), ১১৬।

৬০. *ত-স-প*-র প্রথম সংস্করণের (১৯২৬) সম্পাদক, এম্বর কৃষ্ণাচার্য এই ব্যাপারটি খেয়াল করেন নি। সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রথম এটি নজরে আনেন ((১৯৩৫), ২০৪ টী. ২)। সাতকড়িবাবু লিখেছিলেন : "It is strange that the editor of the *Tattvasaṅgraha* has failed to enumerate *Ślokas* 1865 to 1868 in that work in the list of quotations from Kumārila, given as an appendix. Perhaps the omission to mention Kumārila as the author of the same by Kamalaśīla is responsible for this overt omission on the part of the editor. It is absolutely necessary that these *ślokas* should be noticed in the appendix of *Tattvasaṅgraha*." বরোদা সং.-এর পুনর্মুদ্রণে (১৯৮৪) ও বারাণসী থেকে প্রকাশিত দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী-সম্পা. পরের দুটি সং.-এ (১৯৬৮, ১৯৮১)-ও এই তথ্যটির উল্লেখ করা হয় নি।

৬১. *প্র-চ*, ২।১৮,৩৮; *নৈ-চ*, ১৭।৪০; *স-দ-স*, ১০।

৬২. দিওজেনেস (১৯২৬), ৬৫৭।
একটি অ-সাধারণ অভিধান থেকে Epicure সংক্রান্ত অংশটি উদ্ধৃত করা যাক :
Epicure; n. A person who is overmuch given to pleasures of the table, so called from Epicurus, a philosopher widely celebrated for his abstemious habits, as a condition favourable to the cultivation of the intellectual enjoyment.
— *n.* An opponent of Epicurus, an abstemious philosopher, who, holding that pleasure should be the chief aim of man, wasted no time in gratification of the senses আমব্রোস বিয়ার্স্ [১৯১১], ৭৭।

৬৩. রাসেল, ১৯৯।

৬৪. উৎস ও বিস্তৃত আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৯) দ্র.।

৬৫. *মা-বৃ, সাংখ্যকারিকা* ৩৭ প্রসঙ্গে, ১৪৯। রাজশেখর সূরি-র *ষ-দ-স*-এ এটি মাঠর থেকেই উদ্ধৃত হয়েছে। হরিভদ্র সূরি, *ষ-দ-স* (১৯৭৯)-র পরিশিষ্ট-য় রাজশেখরের পুস্তিকাটিও ছাপা হয়েছে। উদ্ধৃত শ্লোকের জন্যে ৭৪ দ্র.। *য-তি-চ*-তেও এই ধরণেরই একটি বাক্য উদ্ধৃত হয়েছে (২৫০)। সেটি বলানো হয়েছে আসুরি-র মুখ দিয়ে। হন্দিকৈ (১৯৪৯), ১৪৬ দ্র.।

৬৬. *প্র-চ*, অঙ্ক ২; *আ-ড*, অঙ্ক ১। অন্যত্রও বৌদ্ধ-জৈন-কাপালিকদের নিয়ে বিস্তর বিদ্রূপ করা হয়েছে।

৬৭. "মহেশের মহাযাত্রা", *পরশুরাম গল্পসমগ্র*, ২১৬। বাংলাদেশে মুসলমানদের বিয়েতে *বেহেস্ত* (*স্বর্গ*) নিয়ে নানা ধরনের বই উপহার দেওয়া হয়। তাতে স্বর্গসুখের বর্ণনা থাকে এইরকম : "হুরগণের সহিত বেহেস্তবাসী পুরুষগণের যে-মিলন ঘটিবে, তাহার তুলনায় দুনিয়ার মিলন-সুখ লক্ষ ভাগের এক ভাগও নহে..." (হুর মানে স্বর্গের অপ্সরা, black-eyed nymph। ইংরিজি ও বাঙলায় একেই houri, 'হুরি' বলা হয়)। আর অতৃপ্ত ইচ্ছা পূরণের চরম নিদর্শন হলো : "আপনি আরাম কেদারায় বসিয়া স্বচ্ছন্দে হুকা টানিতে পারিবেন, কেহই কল্কেটা পাওয়ার জন্য হাত বাড়াইয়া আপনার সেই আরামের ব্যাঘাত ঘটাইবে না" (ফাদার দ্যতিয়েন (১৯৯১), ২০৬-এ উদ্ধৃত)।
কালিদাস-এর *রঘুবংশ*-তেও দেখা যায় : যুদ্ধে মারা গেলে তৎক্ষণাৎ স্বর্গলাভ হয় ও সুরাঙ্গনার আলিঙ্গন জোটে (৭।৫১)!
এ হলো সুখবাদের হদ্দমুদ্দ— মরণোত্তর সুখলাভ!

৬৮. অন্যান্য অনেকের মতো রিশার্ড গার্বে-ও মনে করতেন : "On the practical side this system exhibits itself as the crudest Eudaemonianism, for it represents the gratification of the senses as the sole desirable good." হেস্টিংস (১৯৫৩), ৩ : ১৩৮।
গার্বে-র কিন্তু সন্দেহ ছিল : লোকায়ত বলতে এমন স্থূল ইন্দ্রিয়সুখবাদ বোঝাত কি না। তিনি লিখেছিলেন : "It is natural to conjecture that the *Lokayata system was based by its founder upon more serious philosophical lines than the information which has come to us from their opponents allow*

us to understand. The conjecture, however, cannot be established" (Emphasis added) (ঐ)।

এরই প্রতিধ্বনি করেছেন মৈসূর হিরিয়ান্না : "*It is difficult to believe that there could ever have existed such a school of thought.* Even if we explain its extreme views as due to a reaction against the free speculations and the austere asceticism that were widely current in ancient India, *the system, we must admit, should once have inculcated less objectionable principles. The form in which it is now presented has an air of unreality about it.* If any proof were required, it is found in its lesson of self-indulgence, which needs not to be taught. It is also somewhat suspicious that the Cārvāka doctrine should consist so much in denying what is accepted by the other schools and so little in contributing any new ideas of its own to the sum of Indian thought" (Emphasis added) (১৯৩২/১৯৭৩), ১৯৪-৯৫।

৬৯. *ন্যা-ম,* ১ : ২, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৩; *আ-ড,* অঙ্ক ৩, ৫৯; *শা-ভা* (৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), ৮৫০; *সূ-কৃ-সূ-বৃ,* ১।১।৮, ১০; *ত-স-প,* ৫২১-২২; *স্যা-বা-র,* ২৬২।

৭০. *বা-প,* ১।৩৮-৪৩ দ্র.। 'আগমচক্ষু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ব্যাখ্যাকার বৃষভদেব (১।৪৩-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)।

৭১. পিকিং তন্‌জুর, ১১৫ কঙ। সংস্কৃত রূপটি পুনরুদ্ধার করেছেন ড. সঞ্জিতকুমার সাধুখাঁ। এখনও এটি ছেপে বেরয় নি। তাঁর পাণ্ডুলিপির পৃ. ১৭-য় অনুমান বিষয়ে এই বাক্যটি আছে।

৭২. জয়ন্তভট্ট তবু বৌদ্ধ আর চার্বাক-এর তফাত করতে পারতেন, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য শর্মা তাও জানতেন না। তাঁর কাছে নাস্তিক বলতে বোঝাত চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধ মিলিয়ে একটি খিচুড়ি মতবাদ। এই তিন সম্প্রদায়ের কোনো মূলগ্রন্থই তাঁর পড়ার সুযোগ হয় নি। তাঁর *বিদ্বন্‌মোদতরঙ্গিণীচম্পূ* দেখলেই তা বোঝা যায়। এই বই-এর অধ্যায় ২৭ দ্র.।

৭৩. বস্তুবাদের মূল কথা এই তিনটি :

১. যা কিছু আছে, তা বস্তুগত।

২. যা কিছু ব্যাখ্যা করা যায় তাকে একমাত্র পূর্বগামী ভৌত পরিস্থিতি-ঘটিত সূত্র (laws)-র ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করা যাবে।

৩. প্রত্যেক ঘটনারই একটি কারণ থাকে।

পল এডওয়ার্ড্‌স্ সম্পা., ৫ : ১৭৯।

৭৪. এই বই-এর অধ্যায় ৭ দ্র.।

৭৫. টী. ৩৫-এ ফ্রাউভালনের-এর মন্তব্য দ্র.।

৭৬. জয়ন্তভট্ট বলেছেন : চার্বাকরা কোনো ব্যাপারেই ইতিবাচক কিছু বলে না; তাদের সব শিক্ষাই নেতিবাচক (*ন্যা-ম,* ১ : ৪, ৩৮৮)। সঙ্কলিত সূত্রগুলি থেকে কিন্তু এই অভিযোগ টেঁকে না। সেখানে ইতিবাচক কথাও আছে।

৭৭. মম্ (১৯৪৭/১৯৭৮), ২৬। অংশটি তর্জমা করে বাধিত করেছেন শ্রীপ্রদ্যুৎকুমার দত্ত। এই কথাগুলি মম্ লিখেছিলেন ১৮৯৪-এ, যখন তাঁর বয়স বাইশ। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইংল্যান্ড-এর যুক্তিবাদী সমিতি-র সঙ্গে মম্-এর যোগ ছিল; তার মুখপত্র, *দ্য র‍্যাশনালিস্ট অ্যানুয়াল*-এ তাঁর গল্প বেরিয়েছে।

৭৮. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য স্বভাববাদের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কেরও আভাস দেখেছেন (১৯৯৩), ১৫৫-১৬১ দ্র.)। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ আছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯১), ৯২-১০১ দ্র.।

অধ্যায় ৭

ভারতে বস্তুবাদ : *চার্বাকসূত্র*-র পরে

আগেই বলা হয়েছে, *চার্বাকসূত্র* এখনও অবধি পাওয়া যায় নি। তবে বিরোধী পক্ষর কাব্য-নাটক ইত্যাদিতে ব্যঙ্গরূপ (প্যারডি) পাওয়া যায়।

খ্রি আট থেকে বারো শতকের মধ্যে চার্বাকপন্থী ও তার বিরোধীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছিল। একদিকে চার্বাক একা, অন্যদিকে সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত ইত্যাদি আস্তিক দর্শন, আর বৌদ্ধ (বিজ্ঞানবাদী) ও জৈন (শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর) সম্প্রদায়। এই তর্কে শুধু সূত্র ও শ্লোকগুলিই আসে নি, চার্বাকমতের বিভিন্ন বৃত্তিকারদের কথাও উঠেছে। সেই সব বৃত্তি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতিও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মকীর্তি, জৈন অকলঙ্ক, মীমাংসক কুমারিল, বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য, নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট, "সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র" বাচস্পতিমিশ্র আর এঁদের টীকাকারদের লেখায় চার্বাকমত খণ্ডনের ব্যাপক চেষ্টা দেখা যায়। বিতর্কর মূল বিষয় তিনটি : ১. চারটি ভূত (মাটি, জল, আগুন ও বাতাস) থেকেই চেতনা আসে কিনা, ২. দেহছাড়া অক্ষয় আত্মা আছে না নেই, আর, ৩. অনুমানকে প্রমাণ বলে ধরা ঠিক কিনা। *চার্বাকসূত্র*-র বৃত্তিকারদের বক্তব্য খণ্ডনে এঁদের বিস্তর কালি খরচ করতে হয়েছে, কারণ পূর্বপক্ষর যুক্তি নেহাত খেলো ছিল না। সেই তর্কে ইহসুখবাদের কথা এঁরা তোলেন নি। চার্বাকমত ধর্মবিরোধী, ইহলোকসর্বস্ব, সুতরাং ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া এরা কিছু বোঝে না— এই বিকৃতি শুরু করেন বৈদান্তিক কৃষ্ণমিশ্র আর শ্রীহর্ষ। জৈন ঐতিহ্যে 'কলিকালসর্বজ্ঞ' হেমচন্দ্র থেকে চার্বাকদের হেয় করার জন্যে তাঁদের ভোগসর্বস্ব বলে দেখানো শুরু হয়। তাতে যোগ দেন আর-এক জৈন টীকাকার, গুণরত্ন। এতেই ইন্ধন জুগিয়েছেন বৈদান্তিক সায়ণ-মাধব একটি শ্লোকের বিকৃত পাঠ দিয়ে।[১]

ইহসুখবাদের অভিযোগ অন্য দর্শনের ক্ষেত্রেও উঠেছে। *সাংখ্যকারিকা*-র *মাঠরবৃত্তি*-তেই বিরোধী পক্ষর লেখা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে :

> সর্বদা হাসো, পান করো, খেলা করো, আনন্দ করো, সব বিষয় উপভোগ করো,
> ভয় কোরো না।

যদি তোমার কপিলমত জানা থাকে, তাহলে তুমি মোক্ষও পাবে, সুখও পাবে।[২]

যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা— ব্যাপারটা এখানেও এইরকম। যে-দর্শন পছন্দ হয় না, ভগবানের নাম যেখানে নেই— তাকেই 'ইহসুখবাদী' ছাপ মেরে দাও। ইহসুখবাদকে চার্বাকমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করার কোনো কারণ নেই। আসল তর্ক ছিল জ্ঞানতত্ত্বর জগতে। শুধু লোকায়তসূত্র নয়, তার ব্যাখ্যাকারদের কথাও এই প্রসঙ্গে এসেছে। এঁদের মারফতই চার্বাকদর্শনের নৈয়ায়িক দিকটি আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল। এঁদের কথা বিশেষ কেউ বলেন না। এবার চার্বাকদর্শনের পাঁচজন ব্যাখ্যাকারের পরিচয় দেওয়া হবে।

১. ক ম্ব লা শ্ব ত র।। বৌদ্ধ দার্শনিক কমলশীল-এর *ত-স-প*-য় এঁর নাম পাওয়া যায়। এঁর লেখা থেকে একটি বাক্যাংশ সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে : "কায়া থেকেই (চেতনা আসে)।"[৩]

বাক্যাংশটি কোনো সূত্র বা তার ভাষ্য থেকে নেওয়া হয়েছে—এমনই মনে হয়। এঁর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে ইনি নিশ্চয়ই আট শতক বা তার আগের লোক।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এই কম্বলাশ্বতরকে সঙ্গীতশাস্ত্রর এক প্রাচীন আচার্য-র সঙ্গে এক বলে অনুমান করেছেন, আবার বুদ্ধর সমকালীন দার্শনিক অজিত কেসকম্বল (কেশকম্বলী)-এর সঙ্গেও তাঁকে মেলাতে চেয়েছেন।[৪] নারদ, তুম্বুরু প্রমুখের মতো কম্বলাশ্বতর একটি নামমাত্র। কম্বল আর অশ্বতর দুজন আলাদা লোকও হতে পারেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে কম্বলকম্বলাম্বর বলেও একটি নাম পাওয়া যায়। প্রজ্ঞারক্ষিত নামে এক দর্শনবিদ্‌কে 'কম্বলাম্বর'-এর অনুসারী বলা হয়েছে।[৫] এঁদের সবাইকে, শুধু 'কম্বল' শব্দটির সূত্রে, এক বলে মনে করার কোনো হেতু নেই।

২. পু র ন্দ র ।। এঁর নামও প্রথম পাওয়া যায় *ত-স-প*-য়।[৬] *স্যা-বা-র*-য় বাদিদেব সূরিও একটি পৌরন্দরসূত্র উদ্ধৃত করেছেন। *প্র-ক-মা*-য় সেটি চার্বাক-এর নামে উদ্ধৃত হয়েছে। পুরন্দর-এর নাম না-করে ঐ একই সূত্র আরও তিনটি বই-এ (অল্প পাঠভেদ সমেত) পাওয়া যাচ্ছে।[৭] সেই সঙ্গে জৈন দার্শনিক অনন্তবীর্য-র *সি-বি-টী*-তে আর-একটি পৌরন্দর-সূত্র উদ্ধৃত হয়েছে।[৮]

এ ছাড়া দশ শতকের জৈন কবি পুষ্পদন্ত চার্বাকদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে একটি "পৌরংদরিয় বিত্তি" (পৌরন্দরীয় বৃত্তি)-র কথা বলেছেন।[৯] তার মানে, পুরন্দর নামে কোনো দার্শনিক চার্বাক/লোকায়ত-মতের একটি সূত্র সঙ্কলন করেছিলেন, আর নিজেই তার একটি বৃত্তিও লিখেছিলেন। কমলশীল সম্ভবত এই বৃত্তি থেকেই একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

পুরন্দর যে-সূত্রসঙ্কলন করেন তাতে কি শুধু প্রথাগত সূত্রগুলিই ছিল, না তিনি

নিজেও কিছু যোগ করেছিলেন? এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে তিনিও নিঃসন্দেহে আট শতক বা তার আগের লোক। বাদিরাজ সূরি-ও পুরন্দর-এর নাম করেছেন।[১০]

পুরন্দর পরিষ্কার বলেছিলেন : লৌকিক ক্ষেত্রে অনুমানকে স্বীকার করতে চার্বাকদের কোনো আপত্তি নেই। শুধু অলৌকিক ব্যাপারে (ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি) তাঁরা অনুমানকে মানেন না।

৩. অ বি দ্ধ ক র্ণ ।। *পৌরন্দরসূত্র*-র একটি টীকা লিখেছিলেন অবিদ্ধকর্ণ। বাদিরাজ সূরি এঁকে স্পষ্টভাবে 'চার্বাকবিশেষ' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। কর্ণকগোমী-ও এঁর মতের কথা লিখেছেন।[১১] *ত-স-প*-য় দুজন অবিদ্ধকর্ণ-র কথা পাওয়া যায়। একজন নৈয়ায়িক, অন্যজন চার্বাকপন্থী। দ্বিতীয় জনের টীকাগ্রন্থটির নাম ছিল *তত্ত্বটীকা*।[১২] অনন্তবীর্য-র বই-এ সম্ভবত এই টীকা থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। মহেন্দ্রকুমার ন্যায়াচার্য অনুমান করেছিলেন, অবিদ্ধকর্ণ-ই *পৌরন্দর সূত্র*-র লেখক।[১৩] কিন্তু বাদিরাজ সূরি আলাদা করে ঐ দুজনের নাম ও উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[১৪]

৪. ভা বি বি ক্ত ।। চক্রধর এঁর নাম করেছেন 'চিরন্তন-চার্বাকাচার্য' অর্থাৎ প্রথাগত চার্বাক-আচার্যদের একজন হিসেবে।[১৫] ইনিও *চার্বাকসূত্র*-র একটি টীকা লিখেছিলেন। অনুমান করা যায়, কমলশীল ও প্রভাচন্দ্র যেসব বৃত্তিকারের কথা লিখেছেন, ইনি তাঁদেরই একজন। ভাবিবিক্ত বলে একজন নৈয়ায়িকের নামও পাওয়া যায়।[১৬] কিন্তু প্রথম অবিদ্ধকর্ণ-র মতো এই ভাবিবিক্ত-রও কোনো বই আজ অবধি পাওয়া যায় নি। ইনি কোন্ সময়ের লোক তা-ও বলা যায় না, তবে আট শতক বা তার আগের, নিশ্চয়ই।

৫. ভ ট্ট উ দ্ভ ট (বা উদ্ভট ভট্ট)।। চক্রধর ও বাদিদের সূরি-র বই-এ একাধিকবার এঁর কথা এসেছে।[১৭] এঁর বইটির নাম *তত্ত্ববৃত্তি*। ইনি ছিলেন চার্বাকমতের অভিনব ব্যাখ্যাকার, 'শোধনবাদী' বললেও ভুল হয় না। "তেভ্যশ্চৈতন্যম্", "সেগুলি (আগুন, বাতাস, মাটি ও জল) থেকেই চৈতন্য"— এই সূত্রটি তিনি নতুন (ও অপ্রথাগত) ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ভাবিবিক্ত-র মতো টীকাকাররা সূত্রটি ব্যাখ্যা করেন এইভাবে : সেগুলি থেকেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। উদ্ভট বললেন : না, সেগুলির জন্যেই চৈতন্য জন্মায় (সংস্কৃত ভাষায় "তেভ্যঃ" শব্দটি পঞ্চমী বিভক্তি বা চতুর্থী বিভক্তি— দুই হতে পারে)।[১৮] সূত্রটি ব্যাখ্যায় দুটি মত অনেক আগে থেকেই চালু ছিল— কমলশীল ও প্রভাচন্দ্র তার উল্লেখ করেছেন।[১৯] আবার, যে-সূত্রটি "পৌরন্দরসূত্র" হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে— উদ্ভট সেটিরও অভিনব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রধর বলেছেন, "চার্বাকধূর্ত" বা "সুশিক্ষিত চার্বাক" বলতে জয়ন্তভট্ট এই উদ্ভটকেই বুঝিয়েছেন।[২০] তার মানে ইনি জয়ন্ত-র সমকালীন বা আরও আগের লোক।

বাদিদেব সূরি-ও এঁকে 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহানুভাব' ("জরদ্‌দ্বিজন্মা-মহানুভাবঃ") বলে উল্লেখ করেছেন।[২১] তার থেকেও মনে হয়, ইনি খ্রি ন শতক বা তার আগের লোক। এঁর লেখার যে কটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তার থেকে একটি কথা স্পষ্ট : ন্যায়শাস্ত্রে এঁর অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। চার্বাকদর্শনের বিকাশের দ্বিতীয় ধারাটি এঁর রচনা থেকেই ধরা যায়। আপসহীন বস্তুবাদের সঙ্গে এসে মিলেছে ন্যায়ের সূক্ষ্মতা। অনুমান কেন প্রত্যক্ষ-র মতো মুখ্য প্রমাণ নয়— এ বিষয়ে অবিদ্ধকর্ণ-র যুক্তির সঙ্গে তিনি আরও নতুন যুক্তি হাজির করেন।[২২]

তাহলে ব্যাপার দাঁড়াল এই : অন্যান্য দর্শনের মতো চার্বাকদর্শনেরও নানা বিকাশ ঘটেছিল। ব্যাখ্যাকাররা সব বিষয়ে একমত হন নি, আর জটিল তর্কে নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁরা রীতিমতো পাল্লা দিতেন। তারপরেও কেন সব বই হারিয়ে গেল, কিছু টুকরো উদ্ধৃতি ছাড়া কিছুই রইল না— এ এক বিস্ময়।

ফ্রাউভালনের লক্ষ্য করেছেন, ব্যাখ্যাকারদের রচনায় চার্বাকদর্শন আগের তুলনায় আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল।[২৩] দুঃখের বিষয়, ভারতীয় দর্শনের আধুনিক বিদ্বান্‌রা এ বিষয়ে যথেষ্ট খবর রাখেন বলে মনে হয় না। গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় সকলেই সেই পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে চলেছেন : রাধাকৃষ্ণণ, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রমুখের পরে যেন আর কিছুই জানা যায় নি। অথচ বিশ শতকের গোড়া থেকেই, একটু-একটু করে, চার্বাকসূত্র ছাড়াও চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তাদের কথা পাওয়া গেছে।

এক নজরে উৎসগুলির প্রকাশকাল দেখা যাক। প্রভাচন্দ্র-র *প্র-ক-মা* প্রথম ছেপে বেরয় ১৯১২-য়, নতুন সংস্করণ ১৯৪১-এ। বাদিদেব সূরি-র *স্যা-বা-র* বেরয় ১৯১৪-য়, তারপর ১৯২৬-৩০-এ (১৯৮৮-তে এটি আবার ছাপা হয়েছে)। শান্তরক্ষিত-এর *ত-স* এবং কমলশীল-এর *ত-স-প* বেরয় ১৯২৬-এ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪), ১৯৩৭-এ এর ইংরিজি তর্জমাও ছাপা হয়। ১৯৬৮-তে এর একটি নতুন সংস্করণও বেরিয়েছে, পুনর্মুদ্রণও হয়েছে (১৯৮১)। কর্ণকগোমী-র *প্র-বা-স্ব-টী* বেরয় ১৯৪৩-এ, বাদিরাজ সূরি-র *ন্যা-বি-বি* ১৯৪৯ ও ১৯৫৪-য়, অনন্তবীর্য-র *সি-বি-টী* ১৯৫৬-৫৯-এ। চক্রধর-এর *গ্রন্থিভঙ্গ* প্রথম ছাপা হয় ১৯৭২-এ, নতুন একটি সংস্করণ বেরিয়েছে ১৯৮২-৮৫-তে।[২৪]

সুতরাং এঁদের লেখা না-পাওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এ ছাড়া ভট্ট উদ্ভট সম্পর্কে চমৎকার একটি প্রবন্ধ লেখেন এস্তের ই. সোলোমন (১৯৭৮), পৌরন্দরসূত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এলি ফ্রাঙ্কো (১৯৯১)। তবু ছাত্রপাঠ্য বই-এ, পত্রপত্রিকার আলোচনায় এ সবের কোনো ছাপ দেখা যায় না। জয়ন্তভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র প্রমুখ চার্বাকদের সম্পর্কে যা যা লিখে গেছেন— এঁরা লৌকিক ক্ষেত্রেও অনুমানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, ইত্যাদি— এখনও তারই চর্বিতচর্বণ করা হয়।

১. *প্র-চ,* ২।২২; *নৈ-চ,* ১৭।৫০, ৬৮, ৬৯; *ত্রি-শ-পু-চ,* ১।১।৩৪০-৪৪; *ত-র-দী,* ৩০০-১০; *স-দ-স,* ১৪, শ্লোক ৭ (যার দ্বিতীয় পাদ-য় আছে 'ধার করেও ঘি খাবে'। এই বই-এর অধ্যায় ৩১-এ শ্লোকটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)।
২. *মাঠরবৃত্তি, সাংখ্যকারিকা* ৩৭ প্রসঙ্গে (১৩৭৫ ব), ১৪৯।
৩. *ত-স,* ২২৫ (শ্লোক ১৮৬৩ প্রসঙ্গে)।
৪. *ত-স* (১৯২৬/১৯৮৪), আটতিরিশ-উনচল্লিশ। তুচ্চি-ও কম্বলাশ্বতর-কে অজিত কেশকম্বলী-র সঙ্গে এক করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। (১৯৭১), ১ : ১৪০। ফ্রাঙ্কো এই মত বাতিল করে দেন। (১৯৯৭), ১০৩। ফ্রাঙ্কো-র অনুমান কম্বলাশ্বতর 'বৃহস্পতিসূত্র'-র একটি টীকা লেখেন খ্রি ৫৪০ নাগাদ (ঐ, ১১৭)। তবে এটি নেহাতই অনুমান। ফ্রাঙ্কো-ও সে-কথা স্বীকার করেছেন।
৫. *NCC* (১৯৬৮), ১ : ১৬৮-৬৯ দ্র.।
৬. *ত-স-প,* ৫২৮ (শ্লোক ১৪৮১-৮২ প্রসঙ্গে)।
৭. *স্যা-বা-র,* ২৬৫। সূত্রটি আরও তিন জায়গায়, *ন্যা-ম,* ভাসর্বজ্ঞ-র *ন্যায়ভূষণ* ও প্রভাচন্দ্র-র *প্র-ক-মা-*য়, পুরন্দর-এর নাম না-করে, পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্কো (১৯৯১), ১৬১ টী. ১ দ্র.। সূত্রটির পাঠও অনিশ্চিত ('প্রমাণস্যাগৌণত্বাৎ' না 'প্রমাণস্যাগৌণত্বাৎ')।
৮. *সি-বি-টী,* ৩০৬।
৯. *মহাপুরাণ (তিসট্ঠিমহাপুরিসগুণালংকার),* ১ : ৩২৮। এর সম্পাদক, পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য অবশ্য পুরন্দর অর্থে দেবরাজ ইন্দ্রকে ধরেছেন, বৃহস্পতি-র সঙ্গে সঙ্গে যাঁকে নাকি চার্বাক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয় (ঐ, ৬৪৩ টী.)। এমন কোনো উল্লেখ তো চোখে পড়ে না। বরং কমলশীল ও অনন্তবীর্য-র সাক্ষ্যে পুরন্দর-কে 'চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা' বলে ধরাই সঙ্গত। পুষ্পদন্ত-র বইটির একটি পুঁথিতে পুরন্দর সম্পর্কে এই কথাই পাশে লেখা আছে (*ভবিসয়ত্তকহা,* ভূমিকা, ৪২-এ উদ্ধৃত)।
১০. *ন্যা-বি-বি,* ২ : ১০১।
১১. ঐ, ১০১ : 'চার্বাকবিশেষো' বিদ্ধকর্ণঃ'; কর্ণকগোমী, *প্র-বা-স্ব-টী,* ১৯, ২৫।
১২. টী. ৫, ৪২৬-২৭ দ্র.।
১৩. টী. ৮, ভূমিকা, ৭৭।
১৪. *ন্যা-বি-বি,* ২ : ১০১।
১৫. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৭, ২ : ২৫৭।
১৬. ফ্রাঙ্কো (১৯৯৭), ৯৯, ১৪২ দ্র.।
১৭. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ১, ১ : ৫২, ১০০; আহ্নিক ৭, ২ : ২৫৭; ঐ, ২৬৩; *স্যা-বা-র,* ২৬৫, ২৬৯-৭০, ৭৬৪-৬৫, ১০৮৭।
১৮. *ন্যা-ম,* ২ : ২৫৭; *ত-স-প,* ১০৮৭-ও দ্র.।
১৯. *ত-স-প* (শ্লোক ১৮৫৭-৫৮ প্রসঙ্গে); *ন্যা-কু-চ,* ৩৫২।
২০. *ন্যা-ম,* ১ : ৫২, ১০০।

২১. *স্যা-বা-র,* ৭৬৪।
২২. ঐ, ২৬৫।
২৩. ফ্রাউভালনের, ২ : ২২৫।
২৪. পটার (১৯৯৫)-এ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে। যদিও পটার-এর অনুমিত সালগুলি নিয়ে বিতর্ক আছে।

অধ্যায় ৮

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-য় সাংখ্য যোগ লোকায়ত

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-র গোড়ায় (১।২।১) বলা হয়েছে : বিদ্যা = আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, আর দণ্ডনীতি।[১] এর শেষ তিনটি নিয়ে কোনো গোলমাল নেই। ত্রয়ী মানে বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ) ; বার্তা মানে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য ; দণ্ডনীতি মানে রাষ্ট্র পরিচালনার সুনীতি-কুনীতি।[২] এখনকার ভাষায় বললে, ত্রয়ী = ধর্মতত্ত্ব, বার্তা = অর্থনীতি, দণ্ডনীতি = রাষ্ট্রনীতি। কথা হলো : আন্বীক্ষিকী মানে কী?

ঐ একই অধ্যায়ে (১।২।১০) কৌটিল্য লিখেছেন : আন্বীক্ষিকী = সাংখ্য, যোগ, আর লোকায়ত।[৩] ১৯০৯-এ বইটি বেরনোর পরে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন : এই তিনটিই তাহলে ভারতের সবচেয়ে পুরনো দর্শন। তবে, সাংখ্য বলতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরবাদী সাংখ্য নয় (কারণ যোগকে এখানে আলাদা রাখা হয়েছে, যদিও *গীতা*-র সময়েই সাংখ্য আর যোগকে মিলিয়ে একটি দর্শনের কথা বলা হয়),[৪] আদি নিরীশ্বর সাংখ্যই হবে। যোগ বলতে অবশ্যই পতঞ্জলি-র *যোগসূত্র*, আর লোকায়ত বলতে চার্বাক বা বৃহস্পতি-র নামে যে-দর্শনের কথা জানা যায়, সেটিই। অর্থাৎ লোকায়ত = বেদপ্রামাণ্যের বিরোধী, আত্মা-পরলোকে অবিশ্বাসী, বস্তুবাদী দর্শন।

এর মধ্যে একটু অস্বস্তি অবশ্য ছিল। *অর্থশাস্ত্র*-য় যে সব বিদ্যার কথা বলা হয়েছে তার সবই রাজার শিক্ষার জন্যে। *কামন্দকীয় নীতিসার* (২।৩)-এ এরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[৫] সেখানে দর্শন শিক্ষার তালিকায় লোকায়ত-র মতো একটি অবৈদিক (নাস্তিক) দর্শন জুটল কেমন করে? *অর্থশাস্ত্র*-র প্রথম সম্পাদক শামশাস্ত্রী তাঁর ইংরিজি অনুবাদে লোকায়ত-র পাশে বন্ধনীর মধ্যে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দিয়ে তাই লিখেছিলেন : (নিরীশ্বরবাদ?), (Atheism)।[৬]

অর্থশাস্ত্র-র দুজন টীকাকার অবশ্য কোনো দ্বিধাবোধ করেন নি। *জয়মঙ্গলা*-টীকায় পরিষ্কার বলা হয়েছে : লোকায়ত মানে বার্হস্পত্য মত।[৭] যোগ্ঘম-র *নীতিনিনীতি* টীকা-য় আছে : বৃহস্পতির লেখা নাস্তিক শাস্ত্র।[৮]

পরবর্তীকালে চার্বাক = লোকায়ত = বার্হস্পত্য এমন একটা সমীকরণ চালু ছিল। ঐ দুই টীকাকারের ব্যাখ্যা মানতে তাই আপত্তি হয় নি। এর থেকে সিদ্ধান্ত টানা হয়েছিল : পরে ধর্মশাস্ত্রে ও অন্যান্য সূত্রে লোকায়ত-কে যতই নিন্দেমন্দ করা হোক, আদতে এটি বেশ সম্মানীয় দর্শনই ছিল।[৯]

লোকায়ত = বস্তুবাদ না ন্যায়দর্শন?

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় বাদ সেধেছিলেন এক নাম-না-জানা মলয়লম টীকাকার (সম্ভবত খ্রি বারো শতক)। তিনি বলেন : লোকায়ত হলো ব্রহ্মা, গার্গ্য প্রমুখের শেখানো ন্যায়শাস্ত্র।[১০] এরই অনুসরণে মহামহোপাধ্যায় ত. গণপতি শাস্ত্রী তাঁর সংস্কৃত টীকায় (১৯২৪) লিখলেন : লোকায়তং ন্যায়শাস্ত্রং ব্রহ্মগার্গ্যোক্তম্।[১১]

বাঙলায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশও লিখলেন : "... প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছি।"[১২] তাঁর মতে, *অর্থশাস্ত্র*-য় লোকায়ত বলতে ন্যায়শাস্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে। তবে সে ন্যায়শাস্ত্র বেদবিরোধী নয়, আস্তিক।

তার মানে, লোকায়ত নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। দুটো অর্থ প্রস্তাব করা হচ্ছে : ১. বস্তুবাদী দর্শন, ২. আস্তিক ন্যায়দর্শন।

আন্বীক্ষিকী = তর্কবিদ্যা না দর্শনশাস্ত্র?

পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে বললেন : আন্বীক্ষিকী-র মধ্যে লোকায়ত পড়ল— এ তো আশ্চর্যর কথা। মনে হয়, সাধারণ অভিজ্ঞতা ('লোক') থেকে পাওয়া আশ্রয়বাক্য (premise)-র ভিত্তিতে যে তর্কবিদ্যা, logic— সেই অর্থেই কৌটিল্য শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরে অবশ্য লোকায়ত বলতে নাস্তিক (নিরীশ্বরবাদী, বস্তুবাদী) বোঝায়। আন্বীক্ষিকী বলতে পরের অনেক লেখায় তর্কবিদ্যাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ আবার ঐ শব্দটির অর্থ করেছেন আত্মবিদ্যা। কোথাও কোথাও দুটো মিলিয়ে মানে করা হয়েছে : আত্মজ্ঞান অর্জনের উপযোগী তর্কবিদ্যা। *নীতিময়ূখ*-এ আন্বীক্ষিকী-র মধ্যে ধরা হয়েছে তর্কবিদ্যা আর বেদান্তকে, মীমাংসা ও স্মৃতি আছে ত্রয়ীর মধ্যে।[১৩]

এই ব্যাখ্যায় আপত্তি করেন রামচন্দ্র পণ্ডেরীনাথ কঙ্গলে। তাঁর মতে, তর্কবিদ্যা বলতে হেতুবিজ্ঞান, the science of reasoning বোঝালে, সেটি ঠিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। আন্বীক্ষিকী-কে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে সেখানে হেতু ব্যবহার করা হয়। এর থেকেই তর্কবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, এমনকি গৌতম-এর *ন্যায়সূত্র*-র সঙ্গে সেটি এক হয়ে গেছে। *অর্থশাস্ত্র*-য় আন্বীক্ষিকী মানে হেতুবিজ্ঞান বা তর্কবিদ্যা নয়। শব্দটি দিয়ে কয়েকটি হেতুভিত্তিক দর্শনতন্ত্র, system of philosophy-কেই বোঝানো হয়েছে।[১৪]

এবার তাহলে আন্বীক্ষিকী শব্দটি নিয়ে একটি নতুন সমস্যা তৈরি হলো। কঙ্গলে যেমন বলেছেন, বিভিন্ন সূত্রে আন্বীক্ষিকী = তর্কবিদ্যা = ন্যায়শাস্ত্র— এমন কথা পাওয়া যায়। ব্যোটলিঙ্ক-রোট তাই সংস্কৃত-জার্মান শব্দকোষে আন্বীক্ষিকী-র অর্থ দেন : Logik।[১৫] তাহলে কঙ্গলে (ও তাঁর আগে-পরে আরও অনেকেই) শব্দটি 'দর্শন' অর্থে নিতে চান কেন?

আসলে যে-প্রসঙ্গে *অর্থশাস্ত্র*-য় আন্বীক্ষিকী কথাটি এসেছে, সেখানে তার অর্থ ন্যায়শাস্ত্র ধরলে সাংখ্য ও যোগ-কেও তর্কবিদ্যা বলে ধরতে হয়। অথচ ভারতীয় পরম্পরায় ন্যায়কে (পরে ন্যায়-বৈশেষিককে একসঙ্গে) আলাদা দর্শন বলে ধরা হয়েছে। একই ন্যায়শাস্ত্রর তিনটি রূপ— সাংখ্য, যোগ, ও লোকায়ত— এমন কথা ভূ-ভারতে শোনা যায় না।[১৬] তাই আন্বীক্ষিকী বলতে দর্শন বোঝাই সঙ্গত। হেরমান ইআকবি-ও তা-ই ধরেছিলেন। তিনি শুধু লক্ষ্য করেন : আন্বীক্ষিকী বলতে তিনটি, ও কেবল তিনটি দর্শনই বোঝাচ্ছে। তিনি অবশ্য মনে করতেন : প্রাচীন সাহিত্যের দুটি ধারার— প্রত্যাদেশ, *offenbarung*, Revelation ও পরম্পরা, Tradition— কোনোটির সঙ্গেই বৈশেষিক ও ন্যায়ের কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না; দুটিই ছিল জাগতিক জ্ঞানের বিদ্বান্‌দের, 'পণ্ডিত'দের দর্শন। তাঁরও মত ছিল : খ্রিপূ ৩০০ নাগাদ দর্শনতন্ত্র হিসেবে ন্যায় ও বৈশেষিক কোনো স্বীকৃতি পায় নি।[১৭]

যোগ = পাতঞ্জল দর্শন না বৈশেষিক দর্শন?

তাহলে আন্বীক্ষিকী-র মানে কী দাঁড়াবে : লজিক না ফিলজফি? ইউলিউস ইওল্লি একটি মাঝ-বরাবর সমাধান দিয়েছিলেন : Logical Philosophy, তর্কভিত্তিক দর্শন।[১৮] লোকায়ত বলতে তিনিও বুঝেছিলেন বস্তুবাদী (দর্শন) তন্ত্র, materialistic system। এর সপক্ষে তিনি চিত্রকূটে রাম-ভরত সংবাদ (*রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড)-এর উল্লেখ করেছেন।[১৯] সেখানে লোকায়তিক বলতে অবৈদিক বিতণ্ডাবাদীদের বোঝানো হয়েছে।

এতে কিন্তু আপত্তি করেছেন ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। তিনি মনে করেন, লোকায়ত বলতে *অর্থশাস্ত্র*-য় বেদসম্মত ন্যায়শাস্ত্রকেই ধরা হয়েছে। সেটিই তার আসল মানে। এর সঙ্গে 'যোগ' শব্দটি নিয়ে তিনি অন্য একটি অর্থ প্রস্তাব করেন। যদি লোকায়ত বলতে চার্বাকমত ছাড়া আর কোনো দর্শন না বোঝায়, তবে "অর্থশাস্ত্র যোগ শব্দের দ্বারা ন্যায় অথবা ন্যায়-বৈশেষিক উভয়ই আন্বীক্ষিকীর মধ্যে কথিত হইয়াছে। ইহাই এ পক্ষে বুঝিতে হইবে।" আর, তার বিকল্পে, "অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত বলিতে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিলে, যোগ বলিতে কেবল বৈশেষিক অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে।"[২০]

ফণিভূষণ কিছু মনগড়া কথা বলেন নি। যোগ বলতে যে বৈশেষিক বোঝানো হতো— *ন্যায়সূত্র*, ১।১।২৯-এর বাৎস্যায়ন-ভাষ্য থেকে তা বোঝা যায়। আর

কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীও দাবি করছেন : যোগ অর্থে শুধু বৈশেষিক কেন, ন্যায়শাস্ত্র-ও বোঝায়; 'যোগ' আর 'যুক্তি' সমার্থক শব্দ, একই ধাতু (√যুজ্) থেকে তৈরি।[২১]

বৌদ্ধ পরম্পরায় কী আছে

সমস্যা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল, সন্দেহ নেই। প্রথম সমস্যা ছিল লোকায়ত নিয়ে, তারপর আন্বীক্ষিকী, তারও পরে যোগ। সর্বসম্মত কোনো অর্থ করা যাচ্ছে না।

ব্রাহ্মণ্য পরম্পরা ছেড়ে বৌদ্ধ পরম্পরা থেকে কি কোনো সমাধান পাওয়া যাবে? পালি 'তিপিটক' (ত্রিপিটক)-এর বিভিন্ন জায়গায় বলা আছে : শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বেদ-বেদাঙ্গ-ইতিহাস-ব্যাকরণ ও লোকায়ত জানেন।[২২] বুদ্ধঘোস-এর অট্‌ঠকথা (=অর্থকথা, ভাষ্য)-য় ও পালি অভিধানে লোকায়ত শব্দর একটিই অর্থ আছে : বিতণ্ডসত্থং, বিতণ্ডাশাস্ত্র, অর্থাৎ তর্কাতর্কির শাস্ত্র।[২৩] জয়ন্তভট্ট তাঁর *ন্যায়মঞ্জরী*-তে লোকায়তিকদের সম্পর্কে এই অভিযোগই করেছিলেন : তারা শুধু অন্যের মত খণ্ডন করতেই উৎসাহী, নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করতে নয়।[২৪] এর সঙ্গে বৌদ্ধ পরম্পরার মিল আছে। তফাতের মধ্যে, জয়ন্তভট্ট লোকায়তিকদের 'বরাক' (=নীচ) বলে বিদ্রূপ করেন; বৌদ্ধ পরম্পরায় কিন্তু লোকায়ত-ও, ইতিহাস-ব্যাকরণের মতো, ব্রাহ্মণের শিক্ষণীয় বিষয়। বুদ্ধ সেটিকে পছন্দ করতেন না— এই যা।

লোকায়ত = Nature-lore?

অর্থশাস্ত্র ও 'তিপিটক' পর্যালোচনা করে ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই সিদ্ধান্ত করেন : লোকায়ত বলতে কৌটিল্য চার্বাকমত বোঝান নি, এটি দিয়ে কোনো সম্মানীয় দর্শনতন্ত্র বোঝানো হয়েছে। বহু সনাতনী ব্রাহ্মণ, বেদবিদ্যা-বিশারদ এর অনুসারী ছিলেন। আর, বাৎস্যায়ন যে আন্বীক্ষিকী শব্দটি ন্যায়শাস্ত্র অর্থে একচেটিয়া করে নিয়েছেন— সেটিও ঠিক হয় নি। *অর্থশাস্ত্র*-য় শব্দটি দিয়ে সাধারণভাবে দর্শনই বোঝাবে, তর্কবিদ্যা নয়।

তাহলে লোকায়ত বলতে কোন্ দর্শন বোঝাচ্ছে? ক্ষেত্রেশচন্দ্রর মতে, লোকায়ত মানে প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান, Nature-lore। এটি হয়তো বৈশেষিক-এর পূর্বসূরি। এর সঙ্গে নিরীশ্বরবাদ, দেহাত্মবাদ বা বেদপ্রামাণ্য অস্বীকারের কোনো সম্পর্ক নেই।[২৫]

লোকায়ত ও ব্রাহ্মণ্য পাঠক্রম

লোকায়ত মানে nature-lore—এ ব্যাখ্যা নতুন নয়। *অর্থশাস্ত্র* আবিষ্কারের আগেই, *দীঘনিকায়*-এর অনুবাদ-সূত্রে, টি. ডব্লিউ. রিস ডেভিড্‌স্-ও এই তর্জমাই করেছিলেন (ক্ষেত্রেশচন্দ্রও তার উল্লেখ করেছেন)।[২৬] মজার ব্যাপার হলো, রিস ডেভিড্‌স্ ছিলেন এ বিষয়ে একেবারে প্রান্তবাদী, extremist। পালি ও সংস্কৃত রচনাবলিতে লোকায়ত শব্দটির ব্যবহার থেকে তাঁর মনে হয়েছিল : লোকায়ত বলে কোনো দর্শন

ভারতে আদৌ ছিলই না। সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-য় চার্বাকদর্শনের যে বিবরণ আছে, তাতে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্তটাই তাঁর মনগড়া। খ্রিপূ ৫০০ নাগাদ লোকায়ত বলতে বোঝাত : জ্ঞানের ধাঁধা, ছড়া, বিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে পরম্পরাগত কিছু তত্ত্ব, আকাশের তারা, আবহাওয়া, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাথমিক পদার্থবিদ্যা, এমনকি শারীরবিদ্যার কিছু টুকরো কথা; দামি পাথরের ধরণধারণ, পশুপাখি-গাছপালা বিষয়ক জ্ঞান। এটি ছিল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটি শাখার নাম, প্রশংসার সুরেই এর কথা বলা হয়েছে।[২৭]

দেখবার জিনিস হলো : যেসব বিষয়ে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে তার সবই ইহজগতের বস্তু নিয়ে ; পরমার্থ-র সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এর থেকেই হয়তো লোকায়ত = বস্তু বিষয়ক জ্ঞান = বস্তুবাদ— এমন একটা ধারণা গড়ে ওঠে। কুমারিল, শঙ্করাচার্য প্রমুখ তাই বেদপ্রামাণ্য-বিরোধী বস্তুবাদ বোঝাতে লোকায়ত নামটি ব্যবহার করেছেন।[২৮]

লোকায়ত শব্দর ব্যুৎপত্তি থেকেও এই ইঙ্গিতই মেলে। যা এই লোকেই আয়ত (বিস্তৃত), বা এই লোকেই যা প্রয়াস করে (লোক + আ-√যৎ)— তা-ই লোকায়ত।[২৯] *দীঘনিকায়*-এর জার্মান তর্জমায় রুডল্‌ফ্‌ অটো ফ্রাঙ্কে তাই শব্দটির অনুবাদ করেন : যুক্তিযুক্ত প্রামাণিক প্রকৃতি-ব্যাখ্যা, logisch bewcisende Naturerklaerung।[৩০] রিস ডেভিড্‌স্‌-এর মতের সঙ্গে এটি অনেক অংশেই মেলে।

রিস ডেভিড্‌স্‌-এর মত খণ্ডন : তুচ্চি

কিন্তু রিস ডেভিড্‌স্‌-এর ব্যাখ্যায় আপত্তি করেন জোসেপ্পে তুচ্চি। তাঁর মতে, সংস্কৃতে 'লোক' শব্দটি কখনোই 'নেচর' অর্থে বসে না। নেচর-এর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'প্রধান', 'প্রকৃতি', 'স্বভাব'। বৌদ্ধ রচনায় যেখানে ব্রহ্মাণ্ড নিয়ে কথা উঠেছে, ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে সেখানে 'লোক' শব্দটির আগে 'ভজন' কথাটি যোগ করা হয়। 'ভজনলোক' বললে বুঝতে হবে : ব্রহ্মাণ্ডকে একটি ভৌত পদার্থ হিসেবে ধরা হচ্ছে। শুধু 'লোক' বলতে বোঝায় মানবজগৎ বা বিশেষ শ্রেণীর সত্তা, যেমন, 'লোকযাত্রা', 'লোকোক্তি', 'লোকবাদ', 'দেবলোক'। চীনা অনুবাদেও লোকায়তিককে বলা হয় 'শুন সে' বা 'শুন সু', যাঁরা জগৎকে বা জগতের প্রথাকে অনুসরণ করেন। সুতরাং রিস ডেভিড্‌স্‌-এর ব্যাখ্যা মানা যায় না।[৩১]

তুচ্চিও মনে করতেন, অর্থশাস্ত্র-য় লোকায়ত বলতে একটি দর্শনতন্ত্রই বোঝায়।

রিস ডেভিড্‌স্‌-এর মত খণ্ডন : দাসগুপ্ত

রিস ডেভিড্‌স্‌ ও ফ্রাঙ্কে-র ব্যাখ্যায় আপত্তি তুলেছিলেন আর-একজন বিদ্বান্‌ : সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। 'নেচর-লোর' অর্থে লোকায়ত শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রমাণ আছে— তাঁরও এমন মনে হয় নি। তাঁর মতে, লোকায়ত মানে বিতণ্ডাশাস্ত্র, the

science of disputation, sophistry and casuistry। কিন্তু শব্দটি যে সর্বদাই পারিভাষিক যুক্তিবিজ্ঞান, technical logical science অর্থে বসেছে— এমন নয়। কখনও কখনও এটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থেও বসে। যেমন,

লোকায়ত-যজ্ঞ-মন্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ (*দিব্যাবদান*)

এখানে 'লোকায়ত' মানে : মানুষের মধ্যে প্রচলিত ('লোকেষু আয়তঃ')।[৩২]

লোকায়ত-র ব্যুৎপত্তি

ব্যুৎপত্তির কথাই যখন উঠল, তখন সে-দিকটাও দেখা যাক। শব্দ মাত্র দুটো : 'লোক' আর 'আয়ত'। কিন্তু শেষেরটি 'অয়ত' হতেও বাধা নেই। পালি ব্যাকরণে সেই ধরেও ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে।

'লোক' মানে কী? *অমরকোষ*-এ এর অর্থ : ভুবন (যেমন, ভূলোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি), মানুষ, প্রজা।[৩৩]

আয়ত-র ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে :

১. আ—√যম্ + ক্ত

২. আ—√যৎ + অ (কর্মে বা ক্রিয়া অর্থে)

আর 'অয়ত' ধরে :

১. অ ('না' অর্থে)—√যৎ (=যত্ন বা চেষ্টা না করা)

২. অ (ঐ)—যতন্তি (=যা দিয়ে লোকে আর চেষ্টা করে না)[৩৪]

মহাভারত-এর টীকায় নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন : মানুষেরই মধ্যে যাঁরা সম্যক্ রূপে যত্ন করেন, চেষ্টা করেন লোককে খুশি ক"রতে, তাঁরা লোকায়তিক।[৩৫] পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী*, ৪।২।৬০ ও *গণপাঠ*, ২৩-এর সূত্র ধরে এতে আপত্তি করেছেন কাণে।[৩৬] 'লোকায়ত' শব্দটি এড়িয়ে 'লোকায়তিক'-র অর্থ করা যাবে না। পালিতে কিন্তু তা-ই করা হয়েছে।

অন্যদিকে, 'আয়ত' মানে শুধু 'বিস্তৃত' নয়, 'আয়তন' বা ভিত-ও হতে পারে। লোক-ই যে-দর্শনের ভিত— সে-অর্থেও 'লোকায়ত' শব্দটি সিদ্ধ।[৩৭]

ফণিভূষণ কিন্তু 'লোকায়ত' শব্দটি বাদ দিয়ে পুরোপুরি অন্য একটি ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মূলে শব্দটি ছিল 'লোকায়তি'। তার সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করে 'লো(লৌ)কায়তিক'। "ইহলোকেই যাহাদিগের আয়তি (উত্তরকাল), অর্থাৎ যাহাদিগের মতে উত্তরকালীন পরলোক নাই, এইরূপ অর্থে লোকায়তিক বলিতে নাস্তিক।"[৩৮] কাণে নিশ্চয়ই এতে আপত্তি করতেন। পাণিনি পরিষ্কার 'ঠক্' প্রত্যয়ের কথা বলেছেন। *গণপাঠ*-এ 'লোকায়ত' শব্দটিই আছে। তারই সঙ্গে 'জানে বা বোঝে' অর্থে ঠক্ প্রত্যয় যোগ হয়।

লো (লৌ) কা য় তি ক-এর এত ব্যুৎপত্তি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর মধ্যে

দিয়ে বরং একটি তথ্য বেরিয়ে আসে : যে-সময় থেকে ভাষ্যকাররা এ বিষয়ে লিখতে শুরু করেছেন তখন আর 'লোকায়ত' বলে কোনো দর্শনতন্ত্র বা বিদ্যা বা শাস্ত্র প্রচলিত ছিল না। লোকায়তসূত্র বা বার্হস্পত্যসূত্র ও তার টীকাভাষ্যও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে, যে যার বিদ্যাবুদ্ধি মতো শব্দটির অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। অথচ একদা (অন্তত খ্রিপূ তিন শতকেও) যে লোকায়ত-মতের বই ছিল— একথা বোঝা যায়।

লোকায়ত আর বৃহস্পতি-মত

ব্রাহ্মণ্য দর্শন-পরম্পরায় লোকায়ত সম্পর্কে দুটি ধারণা চালু আছে :

১. এই মতে তর্ক বা হেতু-র ওপর জোর পড়ত, বিশ্বাসের ওপর নয়। তাই 'হৈতুক', 'হেতুবাদী', 'বৈতণ্ডিক' ইত্যাদি তার প্রতিশব্দ হয়ে ওঠে।

২. ইহলোক ছাড়া আর কিছু (স্বর্গ, নরক) এ-মতে স্বীকার করা হয় না। বেদকেও প্রমাণ বলে মানা হয় না।

পালি রচনায় কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই। লোকায়ত মানে বিতণ্ডাশাস্ত্র ঠিকই, কিন্তু তা বেদবিরোধী নয়। আগেই বলা হয়েছে, বেদ-ইতিহাস-পুরাণ-ব্যাকরণের সঙ্গে তা ব্রাহ্মণ্য শিক্ষারই অঙ্গ। অথচ, ব্রাহ্মণ্য পরম্পরায় লোকায়ত-র সঙ্গে বস্তুবাদ তথা বেদবিরোধিতার ধারণা এমনভাবে মিশে আছে যে *অর্থশাস্ত্র* প্রসঙ্গে তার অন্য অর্থ করার কথা বিশেষ কেউই ভাবেন নি। লোকায়ত মানে তো অবিশ্বাসী দর্শন, infidel philosophy।[৩৯] ইআকবি বলেছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে-কৌটিল্য বেদ-ভিত্তিক গোটা সমাজবিন্যাসকে স্বীকার করেন, তিনি লোকায়ত বলতে এই চূড়ান্ত বস্তুবাদী দর্শনতন্ত্রকে বোঝাবেন। তবু, ইআকবি-র মনে হয়েছিল, এতে সন্দেহর কিছু নেই, কারণ লোকায়ত-মত তো দেবগুরু বৃহস্পতি-র নামে চলে। অর্থশাস্ত্র-কার বৃহস্পতি, বস্তুবাদী দর্শন-কার বৃহস্পতি আর স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র)-কার বৃহস্পতি-কে তিনি তাই একই লোক বলে ধরে নেন। *ব্রহ্মসূত্র*, ২।১।১-৩ ও তার শঙ্করভাষ্য-র ভিত্তিতে তিনি বলেন, শুধু লোকায়ত নয়, সাংখ্য ও যোগকেও 'স্মৃতি' বলে ধরা হয়।[৪০]

স্টেন কোনৌ-ও ধরে নিয়েছেন, লোকায়ত আর বার্হস্পত্য একই ব্যাপার। "বার্হস্পত্যরা ছিলেন ধর্মদ্রোহী, heretics, শ্রুতিতে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। লোকায়ত হলো ইহলোকের (দর্শন) তন্ত্র, ব্যাবহারিক দর্শন, যেটি বিদ্যার প্রতিটি শাখারই সহায়ক।"[৪১]

বাণভট্ট কী বলেন

দার্শনিক আলোচনার বাইরে, অন্য কোনো সূত্র থেকে কি সাহায্য পাওয়া যায়? সে গুড়ে বালি। খ্রি ছ শতকের শেষে বা সাত শতকের গোড়ায় বাণভট্ট তাঁর *কাদম্বরী*-তে

লিখেছেন : ধর্মে যার রুচি নেই এমন লোকের কাছে লোকায়তবিদ্যা আর মাতালের কাছে মদ একই রকম।[৪২] এতে লোকায়ত-র ধর্মবিরোধী রূপটা ধরা পড়ে। কিন্তু তাঁরই *হর্ষচরিত*-এ দেখা যায়, তপোবনে বসে আছেন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন, বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্মত্যাগী উপাসক, ভাগবত সম্প্রদায়ের লোক (বৈষ্ণব), আর সেই সঙ্গে কপিল, লোকায়ত, কণাদ, উপনিষদ্‌, ঈশ্বরকারণে বিশ্বাসী (ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা এই মতে বিশ্বাসী) ইত্যাদি বহু মতের লোক।[৪৩] এই তপোবনের ছবি অনেকটাই *মহাভারত*, আদিপর্বে, কণ্ব মুনির তপোবনের মতো। বাস্তবে কোথাও এমন ছিল বলে মনে হয় না। এর থেকে এইটুকু বোঝা যায় : সাংখ্য, বৈশেষিক, বেদান্ত-র মতো লোকায়তকেও একটি দর্শনতন্ত্র বলে ধরা হচ্ছে। বাণভট্ট-র টীকাকার ও অনুবাদকরা অবশ্য অভ্যেস মতো 'লোকায়তিক' বলতে চার্বাক, নিরীশ্বরবাদী, বস্তুবাদী— এমনই ধরেছেন।[৪৪]

চার্বাকমত ও লোকায়ত

কিন্তু খ্রি সাত শতকে কি আদৌ লোকায়ত দর্শনের চর্চা ছিল? আট শতকে, শান্তরক্ষিত, কমলশীল, হরিভদ্র ও শঙ্করাচার্য-র লেখা থেকে লোকায়ত দর্শনের বস্তুবাদী চরিত্রর কথা বোঝা যায়।[৪৫] *বি-পু, প-পু* এবং *বি-ধ-ম-পু* (উপপুরাণ)-এও সে-মতের পরিচয় 'লোকায়ত' বলে[৪৬] ('চার্বাক' নামটি, যতদূর জানা যায়, কমলশীল ও হরিভদ্র-ই প্রথম ব্যবহার করেছেন, পুরাণে বা শঙ্করাচার্য-র লেখায় শুধু 'লোকায়ত' ও/বা 'বার্হস্পত্য মত'-এর কথা আছে)। সে-দর্শন বেদ-আত্মা-পরলোক-ঈশ্বরে অবিশ্বাসী—এইটুকু নিশ্চিত। জৈন ও বৌদ্ধরাও নানা কারণে এই দর্শনের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সে সবই খ্রি আট শতকের পরের কথা। খ্রিপূ চার শতকেও লোকায়ত বলতে কি এ-ই বোঝাত?

সায়ণ-মাধব তাঁর *স-দ-স*-য় চার্বাকদর্শনের বিবরণ দিয়েছেন। তাতে চার্বাক ছাড়া আর কোনো দার্শনিকের নাম নেই, কোনো বই-এর নাম নেই, 'বৃহস্পতি বলেছেন'— এই বলে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ও আক্রমণমূলক কিছু শ্লোক আছে। রিস ডেভিড্‌স্‌ ঠাট্টা করে বলেছেন, কিছু ছড়ার ভিত্তিতে এই দর্শনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে; প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণরা যে-লোকায়ত-র চর্চা করতেন, ঐ ছড়াগুলো বোধহয় তার অঙ্গ ছিল না।[৪৭]

কথাটা ভুল নয়। সায়ণ-মাধব-এর পরে সদানন্দ যতি চার রকম লোকায়ত-মতের কথা বলেছেন, কিন্তু সবেরই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন উপনিষদ্‌ থেকে।[৪৮] অর্থাৎ, লোকায়ত-র সূত্র ও ভাষ্য বলতে কোনো বই তাঁর হাতে ছিল না। ততদিনে নাস্তিক = চার্বাক = লোকায়ত = বার্হস্পত্য = পাষণ্ড — এইরকম ধারণাই চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সঙ্গে *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-র লোকায়ত কি মিলবে?

বরং উল্‌টো কথা বলা যায়। পরবর্তী বিবরণ ধরে 'লোকায়ত'-র আদি অর্থ

করতে গিয়ে শুধু বিভ্রান্তিই বেড়েছে। লোকায়ত দর্শন বলে আদৌ কিছু ছিল কিনা প্রশ্ন উঠেছে এই নিয়েও। ফলে, কৌটিল্য-র সময়ে আন্বীক্ষিকী বলতে কী বোঝাত — সে-ব্যাপারে মতান্তর এত ব্যাপক যে কোনো সর্বগ্রাহ্য সমাধান প্রায় অসম্ভব।

দুটি স্বীকার্য

এতজনের এত মতের কথা বললে নিজের মতটাও— তা যত তুচ্ছই হোক— দিতে হয়। এবার সেই চেষ্টাই করা যাক।

দুটি কথাকে আমরা স্বীকার্য, postulate বলে ধরে নিচ্ছি :

১. শব্দর অর্থ বদলায়, সব যুগে সব শব্দ একই অর্থে বসে না। কালানুক্রমে সাজালেই এই অর্থান্তর ধরা পড়বে।[৪৯]

২. ভারতে একই নামে একাধিক দর্শনতন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।[৫০]

এতকাল *অর্থশাস্ত্র*-র ঐ বাক্যটি নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে তার প্রধান দুর্বলতা হলো : কয়েক শতক পরে 'লোকায়ত', 'যোগ' ও 'আন্বীক্ষিকী' বলতে যা বোঝাত তা-ই দিয়েই শব্দ তিনটির আদি অর্থ বোঝার চেষ্টা।

আন্বীক্ষিকী = যুক্তিমূলক দর্শন

প্রথমে 'আন্বীক্ষিকী' শব্দটি নেওয়া যাক। খ্রি দু শতক, অর্থাৎ *মনুসংহিতা*-র সময় থেকে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে হয়তো তর্কশাস্ত্র বা হেতুবিদ্যা বোঝাত। মনুর প্রায় সব টীকাকার (সকলে নন) তা-ই লিখেছেন।[৫১] খ্রি পাঁচ শতকে *ন্যায়সূত্র*-র ভাষ্যে তা-ই ধরেছেন বাৎস্যায়ন।[৫২] *কামন্দকীয় নীতিসার*-এও আন্বীক্ষিকী অর্থে আত্মবিজ্ঞান; টীকাকার তার অর্থ করেছেন : ন্যায়বৈশেষিক ইত্যাদি অনুমানবিদ্যা।[৫৩]

কিন্তু কৌটিল্য-র বাক্যটিতে সাংখ্য আর যোগ-এর পাশাপাশি লোকায়ত-র উল্লেখ থেকে বলা যায় : এখানে আন্বীক্ষিকী মানে শুধু তর্কবিদ্যা নয়, দর্শনই— তবে যুক্তিমূলক দর্শন। তখনও তর্কবিদ্যা আর দর্শন— এই দুটি ধারণাকে আলাদা করে দেখা হতো না। পরবর্তী কালে *ন্যায়সূত্র*-র ক্ষেত্রেও দুটি ধারণা মিশে আছে। কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী অনুমান করেছিলেন, *অর্থশাস্ত্র*, ১।২।১০-এ আন্বীক্ষিকী মানে দর্শন, কিন্তু ঐ অংশর শেষের শ্লোকটিতে তার মানে তর্কবিদ্যা।[৫৪] এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

সাংখ্য = নিরীশ্বর সাংখ্য

এবার, সাংখ্য। সাংখ্য-র অনেক রূপের কথা জানা যায়। *মহাভারত*-এ যে সাংখ্য-র কথা আছে (সাহেবরা যার নাম দিয়েছেন 'এপিক সাংখ্য'), *চরক-সংহিতা* (খ্রি এক শতক)-র বিবরণের সঙ্গে তা মেলে না। তবে সাংখ্য যে বিচারবিতর্কমূলক দর্শন ছিল তা *চরক* থেকে বোঝা যায়। এর পরে সাংখ্য-র পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ঈশ্বরকৃষ্ণ-র *সাংখ্যকারিকা* (খ্রি তিন শতক) থেকে।[৫৫]

কৌটিল্য তাহলে সাংখ্য বলতে চরক-ঐতিহ্যের সাংখ্যকে বুঝিয়ে থাকতে পারেন। তা নিরীশ্বরবাদী ছিল। *সা-প্র-সূ* (খ্রি চোদ্দো শতকের পরে সঙ্কলিত)-তেও তারই রেশ রয়ে গেছে। মনে রাখা ভালো, খ্রি আট শতকেও শঙ্করাচার্য-র কাছে সাংখ্য-ই ছিল প্রধান বিপক্ষ, কারণ *ব্রহ্মসূত্র*-র সাংখ্য খণ্ডনের চেষ্টাই সবচেয়ে বেশি।[৫৬] সে-সাংখ্যর সঙ্গে কৌটিল্য-র জানা সাংখ্য-র মিল থাকা সম্ভব।

নিরীশ্বর সাংখ্যকে কৌটিল্য স্বীকার করে নিয়েছেন— এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ঈশ্বরে বিশ্বাস-অবিশ্বাস খুব একটা বড় ব্যাপার ছিল না। আসল প্রশ্ন ছিল : বেদ-এর প্রামাণ্য মানে, না মানে না।

যোগ = বৈশেষিক দর্শন

এর পরের শব্দ : যোগ। *অর্থশাস্ত্র*-র *জয়মঙ্গলা*-টীকায় এর অর্থ করা হয়েছে : চিত্তবৃত্তিনিরোধ ; তার ছ'টি অঙ্গ— প্রত্যাহার, ধ্যান, প্রাণায়াম, ধারণা, তর্ক ও সমাধি। অর্থাৎ পতঞ্জলির যোগদর্শন।[৫৭]

যোগসাধনার ঐতিহ্যটি প্রাগ্-আর্য ও বহু প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতার সময়েও হয়তো তার চল ছিল। খ্রিপূ চার শতকে তার কথা ওঠা বিচিত্র নয়। কিন্তু সাংখ্য-র সঙ্গে মিলে পরবর্তীকালে যা সাংখ্য-যোগ বলে পরিচিত, সেটি নিশ্চয়ই কৌটিল্য-র সময়ে তৈরি হয় নি (তাহলে তিনি সাংখ্য আর যোগকে আলাদা করে উল্লেখ করতেন না)। তা ছাড়া, যোগ-এর জ্ঞানতত্ত্ব পুরোপুরি সাংখ্য থেকেই নেওয়া। সুতরাং *অর্থশাস্ত্র*-য় যোগ বলতে যে পাতঞ্জল যোগ বোঝাচ্ছে না— এটুকু নিশ্চয়ই বলা যায়।

তাহলে 'যোগ' বলতে কী বোঝাতে পারে? ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ও কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী *ন্যায়সূত্র*, ১।১।২৯-এর বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ও অন্য কয়েকটি রচনার উল্লেখ করেছেন যেখানে যোগ বলতে অবশ্যই বৈশেষিক বোঝায়।[৫৮] ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও এইচ. এন. র‍্যান্‌ড্‌ল্‌ এই অর্থটি লক্ষ করেছেন।[৫৯] কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী দেখিয়েছেন, বৈশেষিক এবং ন্যায় আলাদাভাবে বিকশিত হয়েছিল।— প্রথমটি আরোহী, Inductive, দ্বিতীয়টি অবরোহী, Deductive পদ্ধতিতে।[৬০] খ্রিপূ চতুর্থ শতকে দুটি মিলে ন্যায়-বৈশেষিক— এই মিলিত রূপ পায় নি।

তাই *অর্থশাস্ত্র*-য় যোগ অর্থে বৈশেষিক ধরলে বোধহয় ভুল হবে না।

লোকায়ত = বিতণ্ডাশাস্ত্র

সবশেষে লোকায়ত। এইখানেই প্যাঁচ সবচেয়ে বেশি। অন্তত খ্রি সাত শতক থেকে যে লোকায়ত বলতে বেদবিরোধী ও পরলোক অবিশ্বাসী (এই দু অর্থেই 'নাস্তিক') মত বোঝাত— এতে কোনো সন্দেহ নেই। পুরাণেও 'লোকায়তিক' শব্দটি এই ধরণের অর্থেই পাওয়া যাচ্ছে। বৃহস্পতি যে অসুরদের ছলনা করার জন্যে একটি

অবৈদিক শাস্ত্র তৈরি করেছিলেন— *বিষ্ণুপুরাণ*-এ সে-কথা আছে।[৬১] তার মানে, খ্রি পাঁচ শতকের আগেই লোকায়ত = বার্হস্পত্য— এমন একটা সমীকরণ চালু হয়ে গিয়েছিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, কাব্য-দর্শন ছাড়াও এ বিষয়ে একটি পাথুরে প্রমাণ আছে। খ্রি সাত শতকের রণোদ (গোয়ালিয়র-এর অন্তর্গত) শিলালেখ-এ ব্যোমশিব আচার্য নামে এক বৈশেষিক দর্শনবিদের প্রশস্তিতে লেখা হয়েছে : শিব সিদ্ধান্তে তিনি সাক্ষাৎ শিব, ন্যায়-এ অক্ষপাদ মূল (=গৌতম), বৈশেষিক-এ কণাদ, মীমাংসা-য় জৈমিনি, সাংখ্য-য় কপিল, লোকায়ত-য় সদ্‌গুরু (=বৃহস্পতি), বুদ্ধমতে বুদ্ধ, জৈনমতে জিন (=মহাবীর)।[৬২] অর্থাৎ, মূলত ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের পণ্ডিত হলেও ব্যোমশিব এই সবকটি দর্শনেই সমান জ্ঞানী ছিলেন।

কিন্তু তার হাজার বছর আগেও কি লোকায়ত বলতে বার্হস্পত্যমত বোঝাত? বরং পালি ঐতিহ্যে শব্দটি যে-অর্থে পাওয়া যায়— বিতণ্ডাশাস্ত্র— সেই অর্থটিই এর আদি অর্থ হতে পারে। সেটি কৌটিল্যর সময়ের আরও কাছের।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যেও লোকায়ত শব্দটি আছে। *সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র*-র এক জায়গায় বলা হয়েছে : "অন্য সূত্র ও অন্যতর লোকায়তশাস্ত্রর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ বালকরাও (=অবোধরাও) এটি দেখতে পায়"।[৬৩] এখানে লোকায়ত বলতে স্পষ্টতই বিতণ্ডাশাস্ত্র বা অনুমান-ভিত্তিক বিচার বোঝাচ্ছে।

ঐ বইটির অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : বোধিসত্ত্ব (কখনও) লোকায়ত-মন্ত্রধারক ও লোকায়তিকদের সেবা করেন না।[৬৪] আরও এক জায়গায় আছে কাদের সঙ্গে ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধর সম্পর্ক থাকা উচিত নয় : লোকায়ত, কাব্যানুরাগী, নর্তক, কুস্তিগীর, শুঁড়ি, মাংস-ব্যবসায়ী, স্ত্রীর পয়সায় যে বাঁচে, ইত্যাদি।[৬৫] হেন্‌ড্রিক কের্ন ও তাঁর অনুসরণে পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য দু ক্ষেত্রেই অর্থ করেছেন : জনবল্লভ দর্শন, popular philosophy। কিন্তু প্রসঙ্গসূত্রে বিতণ্ডাশাস্ত্র ধরলে তিনটি ক্ষেত্রেই সঙ্গত অর্থ হয়।

পাণিনি ও তাঁর ব্যাখ্যাকারদের পরম্পরা

লোকায়ত-র ক্ষেত্রে আমরা পাণিনি-র ভাষ্য-পরম্পরারও সাহায্য নিতে পারি। *অষ্টাধ্যায়ী*, ৭।৩।৪৫ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য*-য় দুটি বাক্য পাওয়া যায় : লোকায়ত-র বর্ণিকা (হলো) ভাগুরী, লোকায়ত-র বর্তিকা (হলো) ভাগুরী।[৬৬] বর্ণিকা ও বর্তিকা— দুটি শব্দরই অর্থ : ব্যাখ্যাগ্রন্থ।[৬৭] অর্থাৎ পতঞ্জলি-র সময়েই (খ্রিপূ ১৫০) লোকায়ত বলে একটি শাস্ত্রগ্রন্থ ও তার ভাষ্য ছিল।

তেমনি *অষ্টাধ্যায়ী*, ১।৩।৩৬-এ বলা হয়েছে : সম্মানন (সম্মান করা), উৎসঞ্জন (তুলে ধরা), আচার্যকরণ (কাউকে গুরু করা), জ্ঞান, ভৃতি (বেতনের বিনিময়ে

কাউকে ভাড়া করা), বিপণন (ধার শোধ করা) ও ব্যয় (দান করা)— এই সব অর্থে 'নী' ধাতু আত্মনেপদ হয় ('নী' মানে কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া)। 'সম্মানন' অর্থে বৌদ্ধ বৈয়াকরণ বামন-জয়াদিত্য ধরেছেন : পূজন (পূজা করা)। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি বাক্যও তাঁদের টীকায় দেওয়া হয়েছে : নয়তে চার্বী লোকায়তে। লোকায়ত শাস্ত্রর সিদ্ধান্তগুলি স্থির করে চার্বী তাঁর শিষ্যদের শেখান, সেগুলি যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে শিষ্যদের জানান, আর সেই মতগুলি সম্মানিত, পূজিত হয়। চার্বী মানে বুদ্ধি, তারই সম্বন্ধসূত্রে আচার্যকে চার্বী বলা হয়েছে।[৬৮] বামন-জয়াদিত্য-র টীকাকাররাও বলেছেন : আচার্যও চার্বী।[৬৯]

অর্থাৎ, সব মিলিয়ে মানে দাঁড়াল : বুদ্ধিমান আচার্য লোকায়ত-র সত্য প্রমাণ করেন।

এখানেও লোকায়ত শব্দটি পালি ঐতিহ্য মতোই কোনো নিন্দনীয় অর্থে বসে নি, তা স্পষ্ট। লক্ষ্য করার বিষয় হলো : বুদ্ধির সঙ্গে লোকায়ত-র একটা যোগ ধরে নেওয়া হয়েছে। বোধহয় এই অর্থেই স্টেন কোনৌ মনে করতেন : 'ন্যায় ও বৈশেষিক পুরনো লোকায়ত-রই পরবর্তী পরিণতি।'[৭০] অন্যদিকে, এও দেখার : বিতণ্ডা-কে *ন্যায়সূত্র*-য় মেনে নেওয়া হয়েছে।[৭১] ধর্মশাস্ত্রকাররা বরং যাবতীয় হেতুবাদীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত।[৭২] ফণিভূষণ তর্কবাগীশ তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন : হেতুশাস্ত্র দুরকমেই হতে পারে— বেদসম্মত ও বেদবিরোধী। মনু কেবল দ্বিতীয়টিরই নিন্দে করেছেন; বেদসম্মত তর্কে তাঁর আপত্তি ছিল না।[৭৩]

এই বক্তব্য মানতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু এর থেকে একটা সিদ্ধান্ত করতে হয় : লোকায়ত বলতে একদা তর্কশাস্ত্রও বোঝাত। পালি সূত্রে সর্বত্রই এই অর্থেই বিতণ্ডাশাস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সময়ের দিক থেকে *তিপিটক*-ই *অর্থশাস্ত্র*-র সবচেয়ে কাছাকাছি। তাই মলয়লম টীকায় যে-অর্থ দেওয়া হয়েছে— ব্রহ্মা-গার্গ্যর ন্যায়শাস্ত্র— সেটিই এক্ষেত্রে তার সঠিক অর্থ। গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-র আগে এই ধরণের কোনো আদি-তর্কশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। চার্বাকদর্শন বলে পরে যা পরিচিত হয়েছে তার সঙ্গে সরাসরি এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। পাণিনি-পরম্পরায় লোকায়ত অর্থে এই তর্কশাস্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে, দেহাত্মবাদকে নয়।

তাহলে কৌটিল্য-র বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল : আদি (নিরীশ্বর, হয়তো বা অবৈদিক) সাংখ্য, আদি বৈশেষিক ও আদি তর্কশাস্ত্র— এই তিনটি হলো যুক্তিমূলক দর্শন (আন্বীক্ষিকী)।[৭৪]

---

১. *অর্থশাস্ত্র*-র সব উল্লেখই কঙ্গলে সম্পা. সং. থেকে।

২. ১।৩-৬।

৩. সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।

৪. *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,* ৫।৪ : "অজ্ঞরাই সাংখ্য আর যোগকে আলাদা বলেন, পণ্ডিতরা নয়। একটির মধ্যে ভালোভাবে থাকলে দু-এরই ফল পাওয়া যায়।" অবশ্য *গীতা*-য় সাংখ্য বলতে কোনো বিশেষ দর্শনতন্ত্র বোঝানো হয়েছে না যাবতীয় জ্ঞানমার্গকেই ঐ নামে ধরা আছে— এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না।

৫. "রাজা আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি শিখবেন"। *কামন্দকীয় নীতিসার,* ৩৫, ২। ৭-এ আন্বীক্ষিকী-কে আত্মবিজ্ঞান-ও বলা হয়েছে (টী. ৫৩ দ্র.)। পরবর্তীকালে যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে, মহাকাব্যে, এমনকি *কামশাস্ত্র*-য় (১।১।৯, ১।৩।১) 'বিদ্যা'-র কথা থাকে, আর সেটি দিয়ে সাধারণত এই চারটি বিষয়ই বোঝানো হয়। ফণিভূষণ, *ন্যা-দ-বা-ভা,* ১ : চার-পাঁচ দ্র.।

৬. শামশাস্ত্রী সম্পা., ৬।

৭. জি. হরিদাস শাস্ত্রী সম্পা., ১০।

৮. মুনি জিনবিজয় সম্পা., ৫।

৯. কঙ্গলে, ভাগ ২, ৬ টী. ১০; লিময়ে, থিটে সম্পা., *চা-স,* ২৪।

১০. কঙ্গলে, ২ : ৬ টী. ১০-এ এটির উল্লেখ করেছেন।

১১. ত. গণপতি শাস্ত্রী সম্পা., ১ : ২৭।

১২. *ন্যা-দ-বা-ভা,* ১ : চৌদ্দ। অনেকেই বোধহয় জানেন না নৈয়ায়িক হিসেবে ফণিভূষণ কত বড় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ন্যায়ভাষ্য-র বাঙলা যখন বেরচ্ছে তখনই এইচ. এন. র‍্যান্‌ড্‌ল্‌ লিখেছিলেন : "Those who can read Bengali regard this as likely to be authoritative on the older Nyāya", ৩৪১।

১৩. কাণে, ৩ : ৪৭-৪৮।

১৪. কঙ্গলে, ৩ : ৯৯-১০০, ১৩০।

১৫. তখনও *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* ছেপে বেরয় নি। উৎস হিসেবে *অমরকোষ, অভিধানচিন্তামণি, মনুসংহিতা* ও মধুসূদন সরস্বতীর *প্রস্থানভেদ*-এর উল্লেখ আছে।

১৬. অবশ্য মনে রাখা ভালো, *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, ২০৩।২০ (প্রামাণিক সংস্করণ ; প্রচলিত সংস্করণে ২১০।২২)-তে আছে, ঋষিরা অনেক ন্যায়তন্ত্র-র কথা বলেছেন, 'ন্যায়তন্ত্রাণ্যনেকানি তৈস্তৈরুক্তানি বাদিভিঃ'। টীকাকার নীলকণ্ঠ এখানে 'ন্যায়তন্ত্র' বলতে তার্কিক, বৈশেষিক, কপিল (সাংখ্য) ও পাতঞ্জল (যোগ) ইত্যাদি আস্তিক (= বেদ-অনুসারী) দর্শন ধরেছেন। তার্কিক বলতে গৌতম-এর *ন্যায়সূত্র* ছাড়া আর কিছু বোঝাচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।—এ ছাড়া টী. ৫০ দ্র.।

১৭. ইআকবি (১৯১১), ৭৩২-৪৩; (১৯৭০), ২ : ৫৪৭-৫৫৮। ইং. সং. (১৯১৮), ১০১-০৯। প্রাসঙ্গিক অংশের জন্যে যথাক্রমে ৭৩৪ (৫৪৯), ৭৩২ (৫৪৭), ৭৩৬ (৫৫১) ও ১০১, ১০২, ১০৪ দ্র.।

১৮. ইওল্লি ও শ্মিট, ২ : ৩। এর ভূমিকায় অবশ্য লেখা হয়েছে : "Accordingly Ānvīkṣikī philosophy which is so highly extolled in the A [rthaśāstra] (1, 2) includes the materialistic system of Lokāyata...." (১ : ৪)।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে আন্বীক্ষিকী শব্দটি 'the science of logic' অর্থে নিয়েছিলেন ((১৯৫৯), ২৫); পরে ইআকবি-র অনুসরণে তিনি এটি Philosophy অর্থে নেন, যদিও সেই সঙ্গে বলে রাখেন, "Jacobi's rendering of *Anviksiki* as philosophy is thus to be taken with this reservation that Kautilya himself does not allow within his concept of philosophy any place for the alleged mystical, intuitive or scriptural approach to reality. For him philosophy is essentially rational and the only data accepted by it for rational analysis are data furnished by direct experience."((১৯৭৬), ২৪১)। এ বিষয়ে তাঁর সর্বশেষ কাজ (১৯৮৯)-এ তিনি 'আন্বীক্ষিকী'-র কঙ্গলে-কৃত অনুবাদ— 'Philosophy'-র বদলে 'logic-based Philosophy'— করার পক্ষপাতী (৫৭)। *অর্থশাস্ত্র*, ১।২।১২-র ক্ষেত্রে কিন্তু 'আন্বীক্ষিকী'-র জায়গায় শুধু logic-ই রাখা আছে (৫৮)।

১৯. ইওল্লি, ২ : ৩। *রামায়ণ*, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০।২৮ (প্রচলিত সংস্করণ, বরোদা প্রামাণিক সংস্করণে ৯৪।৩২) : ভরতকে রাম বলেছেন, "লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের তুমি সেবা কর না তো? এই মূঢ় পণ্ডিতম্মন্যরা অনর্থ ঘটানোয় কুশল। অন্যান্য মুখ্য ধর্মশাস্ত্র থাকতেও আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি পেয়ে তারা নিরর্থক কথা বলে।" আন্বীক্ষিকী শব্দটি এখানে বুদ্ধি-র বিশেষণ, কোনো শাস্ত্রর নাম নয়— এও লক্ষণীয়। বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৯ দ্র.।

২০. *ন্যা-দ-বা-ভা*, ১ : সতের।

২১. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী (১৯৩২/১৯৫১), [ষোলো] : "Those who are sufficiently familiar with the use of the word *yoga* in its old sense of *vaiśeṣika* as it is found used for instance in Vātsyāyana's Bhāsya on [*NS*] 1.1.29, are not likely to consider it a strained interpretation to take the word *Yoga,* used in Kautalīya, in the sense of *Vaiśeṣika.* In fact according to Vācaspatimiśra's *Tātparyaṭīkā* and *Bhāṣyacandra* on the *bhāṣya* on 1.1.29, the word *Yoga* may be taken in the somewhat comprehensive sense of Nyāya, including the Vaiśeṣika, the Nyāya being a philosophical school laying special stress upon *Yoga* or *Yukti* or reasoning *(yoga yukti pradhānatayā vidyate yeṣām. Bhāṣyacandra).*"

ন্যায়/ন্যায়-বৈশেষিক অর্থে 'যোগ' শব্দটি ব্যবহারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ফণিভূষণ (*ন্যা-দ-বা-ভা*, ১ : ষোল, ২৭৮-৮০)।

২২. পালি সূত্রে লোকায়ত/লোকায়তিক শব্দটি এই কটি জায়গায় পাওয়া যায় : *সুত্তপিটক; দীর্ঘনিকায়*—"ব্রহ্মজাল-সুত্ত", "সামঞ্ঞফল-সুত্ত", "কূটদন্ত-সুত্ত"; *সংযুক্তনিকায়*—"লোকায়ত-সুত্ত"; *অঙ্গুত্তরনিকায়*—"জানুস্সোণি-সুত্ত"; *বিনয় পিটক*—"চুল্লবগ্গ" (৫।১৭), "পাচিত্তিয়" (৫।১৮); *মিলিন্দপঞ্হো*।

এগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন টি. ডবলিউ. রিস ডেভিড্স্ (১৮৯৯), ১ : ১৬৬-৭২; *C/L*, ৩৬৯-৭৬-এ পুনর্মুদ্রিত ; দাসগুপ্ত, ৩ : ৫১২-১৭ ; ক্ষেত্রেশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৫), ১৩৭-৫৫। পিৎসাগাল্লি (১৯০৭) ও তুচ্চি (১৯২৪)-ও এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু বইদুটি দেখার সুযোগ হয় নি। তুচ্চি-র অন্য একটি প্রবন্ধর জন্যে *C/L*, ৩৮৪-৯৩ দ্র.।

২৩. পালি-ইংরিজি অভিধান (১৯২১-২৫), ১৯৭৫-এ লোকায়ত-র দুটি মানে দেওয়া হয়েছে : What pertains to the ordinary view (of the world), common or popular philosophy, or as Rhys Davids (*Dial.* i. 171) puts it : 'name of a branch of Brahmin learning, probably *nature-lore*'; later worked into a quasi system of "casuistry, sophistry", 'লোকায়তিক (ব্রাহ্মণ)' অর্থে 'one who holds the view of lokāyata or popular philosophy', কিন্তু *জাতক*-এর অট্‌ঠকথা অনুসারে 'more like "sophistry" or casuistry.' 'লোকক্‌খায়িকা' (-কথা) ও 'লোকায়ত'-কে ঐ অভিধানে popular philosophy অর্থে 'much the same' মনে করা হয়েছে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো : পালি সূত্রে কোথাও লোকায়ত-কে বস্তুবাদ-এর সমার্থক করা হয় নি। *দীঘনিকায়*-এর "ব্রহ্মজাল-সুত্ত"-র এক জায়গায় 'লোকায়ত' শব্দটির তর্জমায় রিস ডেভিড্‌স্ লিখেছেন sophistry, আর টীকায় যোগ করেছেন : Lokāyatam. Usually rendered 'materialism'. But it is quite clear that this meaning is impossible in this connection. See Milinda 174 (১৮৯৯), ২২, টীকা ৪।

পালি টেক্‌সট্ সোসাইটির-র অনুবাদকরা কোনোদিনই একমত হয়ে 'লোকায়ত'/ 'লোকায়তিক'-এর তর্জমা করতে পারেন নি। *The Book of the Gradual Sayings*; খণ্ড ৪ (১৯৩৫), ২৮৭-তে লোকায়তিককে বলা হয়েছে skilled in Metaphysics, আর *The Book of Kindred Sayings*, খণ্ড ২ (১৯১৭), ৫৩য় 'লোকায়তিক ব্রাহ্মণ' অর্থে 'a world-wise Brahmin'। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন : "এ জাতীয় তর্জমা থেকে লোকায়তিক শব্দর প্রকৃত অর্থ সংক্রান্ত অনুবাদকারীদের অনিশ্চয়তাই প্রতিপন্ন হয়।" *লো-দ* (১৯৬৯), ৯৯, টী. ১৬২।

২৪. নহি লোকায়তে কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ উপদিশ্যতে।
বৈতণ্ডিক-কথৈবাসৌ ন পুনঃ কশ্চিদাগমঃ।

ন্যা-ম, ১ : ৩৮৮ (চৌখাম্বা সং. (১৯৩৬), ২৪৭)।

২৫. ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯-৪০, ১৫২-৫৩, (১৫২-য় nature-lore-এর জায়গায় ছাপার ভুলে mature-lore হয়ে আছে)।

২৬. রিস ডেভিড্‌স্ (১৮৯৯), ১৭১ (*C/L*, ৩৭৪); ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৯৭৫), ১৫২ টী. ৩৮।

২৭. রিস ডেভিড্‌স্ (১৮৯৯), ১৭১ (*C/L*, ৩৭৪)। মনে রাখা ভালো, রিস ডেভিড্‌স্ এ কথা বলেছিলেন *অর্থশাস্ত্র* আবিষ্কারের দশ বছর আগে— পালি সূত্র, বৌদ্ধ সংস্কৃত সূত্র ও ব্যোটলিঙ্ক-রোট-এর অভিধানে ধৃত কিছু উদ্ধৃতির ভিত্তিতে। পরে এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক তুলেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (*লো-দ*(১৯৬৯), ৬৯-৮৫)। লোকায়ত

বলে আদৌ কোনো দর্শন ভারতে কোনোদিন ছিলই না— *অর্থশাস্ত্র* আবিষ্কারের পরে এ কথা বলার আর কোনো মানে হয় না।

২৮. কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্ত্তিক,* ১।১০ : "প্রায়েই মীমাংসাকে লোকে (জগতে) লোকায়তীকৃতা করা হয়। তাকে আস্তিক পথে আনার জন্যে আমি চেষ্টা করছি" (১: ৪)। রেভা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জন মিউঅর থেকে পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে পর্যন্ত অনেকেই 'লোকায়তীকৃতা'-র অর্থ করেছেন 'নিরীশ্বরবাদী রূপ দেওয়া' (সূত্র ১৩, খণ্ড ৫ : ভাগ ২ (১৯৭৭), ১২০৬)। কিন্তু দেবীপ্রসাদ (*লো-দ* (১৯৬৯), ১১৪-২৩) ও ক্ষেত্রেশচন্দ্র (১৫২-৫৩ টী. ৪০) দেখিয়েছেন, প্রভাকর, কুমারিল ইত্যাদি সব মীমাংসকই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন; এখানে 'লোকায়তীকৃতা' মানে বেদ প্রামাণ্য অস্বীকার করা। এ ছাড়া শঙ্করাচার্য, *শা-ভা,* ১।১।২, ২।২।২, ৩।৩।৫৩ দ্র.।

২৯. লোকেষু আয়তম্— এই ব্যাসবাক্য করলে পদটি বিশেষণ হবে। বিশেষ্য হিসেবেও 'লোকায়ত' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। কাওয়েল বলেছিলেন, "Lokāyata may be etymologically analysed as 'prevalent in the world' (*loka and āyata*)." *C/L,* ২৫৫ টী. ২ দ্র.। কাওয়েল-এর মত উল্লেখ করে রিস ডেভিড্স্ মন্তব্য করেন: "The exact meaning of *āyata* is really very doubtful" (ঐ, ৩৭৬ টী. ৮)।

৩০. পালি-ইংরিজি অভিধান (টী. ২৩)-এ "লোকায়ত" প্রসঙ্গে উদ্ধৃত। ফ্রাঙ্কে-র তর্জমাটি দেখার সুযোগ হয় নি।

৩১. তুচ্চি (*C/L*), ৩৮৯-৯০। প্রসঙ্গত বলা যায়, ১৯১৯-এ ইআকবি মনে করতেন লোকায়ত সম্প্রদায় 'was in original merely one of popular natural philosophy' (কীথ, ৩২ টী. ১-এ উল্লিখিত। মূল লেখাটি দেখার সুযোগ হয় নি)। কীথ অবশ্য এ-মত এক ফুঁ-এ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, "... the Lokāyatas were clearly early exponents of atheism" (ঐ, ৩২)। পালি সূত্রগুলি মাথায় না থাকলে এমন মনে হতে পারে।

৩২. দাসগুপ্ত, ৩ : ৫১৪ টী. ৩।

৩৩. *অমরকোষ,* কাণ্ড ৩, নানার্থবর্গ, পঙ্ক্তি ২৩৩৮। 'ভূতল' অর্থেও 'লোক' শব্দটির ব্যবহার আছে (পঙ্ক্তি ৫৬৮)। বহু সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদ বা উত্তরপদ হিসেবে 'লোক'-এর অর্থবৈচিত্র্য কম নয়। ব্যোটলিঙ্ক-রোট দ্র.। পালি-ইংরিজি অভিধানে (টী. ২৩) লেখা হয়েছে : "*Loka* is not a fixed def. term. It comprises immateriality as well as materiality and emphasizes either one or the other meaning according to the view applied to the object or category in question." (s.v. *Loka*).

৩৪. দাসগুপ্ত, ৩ : ৫১৪। 'অয়ত' ধরে ব্যুৎপত্তিগুলি অগ্‌গবংস-র পালি ব্যাকরণ *সদ্দনীতি*-র অনুসরণে। (দাসগুপ্ত কেন 'the *Sadda-nīti* of the Aggavaṃsa' (ঐ, ৫১৩) লিখেছেন তা বোঝা যায় না। অগ্‌গবংস তো বারো শতকের একজন বৈয়াকরণের নাম)।

৩৫. *মহাভারত,* আদিপর্ব, ৬৪।৩৭ (প্রামাণিক সং., প্রচলিত সং.-এ ৭০।৪৬)-এর টীকা :

"লোকে এব আয়তন্তে তে লোকায়তিকাঃ তেষু লোকরঞ্জনপরেষু..." (বঙ্গবাসী সং. (১৮২৬ শক), ৮১)। এই একই চরণের ব্যাখ্যায় *হরিবংশ*-য় নীলকণ্ঠ আবার অন্য অর্থ করেছেন। বঙ্গবাসী সং. (১৩২২ ব) ৬৬।৩০, ৫২০ দ্র.।

৩৬. *অষ্টাধ্যায়ী* (৪।২।৬০) ও *গণপাঠ*, ২৩-এর উল্লেখ করে কাণে বলেছেন, "This is not accurate" (১ : ২২৬ টী.)। তাঁর মতে, "Literally [Lokāyata] means what is reached by ordinary people (*Loka* + *āyata*, long extended)" ঐ, ২২৬।

৩৭. বুদ্ধঘোস-এর *সারত্থপকাসিনী*-র সূত্রে তুচ্চি এটির উল্লেখ করেন। দাসগুপ্ত সেই অনুযায়ী লোকায়ত-র অর্থ দিয়েছেন, 'the basis of the foolish and profane world' (৩ : ৫১৫ ও টী. ১))। এর আগেই সদানন্দ-র *বেদান্তসার*-এর *বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী* টীকায় রামতীর্থ যতির উল্লেখ করে কোলব্রুক (১৮২৭) লিখেছিলেন, "Rāmatīrtha names the *Locāyatanas*, a branch of the *Chārvāca*, as particularly intended. No doubt they are the same with the Locāyaticas of the Śancara and the rest" (১৮৩৭), ১ : ৪০৪। এর ভিত্তিতে ব্যোটলিঙ্ক-রোট তাঁদের অভিধানে (খণ্ড ৬ (১৮৬৮-৭১), ৫৮৬) 'লোকায়তন' শব্দটি ধরেছিলেন, তবে সেই সঙ্গে বলে রেখেছিলেন, 'wohl fahlerhaft für লোকায়ত', সম্ভবত লোকায়ত-র ভুল (রূপ)। মনিএর উইলিয়মস-ও তাঁর অভিধানে শব্দটি দিয়েছেন এইভাবে : 'Lokāyatana (!), m.a. materialist, Col. [= Colebrooke]'.

কোলব্রুক সত্যিই একটা ভুল করেছিলেন। রামতীর্থ-র টীকায় আছে : লোকায়তানাং চার্ব্বাকবিশেষাণাং আহ (*বে-সা*, ১২৯)। শব্দটি লোকায়তন নয়, 'লোকায়ত' শব্দের ষষ্ঠী-বিভক্তিযুক্ত (বহুবচন) রূপ। মজার ব্যাপার হলো, সংস্কৃতে না পাওয়া গেলেও পালিতে পরোক্ষে 'লোকায়তন' পাওয়া গেল— বুদ্ধঘোস-এর *সারত্থপকাসিনী*-র ব্যাঙ্কক সংস্করণে!

কিন্তু পালি টেক্স্ট্ সোসাইটি সংস্করণে (১৯২৯-৩৭) এখানে 'আয়তনং' পাঠটি ধরা হয় নি, পাঠভেদ হিসেবে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র (খণ্ড ২, ৭৬), আর 'আয়তন' অর্থে basis, ভিত্তি— এমন অর্থ পালি-ইংরিজি অভিধানে দেওয়া নেই। পি টি এস সংস্করণের পাঠ এই : "লোকায়তন্তি, লোকস্স এব আয়তং। বালে-পুথুজ্জন-লোকস্স আয়তং 'মহন্তং গম্ভীরন্'তি উপদিট্ঠং, পরিত্তং ছবং দিট্ঠি গতং" (২১ টী. ৩৭) : নতুন পালি অভিধানে (১৯৬৫) অবশ্য 'আয়তন' অর্থে base, source ইঃ দেওয়া আছে (১২৮ সারি ১), কিন্তু 'লোকায়তন' বলে কোনো সমাসবদ্ধ পদ নেই।

৩৮. 'কোনো বহুশ্রুত উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে শুনিয়াছি, "লোকায়তি" শব্দের উত্তরে তদ্ধিত প্রত্যয়েই কোন কোন স্থলে লোকায়তিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।' ফণিভূষণ (*ন্যা-দ-বা-ভা*, ১ : পনের টী. ২)। পঞ্চানন তর্করত্নও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন (চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

লো-দ (১৩৬৩), ৫৪১-এ উল্লিখিত)। 'আয়তি' অর্থে উত্তরকাল বা আগামীকাল— এমন কথা *অমরকোষ*-এও আছে (পঙ্ক্তি ১৫২৫। দ্বিতীয় কাণ্ড, ক্ষত্রিয়বর্গ)। কিন্তু কোথায় এই অর্থে 'লোকায়তিক' শব্দর ব্যবহার হয়েছে— তার কোনো দৃষ্টান্তই ফণিভূষণ দেন নি। 'বহুশ্রুত উপাধ্যায় মহাশয়ের' ব্যুৎপত্তি তাই কষ্টকল্পনা বলেই মনে হয় ('লোক + অ-য়ত' ধরে অগ্‌গবংস-র ব্যুৎপত্তি-ও একই রকমের)।

দাসগুপ্ত লক্ষ করেছেন 'লোকায়ত' বলে দুটি আলাদা শব্দ আছে। একটি বিশেষণ, যার অর্থ : জগতে যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, 'prevalent in the world or among the common people', অন্যটি পারিভাষিক শব্দ [বিশেষ্য], তার অর্থ: বিতণ্ডাবাদশাস্ত্র, 'the science of disputation, sophistry and casuistry' (৩ : ৫১৫)। পালি ঐতিহ্যে কোথাও 'নেচর-লোর' বা 'রাষ্ট্রনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান' অর্থে শব্দটির নিদর্শন তিনি খুঁজে পান নি (ঐ)।

৩৯. ইআকবি (১৯১১, ১৯৭০), ৭৩৬ (৫৫১), ইং. তর্জমা, ১০৪ : *unglāubigen philosophie*, infidel philosophy.

৪০. ঐ। কাণেও লিখেছেন : "It is somewhat strange that Lokāyata is included in Ānvīkṣikī, one of the subjects of study for the princes. But it appears from the remarks he makes that Kauṭ. uses it only in the sense of logic based on premises derived from ordinary experience (loka) though in later literature Lokāyata came to mean 'nāstika' (atheist, materialist)." ৩ : ৪৭। স্মৃতিকার বৃহস্পতি আর বার্হস্পত্যমতের স্রষ্টাকে তিনি অবশ্য এক লোক বলে ধরেন নি।

৪১. কোনৌ, ৭।

৪২. *কাদম্বরী*, পূর্বভাগঃ, ১৮৭২ শক (১৯৫০ খ্রি), ৫১৩; সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ৮ : ১৩৪ (অনুবাদ), ৩২৯ (মূল)।

৪৩. *হর্ষচরিত*, উচ্ছ্বাস ৮। ১৯৩৯ (চতুর্থ সং.), ৩৫৩; সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ১৮ : ১৯০ (অনুবাদ), ৩১৭ (মূল)। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের তর্জমা (১৩৮৫), ৩১৬।

৪৪. কাওয়েল ও টমাস-এর ইংরিজি তর্জমা, ২৩৬; *হর্ষচরিত*, কাণে সম্পা., ১২৮; "লোকায়তিক— is a materialist, an atheist, a follower of চার্বাক..." (ঐ, ৫৯৫)। এ ধরণের দর্শনের তালিকা একটি জৈন বইতেও আছে : বৈসেসিয়ম্ (বৈশেষিকম্), বুদ্ধসাসনং (বুদ্ধের শিক্ষা), কাবিলং (কাপিল, অর্থাৎ সাংখ্য), লোগায়তং (লোকায়ত), সট্‌ঠিতংতং [ষষ্ঠীতন্ত্র] = সাংখ্য। ভেবের আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন die Lehre von den sechszig (Begriffen), ষাটটি (ধারণার) তত্ত্ব], মাঢরে (মাঠর) ইত্যাদি। *অনুযোগদ্বারসূত্র*, ৫ ক, ভেবের (১৮৬৬), ২৪৮-এ উদ্ধৃত। বইটির আধুনিক সংস্করণ (*অনুওগাদারাইং*, ১৯৬৮) সুত্ত ৪৯-এ কিছু পাঠভেদ দেখা যায় ('বুদ্ধবয়নং', 'লোয়ায়তং', 'সট্টিতংতং')। ইংরিজি তর্জমা : তাইকেন হানাকি (১৯৭০), ১৪।

৪৫. *ত-স*; *ত-স-প*, ভাগ ২, ৬৩৯ (শ্লোক ১৮৮৫); *য-দ-স* এবং *ত-র-দী*, ৩০৭ (শ্লোক ৮৫); শঙ্করাচার্য, *ব্র-সূ-ভা*, ১।১।২, ২।২।২, ৩।৩।৫৩।

৪৬. *বি-পু*, ৩।১৮; *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।২৯২; *বি-ধ-ম-পু*, ১।১০৮।৪। প্রসঙ্গত বলা যায়, লোকায়তমতের বিখ্যাত একটি শ্লোক— যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্ নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ। ভস্মীভূতস্য শান্তস্য (দেহস্য) পুনারগমনং কুতঃ।।— *বি-ধ-ম-পু*-এই প্রথম পাওয়া যায় (১।১০৮।১৮ গঘ-১৯ কখ)। রাজেন্দ্রনাথ হাজরার মতে, এটি খ্রি ৪০০-৫০০-য় লেখা (১৯৫৮, ১ : ২১২)। এখান থেকেই জয়ন্তভট্ট প্রমুখ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন— কেউ কেউ দ্বিতীয় পাদটি বিকৃতও করেছেন (এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.)। হাজরাই প্রথম *বি-ধ-ম-পু*-তে এই শ্লোকটি লক্ষ করেন।

সা-প্র-ভা-র সূচনায় বিজ্ঞানভিক্ষু *প-পু* থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। তার দুটি চরণ হলো :

[জৈমিনিনা] নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।।
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্।

[পার্বতীকে শিব বলছেন :] নিরীশ্বরবাদ দিয়ে মহত্তর শাস্ত্র তৈরি করেছেন জৈমিনি, ধিষণ (=বৃহস্পতি) অতিনিন্দিত চার্বাক (মত) বলেছেন।

(*সাংখ্যদর্শনম্* (১৩৮৬), ২৩৭)। কিন্তু রিশার্ড গার্বে *প-পু*-এর এই চরণগুলি খুঁজে পান নি। (১৮৯৫), ১৯৫ দ্র.। মনে হয় এই সব শ্লোক কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক প্রক্ষেপ : শৈব, পাশুপত, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, চার্বাক, বৌদ্ধ, মায়াবাদ (মায়াবাদম্ অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ)— জগৎ ধ্বংসের জন্যে স্বয়ং শিবই নাকি ব্রাহ্মণদের দিয়ে এই সব দর্শন তৈরি করিয়েছিলেন!

বিজ্ঞানভিক্ষু-উদ্ধৃত শ্লোকগুলি শনাক্ত করেছেন রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা ((১৯৪০/১৯৮৭), ১২৬); *প-পু*, উত্তরখণ্ডে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য ইত্যাদির সঙ্গে চার্বাক-নিন্দার শ্লোকার্ধটিও আছে (পুণা : আনন্দাশ্রম, ১৮৯৪), ২৬৩।৬৯ কখ)। হাজরার মতে, উত্তরখণ্ডটি ৯০০ খ্রি-র আগে লেখা হয় নি, আর এই অংশটি শ্রী বা মাধ্ব (মধ্ব-অনুসারী বৈদান্তিক) সম্প্রদায়ের প্রক্ষেপ হতে পারে (ঐ, ১২৬)। শঙ্করের মায়াবাদকেও যেভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে তার থেকেও এর সমর্থন মেলে। তবে এও লক্ষ করার যে, দেবনাগরী (দাক্ষিণাত্য) শাখার সব পুঁথিতে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায় না (আনন্দাশ্রম সং., ১৮৩৪ টী. দ্র.)।

সাংখ্যসূত্রম্ (বিজ্ঞানভিক্ষু-র ভাষ্য সমেত)-এর নতুন একটি সংস্করণে (১৯৭৭) রামশংকর ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন, আনন্দাশ্রম সং. পাঠের সঙ্গে *সা-প্র-ভা*-র পাঠে ফারাক আছে (৫ টী. ১)।

প-পু-এর গৌড়ীয় (উদীচ্য বা উত্তর ভারতীয়) শাখার পাঠ এখনও ছাপা হয় নি (বঙ্গবাসী সং. (১৩২২ ব)-এ দাক্ষিণাত্য শাখার পাঠই রয়েছে। তবে অধ্যায় বিভাগ অন্যরকম।

প্রাসঙ্গিক শ্লোকার্ধটি সেখানে ২৩৬।৫ গঘ)। তবে তার কিছু পুঁথি পাওয়া যায়। সেখানেও আলোচ্য শ্লোকগুলি যথাস্থানে আছে (অশোক চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৭), ৯০ টী. ৩০ দ্র.)।

৪৭. রিস ডেভিড্স্ (১৮৯৯), ১৭২; (*C/L*, ৩৭৫) : "[Sāyana-mādhava's] very able description has all the appearance of being drawn from his own imagination and is chiefly based on certain infidel doggerel verses which cannot possibly formed part of the Lokāyata studied by the Brāhmins of old."

৪৮. *বে-সা* (১৩৫৬ব), ১২৮-৩২ দ্র.।

৪৯. ভারতীয় দর্শনের ছাত্ররা জানেন, 'সাংখ্য'-র নাম কেন সাংখ্য, 'ন্যায়' কেন ন্যায়, 'বৈশেষিক' কেন বৈশেষিক— এ-সবের কোনো সর্বসম্মত (বা বহুজনসম্মত) ব্যাখ্যা নেই। কাওয়েল বলেছিলেন, "But we can only weary ourselves with asking questions to which there can be no answer, as well traces of chronology and successive development have been obliterated in the present sútras of the Darśanas. Each one now seems to imply the contemporary existence of all the rest, and consequently for historical purposes they are all delusive and useless" (১৮৬২), ৩৮২।

৫০. যেমন, "'মীমাংসা' অর্থে বেদশাস্ত্রবিরোধী 'তর্ক' শব্দের প্রয়োগও পাওয়া যায় [*মনু*, ১২।১০৬], শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে মীমাংসা-শাস্ত্রই একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। এই কারণে এই শাস্ত্রকে 'ন্যায়'ও বলা হয়" (সুখময় ভট্টাচার্য সম্পা., *জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ* (১৩৫৮ব), ক)। 'যোগ' অর্থে যে বৈশেষিক বা ন্যায় বা ন্যায়-বৈশেষিক বোঝাত— তাও দেখা গেছে (টী. ২১ দ্র.)। পরে এ নিয়ে আরও আলোচনা করা হবে। কাণে বারবার বলেছেন, লোকায়ত শব্দটির অর্থ বদলেছে। ১ : ২২৫-২৬; ৩ : ৪৭-৪৮; ৫।২ : ১২০৫ টী. ১৯৫৩ দ্র.।

৫১. আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং [পাঠান্তরে 'আন্বীক্ষিকীং বাত্মবিদ্যাং' (বা + আত্মবিদ্যাং)-ও পাওয়া যায়] (*মনু*, ৭।৪৩)। টীকায় বলা হয়েছে : এবং আন্বীক্ষিক্যপি তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রণদিকা (মেধাতিথি), তর্কবিদ্যাং ভূতপ্রবৃত্তিপ্রযুক্ত্যুপযোগিনীম্ (কুল্লূক), তর্কবিদ্যাং উহাপোহার্থং... (রাঘবানন্দ), তর্কবিদ্যাম্ (রামচন্দ্র)। কিন্তু সর্বজ্ঞনারায়ণ অর্থ করেছেন : ন্যায়সাংখ্যাদিকাম্ অপবর্গোপযোগিনীং, অর্থাৎ আস্তিক দর্শন, যার মধ্যে সাংখ্য ইত্যাদি, অর্থাৎ মীমাংসা, বৈশেষিক, যোগও পড়ে, হয়তো বেদান্তদর্শনও; গোবিন্দরাজ বলেছেন : তর্কবিদ্যাং সাংখ্যাদিবিদ্যাম্। এখানেও 'আদি' শব্দটি দিয়ে সম্ভবত বেদবিশ্বাসী ষড়্দর্শনকেই বোঝানো হয়েছে (নটি টীকা সহ *মনুস্মৃতি* (১৯৮৪), ৪।১ : ৩১-৩২ দ্র.)। অর্থাৎ আন্বীক্ষিকী বলতে মানবদের মধ্যেও দুটি মত প্রচলিত ছিল : একটি প্রাচীন, অন্যটি অর্বাচনী (= পরবর্তী)।

৫২. "প্রত্যক্ষ ও আগম (= আপ্তবাক্য)-আশ্রিত অনুমানই অন্বীক্ষা, আর সেই অন্বীক্ষা দিয়ে প্রবৃত্ত (প্রকাশিত) আন্বীক্ষিকীই ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র।" *ন্যায়সূত্র*, ১।১।১-এর বাৎস্যায়নভাষ্য (সূত্র ৫, ২৮-২৯)। ক্ষেত্রেশচন্দ্র অবশ্য এ-ব্যাখ্যায় খুশি নন, তাঁর মনে হয়েছে, এই দিয়ে বাৎস্যায়ন ন্যায়দর্শনের জন্যে আন্বীক্ষিকী শব্দটি একচেটে করে ফেলেছেন ((১৯৭৫), ১৪১)। আসলে 'আন্বীক্ষিকী' বলতে দর্শনই বোঝানোর কথা।

৫৩. *নীতিসার,* ২।৭, ২।১১। তবে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 'দর্শন' অর্থটিই বেশি প্রযোজ্য। সেখানে বলা হয়েছে : "আন্বীক্ষিকী হলো আত্মবিদ্যা, যা দিয়ে সুখ-দুঃখ (-র কারণ) দেখা যায়। তা-ই দিয়ে তত্ত্ব বুঝে (রাজা) হর্ষ ও শোক ত্যাগ করেন" (ঐ, ৩৯)। টীকাকার অর্থ করেছেন : ধর্ম কারণ সুখ ফল; অধর্ম কারণ দুঃখ ফল— এই হলো তত্ত্ব।

নীতিসার ও *মনুস্মৃতি*-তে আন্বীক্ষিকী শব্দটি 'আত্মবিদ্যা'-র বিশেষণ বা পর্যায়বোধক শব্দ। কিন্তু বাৎস্যায়ন তাঁর ভাষ্যে বলে রেখেছেন : আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা শুরু হয় সংশয় ইত্যাদি দিয়ে, তার আলাদা উল্লেখ না থাকলে এটি উপনিষদের মতো কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হয়ে যেত (১।১।১-এর ভাষ্য, *ন্যা-দ-বা-ভা,* ১ : ২৫)। এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদ, *লো-দ* (১৯৬৯), ২৭৯-৮০ দ্র.।

৫৪. "It is evident here that Kautalīya elucidates the two meanings of the term ānvīksikī. One in the general sence, *philosophical enquiry* or *philosophy* ... It is hardly necessary to point out that a careful consideration of the above extract [*Arthaśāstra*, 1.2.10] from the Kautalīya in comparison with its striking parallel in Vātsyāyana's bhāṣya on 1.1.1 would make it very difficult to believe that *ānvīksikī*, in the sense of 'system of logic', was not presupposed by the Arthaśāstra of Kautalya." কুপ্পস্বামী শাস্ত্রী (১৯৩২, ১৯৫১), আঠেরো-উনিশ।

৫৫. বিশদ আলোচনার জন্যে *লো-দ* (১৩৬৩), ৪৯২-৫৪০ দ্র.। দেবীপ্রসাদের *Lokāyata* (১৯৫৯), ৩৫৯-৪৮৫-তেও সাংখ্য-র বিবর্তনের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

৫৬. *ব্র-সূ-ভা,* ১।১।৫ ইত্যাদি ষাটটি সূত্রে সাংখ্য-খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। ২।১।১২-র ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন, সাংখ্য-ই হলো প্রধান কুস্তিগির, তাকে হারাতে পারলেই অন্য সব বেদবিরোধী মত হেরে যায়।

৫৭. টী. ৭, ১০। যোগঘমও লিখেছেন, "যোগ মোক্ষের সঙ্গেই সংযোগ করে। সেটির ছয় অঙ্গ।" এরপর বলা হয়েছে : 'স (= যোগঃ) চ ন্যায়বৈশিষিক [তথৈব] শাস্ত্রোক্তঃ' (টী. ৮, ৫)।

৫৮. টী. ২১ দ্র.।

৫৯. র‍্যান্‌ড্‌ল্‌, ৩ টী. ১; ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৯২৭), ৮৫৫। তবে, গঙ্গানাথ ঝা-র অনুসরণে ক্ষেত্রেশচন্দ্র 'যোগানাম্‌' বলতে নৈয়ায়িকদের ধরতে চেয়েছেন, বৈশেষিকদের নয় (ঐ, ৮৫৮)।

৬০. "The Vaiśeṣika-sūtra— 1.1.4...lays special emphasis, not upon any of the categories, but upon 'the comprehension of truth through similarities and dissimilarities' (sādharmyavaidharmyābhyāṁ tattvajñānaṁ— upon the striking out of the *one* in the *many*, and this amounts to an unmistakable stress on 'the *analytic* or inductive method of philosophical *reasoning*'. Gautama's *Nyāya-darśana* took its name from *nyāya* which means 'the *synthetic* or *deductive* method

of syllogistic demonstration'. Gautama's system lays special stress on the synthetic method of syllogistic reasoning. One of the earlier meanings of the term *nyāya* is 'exegetic principle or maxim'; and after logical reasoning had been *released* from *Vedic exegesis* [= *Mīmāṃsā*], the term *nyāya* developed the specialised sense of syllogistic reasoning". কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, কুড়ি-একুশ।

৬১. *বি-পু,* ৩।১৭। তবে রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার মতে, এটি সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত। হাজরা (১৯৮৭), ২৫। খ্রি চার শতকের মাঝামাঝি বা ৫০০ খ্রি নাগাদ হয়তো এই প্রক্ষেপ ঘটেছিল। মনে হয়, *মৈত্রী* (বা *মৈত্রায়ণী*) *উপনিষদ,* ৭।৯ থেকেই এই ধরণের গল্প পুরাণে এসেছে।

৬২. *এপিগ্রাফিআ ইন্ডিকা,* ১ : ৩৫২-৫৮; *ব্যোমবতী,* চার ও 'আ' দ্র.। কর্ণাটকের বহু তাম্রশাসনে লোকায়ত-র কথা পাওয়া যায়। সালেতোরে (১৯৪২), ৩৮৭-৯৭ দ্র.। ১১৪৮-এর একটি পুরালেখ-এ রাজা বীর পাণ্ড্যকে 'লোকায়ত-মত-বিচার-দেবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত হতে দেখা যায় (প্রা.গ্র.হ. খরে ও রাঘবেন্দ্র কুলকর্ণী, গণেশ থিটে সম্পা., ১০৭)।

৬৩. তোকিও সং. (১৯৩৪), ৯৪; কলকাতা সং. (১৯৫৬), ৭২; দরভঙ্গা সং. (১৯৬০), ৭০; ফরাসি তর্জমা (১৮৫২), ৬২; ইংরিজি তর্জমা (১৮৮৪), ৯৭। বুর্নুফ ও কের্ন এক্ষেত্রে 'লোকায়তশাস্ত্র'-কে পারিভাষিক অর্থে নেন নি; শব্দসূচি, Index-এ এটি তাই ঠাঁই পায় নি। তাঁদের তর্জমায়, une science vulgaire, লোকপ্রচলিত জ্ঞান; a profane philosophy, অ-ধর্মীয় দর্শন। দুটি অর্থই ব্যুৎপত্তিগত, কিন্তু অধ্যায় ১৩ ও ২৬-এর 'লোকায়ত' ও 'লোকায়তিক' শব্দ দুটির সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকে না (টী. ৬৪ ও ৬৫ দ্র.)।

৬৪. তোকিও সং., ২৩৬; কলকাতা সং., ১৮০-৮১; দরভঙ্গা সং., ১৬৬; ফরাসি তর্জমা, ১৬৮; ইংরিজি তর্জমা, ২৬৩। বুর্নুফ-এর অনুবাদে আছে : "ne recherche pas les Lokāyatikas qui lisent les Tantras de leur secte...", যে লোকায়তিকরা তাঁদের সম্প্রদায়ের তন্ত্রগুলি পড়েন, (বোধিসত্ত্ব) তাঁদের দাক্ষিণ্য চান না। 'মন্ত্র'-র জায়গায় 'তন্ত্র'— এই পাঠ আর কোথাও পাওয়া যায় না ('লোকায়তমন্ত্রধারকান্'-এর বদলে '-পারগান্' পাঠ অবশ্য আছে। তোকিও সং., ২৩৬ টী. ১ দ্র.)। রিস ডেভিড্স্ মনে করতেন, বুর্নুফ-এর পাঠ ভুল (সূত্র ২২, ১৬৯-৭০ টী. ৪; সূত্র ১৮,৩৭৫ টী. ১২)। কের্ন এর অনুবাদ করেছেন, "adepts at worldly spells and votaries of a worldly philosophy", আর টীকায় লিখেছেন : "Lokāyatikas, the Sadducees or Epicureans of India." রিস ডেভিড্স্ এর অর্থ করেছিলেন : "the Lokāyatikas who know by heart the Lokāyata *Mantras* (mystic verses)." (ঐ, ১৬৯; ৩৭৩)। এই তর্জমায় প্রবল আপত্তি করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ((১৯৬৯), ১১)।

৬৫. তোকিও সং., ৩৮৯; কলকাতা সং., ৩১০-১২; দরভঙ্গা সং., ২৬৬-৬৭, ফরাসি তর্জমা ২৮০; ইংরিজি সং., ৪৩৮। এখানে বুর্নুফ কোনো ব্যাখ্যায় যান নি, 'la doctrine des Lokāyatas' লিখেই ছেড়ে দিয়েছেন; কের্ন লিখেছেন 'worldly philosophy', টীকায় : "The Lokāyatikas are the Indian Epicureans"।

বুর্নুফ অবশ্য মনে করতেন, লোকায়তিক বলতে চার্বাকদের নিরীশ্বরবাদী মতবাদই বুঝতে হবে। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণরা এই একই অর্থে শব্দটি নিয়েছেন। পালিতে এখানে অন্য ব্যাখ্যার প্রস্তাব করা হয়; যেহেতু 'লোকায়ত' বলতে সেখানে বোঝায় "কাল্পনিক কাহিনী, আখ্যান" (histoire fabuleuse, roman), তাই এমন অনুমান করা যেতে পারে যে "আমাদের *পুণ্ডরীক*-এ লোকায়তিক বলতে ঐ ধরণের রচনার লেখক বা পাঠকদের বোঝাচ্ছে, যে-সব রচনার মূল বিষয় হলো জাগতিক সংরাগ ও ঘটনা (les passions et les affaires du monde forment le sujet principal)।" ঐ, ৪০৯। পালিতে 'লোকায়ত'-র ঐ অর্থের সূত্র হিসেবে তিনি *অভিধানপ্পদীপিকা*-র উল্লেখ করেছেন (ঐ, টীকা ১)।

এর তীব্র বিরোধিতা করে রিস ডেভিড্‌স্‌ লিখেছেন, "He says Lokāyata means in Pali 'fabulous history, romance' : and quotes as his authority, the passage...from the *Abhidhāna Padīpikā*, in which Lokāytam is simply explained as *Vitaṇḍasattham*. This last expression cannot possibly mean anything of that sort." (১৮৯৯, ১৬৯-৭০ টী. ৪; *C/L* ৩৭৬ টী. ১২)।

কথাটি ঠিকই। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ : বুর্নুফ ভুল করেছেন। কিন্তু তার কারণটা বেশ মজার। *অভিধানপ্পদীপিকা*, ১১২ কখ-য় আছে : 'বিতণ্ডসত্থং বিঞ্‌ঞেয়্যং যং তং লোকায়তং ইতি', আর ১১৩ কখ-য় : 'আখ্যায়িকো পলদ্ধথা পবন্ধকপ্পনা কথা' (বারাণসী সং. (১৯৮১), ১৯)। বুর্নুফ 'আখ্যায়িকা' ও 'কথা'-কেও 'লোকায়ত'-র প্রতিশব্দ ধরে নিয়ে তার ফরাসি তর্জমা করে দিয়েছেন।

মজাটা এখানেই শেষ নয়। বুর্নুফ-এর সূত্র উল্লেখ করেই ব্যোটলিঙ্ক-রোট-ও এর জার্মান তর্জমা করে নিয়েছেন : eine erfudene Geschichte, Roman ("লোকায়ত" দ্র.)। খুবই আক্ষরিক অনুবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু রিস ডেভিড্‌স্‌ খেয়াল করেন নি, ফরাসিতে 'ইস্তোয়ার' মানে শুধু 'ইতিহাস' নয়, 'কাহিনী' বা 'আখ্যায়িকা'ও হয়।

রিস ডেভিড্‌স্‌-স্টীড-এর অভিধানে 'কথা'র অন্যতম অর্থ দেওয়া আছে 'a (longer) story' কিন্তু 'আখ্যায়িকা' শব্দটি ধরাই হয় নি, 'পবন্ধকপ্পনা'-ও না।

মোগ্‌গল্লান এটি পেয়েছিলেন *অমরকোষ*, কাণ্ড ১, পঙ্‌ক্তি ৩২১-২২ থেকে (তার ঠিক আগের পঙ্‌ক্তিতেই আছে আন্বীক্ষিকী = তর্কবিদ্যা)। অমরসিংহ কোনো দর্শনের নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু শব্দাদিবর্গ-য় আন্বীক্ষিকী-র কথা এনেছেন। *অভিধানপ্পদীপিকা*-য় তেমনি লোকায়ত শব্দটি আগে গিরাবগ্‌গো-য়, আর কোথাও কোনো দর্শনের নাম নেই।

৬৬. কীলহর্ন সং., ৩ : ৩২৫-২৬; দাসগুপ্ত, ৩ : ৫১৫-১৬; লিময়ে (টী. ৯), ১৮-১৯।

৬৭. বাসুদেব শরণ অগ্রবাল অবশ্য অন্য অর্থ করেছেন। তাঁর মতে, পতঞ্জলি বলতে চেয়েছেন : ভাগুরীর দৃষ্টিকোণ হলো লোকায়তমতের নমুনা, ভাগুরীর প্রচারিত জীবনযাত্রা লোকায়ত-র জীবনযাত্রা ((১৯৫৩), ৩৯৩)। লোকায়ত বলতে তিনি বুঝেছেন চার্বাকমত, আর ভাগুরী অর্থে কোনো ব্যক্তি। কিন্তু প্রসঙ্গসূত্রে 'ভাগুরী' বলতে একটি টীকাগ্রন্থই বোঝায়। *বৃহদ্‌দেবতা*-য় ও অন্যত্র ভাগুরি বলে একটি ব্যক্তিনাম পাওয়া যায় (মনিএর-উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধান, ৭৫২ সারি ১ দ্র.), কিন্তু তার বানান আলাদা।

৬৮. *কাশিকাবৃত্তি, ন্যাস* (*পঞ্জিকা*) ও *পদমঞ্জরী*, ১ : ৪৩৮-৩৯।

৬৯. 'বুদ্ধি' অর্থে 'চার্বী' শব্দটি কিছু অভিধানেও (যেমন, *ত্রিকাণ্ডশেষ*, ১।১।১১৪, *মেদিনী*, ১৯।৬) পাওয়া যায়। শব্দটি 'চারু'-র স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বনিগত মিল ও লোকায়ত-র সূত্রে এর থেকেই 'চার্বাক' নামটি ঐ একই নামের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি তো? বাসুদেব শরণ অগ্রবাল বলেছেন, "Chārvī or Chārvāka was not a proper name but an epithet derived from their brilliant discourses" (৩৯৩)।

৭০. কোনৌ, ৭।

৭১. *ন্যায়সূত্র*, ১।১।১, ১।২।৩। *চরকসংহিতা*-তেও বিতণ্ডার কথা আছে (বিমানস্থান, অধ্যায় ৮)। বিতণ্ডা মানে কিন্তু ঝগড়া নয়; নিজের মত স্থাপন না-করে শুধু পরমত খণ্ডনকেই বিতণ্ডা বলে। *ন্যা-দ-বা-ভা*, ১ : ৩৮৫-৯০ দ্র.।

৭২. *মনু*, ২।১১, ৪।৩০ ইত্যাদি। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে *ন্যায়সূত্র*, ছয়-বাইশ দ্র.।

৭৩. *ন্যা-দ-বা-ভা*, ১ : আট-নয়, বার-তের দ্র.।

৭৪. *শব্দকল্পদ্রুম*-এ 'লোকায়তম্‌'-এর প্রথম অর্থ দেওয়া হয়েছে : 'তর্কভেদঃ', পরে 'চার্ব্বাকশাস্ত্রম্‌'; 'লোকায়তিকঃ'-র অর্থ : 'তার্কিক ভেদঃ', তারপর 'চার্ব্বাকশাস্ত্রবেত্তা'।

অধ্যায় ৯

রামায়ণ-এর গৌড়ীয় পাঠে জাবালি উপাখ্যান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একবার একটি গল্প লিখেছিলেন, "অমরবৃন্দ"।[১] বাঙলা কথাসাহিত্যের যে সব চরিত্র তাঁর মনে দাগ কেটেছিল, গল্পটি তাদের নিয়ে। এই 'অমর'-দের একজন হচ্ছেন জাবালি। ঠিক *রামায়ণ*-এর জাবালি নন, পরশুরামের গল্পরই সেই বস্তুবাদী।[২]

পরশুরামের জাবালি তাঁর নিজের সৃষ্টি। *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে একবারই এই ঋষির কথা এসেছিল। সেই সূত্র ধরেই পরশুরাম গড়ে তোলেন এক আদর্শ বস্তুবাদী চরিত্র।[৩]

রামায়ণ-এর প্রচলিত, vulgate সংস্করণের জাবালি কিন্তু আদর্শ চরিত্র নন। তাঁকে দেখানো হয়েছে সুবিধেবাদী হিসেবে। রামের ধমক খেয়ে তিনি বলেন, 'আমি নাস্তিকের বাক্য বলছি না, আমি নাস্তিক নই; পরলোকাদি কিছু নেই, এমনও নয়। আমি সময় বুঝে আস্তিক বা নাস্তিক হই। তোমাকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার সময় উপস্থিত হয়েছে, সেজন্য আমি নাস্তিক বাক্য বলেছি। আবার এখন তোমাকে প্রসন্ন করবার জন্য অন্যরূপ বলছি।'[৪]

রামায়ণ-এর টীকাকাররা জাবালির পরিচয় দিতে গিয়ে গোড়াতেই বলে রেখেছেন, তিনি লোকায়তমত অবলম্বন করে, বা চার্বাকমত আশ্রয় করে এই কথাগুলি বলেছিলেন।[৫] অর্থাৎ জাবালি নিজে লোকায়তিক নন। রামকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি চার্বাকপন্থী সেজেছিলেন— এইমাত্র।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে *রামায়ণ*-এর নানা পাঠ চালু আছে। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যর পাঠ হুবহু এক নয়। রাজশেখর বসু ব্যবহার করেছিলেন বোম্বাই-এর নির্ণয়সাগর প্রেস-প্রকাশিত সংস্করণ। এর সঙ্গে জনৈক রাম-এর লেখা *রামায়ণতিলক* টীকা (আঠেরো শতক) ইত্যাদিও ছিল। তাঁর সারানুবাদও এই সংস্করণের ভিত্তিতে।[৬] এর পাঠই সবচেয়ে পরিচিত, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সাধারণভাবে এই পাঠটি চলে। একে বলা হয় প্রচলিত সংস্করণ। পারিভাষিক নাম : গৃহীত পাঠ, *textus receptus*, (received text)।[৭]

কিন্তু *রামায়ণ*-এর আরও অনেককটি রূপ, version পাওয়া যায়।[৮] কাহিনী মূলত এক থাকলেও পাঠভেদ বিস্তর। সর্গ-সংখ্যা, শ্লোক-সংখ্যা বহুক্ষেত্রেই মেলে না। ছোটো বড় তফাতও থাকে অনেক।

যেমন, অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালির উক্তি। দাক্ষিণাত্য পাঠে তথা প্রচলিত সংস্করণে এটি আছে সর্গ ১০৮, শ্লোক ২-১৮-য়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঠে সর্গ ১২১, শ্লোক ২-১৬, গৌড়ীয় পাঠে (অর্থাৎ বাঙলা অঞ্চলে প্রচলিত পাঠে) সর্গ ১১৬, শ্লোক ৩-৩৯-এ।[৯]

বাঙলায় সমগ্র *বাল্মীকি রামায়ণ* (মূল সমেত) অনুবাদ করেছিলেন হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৮৬৯-৮৪)। তিনিও প্রচলিত সংস্করণ ধরেই সম্পাদনা ও তর্জমা করেন রাজশেখর বসু তাঁর "জাবালি" গল্পে এই অনুবাদ থেকেই উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর ঐ সারানুবাদের ভূমিকায় 'কৌতূহলজনক বিষয়'-এর মধ্যে জাবালির অবস্থা বুঝে নাস্তিক বা আস্তিক হওয়ার কথাও আছে।[১০] কিন্তু গৌড়ীয় পাঠটি দেখলে তিনি জানতে পারতেন : জাবালি সেখানে এমন কোনো কথা বলেন নি। অথচ এই সংস্করণেই জাবালির কথা সবচেয়ে বেশি। তার অনেকটাই অবশ্য প্রক্ষেপ। কিন্তু জাবালিকে হেয় করার কোনো চেষ্টা এখানে নেই (উত্তর-পশ্চিম পাঠেও নেই)। তার চেয়েও বড়ো কথা : দর্শনের বই-এর বাইরে বস্তুবাদী বিবরণ, অন্যান্য পাঠের চেয়ে আরও বিস্তৃতভাবে, এখানেই পাওয়া যায়।

এটি অবশ্য কোনো নতুন আবিষ্কার নন। ১৮৬১-তে চার্বাক বিষয়ে লিখতে বসে জন মিউঅর এই জাবালি উপাখ্যানটি লক্ষ্য করেছিলেন।[১১] গৌড়ীয় পাঠের প্রথম দুটি কাণ্ডর দুটি সংস্করণ তখন পাওয়া যেত। একটি সম্পাদনা করেছিলেন কেরী ও মার্শম্যান, দ্বিতীয়টির গাস্‌পারে গোরেসিও।[১২] এ ছাড়াও মিউঅর উল্লেখ করেছেন এ. ডব্লিউ. শ্লেগেল সম্পাদিত সংস্করণের।[১৩] *রামায়ণ*-এর টীকাকাররা জাবালির কথাগুলিকে লোকায়তমতেরই বিবৃতি বলে ধরেছিলেন সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

তারপরে গৌড়ীয় পাঠের একটি নতুন সংস্করণ বার করেন অমরেশ্বর ঠাকুর।[১৪] প্রামাণিক সংস্করণের সম্পাদক, জি.এইচ.ভট্ট-র মতে, গোরেসিও-র চেয়ে এটির পাঠ বেশি নির্ভরযোগ্য, কারণ পুঁথির পাঠের প্রতি এটি আরও বিশ্বস্ত।[১৫] এ ছাড়া বরোদা থেকে *রামায়ণ*-এর যে প্রামাণিক পাঠ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে জাবালির উক্তি অনেক সংক্ষিপ্ত (১০০।২-১৭)। অর্থাৎ গৌড়ীয় পাঠে প্রক্ষেপ সবচেয়ে বেশি। কোন্ উদ্দেশ্যে এই পাঠে ২০টি শ্লোক যোগ করা হয়েছিল তা জানার আজ কোনো উপায় নেই। তবে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যর ভিত্তিতে কিছু যুক্তিনির্ভর অনুমান করা যায়।

সব মিলিয়ে গৌড়ীয় পাঠটির তাই নিজস্ব গুরুত্ব আছে। অমরেশ্বর ঠাকুর-সম্পাদিত সংস্করণ থেকে জাবালির উক্তির বাঙলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো।

অযোধ্যাকাণ্ড, সর্গ ১১৬

অনন্তর, তাঁহাদের [সকলের] সম্মানিত রাজনৈতিক সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মাজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জাবালি ভরতকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমনে অনিচ্ছুক রামচন্দ্রকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এই বাক্য বলিলেন। ।।১-২।।

হে রাঘব, বস্তুতঃ তোমার যেন এইরূপ পরমার্থরহিত বুদ্ধি না হয়, তপস্বিগণের বুদ্ধি সাধারণ মানুষের [বুদ্ধির] ন্যায় গর্হনীয় (= নিন্দনীয়) হইয়া থাকে। ।।৩।।

হে নরশ্রেষ্ঠ, পিতার বাক্য যতদূর পালন করা উচিত, যতদূর তোমাতে সম্ভব হইতে পারে [প্রথম হইতে] আরম্ভ করিয়া [শেষ পর্য্যন্ত] সমস্তই তুমি করিয়াছ। ।।৪।।

তপস্যায় ও ধর্ম্মে অনুরাগবশতঃ এবং রাজ্যে নিস্পৃহতাবশতঃ [সমুৎপন্ন] নির্ব্বেদে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না। ।।৫।।

আর, হে বৎস, তিনিই (দশরথই) তোমাকে এই রাজ্য পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছিলেন; [পরে] তিনি যে ভরতের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করেন, সেই ভরতও [আসিয়া এক্ষণে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত] তোমাকেই অনুরোধ করিতেছে। ।।৬।।

হে প্রভাবশালিন্, আর, যাহার নিমিত্ত তোমার পিতা এই পাপকার্য্য করিয়াছেন, সপুত্রা সেই কৈকেয়ীও তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিতেছেন। ।।৭।।

অতএব তুমি [রাজ্য] গ্রহণ কর, প্রজাসমূহ পালন কর, স্বজনদিগকে সুখী কর; হে বীর, লক্ষ্মণ ও দেবী বৈদেহীর দুঃখভার দূর কর। ।।৮।।

অতঃপর তুমি [আর] প্রাজ্ঞজনবিনিন্দিত, আত্মকৃত এই নিষ্ফল বুদ্ধি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করিও না। ।।৯।।

হে বৎস, ঋচীক যেরূপ স্বপুত্র নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ [প্রায়শই] পিতা কাম ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ।।১০।।

হে বৎস, [তোমার] স্বর্গতঃ পিতা তোমাকে [তাঁহার আদেশ পালন না করিলে] তিরস্কার করিতে পারিবেন না; যেহেতু তিনি বহু শরীরের মধ্যে [এক] অসাধারণ শরীর আস্ফালন করিয়াছেন [যথায় ক্রোধের অবকাশ নাই]। ।।১১।।

কোন্ ব্যক্তি কাহার বন্ধু? কাহার দ্বারা কোন্ ব্যক্তির কি প্রয়োজন সাধিত হয়? যেহেতু মানুষ একাকী জন্ম পরিগ্রহ করে, একাকীই কালকবলে পতিত হয়। ।।১২।।

অতএব মাতা এবং পিতা উভয়েই গৃহসদৃশ (অর্থাৎ কিছুদিন পিতৃশরীরে ও মাতৃগর্ভে বাস করা হইয়াছিল, পুত্রের সহিত পিতামাতার এইমাত্র সম্বন্ধ) যে ব্যক্তি পিতামাতার প্রতি আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তসদৃশ জানিবে। ।।১৩।।

গ্রামান্তরে গমন-প্রবৃত্ত কোনও মানুষ যেরূপ কোথাও আবাস গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পরদিবস সেই আবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, হে কাকুৎস্থ,

মনুষ্যগণের পিতা, মাতা, গৃহ এবং ধনও এইরূপ আবাসগৃহতুল্য (অর্থাৎ ইহাদের সহিত সকলেরই ক্ষণকালের জন্য সমাগম হইয়া থাকে এবং পুনরায় বিশ্লেষ ঘটিয়া থাকে); এই সমস্ত বিষয়ে বালকোচিত চিন্তার প্রয়োজন নাই। ।।১৪-১৫।।

হে বীর, ধূলিবিরহিত ভয়সম্পর্কশূন্য সমতল পথ পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ কুপথ অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ।।১৬।।

সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যায় নিজেকে অভিষিক্ত কর, যেহেতু [অযোধ্যা] নগরী [বৈধব্যনিবন্ধন] একবেণীধরা অর্থাৎ প্রোষিতভর্তৃকার ন্যায় তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। ।।১৭।।

হে রাজপুত্র, দেবলোকে দেবরাজের ন্যায় তুমি অযোধ্যায় মহামূল্য রাজভোগসমূহ সম্ভোগপূর্ব্বক বিহার কর। ।।১৮।।

দশরথ তোমার কেহ নহেন এবং তুমিও তাঁহার কেহ নহ, রাজা [দশরথ] অন্য ব্যক্তি এবং তুমি অন্য ব্যক্তি; অতএব যাহা বলি [তাহা] কর। ।।১৯।।

পিতা প্রাণিগণের নিমিত্ত কারণ মাত্র; [পিতার] শুক্র মাতার ঋতুকালে রুধিরযুক্ত বায়ুর সহিত মিলিত হয়; তাহাই পুরুষের স্বীয় জন্মলাভ। ।।২০।।

নৃপতি সেইস্থানে [-ই] গমন করিয়াছেন, যেস্থানে তাঁহার যাওয়া উচিত; ইহাই প্রাণিগণের স্বাভাবিক পরিণাম, তুমি বৃথা দুঃখপীড়িত হইতেছ। ।।২১।।

আর, যাঁহারা যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ [বলিয়া বিখ্যাত] আমি তাঁহাদের বিষয়েই বলিতেছি, অন্য লোকের (অর্থাৎ সুখভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের) সম্বন্ধে [কিছু] বলিতেছি না; [দেখ] তাঁহারা (ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ) [ইহলোকে নানাবিধ] দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর [সুখভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের ন্যায়ই] অদৃশ্য হইয়া থাকেন। ।।২২।।

সকলেই [পিতৃপুরুষের পারলৌকিক অভ্যুদয়ের নিমিত্ত] অষ্টকা শ্রাদ্ধ এবং সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে; [পিতৃপুরুষের উর্দ্ধগতি কামনা করিয়া] লোক অন্যান্য পারলৌকিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অন্নের অপচয় দর্শন করে, মৃত্যুর পর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে (অর্থাৎ সমুদায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না)। ।।২৩।।

অন্য ব্যক্তির ভুক্ত দ্রব্য যদি অন্য শরীরে যাওয়া সম্ভব হয়, [তাহা হইলে] বিদেশবাসী ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধায় অন্নদান করা যাইতে পারে [এবং] তাহার পথে ভোজনার্থ অন্ন বহন করিতে হয় না। ।।২৪।।

দেবপূজা কর, দান কর, [যজ্ঞার্থে] দীক্ষিত হও, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান কর এবং গৃহ পরিত্যাগ কর (অর্থাৎ প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর), দান প্রবৃত্তির উৎপাদক এই সমস্ত শাস্ত্র [পরপ্রতারণকুশল] পণ্ডিতবর্গ প্রণয়ন করিয়াছেন। ।।২৫।।

হে মহামতে, তত্ত্বজ্ঞ তুমি 'পরলোক নাই' এই সিদ্ধান্ত কর; হে রাঘব, পরোক্ষ বস্তুতে বিশ্বাস করিও না, প্রত্যক্ষ বস্তুতে বিশ্বাস কর। ।।২৬।।

ভরত কর্ত্তৃক প্রার্থিত সেই তুমি সর্ব্বলোকসম্মত 'প্রত্যক্ষই প্রমাণ' এইরূপ বুদ্ধি আশ্রয়পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ কর; হে রাজন্, রাজ্যপ্রাপ্তির পর তুমি (আত্ম) হিতকর বুদ্ধি অবলম্বন করিও [এবং] স্বীয় [ক্ষত্রিয়োচিত] মার্গে বর্ত্তমান থাকিও। ।।২৭।।

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহাযশা ক্ষুপ, মহাভাগ ইক্ষ্বাকু, শত্রুতাপন কাকুৎস্থ, রঘু, দিলীপ, সগর এবং নরশ্রেষ্ঠ দুষ্মন্ত, দুষ্মন্ত-তনয় মহাযশা চক্রবর্তী-শ্রীমান্ ভরত, পুরুকুৎস, শ্রীমান্ শিবি, ধুন্ধুমার, ভগীরথ, বিষ্বক্‌সেন, বজ্রধরসদৃশ রাজা অনরণ্য, ধর্মাত্মা অরিষ্টনেমি এবং বীর্য্যবান যুবনাশ্ব, বৈশ্রবণোপম যুবনাশ্বপুত্র রাজা মান্ধাতা, রাজর্ষি যযাতি এবং মহাযশা সম্ভূত, লোকবিশ্রুত সত্ত্ববান্ নরশ্রেষ্ঠ বৃহদশ্ব— এই সমুদায় এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক নৃপতিপ্রবর প্রিয় পুত্র এবং পত্নীগণকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ।।২৮-৩৩।।

বৎস, তাঁহাদিগকে, না গন্ধর্ব্ব না যক্ষ না রাক্ষস বলিয়া জানি (অর্থাৎ তাঁহারা মৃত্যুর পর গন্ধর্ব্ব হইলেন কি যক্ষ হইলেন অথবা রাক্ষস হইলেন তাহা আমরা জানি না), তাঁহারা কোথায় গমন করিয়াছেন তাহাও জানি না; সমস্ত জগৎ এইভাবে মোহগ্রস্ত হইয়া আছে। ।।৩৪।।

এই রাজাগণের নামমাত্রই শ্রুত হয়, ইঁহাদিগকে যিনি যে স্থানে আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি সেইস্থানেই ইঁহাদিগকে কল্পনা করিয়া লয়েন। ।।৩৫।।

কাজেই এই জগৎ কোথায় অবস্থান করিতেছে (অর্থাৎ ত্রি-জগতে কোন্ বস্তু কোথায় রহিয়াছে) এই বিষয়ে [কোনো] ব্যবস্থা নাই, এই দৃশ্যমান মনুষ্যলোকই পরলোক, অতএব তুমি সুখভোগী হও। ।।৩৬।।

ধর্ম্মপরায়ণ সমস্ত ব্যক্তি কেবল সুখভোগরই যোগ্য হয় না; হে কাকুৎস্থ, ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ [প্রত্যুত] অতীব দুঃখভাগী হইয়া থাকে। ।।৩৭।।

অধর্ম্মনিরত মানবগণকে সুখভাগী হইতে দেখা যায়; তথাপি বিপরীতাচরণে প্রবৃত্ত এই জগৎ সর্ব্বপ্রকারেই ব্যাকুলিত হইতেছে। ।।৩৮।।

অতএব, হে নরশ্রেষ্ঠ, তুমি সমুপস্থিত লক্ষ্মীকে অবমানিতা করিও না, বিপক্ষ পরিশূন্য সুবিস্তীর্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্য গ্রহণ কর। ।।৩৯।।

প্রথমেই লক্ষ্য করার বিষয় হলো : জাবালি প্রসঙ্গে 'সম্মানিত', 'রাজনৈয়ায়িক', 'সর্বশাস্ত্রজ্ঞ', 'ধর্মজ্ঞ', 'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ'— এই বিশেষণগুলি। তারপরেই অবশ্য বলা হয় তাঁর বাক্য 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ'। এখানে একটু পাঠভেদের সমস্যা আছে। কোথাও পাওয়া যায় 'ধর্মোপেতম্', কোথাও বা 'ধর্মাপেতম্'। গোরেসিও-র পাঠে প্রথমটিই আছে; ইতালীয় ভাষায় তিনি এর অনুবাদও করেছেন morali parole, নৈতিক বচন।[১৬] 'ধর্মাপেতম্' মানে far away from the accepted law, অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ।[১৭] মনে হয়, এক্ষেত্রে প্রথম পাঠটিই ঠিক। না হলে 'ধর্মজ্ঞ'-র পাশে 'ধর্মাপেতম্' আদৌ খাপ

খায় না। জাবালিকে অধার্মিক বলার কোনো ইচ্ছে এখানে নেই।[১৮] তবে তাঁকে দিয়ে বৈদিক ধর্মর বিরুদ্ধে চোখা-চোখা কিছু কথা বলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রচলিত পাঠে এতগুলি বিশেষণ নেই, আর 'ধর্মোপেতম্'-এর জায়গায় 'ধর্মাপেতম্' পাঠই পাওয়া যায়। টীকাকাররা তার অর্থ করেছেন : বৈদিকধর্ম-রহিত।

এর পরের আটটি শ্লোক (শ্লোক ৪-১১) একমাত্র গৌড়ীয় পাঠেই পাওয়া যায়। জাবালি যে রাজনৈয়ায়িক— ছত্রে ছত্রে তার প্রমাণ মেলে। শ্লোক ৫ তো প্রায় *গীতা*-র (২।৩) প্রতিধ্বনি।[১৯] অর্জুনকে কৃষ্ণ যেমন ক্লীবতা পরিহার করতে বলেছিলেন, জাবালিও রামকে প্রায় তেমনি উপদেশ দেন। সন্দেহ হয়, এটি *গীতা*-বচনেরই ব্যঙ্গরূপ।

শ্লোক ১২ থেকে ১৯ পর্যন্ত সব পাঠই মোটের ওপর এক। শ্লোক ২১-২৬ সব পাঠেই পাওয়া যায় (শ্লোক ২০ আছে দাক্ষিণাত্য পাঠেও, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম পাঠে নেই)। এখানে গৌড়ীয় পাঠের কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। এই অংশে মূলত শ্রাদ্ধর নামে অন্ন অপচয়ের কথা আছে। আর সেই সূত্রে, মৃত্যুর পরে যে আর কিছু থাকে না, অর্থাৎ আত্মা বলে কিছু নেই, পরলোক বলে কিছু নেই— এই সুপরিচিত বস্তুবাদী মতটি সব পাঠেই পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে এসেছে আর-একটি দার্শনিক ধারণা : যা প্রত্যক্ষ তাকেই গ্রহণ করো, যা পরোক্ষ (= প্রত্যক্ষ নয়) তাকে ত্যাগ করো (*তিলক*-টীকায় বলা হয়েছে : পরোক্ষ মানে অনুমান, শব্দ [= আপ্তবাক্য] ইত্যাদি দিয়ে যা জানা যায় তাকে ত্যাগ করো)। এটিও একটি পরিচিত বস্তুধর্মীমত।[২০] শ্লোক ২৪-এর যুক্তিটিও পরে বহু জায়গায় পাওয়া যায় (যেমন, *স-দ-স*-য়)।[২১]

শ্লোক ২৮-৩৩-এ বেশ কিছু পৌরাণিক রাজার প্রসঙ্গ ওঠে। এখানে জাবালি অজ্ঞেয়বাদীর মতো কথা বলেন (শ্লোক ৩৪-৩৫)। পৃথিবীতে যে ধার্মিক লোকরাই দুঃখ পায় আর অধার্মিকরাই সুখী হয় (অর্থাৎ ধর্ম আচরণের সঙ্গে পার্থিব সুখ-দুঃখের কোনো যোগ নেই)— এ কথা বলে জাবালি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। *শ্লোক ২৮-৩৯ একমাত্র গৌড়ীয় পাঠেই পাওয়া যায়।*

বস্তুবাদের মূল কয়েকটি দিক জাবালির এই উক্তির মধ্যে ধরা পড়ে। যেমন, পরলোক নেই, আত্মা নেই, তপস্বীদের বুদ্ধি আদৌ প্রশংসার যোগ্য নয়; শ্রাদ্ধ, পূজা, ব্রত, যজ্ঞ, সন্ন্যাস ইত্যাদির নামে লোককে দিয়ে দান করানোর জন্যে কিছু বুদ্ধিমান মেধাবী লোক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'মেধাবী' শব্দের টীকায় গোবিন্দরাজ বলেছেন : যাদের বুদ্ধি পরের দ্রব্য গ্রহণে কুশল। *তিলক*-টীকায় বলা হয়েছে, পামরদের প্রতারণা করে অনায়াসে ধনগ্রহণের জন্যে, লোককে দিয়ে দান করানোর উদ্দেশ্যে বশীকরণের উপায় হিসেবে *বেদ* ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সেগুলি কোনো প্রমাণ (= তত্ত্বজ্ঞানের উপায়) নয়।

এর পরে, গৌড়ীয় পাঠে দেখা যায়, সাতটি শ্লোকে (১১৬।৪২-৪৮) রাম জাবালির উত্তর দেন। কিন্তু এক সর্গ পার হয়ে আবার দেখা যায় রাম, আরও

সবিস্তারে, জাবালিকে দ্বিতীয়বার উত্তর দিচ্ছেন (১১৮।২-৩২, ১১৭-য় ভরতের উপরোধ)। এইখানেই গৌড়ীয় পাঠের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য পাঠের বড় তফাত। গৌড়ীয় পাঠে জাবালির উক্তি *একবার*, রামের উক্তি *দুবার* আছে। দাক্ষিণাত্য পাঠে জাবালির *দুবার*, রামের *একবার*। প্রামাণিক সংস্করণে দুজনেই *একবার* করে তাঁদের বক্তব্য বলেন (১০০।২-১৭, ১০১।২-৩১)। যাই হোক, আগে গৌড়ীয় পাঠে রামের প্রথম উত্তরটি দেখা যাক :

সুশিক্ষিত অশ্ব ও পতিব্রতা পত্নী যেরূপ পথিভ্রষ্ট হয় না, সমাহিতচিত্ত আমিও সেইরূপ পিতৃবাক্য হইতে বিচলিত হইব না। ।।৪২।।

পিতা জীবিত থাকিতে [তাঁহার] বাক্য পালন করিয়া [তাঁহার] মৃত্যুর পর যদি সেই বাক্যের অন্যথা করি, তাহা হইলে আমি সমস্ত লোকের [নিকট] কাপুরুষাখ্যা প্রাপ্ত হইব। ।।৪৩।।

বায়ু যেরূপ মহীধরকে বিচলিত করিতে পারে না, আপনিও আমাকে সেইরূপ ঈদৃশ নিরর্থক এই হেতুবাদসমূহের দ্বারা (শাস্ত্রবিরুদ্ধ যুক্তিমাত্রসার বাক্যসমূহের দ্বারা) বিচলিত করিতে পারিবেন না। ।।৪৪।।

আপনি যে কর্ম্মেরও বিফলতা বর্ণনা করিয়াছেন, অতিশয় গর্হিত পরমার্থবিরোধী ঈদৃশ বাক্যও, উপদেশপ্রসঙ্গে আপনার বলা উচিত নহে। ।।৪৫।।

যখন দেবাধিপতি ইন্দ্র শত যজ্ঞের দ্বারা অনুত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, [তখন] তাঁহার কার্য্যই প্রমাণ [রূপে গণ্য]; কর্ম্ম আপনার নিকট কিরূপে বৃথা [বলিয়া পরিগণিত] হইল? ।।৪৬।।

স্বস্ত্যাত্রেয় পুত্র, আমার মিত্র সেই বিশ্বামিত্র এবং অন্যান্য মুনিগণ তপস্যার দ্বারা স্থানমাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন। ।।৪৭।।

এই বিষয়ে অদ্য [আমার] ঈদৃশ কার্য্য করা আপনি যেরূপ মনে করেন সেইরূপ নিষ্ফল হউক, অথবা [আর] যাহাই হউক, মহর্ষি যেরূপ সঙ্কল্পিত পরম ব্রত হইতে বিচলিত হয়েন না, আমিও সেইরূপ আদরণীয় পিতৃনির্দ্দেশ হইতে বিচলিত হইব না। ।।৪৮।।

[পিতার] আদেশানুসারে ভরত রাজ্য শাসন করুন; নৃপতি কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ রাজ্য আমি কামনা করি না। রঘুবংশবর্দ্ধন রামচন্দ্র এইরূপ বলিলেন : তদনন্তর, দিবাবসানে রজনী সমাগতা হইল। ।।৪৯।।

এই উত্তরে লক্ষ্য করার বিষয় হলো : জাবালির কথার সঙ্গে রামের কথার কোনো মিল নেই। জাবালি কোথাও সাধারণভাবে কর্মর (=যজ্ঞর) বিফলতার উল্লেখ করেন নি, অথচ রাম তারই সমর্থনে দুটি শ্লোক খরচ করেন (৪৫-৪৬)। তপস্যা সম্পর্কেও একই ব্যাপার ঘটে (শ্লোক ৪৭)।

সবচেয়ে বড় কথা, পরদিন সকালে আবার রাম অন্য একটি বক্তৃতা শুরু করেন। বিষয় একই : পিতার আজ্ঞা পালন, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি। ১১৬।৩৯-এ যদি সর্গটি শেষ হয়, তবে ঘটনার পরম্পরা ঠিক থাকে। প্রথমে জাবালির উক্তি (১১৬।৩-৩৯), তারপর তারপর ভরতের উক্তি (১১৭।৩-২৭, ১-২ শ্লোকদুটি সূচনাস্বরূপ), তারপর দুজনেরই উত্তরে রামের উক্তি (১১৮।২-৩২, প্রথম শ্লোকটি সূচনাস্বরূপ)। কিন্তু গৃহীত গৌড়ীয় পাঠে সর্গ ১১৬-তেই রাম জাবালির কথার উত্তর দেন, বেশ রাগ করেই (১১৬।৪০-৪১) :

> মৃদুকোপ হইলেও তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নাস্তিকতায় অনুপদিষ্ট রামচন্দ্র নিরতিশয় কুপিত হইলেন। পিতৃবিয়োগসন্তপ্ত লক্ষ্মণাগ্রজ [রামচন্দ্র] ক্রোধান্বিত হইয়া মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় [দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত] কিঞ্চিৎ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন।

অথচ ১১৮।১-এ দেখা যায় :

> জাবালি এবং ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া [জাবালেস্তু বচং শ্রুত্বা ভরতস্য চ] বীর্যবান রামচন্দ্র জাবালিকে অবিচলিত বুদ্ধিতে সম্যক্‌ভাবে বলিলেন।

এখানে কোনো কোপের কথা নেই। জাবালিকে হেয় করার কোনো ইঙ্গিতও এখানে পাওয়া যায় না। রামের কথার উত্তরে জাবালিও কিছু বলেন না (দাক্ষিণাত্য তথা প্রচলিত পাঠে জাবালির দ্বিতীয় উক্তি পাওয়া যায় (১০৯।৩৮-৩৯)। এই প্রবন্ধর গোড়াতেই সেটি উদ্ধৃত হয়েছে)।

রামের দ্বিতীয় উত্তরের (অন্য সব পাঠে : একমাত্র উত্তর) পরে, সব পাঠেই দেখা যায়, বশিষ্ঠ রামকে বলছেন : জাবালিও লোকের (জগতের) গতাগতি জানেন (=পরলোকে গিয়ে আবার ফিরে আসার কথা জানেন)। শুধু রামকে বনবাস থেকে নিবৃত্ত করার জন্যে তিনি ওসব কথা বলেছেন।[২২] অর্থাৎ জাবালিকে শেষ পর্যন্ত হেয় করা হয় নি। পিতার আজ্ঞা-পালন, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদির মধ্যেই রাম তাঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন। জাবালি যেসব দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছিলেন সেগুলির কোনো উত্তর তিনি দেন না।

রামায়ণ-এর ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্য পাঠটি তুলনায় কম বদলেছে (*মহাভারত*-এর ক্ষেত্রে উদীচ্য, অর্থাৎ উত্তর-ভারতীয় শাখাই বেশি নির্ভরযোগ্য)। সেই দাক্ষিণাত্য পাঠেও কিন্তু এই অংশে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে মজার হলো এইটি। রাম জাবালিকে ধমকে বলছেন :

> আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা আপনাকে যে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড [দান] করিতে

হইবে, অতএব যাহাকে বেদ বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না।[২৩]

পুঁথির সাক্ষ্যে দেখা যায়, চোর = নাস্তিক = বৌদ্ধ এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত। গৌড়ীয়, নেপালী ও মৈথিলী পাঠে এটি একেবারেই নেই, উত্তর-পশ্চিম পাঠেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রামাণিক সংস্করণে তাই এ ক'টি শ্লোক বর্জিত হয়েছে।[২৪] বোঝাই যায়, নাস্তিক (শিবসহায় ও গোবিন্দরাজ লিখেছেন : নাস্তিকং চার্বাকম্) ও বুদ্ধ দু-এরই বিরোধী কোনো কবি এই কটি শ্লোক এই জায়গায় মওকামাফিক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রক্ষেপ নিঃসন্দেহে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের আগেই ঘটেছিল, কারণ উদারি (উদালি) বরদরাজের টীকায় এই ক'টি শ্লোকেরও ব্যাখ্যা আছে।[২৫]

তেমনি গৌড়ীয় পাঠে জাবালির উক্তির মধ্যে যে ক'টি বাড়তি শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলিও, মনে হয়, কোনো লোকায়তিকের, বা লোকায়ত বিষয়ে অভিজ্ঞ কবির রচনা। একমাত্র গৌড়ীয় পাঠেই সেগুলি রয়েছে।

কিন্তু গৌড়ীয়-অগৌড়ীয় নির্বিশেষে সব পাঠেই যে ক'টি শ্লোক পাওয়া যায় সেগুলিও কম লক্ষণীয় নয়। এর আগেও, অযোধ্যাকাণ্ডেই জাবালি উপাখ্যানের আগে এক জায়গায় অবশ্য লোকায়তিকদের নিন্দা করা হয়েছে। সব পাঠেই এটি পাওয়া যায় (সর্বত্রই কিছু গৌণ পাঠভেদ আছে)। রাম সেখানে ভরতকে বলছেন :

> কশ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
> অনর্থকুশলা হ্যেতে বালা পণ্ডিতমানিনঃ।
> ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
> বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে।[২৬]

নাস্তিক [লোকায়তিক] ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত' বিশেষ সংশ্রব নাই? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা (= অজ্ঞরা) কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র থাকিতে ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাকবিতণ্ডা করিয়া থাকে।[২৭] (তু. গৌড়ীয় পাঠ ১১৬।৪৪ : হেতুর্বচনৈরেব নিরর্থকৈঃ— লোকনাথ চক্রবর্ত্তী ব্যাখ্যা করেছেন : হেতুঃ = হেতুবাদী চার্বাকঃ, তদ্‌বচনৈঃ)।

লোকায়ত ও আন্বীক্ষিকী (= ন্যায়শাস্ত্র) তথা হেতুবাদীদের সম্পর্কে 'বাল্মীকি'-র মনোভাব যে অনুকূল ছিল না— তা এর থেকেই বোঝা যায়। তবু তারই একটু পরে, জাবালির মুখ দিয়ে, বস্তুবাদের মূল বক্তব্যটি যে বলানো হয়েছে— সেটাই আশ্চর্য। গৌড়ীয় পাঠে অতিরিক্ত শ্লোকগুলি সেই কারণেই আরও উপকারে লাগে।

রামায়ণ-মহাভারত-এর পাঠ-কে বলা হয় বহমান বয়ান, fluid text। বৈদিক সাহিত্যর ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দ, এমনকি তার উচ্চারণ পর্যন্ত অবিকল রাখা হয়েছে

(যদিও *উপনিষদ্*-এর ক্ষেত্রে বহু পাঠভেদ পাওয়া যায়)।[২৮] তার বাইরে মহাকাব্য-পুরাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে খোলা মাঠ। যে যেখানে পারেন দু-দশটা শ্লোক গুঁজে দেন। শ্রৌত-সাহিত্য (শ্রুতি অর্থাৎ বেদমূলক রচনা)-র উল্টো দিকে মহাকাব্য (*রামায়ণ* ও *মহাভারত*) ও পুরাণকে এস. ভি. কেতকর নাম দিয়েছিলেন 'সৌত-সাহিত্য', সূত (ভ্রাম্যমাণ চারণকবি, rhapsode)-ই যার রচয়িতা, কথক ও সংরক্ষক। পরে কোনো এক সময়ে সূতদের হাত থেকে এগুলি চলে যায় ব্রাহ্মণদের (বিশেষ করে ভার্গব গোত্রর) হাতে, আর প্রক্ষেপও বাড়তে থাকে।[২৯] *রামায়ণ* ও *মহাভারত*-এর ক্ষেত্রে তার আদিরূপ বা কেন্দ্রীণ, nucleus এখন খুঁজে বার করা অসম্ভব। খুব বেশি হলে হাজার খানেক বছরের পুরনো পাঠ কোনো রকমে উদ্ধার করা যায়। প্রামাণিক সংস্করণে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।[৩০]

তারপরেও অবশ্য থাকে অনুমানভিত্তিক পাঠসংস্কার, emendatio ও উচ্চতর সমালোচনা, higher criticism-এর কাজ। জাবালি উপাখ্যানের ক্ষেত্রে আমরা তার একটু চেষ্টা করতে পারি।

জাবালি উপাখ্যানের অন্য দুটি পাঠের সঙ্গে তুলনা করে এই অংশর গৌড়ীয় পাঠ সম্পর্কে, তথা গোটা উপাখ্যানটি সম্পর্কে, কয়েকটি সিদ্ধান্তর দিকে যাওয়া যায়।

১. *আদি-রামায়ণ*-এ আদৌ জাবালি উপাখ্যান ছিল না— হেরমান ইআকবি-র এই অভিমত অসঙ্গত নয়।[৩১] *রামায়ণ*-এর সব পাঠেই, এই উপাখ্যানের আগেও, বালকাণ্ডে ও অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের অন্যান্য গুরু ('রাজগুরু')-র প্রসঙ্গে জাবালির নাম এসেছে।[৩২] কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ডর শেষে তাঁদের তিনজনকেই দেখা যায় : জাবালি, বশিষ্ঠ (বসিষ্ঠ) ও বামদেব। চিত্রকূটে ভরত-রাম-জাবালি-বসিষ্ঠ মিলে কাহিনীর মধ্যে অযথা ব্যাঘাত করেন। জাবালি বা বসিষ্ঠর এখানে কিছু করার ছিল না। দুজনে দুভাবে রামকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন— এইমাত্র। দুজনের ভাষণই প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা (যদিও দুটি শাখাতেই তা আছে)। *আদি-রামায়ণ*-এ এখানে শুধু রাম-ভরত কথোপকথনই ছিল।
২. প্রামাণিক সংস্করণে জাবালির মুখে ষোলোটি শ্লোক (১০০।২-১৭) দেওয়া আছে। উত্তর-পশ্চিম পাঠে একটি শ্লোক (১৭) কম। সেটিই সম্ভবত প্রথম সংযোজনের পরবর্তী রূপ। দাক্ষিণাত্য পাঠে আর-একটি (শ্লোক ১০৮।১১ = গৌ ১১৬।২০) যুক্ত হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম পাঠে সেটি নেই।[৩৩]
৩. এই প্রথম সংযোজনের পর গৌড়ীয় তথা উত্তর-পূর্ব পাঠে জাবালির মুখে আরও কুড়িটি শ্লোক (১১৬।৪-১১, ২৮-৩৯) দেওয়া হয়েছে, যা অন্য কোনো পাঠে নেই। সবকটি শ্লোকই বস্তুবাদের সমর্থনে। গৌড়ীয় পাঠে, এই উপাখ্যানে এটি *দ্বিতীয় সংযোজন*।

৪. জাবালির কথা শুনে রাম ক্রুদ্ধ হয়েছেন— এমন কোনো উল্লেখ প্রথম সংযোজনের পরেও গৌড়ীয় পাঠে ছিল না। সর্গ ১১৬ জাবালির উক্তিতেই শেষ হয়েছিল (শ্লোক ৩৯)। সর্গ ১১৭-য় ছিল ভরতের অনুরোধ। সর্গ ১১৮-য় রাম একবারই জাবালি ও ভরতের কথার উত্তর দেন। তারপরে জাবালিরও আর কিছু বলার ছিল না। দাক্ষিণাত্য ও প্রচলিত পাঠে রামের ক্রোধ ও জাবালিকে ভর্ৎসনা, আর জাবালির বিনয়বচনের কথা অনেক বেশি করে আছে। গৌড়ীয় পাঠেও অন্য *হাতে তৃতীয় সংযোজন* ঘটে ১১৬।৪০-৪৯-এ। ১১৮।১-এর সঙ্গে তার কোনো মিল থাকে না। ১১৮।১-এর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম, দাক্ষিণাত্য ও প্রচলিত পাঠের তফাত এখানেই (টীকা ২২ দ্র.)। দুই প্রক্ষেপকারের মতিগতিও এক ছিল না। একজন বস্তুবাদের সমর্থনে নতুন নতুন শ্লোক রচনা করেছেন, অন্যজন মতটিকে হেয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু ১১৮।১-এ কোনো পাঠ-পরিবর্তন না-করায় *তৃতীয়* প্রক্ষেপটি ধরা পড়ে যায়।

৫. অযোধ্যাকাণ্ডর যে-জায়গায় 'লোকায়তিক'-এর উল্লেখ আছে (টীকা ২৬ দ্র.) সেটিও পরবর্তী প্রক্ষেপ। *আদি-রামায়ণ*-এ কোনো লোকায়তিক প্রসঙ্গ ছিল না।

৬. কেন এই প্রক্ষেপ ঘটল তার উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে মনে হয়, রামকে দিয়ে লোকায়তমত ও লোকায়তিকের নিন্দা করানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দাক্ষিণাত্য পাঠেই এই প্রক্ষেপের শুরু। কিন্তু গৌড়ীয় পাঠে লোকায়তিক-নিন্দা (১০৯।২৯-৩০) থাকলেও জাবালিকে নিন্দে করা হয় নি (দ্বিতীয় প্রক্ষেপ বাদে), বরং বস্তুবাদের সমর্থনে যোগ হয়েছে কুড়িটি বাড়তি শ্লোক (১১৬।২০কে ধরলে, একুশটি, কিন্তু এই শ্লোকটি প্রামাণিক সংস্করণে বাদ পড়লেও (কারণ এটি উত্তর-পশ্চিম পাঠে নেই), দাক্ষিণাত্য ও প্রচলিত পাঠে আছে)।

একটি পরিচিত শ্লোকে বলা হয়েছে : প্রক্ষেপের কারণ পাঁচটি : যুদ্ধ, বিবাহ (-র বর্ণনা), স্তুতি, দেবীর বর ইত্যাদি, ও ফলশ্রুতি।[৩৪] —জাবালি উপাখ্যানের ক্ষেত্রে অবশ্য এর কোনোটিই খাটে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই সুযোগে বস্তুবাদের সমর্থনেও বেশ কিছু কথা ঢুকে গেছে!

পরবর্তীকালে *রামায়ণ* হয়ে দাঁড়ায় ভক্তিরসের আধার। তার অবলম্বনে রামকথা লেখার সময়ে কম্বন (তামিল), কৃত্তিবাস (বাঙলা) ও তুলসীদাস (হিন্দী) এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটি পুরোপুরি বর্জন করেছেন। তাঁদের *রামায়ণ*-এ কোথাও লোকায়তিক বা জাবালির কথা নেই। একদিক দিয়ে দেখলে, তাঁরা ঠিক কাজই করেছেন— নিজেদের অজান্তেই, পুঁথির বয়ানকে অগ্রাহ্য করে, ফিরে গেছেন *আদি-রামায়ণ*-এ।

১. রচনা : ৭ চৈত্র ১৩৪০। *ব্যুমেরাং* গল্পগ্রন্থের (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) অন্তর্গত। *শরদিন্দু অমনিবাস*, ৭।

২. "জাবালি", *কজ্জলী* গল্পগ্রন্থের (১৩৩৫ ব.) অন্তর্গত। *পরশুরাম গ্রন্থাবলী*, খণ্ড ২।

৩. পরশুরাম অবশ্য স্পষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করেন নি, কিন্তু জাবালিকে দিয়ে তিনি লোকায়তমতের কথাই বলিয়েছেন। পরশুরামের গল্পটির একাধিক পালারূপ দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে জাবালি ঘোষণা করেন : 'আমি চার্বাক পড়েছি।' "ঋষিযাত্রা", *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, ৬ : ১৭৪।

৪. *বাল্মীকি-রামায়ণ*, রাজশেখর বসুর সারানুবাদ (১৩৫৩), ১৩৫৭, ১৪০। প্রচলিত সং., ১০৯। ৩৮-৩৯।

৫. '.... লোকায়তিকমতাবলম্বনমিতি যাবৎ....' (রাম-এর *তিলক*-টীকা, আঠেরো শতক), 'চার্বাকমতমাশ্রিত্য' (গোবিন্দরাজ-এর *ভূষণ*-টীকা, ষোলো শতক)। *তিলক*, *ভূষণ* ও *শিরোমণি*-টীকার ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কট্টী সম্পা. *রামায়ণম্* ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. টী. ৪, ১১ দ্র.। নির্ণয়সাগর প্রকাশনের ১৯১৯ সংস্করণ বা তার কোনো পুনর্মুদ্রণই রাজশেখর বসুর কাছে ছিল।

৭. এই দেবনাগরী রূপটিকে বলা হয় মিশ্ররূপ, composite version। *রামায়ণ*-এর সবকটি রূপের (উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ) এটি প্রতিনিধি। *তিলক*-টীকার পাঠ মূলত দাক্ষিণাত্য পাঠের সঙ্গে মেলে। প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনার সময়ে এটিকেই তাই প্রচলিত পাঠ বলে ধরা হয়েছে। *বাল্মীকি-রামায়ণ*, প্রামাণিক সং., ভূমিকা, (চার) দ্র.।

৮. *রামায়ণ*-এ পাঠভেদের মাত্রা এত বেশি যে আলব্রেশ্‌ট্‌ ভেবের বলেছিলেন, যতগুলি পুঁথি, ততগুলি রামায়ণ আছে (Soviel Handschriften, soviel Rāmāyanas)। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা করেছিলেন ভাল্‌টের রুবেন। তিনি অবশ্য *মহাভারত*-এর প্রামাণিক সংস্করণের সম্পাদক বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর-এর পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। এই রীতিতেই *রামায়ণ*-এর প্রামাণিক সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে।

'রামায়ণ'-এর বিবর্তনের ধারা এইরকম :

প্রামাণিক সং., ভূমিকা, ৩১)।
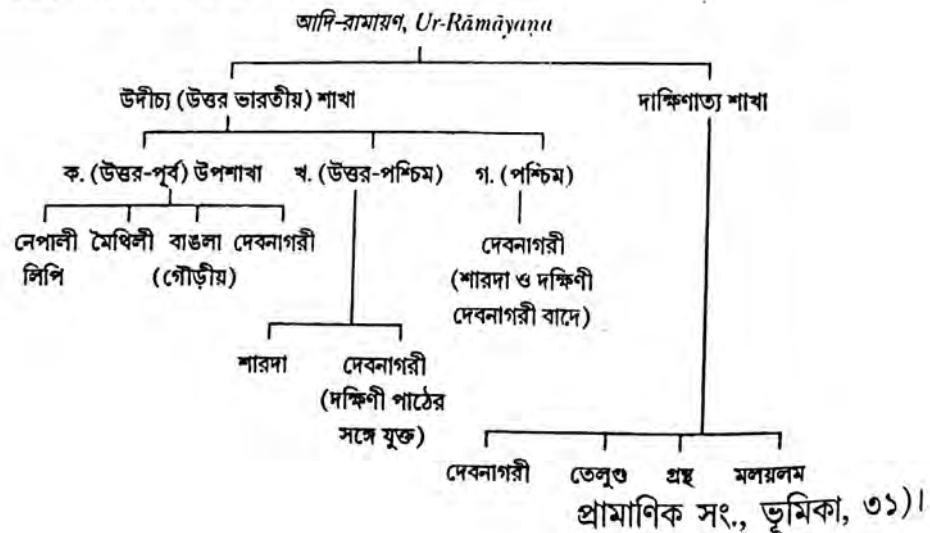
৯. অযোধ্যাকাণ্ডর প্রচলিত সংস্করণের জন্যে কট্টী শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সম্পাদিত সং. (সূত্র ৫); উত্তর-পশ্চিম পাঠের জন্যে পণ্ডিত রামলভায়া সম্পা. সং. (১৯২৮); গৌড়ীয় পাঠের জন্যে গাস্‌পারে গোরেসিও সম্পা. সং., আর লোকনাথ চক্রবর্ত্তী-র *মনোহরা*-টীকা (ষোলো শতক) সমেত অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পা. সং.; দাক্ষিণাত্য পাঠের জন্যে চিন্নস্বামীশাস্ত্রী ও বা হ. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী সম্পা. সং. (১৯৫৮) ও কে. এস. বরদাচার্য-সম্পা. সং. (১৯৬০) ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পা. (১৭৯৪ শক = ১৮৭২ খ্রি), পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা. সং. (১৮১২ শক = ১৮৯০ খ্রি) আর মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি সংস্করণ (১৯২৯)-ও দেখা হয়েছে। তিনটিতেই মূলত প্রচলিত সংস্করণের পাঠ পাওয়া যায়।

১০. টী. ৪, সাত।

১১. মিউঅর, ১৮৬১। *C/L*, ৩৫১-৬৮।

১২. কেরী ও মার্শম্যান-এর সংস্করণ (ইংরিজি তর্জমা সমেত) বেরিয়েছিল ১৮০৮ (বালকাণ্ড) ও ১৮১০ (অযোধ্যাকাণ্ড)-এ। গাস্‌পারে গোরেসিও-সম্পাদিত (ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত) সংস্করণ বেরয় ১৮৪৩-৬৭তে। এই পাঠের একটি ফরাসি অনুবাদ করেন ইপোলিত ফোশ, (১৮৫৪-৫৮, তিন খণ্ডে)।

১৩. আউগুস্ত ভিলহেল্‌ম্‌ শ্লেগেল-এর সংস্করণ (আংশিক লাতিন অনুবাদ সমেত) বেরয় ১৮২৯ ও ১৮৩৮-এ। এতে মূলত উত্তর-পশ্চিম পাঠই পাওয়া যায়। কেরী ও মার্শম্যান-এর মতো শ্লেগেল-এর সংস্করণও অসম্পূর্ণ। দুটি সংস্করণই জায়গায় জায়গায় বহুগ্রাহী, eclectic।

১৪. টী. ৯ দ্র.। কলকাতা সংস্কৃত সিরিজ-এ এটি বহুখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৩২-৪১-এ।

১৫. প্রামাণিক সং., তিরিশ টী. ৩ দ্র.। পুঁথিতে থাকা সত্ত্বেও গোরেসিও কিছু শ্লোক বাদ দিয়েছেন— এমন কথাই এখানে বলা হয়েছে।

১৬. মিউঅর (*C/L*, ৩৬৬ টী. ১০) অবশ্য 'ধর্মাপেতম্‌' পাঠই পছন্দ করেছেন।

১৭. প্রামাণিক সং., অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০৩। অন্যান্য টীকাকারও অর্থ করেছেন : বেদোক্তধর্মরহিতম্‌, বৈদিকধর্মাপেতম্‌, ধর্মমার্গবিরুদ্ধম্‌, অধর্মমার্গম্‌, ইত্যাদি।

১৮. প্রচলিত পাঠে 'ধর্মজ্ঞ' শব্দটি রামের বিশেষণ :
....জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ / উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং, ধর্মাপেতমিদং বচঃ।। ১০৮।১।
'ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জাবালি ধর্মজ্ঞ রামকে অধার্মিক এই কথা বলেন।'

১৯. তু. *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*, ২।৩ : 'হে পার্থ, ক্লীবতার আশ্রয় কোরো না; তোমায় এটি শোভা পায় না। ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্বলতা ত্যাগ করে, হে, পরন্তপ, তুমি উঠে দাঁড়াও।' গোরেসিও-ও এটি লক্ষ্য করেছিলেন (সূত্র ১৬, ৩৪৫ টী. ৭৮)।

২০. *ভূষণ*-টীকায় অবশ্য 'প্রত্যক্ষ' বলতে বোঝানো হয়েছে প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যভোগ, আর 'পরোক্ষ' বলতে পিতৃবচন-পরিপালন ইত্যাদি পরোক্ষ সুখফল।

২১. *স-দ-স* (পুণা সং.), ১৪, শ্লোক ৫। *রামায়ণ*, ১১৬। ২৫-এর সঙ্গে ১৪, শ্লোক ৯ তু.।

২২. গৌড়ীয় পাঠ : ১১৯। ১-২; দক্ষিণী তথা প্রচলিত পাঠ : ১১০। ১-২; উত্তর-পশ্চিম

পাঠ : ১২৩। ১-২; প্রামাণিক সং. ; ১০২। ১-২। এখানেও পাঠভেদ লক্ষ্য করার মতো। গৌড়ীয় পাঠ ছাড়া অন্য সব পাঠের শুরুতে আছে : রামকে ক্রুদ্ধ দেখে বসিষ্ঠ তাঁকে বললেন, ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু (বা তং) বসিষ্ঠঃ প্রত্যভাষত (বা, প্রত্যুবাচ হ)। ১, ক-খ। গৌড়ীয় পাঠের শুরুতে রামের ক্রোধের কথা নেই। সেখানে শুরু হয়েছে : 'রামের কথা শুনে বসিষ্ঠ তার উত্তরে বললেন', রামস্য বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ। (১১৯।১)

অবশ্য ১১৬। ৪০-৪১-এ রামের রাগের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এই অংশটির প্রামাণিকতা নিঃসংশয় নয়।

২৩. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যর তর্জমা (১০৯। [৩৩-৩৪]। হেমচন্দ্রও প্রচলিত সংস্করণ ধরেই তর্জমা করেছিলেন)। উত্তর-পশ্চিম পাঠেও (সূত্র ৯, সর্গ ১২১, ৪৬৪) 'যথা হি চোরঃ' থেকে 'স চাপি কালোঽয়ম্' ইত্যাদি (প্রচলিত সং. ১০৯। ৩৪-৩৯) ছটি শ্লোক নেই। পণ্ডিত রামলভায়া লক্ষ্য করেছেন বঙ্গশাখীয় পাঠে (গোরেসিও সং.) বৌদ্ধ প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু দাক্ষিণাত্য পাঠে (বোম্বাই সং., ১৯১৩) আছে (৪৬৪)।

২৪. প্রামাণিক সং., অতিরিক্ত অংশ, Additional Passage ২২৪১*. ২২৪১ (A) ও (B), ৫৭৬ ও ৭০৩-এর টীকা দ্র.।

২৫. অযোধ্যাকাণ্ড সম্পাদনার সময়ে শ্লেগেলও এটি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর সংস্করণে এই অংশটি বাদ না-দেওয়ার জন্যে তিনি দুঃখও করেন। অনুষ্টুপ্ ছেড়ে এখানে হঠাৎ উপজাতি ছন্দর ব্যবহার, গৌড়ীয় পাঠে এই অংশটি না-থাকা এসব কথাও তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করা ছিল। পরে *রামায়ণ*-অনুবাদকরা (র‍্যাল্‌ফ্ গ্রিফিথ প্রমুখ) এই অংশটিকে 'জাল', spurious বলেছেন ((১৯৭৭), ২১৯ টী. ১,৫৪০-৪১ দ্র.)। এছাড়া প্রামাণিক সং., অযোধ্যাকাণ্ড, ৭০১ দ্র.।

২৬. প্রামাণিক সং., ৯৪। ৩২-৩৩ = দাক্ষিণাত্য সং., ১০০। ৩৮-৩৯ = নির্ণয়সাগর সং., ১০০। ৩৯-৪০, উত্তর-পশ্চিম সং., ১১৩। ৩০-৩১ = গৌড়ীয় সং., ১০৯। ২৯-৩০ (গৌণ পাঠভেদ আছে)। ফ্রাঙ্কলিন এজার্টন, কামিল বুল্কে ও পরশুরাম লক্ষণ বৈদ্য-র মতে, এই সর্গটি স্পষ্টতই প্রক্ষিপ্ত। এজার্টন দেখিয়েছেন, *মহাভারত*, সভাপর্ব, অধ্যায় ৫-এর সঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডর এই সর্গের ৩৭টি শ্লোক মেলে। *রামায়ণ*, প্রামাণিক সং.-এ এই সর্গে প্রশ্নসূচক ৫৬টি শ্লোক আছে, প্রচলিত সং-এ আছে ৭৩টি, গৌড়ীয় পাঠে ৬৭টি। সভাপর্বে অবশ্য আলোচ্য শ্লোকদুটি নেই, তবে অন্যান্য দোষের সঙ্গে নাস্তিকতার নিন্দাসূচক শ্লোকটি দুটি মহাকাব্যেই আছে [*মহাভারত* (প্রা. সং.) সভা, ৫। ৯৬ = *রামায়ণ* (প্রা. সং.) অযোধ্যা, ৯৪।৫৬]। কামিল বুল্কে, এস. জে., ৩০৫-০৬ (ভুল করে সভাপর্ব, অধ্যায় ৫-এর জায়গায় ৫০ ছাপা হয়েছে), পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য, ৭০২ দ্র.।

২৭. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যর তর্জমা (২৯৯)। গোরেসিও-ও 'লোকায়তিকান্'-এর তর্জমা করেছিলেন Brahmani atei (১০৭)। মাখনলাল সেনের তর্জমায় atheistic Brahmanas ((১৯২৭), ১৯৭৬), ২৭৩, অধ্যায় ৩৯); হরি প্রসাদ শাস্ত্রীর তর্জমায়

'materialistic brahmins' (অধ্যায় ১০০, ১৯৬), অমরেশ্বর ঠাকুরের তর্জমায় : "চার্ব্বাকমতাবলম্বী (নাস্তিক) ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণের তুমি সেবা কর না? এই সমুদায় পণ্ডিতমানী (যাহারা নিজেদের পণ্ডিত মনে করেন) মূর্খ ব্রাহ্মণই অনর্থ-[সংঘটন] কুশল" ইত্যাদি (১৮৩৩)। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭), পরিচ্ছেদ ৬, ভাগ ৬-এ এই শ্লোকদুটি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা আছে।

রামায়ণ-মহাভারত-এ 'লোকায়তিক' বলতে চার্বাকপন্থীদেরই বোঝায়— এমন মনে করার কোনা নিশ্চিত প্রমাণ অবশ্য নেই, যদিও সব টীকাকারই তা-ই ধরেছেন। কেউ কেউ (যেমন শিবসহায়, গোবিন্দরাজ) তো তার সঙ্গে বৌদ্ধদের ও সম্ভবত জৈনদেরও জুড়ে দিয়েছেন : 'চার্বাকবৌদ্ধাদীনপি,' 'নাস্তিকা বৌদ্ধচার্বাকাদয়ঃ'। টীকাকার রামানুজ আবার বলেছেন : চার্বাকপন্থীরা এক ধরণের লোকায়তিক, নৈয়ায়িকরা আর-এক ধরণের (ফণিভূষণ (১৯৮৯), প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১ : চোদ্দ দ্র.)।

২৮. নানা উপনিষদের পাঠান্তরের জন্যে *অষ্টাদশ উপনিষদঃ* দ্র.।

২৯. কর্বে, ২-৩। *মহাভারত*-এর পাঠ নির্ধারণ ও ভার্গব সম্পাদনা প্রসঙ্গে সুকঠণকর (১৯৪৪), ২৭৮-৩৩৭ দ্র.।

৩০. *রামায়ণ*-এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরনো পুঁথি পাওয়া গেছে কাঠমণ্ডুর বীর গ্রন্থাগার থেকে। নেওয়ারী লিপিতে লেখা এই পুঁথির অনুলিপি হয়েছিল ১০৭৩ বিক্রম সংবৎ = আনু. ১০২০ খ্রি. (প্রামাণিক সং., পনেরো)। গৌড়ীয় পাঠের সর্বপ্রাচীন পুঁথিটি তুলনায় আধুনিক : ১৬৮৮ খ্রি. (ঐ, তেত্রিশ)। পুঁথিটি এখন আছে ফ্রান্স্-এর জাতীয় গ্রন্থাগার, পারী-তে।

৩১. ইআকবি (১৮৯৩), ৮৯, টী. ১। ইআকবি-র মতে, প্রচলিত পাঠের ১০৭। ১৭ থেকে ১১১। ১ পর্যন্ত পুরো অংশটিই প্রক্ষিপ্ত। তার মধ্যে বসিষ্ঠ-র বক্তৃতাটি (সর্গ ১১০) হলো প্রক্ষেপের মধ্যে প্রক্ষেপ, einem Einschub in einem Einschub (ঐ)। কামিল বুল্কে, এস.জে.-ও তাঁর সঙ্গে একমত (৩০৬)।

এর বিরোধিতা করে রুবেন বলেছেন, ইআকবি-র মত পুঁথি-পরম্পরার বিরোধী। রুবেন মনে করেন, পূর্বপরিকল্পিতভাবেই কবি বস্তুবাদী জাবালিকে এনেছেন। দশরথের মৃত্যুর পরেই জাবালির পরলোক ও আচার সংক্রান্ত কুসংস্কারের বিরোধিতা যথাযোগ্য জায়গায় আসে (রুবেন (১৯৫৬ / ১৯৬৬), ১৮-১৯)। এই মত স্বীকার করেও বলতে হয় : বিভিন্ন পাঠে জাবালির বক্তব্য মূলত এক হলেও, রামের উত্তর এত বিভিন্ন কেন? আদি-*রামায়ণ*-এ এই জায়গাটি প্রক্ষিপ্ত বলেই সর্গ-সংখ্যা, শ্লোক-সংখ্যা ও পাঠভেদ এত বেশি হয়। প্রামাণিক সংস্করণে এই অংশর তুলনামূলক তালিকা দ্র.। (Concordance. LVIII-LX)। এখানে তার সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হলো :

প্রামাণিক সং.	দাক্ষিণাত্য তথা প্রচলিত	উত্তর-পশ্চিম পাঠ	গৌড়ীয় পাঠ
১০০। ২-১৭ জাবালি	১০৮। ২-১৮ জাবালি	১২১। ২-১৬ জাবালি	১১৬। ৩-৩৯ জাবালি
১০১। ২-৩১ রাম	১০৯। ২-২৯। ৩১-৩৬ রাম	১২১। ১৭-১৯ রাম	১১৬। ৪২-৪৯ রাম

১০২। ১ গঘ বসিষ্ঠ	১০৯। ৩৮-৩৯ জাবালি	১২২।— (নেই)	১১৭। ৪-২৭ ভরত
১০৩। ২-৭ বসিষ্ঠ	১১০। ১-৩৫ বসিষ্ঠ	১২৩। ১-৩৩ বসিষ্ঠ	১১৮। ২-৩২ রাম
১০৩। ৯-১১ বসিষ্ঠ	১১১। ১-৭ বসিষ্ঠ	১২৪। ১-৬ বসিষ্ঠ	১১৯। ১-৩৪ বসিষ্ঠ
১০৩। ১৩-১৪ ভরত	১১১। ৯-১১ রাম	১২৪। ৭-১০ রাম	১২০। ২-৭ বসিষ্ঠ
১০৩। ১৬-১৮ রাম	১১১। ১৩-১৪ ভরত	১২৪। ১২-১৩ ভরত	১২১। -১১ রাম
১০৩। ১৯ ভরত	১১১। ১৬-১৮ রাম	১২৪। ১৫-২৭ রাম	১২১। ১৩-১৪ ভরত
১০৩। ২০-২২ পৌর-জনপদজন ইত্যাদি	১১১। ১৯ ভরত	১২৪। ১৮ ভরত	১২১। ১৫-১৯ রাম
	১১১। ২০-২১ পৌর-জানপদজন ইত্যাদি	১২৪। ১৯ পৌর-জানপদজন ইত্যাদি	১২১। ২০ ভরত
			১২১। ২২-২ পৌর-জানপদজন ইত্যাদি

৩২. বালকাণ্ডে জাবালির নাম সব পাঠেই দুবার পাওয়া যায় (প্রচলিত পাঠ ৮।৬ খ = প্রামাণিক সং. ১১।৬খ = দাক্ষিণাত্য ১২।৫খ = উত্তর-পশ্চিম ৯।৪৫খ = গৌড়ীয় ১১।৯ খ; ৬৯।৪ খ = ৬৮।৪ খ = ৬৯। ৪খ : ৬৫।৪ খ = ৭১। ৪ খ)। জাবালি প্রসঙ্গে প্রচলিত পাঠের একটি বাক্য (১।৭।৫ ক) ইআকবি (টী. ৩১, ২১১) বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু এটি একমাত্র দাক্ষিণাত্য পাঠেই আছে (প্রামাণিক সং., ৭।২৫১*)। আর একটি শ্লোক শুধু উদীচ্য শাখাতেই দেখা যায় [উত্তর-পশ্চিম ৩।৩৮গ = গৌড়ীয় ৩।৩৯ ক (ঠাকুর), ৪১। ৪ক (গোরেসিও)]।

অযোধ্যাকাণ্ডে, রামের সঙ্গে কথোপকথনের আগে, জাবালির নাম সব পাঠেই একবার পাওয়া যায় (প্রামাণিক সং., ৬১। ২ঘ = দাক্ষিণাত্য ৬৭ । ৩ঘ = উত্তর-পশ্চিম ৭৩। ২খ = গৌড়ীয় ৬৯। ২খ)। এটি দশরথের গুরুদের তালিকা। সেখানে রাজগুরু এই কজন : কাশ্যপ, গৌতম, জাবালি, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বসিষ্ঠ ও বামদেব (দাক্ষিণাত্য পাঠে ও প্রামাণিক সং.-এ বসিষ্ঠর জায়গায় কাত্যায়ন-এর নাম আছে)। এঁদের সকলকেই 'মহাযশস্বী' (বা 'মহাতপস্বী') বলা হয়েছে। এ ছাড়া উত্তর-পশ্চিম ও গৌড়ীয় পাঠে আরও দু জায়গায় জাবালির নাম আসে (৩৭।১৯ঘ = ৩৪। ২১ খ; ৮৫। ২০ঘ = ৮১।২০ ঘ)। দাক্ষিণাত্য পাঠে না-থাকায় প্রামাণিক সংস্করণে এ দুটি বর্জিত হয়েছে (Appendix I. 13. I. 41b, 1.23, *l.* 2.94d)। এ ছাড়া চিত্রকূট থেকে ভরত ফিরে যাওয়ার সময়েও একযোগে 'দৃঢ়ব্রত' বসিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি-র নাম পাওয়া যায় (প্রামাণিক সং., ১০৫। ২খ = দাক্ষিণাত্য তথা প্রচলিত সং.-এ ১১৩। ২খ = উত্তর-পশ্চিম, ১২৬। ১ খ = গৌড়ীয়, ১২৪। ১খ)।

৩৩. সিলভ্যাঁ লেভি মনে করতেন, উত্তর-পশ্চিম (তিনি বলতেন, কাশ্মীরী) শাখাই *রামায়ণ*-এর ক্ষেত্রে প্রাচীনতম (রামলভায়া-কে লেভি-র চিঠি, অযোধ্যাকাণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সং., ২৯৬-এ উদ্ধৃত)।

৩৪. সংগ্রামশ্চ বিবাহশ্চ স্তুতির্দেবীবরাদিকম্।
প্রক্ষেপ-কারণান্যাহুঃ পঞ্চমং চ ফলশ্রুতিঃ।।

(*হরিবংশ*, প্রামাণিক সং., খণ্ড ১, ভূমিকা, পঁয়ত্রিশ ও ছত্রিশ-এ উদ্ধৃত)।

অধ্যায় ১০

মহাভারত-এ চার্বাক ও লোকায়ত

মহাভারত-এ লোকায়ত আর চার্বাক-এর কথা একই সঙ্গে আসে নি। আদিপর্ব-র পর্বসংগ্রহ অধ্যায়েই চার্বাকনিগ্রহ বলে একটি আলাদা পর্বর (মানে, উপপর্বর) উল্লেখ আছে (২।৬৩)।[১] সেখানে তাকে ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষস বলা হয়। শান্তিপর্বে (৩৯।২৩-৪৭) দেখা যায়, পরিব্রাজকের বেশ ধরে সে ঘুরে বেড়ায়। দুর্যোধনের সঙ্গে তার খুবই বন্ধুত্ব। সেখানে গল্পটি এই রকম :

> রাজভবনে প্রবেশ ক'রে যুধিষ্ঠির দেবতা ও সমবেত ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চনা করলেন। দুর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভিক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড ও জপমালা ধারণ ক'রে সেখানে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণদের অনুমতি না নিয়েই সে যুধিষ্ঠিরকে বললে, কুন্তীপুত্র, এই দ্বিজগণ আমার মুখে তোমাকে বলেছেন— তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুনৃপতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুরুজনদের হত্যা ক'রে তোমার রাজ্যে কি প্রয়োজন? মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয়। যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে বললেন, বিপ্রজন, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হ'ন ; আমার মরণ আসন্ন, আপনারা ধিক্‌কার দেবেন না।
>
> ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ দুর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা করি নি, আপনার ভয় দূর হ'ক। তার পর এই ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হুংকার করলেন, চার্বাক দগ্ধ হয়ে ভূপতিত হ'ল।
>
> কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার নিকট অভয়বর লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহ্মা বললেন, ভবিষ্যতে এই রাক্ষস দুর্যোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহ্মণগণের অপমান করবে ; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপী চার্বাককে দগ্ধ করবেন। ভরতশ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহ্মতেজে বিনষ্ট হয়েছে।[২]

ব্রাহ্মণদের মাহাত্ম্য জাহির করার জন্যে *মহাভারত*-এ চার্বাক উপাখ্যান

এসেছে— এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয়। আগে তার নাম পাওয়া যায় শল্যপর্বে (৬৩।৩৮)। গদাযুদ্ধে অন্যায় আঘাতে উরুভঙ্গ হওয়ার পর মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন বিলাপ করে বলেন : "পরিব্রাজক, বাক্‌পটু চার্বাক যদি (এ-কথা) জানেন, তবে সেই মহাভাগ নিশ্চয়ই আমার প্রতিশোধের ব্যবস্থা করবেন।" সেই সূত্র ধরেই হয়তো শান্তিপর্বে পুরো একটি চার্বাক উপাখ্যান তৈরি করা হয়েছে।[৩] তাকে কোথাও দেহাত্মবাদী, বেদবিরোধী বা পরলোকে অবিশ্বাসী বলা হয় নি। বরং তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছ থেকে সে বর আদায় করেছিল।

লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে, বৃহস্পতির পাশাপাশি (বা তাঁর বদলে) *মহাভারত* থেকে চার্বাক নামটি নেওয়া হয়েছিল মতটিকে খেলো করার উদ্দেশ্যে— এমন অনুমান করাই যেতে পারে।[৪] কিন্তু তার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবে, বৃহস্পতির বদলে চার্বাক-এর নামটি আনার পেছনে কোনো অভিসন্ধি থাকা অসম্ভব নয়।

'লোকায়তিক' শব্দটি গোটা *মহাভারত*-এ একবারই এসেছে। আদিপর্বে, শকুন্তলার গল্পে (অধ্যায় ৬৪)। কণ্বমুনির আশ্রমে ঢুকেছেন দুঃষ্যন্ত (দুষ্মন্ত)। সেখানে রয়েছেন নানা বিদ্বান্। আছেন বেদ পাঠে অভিজ্ঞ, যজ্ঞ ও সংস্কারে পারঙ্গম, ন্যায়ের তত্ত্ব জানেন এমন লোক, নানা বাক্য জোড়া ও মেলানোয় বিশারদ, আর সেই সঙ্গে সিদ্ধান্তের স্থাপনা, পরের সিদ্ধান্ত খণ্ডনে কুশল, পরমার্থজ্ঞ আর মুখ্য *লোকায়তিক*-রা।— তাঁদের কথা চারদিকে অনুনাদিত হচ্ছে :

লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতম্ (৬৪।৩৭)।[৫]

কিন্তু প্রশ্ন হলো : 'লোকায়তিক' বলতে এখানে কি তাঁদেরই বোঝানো হচ্ছে যাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, আত্মা, পরলোক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, যজ্ঞ ইত্যাদিকে লোকঠকানোর ব্যবসা বলে মনে করেন? বাঙলা অনুবাদে পড়লে তা-ই মনে হবে। বর্ধমান রাজবাড়ির তর্জমায় আছে : "প্রধান প্রধান চার্বাকগণ কর্তৃক চতুর্দিকে অনুনাদিত শব্দসকল..."; কালীপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদ আরও সরেস : "বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকেরা নিজ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন"।[৬] কুলপতির আশ্রমে এমন বেদবিরোধীরা এলেন কী করে— এ প্রশ্ন কি অনুবাদকদের মনে একবারও জাগে নি?

মহাভারত-এর টীকাকার নীলকণ্ঠ (সতেরো শতকের শেষ ভাগ) অবশ্য 'লোকায়তিকমুখ্য'-র ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : যাঁরা শুধু লোকেই (=ইহজগতে) প্রয়াস করেন, তাঁরা লোকায়তিক। (সেই) লোকরঞ্জনপর (= লোককে খুশি করায় যাঁরা নিযুক্ত)-দের যাঁরা প্রধান তাঁরা 'লোকায়তিকমুখ্য'।[৭]

তার মানে, 'লোকায়ত' বলতে নীলকণ্ঠ এখানে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুবাদী দর্শনকে ধরেন নি। পালি সদ্দ-নীতি-তেও 'লোকায়ত' শব্দের ব্যাখ্যায় একই ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে (লোক + আ- √যৎ)।[৮] এই যত্ন বা প্রয়াস কীসের? লোককে খুশি করার। কীভাবে? বৃথা তর্ক করে কাককে সাদা, বককে কালো প্রমাণের চেষ্টায়। *সদ্দনীতি*-তে তাই 'লোকায়ত'-কে 'বিতণ্ডসত্থং' (=বিতণ্ডাশাস্ত্র)-ও বলা আছে।[৯]

তাহলে *মহাভারত*-এ 'লোকায়তিক' বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে? প্রামাণিক সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করলে মনে হয়, 'লোকায়ত' বলতে এখানে ন্যায়শাস্ত্রকেই ধরা হয়েছে। ৬৪।৩৭ কখ-য় তারই উল্লেখ আছে। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ জানিয়েছেন, "...প্রাচীনকালে ন্যায়শাস্ত্রও লোকায়ত নামে অভিহিত হইত, ইহা বহুশ্রুত প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছি।"[১০] এর সপক্ষে তিনি কিছু দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। তাঁর মতে, লোকায়ত শাস্ত্র ছিল দু-রকমের— আস্তিক ও নাস্তিক। এখানে সম্ভবত 'আস্তিক লোকায়তিক', অর্থাৎ বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী 'নৈয়ায়িক'দেরই বোঝানো হয়েছে।[১১] মনে হয়, নৈয়ায়িক ও লোকায়তিক-দের মধ্যে একটাই মিল : বিশ্বাস নিয়ে তাঁর চলতেন না, যুক্তির সন্ধান করতেন। বিশ্বাসসর্বস্ব লোকজন তাঁদের তাই পছন্দ করতেন না।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো : *হরিবংশ*-র কিছু পাঠেও এক জায়গায় 'লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ' শব্দটি পাওয়া যায়।[১২] কণ্বর আশ্রমের বদলে এখানে আছে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা। *হরিবংশ*-র শ্লোকটি (আসলে পুরো অংশটিই) *মহাভারত*-এর আদিপর্বর ঐ শ্লোকটির পুনর্লিখন। *হরিবংশ*-র ক্ষেত্রে নীলকণ্ঠ আবার একই শব্দ 'লোকায়তিকমুখ্য'-র ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে : "লোকায়ত দেহাত্মবাদী বেদদ্রোহীদের ব্রহ্মলোকে গতি হবে— এমন শঙ্কা করার কারণ নেই। এখানে লোকায়ত শব্দটি দিয়ে সেই শাস্ত্রে যে দেবতা অধিষ্ঠান করেন তাঁর প্রতি নিষ্ঠা বোঝাচ্ছে।"[১৩] খুবই বৈদান্তিক ব্যাখ্যা![১৪]

নীলকণ্ঠর এই ব্যাখ্যানকে ফণিভূষণ কিছুতেই মানতে পারেন নি। তাঁর মতে, "...টীকাকার নীলকণ্ঠ প্রসিদ্ধ অর্থে অনুপপত্তি দেখিয়া লক্ষণা অবলম্বনে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ লোকায়তিকমুখ্য বলিতে ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিলে সেখানে কোনো অনুপপত্তি থাকে না এবং সেখানে তাহাই বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায়।"[১৫] ফণিভূষণ আদিপর্ব'র শ্লোকটি খেয়াল করেন নি, করলে তাঁর বক্তব্য আরও শক্তিশালী হতো।

তাহলে *মহাভারত* থেকে চার্বাক / লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না।

তবে কিছুই যে পাওয়া গেল না তা-ও নয়। অন্তত 'লোকায়ত' ও তার থেকে তৈরি লোকায়তিক / লৌকায়তিক শব্দগুলির মানে যে পাল্‌টেছে— সে-বিষয়ে কিছু ধারণা করা যায়।

এখনও অবধি যতদূর জানা যায়, তাতে 'লোকায়ত' শব্দটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে কৌটিল্য-র *অর্থশাস্ত্র* (খ্রিপূ চতুর্থ শতক)-য়।[১৬] সাংখ্য ও যোগ-এর সঙ্গে সেটি তখন বেশ সম্মানজনক দর্শন। একই সময়ে পাণিনি-র বিখ্যাত ব্যাকরণ *অষ্টাধ্যায়ী* (৪।৪। ৬০)-তে আস্তিক, নাস্তিক ও দৈষ্টিক (নিয়তিবাদী) শব্দ তিনটির ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাচ্ছে।[১৭] পরবর্তী ভাষ্যকাররা তার অর্থ করেছেন : পরলোকে বিশ্বাসী, পরলোকে অবিশ্বাসী ও দৈব (=নিয়তি)-বাদী।[১৮] পাণিনীয় *গণপাঠ,* ২৩-এ 'লোকায়ত' শব্দটি এসেছে 'উক্‌থ' ইত্যাদি শব্দে ঠক্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে : যিনি লোকায়ত পড়েন বা বোঝেন তিনি 'লৌকায়তিক', যেমন যিনি উক্‌থ (=একটি বৈদিক আবৃত্তির নাম) পড়েন বা বোঝেন তিনি 'ঔক্‌থিক'।[১৯] *অষ্টাধ্যায়ী,* ৪।২।৬০-এ 'উক্‌থ' ইত্যাদি শব্দর সঙ্গে ঠক্ প্রত্যয় যোগের কথা আছে। *গণপাঠ*-এ দেখা যায়, 'লোকায়ত', 'ন্যায়', 'নিরুক্ত' ইত্যাদি শব্দ 'উক্‌থ'-রই মতো। জানা বা বোঝা অর্থে এগুলির সঙ্গে ঠক্ প্রত্যয় হয়।

'চার্বাক' নামটি সে তুলনায় নেহাতই অর্বাচীন, *মহাভারত*-এর আগে কোথাও তার হদিশ মিলছে না। *মহাভারত* কবে সম্পূর্ণ চেহারা পেয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৪০০-র মধ্যে— এই অবধি বলা যায়।[২০] তার শল্য- বা শান্তি-পর্বে চার্বাক-এর নাম কখন এল তা কে বলবে? তবে প্রাচীনতম পুঁথিগুলিতেও যে সে-নাম আছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়।[২১]

পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু জায়গায় 'লোকায়ত' শব্দটি পাওয়া যায়। কোথাও তার সঙ্গে বেদ-বিরোধিতার যোগ নেই। বরং ব্রাহ্মণদের নানা বিষয়ে শিক্ষার সেটি একটি অঙ্গ।[২২] আগেই বলা হয়েছে, পালি অভিধান ও অট্‌ঠকথায় 'লোকায়ত'-র অর্থ 'বিতণ্ডাশাস্ত্র'। এর থেকে অনুমান করা যায় : লোকায়ত ছিল আদিতে কোনো সম্মানিত আস্তিক শাস্ত্ররই নামান্তর,[২৩] তবে তার সঙ্গে হেতুবাদের যোগ ছিল। পরে এই হেতুশাস্ত্র বা যুক্তিশাস্ত্রকেই 'ন্যায়শাস্ত্র' বা 'আন্বীক্ষিকী' বলা হয়েছে। *ন্যায়সূত্র* ১। ১।১-এর ভাষ্যে বাৎস্যায়ন (খ্রি পাঁচ শতক) তা-ই লিখেছেন।[২৪]

কিন্তু কুমারিলভট্ট-র সময় থেকে (খ্রি আট শতকের প্রথম ভাগ, মতান্তরে সাত শতকের শেষ ভাগ) লোকায়ত-র অন্য একটা মানে দাঁড়িয়ে যায় : যে-মতে বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না।[২৫] এটি আর কোনো 'আন্বীক্ষিকী' নয়। ইআকবি, কঙ্গলে ও ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-য় 'আন্বীক্ষিকী' মানে যুক্তিশাস্ত্র নয়, দর্শনতন্ত্র।[২৬] এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও সেই সূত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতের (লোকায়ত = যুক্তিবিজ্ঞান) সমালোচনাও করা হয়েছে।[২৭] ক্ষেত্রেশচন্দ্র-র মতে, লোক মানে জগৎ, লোকায়ত মানে প্রকৃতি-বিষয়ক জ্ঞান।[২৮] তিনি মনে করেন, আদতে লোকায়ত ছিল সম্ভবত বৈশেষিক দর্শনের পূর্বসূরি। তখন এর সঙ্গে নিরীশ্বরবাদ, দেহাত্মবাদ ও বেদপ্রামাণ্য অস্বীকারের কোনো

সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে এটি ছিল একটি সম্মানজনক বিষয়। বুদ্ধ যে-লোকায়তিকদের পছন্দ করতেন না, তাঁরা ছিলেন তর্কসর্বস্ব। তার সঙ্গে পরবর্তীকালের চার্বাকমতের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ লোকায়ত বলতে তখনও বেদবিরোধী, স্বভাববাদী বা দেহাত্মবাদী মত বোঝাত না। এ অর্থ অনেক পরে এসেছে। খুব সম্ভব তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাণভট্ট-র *কাদম্বরী* (খ্রি সাত শতক)-তে। একটি উপমাসূত্রে সেখানে বলা হয়েছে, লোকায়ত হলো এমন লোকের প্রিয়, ধর্মে যার রুচি নেই।[২৯] কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য প্রমুখ যে-মতবাদকে লোকায়ত বলেন সেটির সঙ্গে এই ধারণার মিল আছে, কিন্তু *মহাভারত*, বৌদ্ধ সাহিত্য ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত 'লোকায়ত' থেকে এটি আলাদা (এঁরা কেউই অবশ্য 'চার্বাক' শব্দটি ব্যবহার করেন নি)।

সম্ভবত হরিভদ্র-র *ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়* (শ্লোক ৮৫) ও কমলশীল-এর *পঞ্জিকা*-তেই লোকায়ত-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'চার্বাক' নামটি (ও তার এখনকার পরিচিত রূপটি) জানা যায়।[৩০] (শান্তরক্ষিত কিন্তু শুধু 'লোকায়ত' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন)। এর থেকেই মনে হয়, *মহাভারত*-এর 'লোকায়তিকমুখ্য' শব্দটি নিশ্চয়ই আদি অর্থেই, অর্থাৎ বৈদিক তর্কশাস্ত্র বা আদি বৈশেষিক বা বেদচর্চার সঙ্গে যুক্ত কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ— এমন কোনো অর্থেই বসেছিল।

রামায়ণ-এ ভরতের সঙ্গে রামের কথোপকথনেও 'লোকায়তিক' ও 'আন্বীক্ষিকী' শব্দদুটি একসঙ্গে পাওয়া যায়।[৩১] সেখানেও 'আন্বীক্ষিকী' মানে কোনো দর্শন নয়, ঐ বিতণ্ডাশাস্ত্র। এ বিষয়ে ক্ষেত্রেশচন্দ্র-র মতও একই। তিনিও মনে করেন, এখানে 'লোকায়ত' অর্থে কৌটিল্য, কামন্দক, আগেকার পালি সাহিত্য ও *মহাভারত*-শান্তিপর্বর 'লোকায়ত' বোঝাচ্ছে না। বরং শব্দটি দিয়ে নাস্তিক (=অবৈদিক) ন্যায়-এর নিন্দা করা হয়েছে।[৩২] ফণিভূষণ তর্কবাগীশও তা-ই মনে করতেন— সে তো আগেই বলা হয়েছে।

তার মানে 'আন্বীক্ষিকী' ও 'লোকায়ত' দুটি শব্দরই অর্থান্তর ঘটেছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে তার মানে দাঁড়িয়েছে দর্শন নয়, শুধুই যুক্তিবিদ্যা (*ন্যায়সূত্র*-র ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন-ই এই সঙ্কীর্ণ অর্থটি করেছিলেন)। 'লো(লৌ)কায়তিক' মানে প্রথমে ছিল বেদচর্চার সঙ্গে যুক্ত কোনো সম্মানিত দর্শন বা বিদ্যাবিশেষ, পরে তার মানে দাঁড়ায় 'নাস্তিক' (=বেদপ্রামাণ্যে অবিশ্বাসী ও নিরীশ্বরবাদী), আত্মা ও পরলোকে আস্থাহীন, চতুর্ভূতবাদী; প্রত্যক্ষকেই তাঁরা প্রমাণজ্যেষ্ঠ ও প্রমাণশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, লৌকিক বিষয় ছাড়া আর কোথাও অনুমান ইত্যাদির সার্থকতা স্বীকার করেন না।

মহাভারত-এর সঙ্গে অন্যান্য উৎস মিলিয়ে আপাতত এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়।

পরিশিষ্ট

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বনপর্বে এক জায়গায় দ্রৌপদী নাস্তিকদের সমালোচনা করে তাদের চার্বাকপন্থী বলে অভিহিত করেছেন।"[৩৩] *মহাভারত*-এর কোন্ সংস্করণে কোন্ অধ্যায়ে এমন কথা আছে তার কোনো সূত্র তাঁর লেখায় দেওয়া নেই, যদিও অন্যান্য প্রসঙ্গে কিছু টীকা রয়েছে। মনে হয়, কালীপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদ থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। সেখানে (বনপর্ব, অধ্যায় ৩২) দ্রৌপদী বলছেন :

> অদৃষ্টপর ও চার্ব্বাকমতাবলম্বী এই উভয়প্রকার লোকই শঠ; কেবল
> কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন।

মূলে কিন্তু কোথাও 'চার্বাক' বা তার ধারে-কাছের কোনো শব্দ নেই। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই :

> যশ্চ দিষ্টপরো লোকে যশ্চায়ং হঠবাদকঃ।
> উভাবপসদাবেতৌ কর্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে।।[৩৪]

বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদটি ব্যাখ্যামূলক, কিন্তু এর চেয়ে যথাযথ :

> সংসারমধ্যে যে ব্যক্তি ভাগ্যের প্রতি নির্ভর করে ও যে ব্যক্তি হঠবাদী
> অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম [=পূর্বজন্মর কর্ম] না মানে, ইহারা উভয়েই অধম।
> পরন্তু যে ব্যক্তি কর্মদ্বারা ইষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত, সেই ব্যক্তিই
> প্রশংসনীয়।

পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী,* ৪।৪।৬০-এর সূত্রে আগেই দেখা গেছে, 'দিষ্ট' মানে দৈব, ভাগ্য। 'দিষ্টপর' মানে ভাগ্যনির্ভর। 'হঠবাদী' মানে যিনি মনে করেন : যা ঘটে তা আকস্মিক, তার পেছনে কোনো কার্যকারণভাব নেই। পূর্বজন্মর বা এই জন্মর কোনো কর্ম থেকেই তার ফল এ জন্মে বা পরজন্মে পাওয়া যায় না। হঠবাদীরা তাই কাজ করায় উৎসাহ পান না, কারণ কাজ করলেই যে তার সুফল পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। বরং যদি কিছু পাওয়ার থাকে তা হঠাৎই পাওয়া যেতে পারে। দর্শনে এই ধারণাকেই বলে যদৃচ্ছাবাদ বা আকস্মিকত্ববাদ।[৩৫] এরই বিরুদ্ধে, যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী বলছেন : হাত-পা গুটিয়ে থাকলে কিছু হয় না। রাজ্য ফিরে পেতে হলে তার জন্যে কিছু করতে হবে, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দু ধরণের নিশ্চেষ্ট লোকের তিনি সমালোচনা করেছেন : দৈববাদী আর হঠবাদী। নাস্তিক বা চার্বাকপন্থীর কোনো কথাই এখানে নেই।

হঠবুদ্ধি আর কর্মবুদ্ধি লোকের তফাতও দ্রৌপদীর কথায় পাওয়া যায়। কাজ করার ক্ষমতা থাকলেও যে কাজ করে না সে হলো হঠবুদ্ধি। অকস্মাৎ (= কোথা থেকে কে জানে) যে-লোক অর্থ পেয়ে যায় তা হঠ (=অকারণ)-এ পাওয়া বলেই ধরা হয়, তার চেষ্টার ফলে তা পাওয়া যায় নি। (৩৩।১৩-১৪)।

সুতরাং দৈববাদী (=দেবতার আরাধনা করে যিনি কিছু পেতে চান) আর হঠবাদী— দুজনকে দ্রৌপদী অলস ও নিশ্চেষ্ট বলে নিন্দে করেন। এ দু-এর বদলে তিনি পুরুষকার তথা কর্মর গুরুত্বকে তুলে ধরতে চান (৩৩।১৫-১৬)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদে তাহলে 'চার্ব্বাকমতাবলম্বী' শব্দটি এল কোথা থেকে?

এর জন্যে নীলকণ্ঠই দায়ী। এই অংশের টীকায় তিনি লিখেছেন : 'হঠ' শব্দটি দিয়ে কোনো কোনো চার্বাকপন্থীদের বোঝায়।[৩৬] এমন ধারণা তাঁর হলো কী করে? হঠবাদকে তিনি স্বভাববাদ তথা চার্বাকমতের সঙ্গে এক মনে করেন, তাই। তাঁর আগেও কেউ কেউ যদৃচ্ছাবাদ (আকস্মিকত্ববাদ) আর স্বভাববাদকে একই মতের রকমফের বলে ধরে নিয়েছিলেন।[৩৭] বৌদ্ধ দার্শনিক চন্দ্রকীর্তি লিখেছেন, স্বভাববাদীরা কার্যকারণ মানে না।[৩৮] আসলে এটি কিন্তু যদৃচ্ছাবাদী মত। বৈদান্তিক অমলানন্দ (আনু. ১২৫০ খ্রি) সঠিকভাবেই দুটি মতের তফাত করেছেন : যদৃচ্ছাবাদীরা প্রকৃতির কোনো নিয়মই মানে না, স্বভাববাদীরা (বস্তুর) প্রকৃতিকেই নিয়ম বলে জানেন।[৩৯] সায়ণ-মাধব-ও চার্বাক ও স্বভাববাদীকে এক দলে ফেলেছেন এই ভিত্তিতেই : জগতের বৈচিত্র্যকে তাঁরা (হঠবাদীর মতো) আকস্মিক বলে মনে করেন না; স্বভাবই বৈচিত্র্যর কারণ।[৪০]

নীলকণ্ঠ এই তফাতটি বোঝেন নি, তাই হঠবাদী (= পূর্বজন্মে আস্থাহীন তাই কার্যকারণে অবিশ্বাসী) = চার্বাক (= পরলোক-জন্মান্তরে আস্থাহীন)— এমন একটা সরল সমীকরণ করে ফেলেছেন।

দ্রৌপদী তিন ধরণের মানুষের কথা বলেছেন : দৈববাদী, হঠবাদী, ও প্রযত্নবাদী (= যে-কোনো কাজে চেষ্টা করে যাঁরা ফলের আশা করেন)।[৪১] তিনি নিজে কিন্তু পূর্বজন্মর কর্মফলে বিশ্বাস করেন। তার দরুনই, তাঁর মতে, পরজন্মর চেষ্টা সার্থক হয়; শুধু চেষ্টা করলেই সকলে তাই ফল পায় না। তবে, দ্রৌপদী বারবার বলেন, কাজ করে যেতে হবে, শুধু দৈব অনুগ্রহে বা হঠাৎই ফল পাওয়া যায় না, যদি-না পূর্বজন্মর কর্মর দরুন বিধাতা তা পাইয়ে দেন (৩৩।৩০-৪০)।

নীলকণ্ঠ ধরে নিয়েছেন, যেহেতু হঠবাদীরা প্রাক্‌কর্ম (= পূর্বজন্মর কর্ম) স্বীকার করেন না, তাই তাঁরাও চার্বাকপন্থী। কিন্তু চার্বাকপন্থীরা (বা সব ধরণের স্বভাববাদীই) নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকায় বিশ্বাস করতেন— এমন কোনো তথ্যপ্রমাণ কোথাও নেই। একদল 'স্বভাববাদী' হয়তো তা-ই মনে করতেন— এমন কথা *মহাভারত*-এও

অন্যত্র আছে।[৪২] কিন্তু তার উল্‌টোদিকে *শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ*-এ দেখা যায়, স্বভাব আর কর্মকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করা হয়েছে।[৪৩] সেখানে আদি-বস্তুবাদের একটি ধারা চোখে পড়ে।[৪৪]

নীলকণ্ঠ এমন ভুল করলেন কী করে? তার একটা কারণ অনুমান করা যায়। দ্রৌপদী যে এত জ্ঞানের কথা বলেন, তিনি তা শিখলেন বা জানলেন কোথা থেকে? বনপর্বর ঐ অধ্যায়ের শেষে দ্রৌপদীই তার উত্তর দেন :

> হে ভারতশ্রেষ্ঠ (=যুধিষ্ঠির)! আমার পিতা পূর্ব্বে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিকটে রাখিয়াছিলেন, ঐ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতি-প্রণীত এই সমস্ত নীতি ('নীতিং বৃহস্পতি-প্রোক্তাং') আমার পিতাকে কহিয়াছিলেন এবং আমার ভ্রাতৃগণকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমি তৎকালে পিতৃগৃহে ভ্রাতৃগণের নিকট ইহা শুনিয়াছিলাম। (৩৩।৫৬-৫৭)

বোধহয় বৃহস্পতির নাম দেখেই নীলকণ্ঠ অমনি বার্হস্পত্যমতের কথা ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু এই বৃহস্পতি-কথিত নীতি আদৌ চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে না। দ্রৌপদীর কথামতো, এ-বৃহস্পতি পূর্বজন্মর কর্ম ও বিধাতায় বিশ্বাস করতেন; চার্বাক/লোকায়তিকরা কখনোই ওসবে বিশ্বাস করেন নি।

মোট কথা : যেমন 'লোকায়তিকমুখ্য'-র বেলায়, তেমনি 'হঠবাদী'-র ব্যাপারেও (বলতে গেলে, যে-কোনো দার্শনিক প্রশ্নেই) নীলকণ্ঠ-র ব্যাখ্যায় আদৌ ভরসা করা যায় না। বনপর্বে কোথাও চার্বাকের কথা ওঠে নি। ওটি নীলকণ্ঠ ও তাঁর অনুসারী অনুবাদকের ভুল।

---

১. বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর প্রমুখ সম্পাদিত পুণা প্রামাণিক সংস্করণ (১৯২৭-৬৬) থেকেই যাবতীয় অধ্যায়- ও শ্লোক- সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠকদের সুবিধের জন্যে অন্য কয়েকটি সংস্করণ / অনুবাদের সূত্রও দেওয়া হলো : বর্ধমান রাজবাড়ি, কালীপ্রসন্ন সিংহ-য় অ. ২; বঙ্গবাসী, ২।৭৪; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, আর্য্যশাস্ত্র, ২। ৭৬।

২. প্রামাণিক সং., ৩৯।২৩-৪৭; বর্ধমান, কালীপ্রসন্ন, বঙ্গবাসী, সিদ্ধান্তবাগীশ ও আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮-৩৯। সারানুবাদটি উদ্ধৃত হয়েছে রাজশেখর বসু থেকে।

৩. বর্ধমান, বঙ্গবাসী, আর্য্যশাস্ত্র, অ. ৬৪; কালীপ্রসন্ন, ৬৫; সিদ্ধান্তবাগীশ সং.-এ শ্লোকটি নেই। দুর্যোধনের এই কথার সূত্রে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কাপালিকদের সঙ্গে চার্বাকের একটা যোগ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। (১৯৬৯), ৮৯-৯০ ও টী. ১৫৩ দ্র.। এই প্রসঙ্গে তিনি তিনটি চরণ একত্র করে অনুবাদ করেছেন : "পরিব্রাজক, বাগ্‌বিশারদ চার্বাক যদি [এ-সংবাদ] জানতে পারেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ত্রিলোকবিশ্রুত সমন্তপঞ্চক [নামে] পুণ্য [সরোবর তীরে] আমার জন্যে অপচিতি (প্রতিশোধব্যবস্থা)

করবেন।" গীতা প্রেস সং.-এ এটি এইভাবেই আছে (৬৪।৩৮ গঘ-৩৯। আর্য্যশাস্ত্র সং.-এও তা-ই)। কিন্তু প্রামাণিক সংস্করণে শেষ চরণটি ৩৯ কখ। আর্য্যশাস্ত্র সং.-এও তা-ই)। কিন্তু প্রামাণিক সংস্করণে শেষ চরণটি ৩৯ কখ। সেখানে পুরো শ্লোকটির (৩৯) অর্থ দাঁড়ায় : "আমি তিন লোকে (=স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে) প্রসিদ্ধ পুণ্য সমন্তপঞ্চক তীর্থে নিহত হয়ে শাশ্বত লোক পাব।" কালীপ্রসন্ন-র অনুবাদও এরই অনুরূপ। অর্থাৎ, দুর্যোধন এখানে সমন্তপঞ্চক তীর্থে মৃত্যুর দরুন অক্ষয় স্বর্গলাভের কথা বলছেন, ঐ তীর্থে বসে চার্বাক কোনোভাবে অভিচার-মূলক প্রতিশোধ অনুষ্ঠান করবেন— এমন কথা বলা হয় নি। সমন্তপঞ্চক আসলে কুরুক্ষেত্ররই অন্য নাম। ভার্গব-গোত্রীয় ব্রাহ্মণরা *মহাভারত*-এ বারবার এই নামটিই ব্যবহার করেছেন, তাঁদের আদিপুরুষ পরশুরামের সম্মানে। সুকঠণকর (১৯৪৪), ২৮১-৮২ দ্র.।

৪. প্রা. বি. ম. বেডেকর, 'মহাভারত আণি চার্বাক', গণেশ থিটে সম্পা., ২৯; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭), ২৪ দ্র.।

৫. বর্ধমান, কালীপ্রসন্ন, বঙ্গবাসী, আর্য্যশাস্ত্র, অ. ৭০।৪৬; সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮৪।৪৭ ঘ।

৬. "লোকে এব আয়তন্তে তে লোকায়তিকাঃ, তেষু লোকরঞ্জনপরেষু মুখ্যৈঃ।।" সিদ্ধান্তবাগীশ সং. (১৩৩৮ ব), আদিপর্ব, খণ্ড ২, ৯৮৮। সিদ্ধান্তবাগীশ অবশ্য তাঁর *ভারতকৌমুদী*-টীকায় লোকায়তিক অর্থে বস্তুবাদী নাস্তিক দর্শনবিদ্-ই ধরেছেন : 'লোকায়তং "অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনলানিলাঃ" ইত্যাদি নাস্তিকদর্শনং তদ্বিদন্তীতি লোকায়তিকাঃ...' (ঐ, ৯৮৭)।

৭. 'লোকাতিবাল-লোকো ; এত্থ আয়তন্তি উস্সাহন্তি বায়মন্তি বদস্সাদেনাতি লোকায়তং।' রিস ডেভিড্স্ (১৮৯৯), *C/L*, ৩৭১। অগ্গবংস *সদ্দনীতি* লিখেছিলেন বারো শতকের গোড়ায়। এখানে 'লোকায়ত'-র আরও কিছু ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায়, অগ্গবংস নিজেও এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না।

৮. বুদ্ধঘোস-ও লিখেছেন : 'লোকায়তং, বুচ্চতি বিতণ্ডবাদ-সত্থং'। 'লোকাক্খায়িক'-র ব্যাখ্যাও তিনি একইভাবে করেছেন। *C/L*, ৩৭১।

৯. *মহাভারত*-এর প্রচলিত পাঠগুলিতে এই অংশে বেশ কিছু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয়েছে (যেমন, কণ্বর আশ্রমে পাখি ও বাঁদরের ভাষা-জানা লোকও ছিলেন!)। কিন্তু প্রামাণিক সংস্করণে পুরো শ্লোকটি এই :

স্থাপনাক্ষেপসিদ্ধান্তপরমার্থজ্ঞতাং গতৈঃ।
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতম্।।

বর্ধমান সং.-এ এর প্রথম চরণটির অর্থ করা হয়েছে : "মতস্থাপন, আশঙ্কা নিরাকরণ ও সিদ্ধান্তকরণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ..." (ভারবি সং. ১৭৬)। কালীপ্রসন্ন-র অনুবাদে : 'উহাপোহ-সিদ্ধান্তকুশল', মানে তর্ক ও পাল্টা তর্ক করে সিদ্ধান্ত করায় দক্ষ (বসুমতী, সাক্ষরতা প্রকাশন ইত্যাদি সং.-এ 'উহাপোহ'-র অর্থ দেওয়া থাকে : 'তর্করহিত'! এ ক্ষেত্রে তার কোনো মানেই হয় না)। তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো : ৬৪।৩৫-এ 'ন্যায়' শব্দর আলাদা উল্লেখ আছে। কিন্তু সেটি এসেছে বেদশিক্ষার সূত্রে, আর তার

পরেই আছে 'মোক্ষধর্ম'-র কথা (যজ্ঞসংস্কারবিত্তিশ্চ ক্রমশিক্ষাবিশারদৈঃ। ন্যায়তত্ত্বার্থবিজ্ঞানসংপন্নৈর্বেদপারগৈঃ।.... মোক্ষধর্মপরায়ণঃ।। ৩৫গঘ-৩৬ঘ)। 'ন্যায়তত্ত্বার্থবিজ্ঞান'-এর জায়গায় প্রচলিত পাঠে 'ন্যায়তত্ত্বাত্মবিজ্ঞান' পাওয়া যায়)।

১০. ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যা-দ-বা-ভা,* ১ : পনের।

১১. ঐ, ১ : ষোল।

১২. *হরিবংশ,* ভবিষ্যপর্ব, ৬৭।৩০ : 'ঐক্যনানাত্বসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্।।' (বঙ্গবাসী সং., পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা., (১৩১২ ব), ৫২০। আর্য্যশাস্ত্র সং. (১৩৮৩-৮৪ ব.), ৬৬।৩০। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু পুঁথিতে এই শ্লোকটি (পাঠভেদসহ) পাওয়া গেলেও, সব পুঁথিতে নেই বলে প্রামাণিক সংস্করণে এটি (ভবিষ্যপর্বর অনেকটাই) বাদ পড়েছে। *হরিবংশ,* প্রামাণিক সং., ২, Appendix 4/2.7 B, lines 2520, ৭৪৪ দ্র.।

শ্লোকটির অনুবাদে নারায়ণচন্দ্র ন্যায়াচার্য লিখেছেন : "...একত্ববাদ (জীব ও ঈশ্বরের একতা প্রতিপাদনকারী), নানাত্ববাদ (জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি— এই তিন অনাদি তত্ত্বসমূহের প্রতিপাদনকারী), সংযোগবাদ (প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির প্রতিপাদনকারী) এবং সমবায়বাদে প্রবীণ পুরুষগণ ও লোকায়তিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মুখ্য মুখ্য বিদ্বান্‌গণের দ্বারা উচ্চারিত শব্দও সেই দেবগণ শ্রবণ করিলেন।" (আর্য্যশাস্ত্র সং., ১০৮৭)।

এতে বেদান্ত ও সাংখ্য-র আভাস মেলে। আমার কিন্তু মনে হয়, এখানে ন্যায়শাস্ত্রর কথাই বলা হয়েছে। 'সমবায়' ও 'সংযোগ' শব্দদুটি ঐ শাস্ত্রে পারিভাষিক, আর ঐক্য-নানাত্ব দিয়ে হয়তো 'একদ্রব্য' ও 'অনেকদ্রব্যত্ব' বোঝাচ্ছে। শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১ : ১৪, ৫৩, ১৬৪ ও ১৭২ দ্র.।

১৩. 'ন চ লোকায়তানাং দেহাত্মবাদিনাং বেদদ্রোহিনাং ব্রহ্মালোকে গতিঃ সম্ভবতীতি শঙ্কনীয়ম্, অত্র লোকায়তশব্দস্য তচ্ছাস্ত্রাভিমানিদেবতাপরত্বাৎ।' বঙ্গবাসী সং., পৃ. ৫২১।

১৪. তুলনীয় *ব্রহ্মসূত্র,* ২।১।৫ : অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্। বেদ-এ যখন বলা হয়, 'জল বলল', 'মাটি বলল', তখন বুঝতে হবে জল ও মাটিতে যে দেবতা অধিষ্ঠান করেন তাঁর উল্লেখ করা হচ্ছে।— সূত্রটি অবশ্য বেদান্তর মত নয়, তার পূর্বপক্ষ।— আদিপর্ব ২০।১০ (= বোম্বাই সং., ২৩।১৫, বঙ্গবাসী সং., ৪৩) প্রসঙ্গেও নীলকণ্ঠ এই ধরণের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুকঠণকর (১৯৪৪), ৮৫ দ্র.।

১৫. টী. ১০, ষোল। তিনি এও বলেছেন : "হরিবংশে লোকায়তিকমুখ্য বলিয়া আস্তিক লোকায়তিকেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং রামায়ণে অনর্থকুশল, অজ্ঞ, দুর্ব্বুধ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিয়া কথিত লোকায়তিকদিগকে নাস্তিক বলিয়াই পরিস্ফুট করা হইয়াছে।" ঐ।

১৬. *অর্থশাস্ত্র,* ১।২।১০ : "সাংখ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।" কঙ্গলে, ১ : ৪। এই সূত্রর প্রতিটি শব্দর ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। এই বই-এর অধ্যায় ৮ দ্র.।

১৭. *অষ্টাধ্যায়ী,* ৪।৪।৬০ : অস্তি-নাস্তি দিষ্টং মতিঃ। শ্রীশচন্দ্র বসু 'দৈষ্টিকঃ'-এর অর্থ করেছেন 'a positivist' ও বলেছেন, "The various other senses are to be found from dictionary and general literature." কিন্তু *অমরকোষ* (১।৭। ২৭০)-এ 'দিষ্টম্' মানে 'ভাগ্যম্', *শব্দকল্পদ্রুম*-এ দৈষ্টিক-এর অর্থ 'ভাগ্যাধীনজাতঃ' 'দৈবপরঃ'। ব্যোটলিঙ্ক-রোট-এর সংস্কৃত-জার্মান অভিধানে Fatalist। *মহাভারত,* আরণ্যক (বন)-পর্ব, অ. ৩৩-এ একাধিকবার শব্দটি আছে। কখনোই তা দিয়ে ধ্রুববাদী বা positivist বোঝায় না। (পরিশিষ্ট দ্র.)।

১৮. ভট্টোজি দীক্ষিত ও জয়াদিত্য-বামন এই অর্থই করেছেন : অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ।। পরলোকো স্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ, তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ। "প্রশ্ন হইতে পারে, পরলোক কোথায় পাইলে? সূত্রে তো তাহার উল্লেখ নাই। উত্তরে কাশিকাকার বলিলেন— অভিধান শক্তিস্বভাব হইতেই ইহা লাভ করিলাম— 'তদেতদভিধানশক্তিস্বভাবাল্লভ্যতে'।" দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ১৮৬।

১৯. কত্রে, ১২৭১, ৪১৬; শ্রীশচন্দ্র বসু, ৭১৮-১৯।

২০. ঘাটাগে সম্পা. অভিধান, ১-এ *মহাভারত, রামায়ণ* ও *হরিবংশ*-র রচনাকাল এইভাবেই নির্দেশ করা আছে।

২১. প্রামাণিক সংস্করণের ক্ষেত্রে শল্যপর্বর সবচেয়ে পুরনো পুঁথি ছিল ১৫৯২ খ্রি-র, শান্তিপর্বর ১৫১৬ খ্রি-র।

২২. রিস ডেভিড্‌স্ (টী. ৭), ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৪৩-৪৮-এ যাবতীয় প্রাথমিক উৎসর উল্লেখ পাওয়া যাবে। এ ছাড়া বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে (যেমন, *ললিতবিস্তর*) ও জৈন রচনাতেও লোকায়ত-র কথা এসেছে। *ভগবতী* (২।১।২০) প্রসঙ্গে আলব্রেশ্‌ট্ ভেবের *অনুযোগদ্বারসূত্র* (৫ক) থেকে উদ্ধৃত করেন : "...বৈসেসিয়ং (বৈশেষিকম্), বুদ্ধসাসণং (বুদ্ধশাসনম্), কাবিলং (কাপিলম্) লোগায়তম্ (লোকায়তম্)...।" (১৮৬৭), ২ : ২৪৮।

২৩. টী. ৭, ৩৬৯; আচার্য বি. প্র. লিময়ে (টী. ৪), ১৭-১৯; ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৫), ১৩৯ ইঃ দ্র.।

২৪. "তয়া (= অন্বীক্ষয়া) প্রবর্ত্তত ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্রং।" ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পা., *ন্যায়দর্শন* (টী. ১০), ২৯। ক্ষেত্রেশচন্দ্র লিখেছেন, "...Vātsyāyana... has monopolised the name Ānvīkṣikī for the Nyāya System" (১৪১)।

২৫. *শ্লোকবার্তিক,* ১।১০ : "প্রায়ই মীমাংসাকে জগতে লোকায়তীকৃতা করা হয়। তাকে আস্তিক পথে আনার জন্যে আমি চেষ্টা করছি।" এ বিষয়ে ক্ষেত্রেশচন্দ্রর ব্যাখ্যা হলো : এখানে 'লোকায়তীকৃতা'-র অর্থ বেদপ্রামাণ্য অস্বীকার ; মীমাংসা-রই কিছু ব্যাখ্যাকার এ-কাজ করছিলেন বলে কুমারিল আপত্তি করেছেন। প্রভাকর, কুমারিল দুজনেই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, সুতরাং 'আস্তিক পথে আনা' বলতে 'ঈশ্বরবাদ' বোঝাতে পারে না। ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫২ টী. ৪০ দ্র.।

২৬. ইআকবি (১৯১৮), ১০১-০৯; কঙ্গলে ২ : ৬ টী. ১০, ৩ : ৯৯-১০০, ১৩০; ক্ষেত্রেশচন্দ্র, ১৪০।

২৭. ক্ষেত্রেশচন্দ্র, ১৪১। মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে-ও এই প্রসঙ্গে 'লোকায়ত'-র অর্থ করেছিলেন "logic based on premises derived from ordinary experience (*loka*)", : ৩ : ৪৭। কঙ্গলে এটি মানতে পারেন নি (৩:১৩০)।

২৮. ক্ষেত্রেশচন্দ্র, ১৫২ : '*Lokāyata* was thus nature lore' (ছাপার ভুলে nature এর জায়গায় mature হয়ে আছে)। তিনি এই প্রসঙ্গে রিস ডেভিড্স্-এর অনুরূপ মতের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তুচ্চি আপত্তি করে বলেছিলেন, সংস্কৃতে 'লোক' শব্দটি কখনোই nature অর্থে বসে নি; তার জন্যে 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি' বা 'স্বভাব' ব্যবহার করা হয় (*C/L*, ৩৮৯)।

২৯. *কাদম্বরী,* পরিচ্ছেদ ১৫৩ : 'লোকায়তিকবিদ্যয়ৈব অধর্মরুচেঃ'। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ৮, ১৩৪, ৩৮৯।

৩০. হরিভদ্র, *ষ-দ-স* শ্লোক ৮৫ ('....চার্বাকাঃ প্রতিপেদিরে')। ঐ, কামেশ্বরনাথ মিশ্র সম্পা., ৬৭; শান্তরক্ষিত, *ত-স* ও কমলশীল-এর *পঞ্জিকা,* ২ : ৬৩৯ (শ্লোক ১৮৮৫ প্রসঙ্গে: 'পরৈঃ = চার্বাকৈঃ')।

৩১. "লোকায়তিক ব্রাহ্মণদের তুমি সেবা কর না তো? এই মূঢ় পণ্ডিতম্মন্যরা অনর্থ ঘটানোয় কুশল। অন্য মুখ্য ধর্মশাস্ত্র থাকতেও আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি পেয়ে তারা নিরর্থক কথা বলে।" *রামায়ণ,* অযোধ্যাপর্ব, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পা., ১০৯।২৯-৩০, ১৮৩৩। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-র অনুবাদে সর্গ ১০০। বরোদা প্রামাণিক সংস্করণে (১৯৬২), ৯৪। ৩২-৩৩ ('মূঢ়'-র জায়গায় 'বাল' (=শিশু) আছে)।

৩২. টী. ২২, ১৫১। ক্ষেত্রেশচন্দ্র অবশ্য এই সর্গটিকে 'কাঁচা প্রক্ষেপ', 'clumsy interpolation' বলেই মনে করেন। ইআকবি ও পরশুরাম লক্ষণ বৈদ্যও তা-ই মনে করেছেন। কিন্তু তেরো শতকের আগেই এই প্রক্ষেপ হয়ে গিয়েছিল।

৩৩. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫), ৮০।

৩৪. পুণা প্রামাণিক সংস্করণ, আরণ্যকপর্ব (১৯৪২), ৩৩।১১। বর্ধমান, সিদ্ধান্তবাগীশ ও আর্য্যশাস্ত্র সং.-এ অ. ৩২।

৩৫. গোপীনাথ কবিরাজ, *C/L,* ৪৪৭-৪৯ দ্র.। কবিরাজের *Aspects of Indian Thought*-এও এটি পাওয়া যাবে। প্রবন্ধটি প্রথম বেরিয়েছিল Saraswati Bhavan Studies, Vol.2-তে।

৩৬. "...স্বভাবস্যাপি হঠে এবান্তর্ভাবঃ, ...হঠৈনৈকে চার্বাকাঃ...।" সিদ্ধান্তবাগীশ সং., বনপর্ব্ব (১৩৪০ ব), ২৮।৩৪-এর টীকা।

৩৭. টী. ৩৫ দ্র.।

৩৮. ওয়ার্ডার (১৯৭১), ৩৫ দ্র.।

৩৯. টী. ৩৫, পৃ. ৪৪৯ (*Aspects,* ৬০-৬২)। *ব্রহ্মসূত্র* ২।১।৩৩ প্রসঙ্গে *বেদান্তকল্পতরু*।

৪০. *স-দ-স* (১৯৭৮), ১২-১৩ : "কোন স্থলে ফল প্রাপ্তি (বিষয় প্রাপ্তি) কিন্তু মণি, মন্ত্র

ও ঔষধাদির ন্যায় যাদৃচ্ছিক। অতএব অনুমান সাধ্য অদৃষ্ট (পাপ ও পুণ্য) প্রভৃতিও নাই। আচ্ছা, অদৃষ্ট অনভিপ্রেত হইলে জগতের বৈচিত্র্য আকস্মিক অর্থাৎ কোন কারণ জন্য হইবে না—এই যদি বলি। না—তাহা শোভন নহে, যেহেতু স্বভাববশতঃই জগতের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হইতে পারে।" (পঞ্চানন শাস্ত্রীর তর্জমা, ৭৮, ৮১)।

৪১. দ্রৌপদী অবশ্য শুধু একজন্মর কর্মে আস্থা রাখেন না, জন্মজন্মান্তর কর্ম করলে তবে ফল পাওয়া যায়। তার কর্মর ফল পেতে হলে দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল—এই চারটি জিনিসকে নিজের স্বস্তিবৃদ্ধির জন্যে যুক্ত করতে হয়; কাল ও অবস্থার ভাগ অনুযায়ী কাজের সিদ্ধিলাভ হয় (৩৩।৪৯, ৫৫)।

৪২. শান্তিপর্ব, ১৭২।১১; ২১৫।১৫-৩৫ (কালীপ্রসন্ন সং.-এ যথাক্রমে অ. ১৭৯ ও ২২২)।

৪৩. স্কন্ধ ১০, অধ্যায় ২৪।

৪৪. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯১)-তে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে।

অধ্যায় ১১

মহাভারত-এ বস্তুবাদ : স্থাপন ও খণ্ডন

মহাভারত-এর শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম-পর্বাধ্যায় অংশটি হলো দর্শন-আলোচনার জায়গা। কুরু-পাণ্ডবের গল্পর সঙ্গে সরাসরি তার কোনো যোগ নেই। ইচ্ছামৃত্যুর আগে অবধি ভীষ্ম শুয়ে আছেন শরশয্যায়। আর সেই সুযোগে জগৎ ও জীবনের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন যুধিষ্ঠির। কখনও নিজের কথায়, কখনও অন্যের বয়ানে ভীষ্ম তার উত্তর দেন। এরই মধ্যে এক জায়গায় খুব সংক্ষেপে বস্তুবাদ ও তার খণ্ডনের চেষ্টা দেখা যায়। যতদূর জানি, চার্বাকমত আলোচনায় আজ অবধি কেউ এই অংশটি নজর করেন নি। অথচ এটিই বোধহয় বস্তুবাদ নিয়ে বিতর্ক-র প্রথম নমুনা। *মহাভারত*-এর রচনাকাল বলতে গোটা একটা পর্ব বোঝায়— আটশ বছর ধরে তার বিস্তার। এমনকি এই পর্বর একেবারে শেষ দিকে যদি এটি রচিত হয়ে থাকে, তাহলেও বস্তুবাদী দর্শনের মূল বক্তব্য ও তা নিয়ে ভাববাদীদের আপত্তির আদি-নমুনা এখানেই পাওয়া যায়।

এমন নয় যে, অংশটি প্রক্ষিপ্ত (= পরে যোগ করা)। প্রচলিত সংস্করণের মতো, প্রামাণিক সংস্করণেও এ বিষয়ে নটি শ্লোক আছে।[১] অধ্যায়টির প্রথমে এসেছে সাংখ্যদর্শনের কথা। মিথিলার রাজা জনকের কাছে ঋষি পঞ্চশিখ তার ব্যাখ্যা করছেন। সেই প্রসঙ্গেই বস্তুবাদ ও বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ স্থাপন ও খণ্ডন করা হয়েছে। কোথাও অবশ্য চার্বাক/লোকায়ত/বার্হস্পত্য —এমন নাম নেই। তবে *ভারতার্থদীপিকা* (বা - *প্রদীপিকা*) টীকায় ২১১।২২ শ্লোকটি প্রসঙ্গে অর্জুনমিশ্র বলেছেন, মিথিলার একশজন আচার্য-র (২১১।৪-৫-এ এই একশ আচার্য ও তাঁদের মতের কথা আছে) মধ্যে একজন অসহিষ্ণু, চার্বাকমত আশ্রয় করে, পঞ্চশিখ-এর কথায় আপত্তি করছেন (তেষামাচার্যাণাং শতসংখ্যাকানাং মধ্যে'ন্যতমো সহমানশ্চার্বাকমতাবষ্টম্ভেন প্রত্যবতিষ্ঠতে)।[২] টীকাকার নীলকণ্ঠ-ও প্রথমটিকে 'লোকায়তমত' ও দ্বিতীয়টিকে 'সৌগতমত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

বস্তুবাদ বিষয়ে শ্লোক-কটি খুবই জটিল, খুবই সাঁটে সব কথা বলা হয়েছে।

পাঠভেদও প্রচুর। তাই আক্ষরিক অনুবাদ না-করে, প্রামাণিক সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী একটু ব্যাখ্যামূলক তর্জমা করা হলো।[৪]

প্রথমে পূর্বপক্ষ হিসেবে দেহাত্মবাদী (=দেহছাড়া কোনো অক্ষয় আত্মার নিজস্ব অস্তিত্বে যিনি বিশ্বাস করেন না) বলেন :

১. দেহের বিনাশ চোখে দেখা যায়, সব লোকই তা প্রত্যক্ষ করে। (তা সত্ত্বেও) শাস্ত্রে আত্মার কথা আছে— এই কারণে যারা (দেহ থেকে আলাদা) আত্মার কথা বলে, তারা হেরে যায়। (অর্থাৎ, লোকের অভিজ্ঞতায় আত্মার অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, শাস্ত্রর দোহাই পেড়েই তার কথা বলতে হয়) ২১১।২২॥

২. দেহর মৃত্যুতেই আত্মার শেষ; কষ্ট, জরা, ব্যাধি, ইত্যাদিতে (দেহর সঙ্গেই) তার মৃত্যু ঘটে। মোহগ্রস্ত হয়ে যে-লোক আত্মাকে দেহছাড়া অন্য কিছু ভাবে, তার মত ঠিক নয়।[৫] ২১১।২৪॥

৩. জগতে নেই এমন জিনিস (= দেহছাড়া আত্মা) যদি থাকে, তবে রাজাকে যা বলে স্তুতি করা হয়— তিনি অজর, অমর— তা-ও ফলবে। (অর্থাৎ কোনো মানুষ যেমন অজর-অমর হতে পারে না, তেমনি অক্ষয় আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না)। ২১১।২৩॥

৪. (আত্মা) আছে না নেই— এর কোনো লক্ষণ (সুস্পষ্ট পরিচয়) যখন নেই, মানুষ তবে কী আশ্রয় করে জীবনযাত্রা চালাবে— তা বলুন।[৬] ২১১।২৫॥

৫. কৃতান্ত (= অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্ত) ও ঐতিহ্য (= শাস্ত্র)— দু-এরই মূলে থাকে প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ দিয়েই শাস্ত্র বাধা পায়, (প্রত্যক্ষ ছাড়া) কৃতান্ত-ও কোনো প্রমাণ নয়।[৭] (অর্থাৎ, আত্মাকে প্রত্যক্ষ জানা যায় না, তাই অনুমান ও শাস্ত্রর আশ্রয় নেওয়া বৃথা)। ২১১।২৬॥

৬. যে-কোনো ধরণের অনুমানেই সিদ্ধ (প্রমাণ) হয়— দেহ আছে। আস্তিকরা যে ভাবেন শরীর থেকে আলাদা আত্মা আছে— তা (সিদ্ধ) হয় না।[৮] ২১১। ২৭॥

৭. শুক্র থেকেই (মানুষের জন্ম), ঘি খেয়ে হজম হলে দেহেই শুক্র জন্মায় (তার মধ্যেই মানুষ নিহিত থাকে)— যেমন বটের বীজ (যার মধ্যে পুরো বটগাছ নিহিত থাকে)। জন্ম, স্মৃতি— এ সবই চুম্বক, সূর্যকান্তমণি ও আগুনের জল খাওয়ার মতো।[৯] (অর্থাৎ শুক্র-র মতো জড় বস্তু থেকেও প্রাণের উদ্ভব সম্ভব; তার দৃষ্টান্ত : জড় চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে, সূর্যকান্তমণি থেকেও তাপ বেরোয়, আগুনও জল শুষে নিতে পারে)। ২১১।২৮॥

আস্তিক এবার নাস্তিকের মত খণ্ডন করছেন :

৮. দেহ প্রাণহীন হলে চৈতন্য থাকে না (সুতরাং দেহ ছাড়াও আত্মা থাকতে পারে)। (রোগ হলে) দেবতার কাছে লোকে প্রার্থনা করে (অতএব, দেবতা আছেন)। কেউ মারা গেলে তার সব কাজ (খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি) বন্ধ হয়ে যায় (কিন্তু কর্মফল শেষ হয় না), অতএব নিশ্চিত প্রমাণ : দেহছাড়া আত্মা আছে। ২১১।২৯।।

৯. জগতে যা কিছু মূর্তিমান জিনিস সেগুলি থেকে আপনাদের সব যুক্তি সিদ্ধ হয় না। মর্ত্য (মর, ক্ষয়শীল) বস্তুর সঙ্গে অমর্ত্য (অমর) কোনো কিছু সমান হতে পারে না (অর্থাৎ, জড় থেকে চৈতন্য আসতে পারে না)। ২১১।৩০।।

এর পরেই আস্তিক চলে গেছেন বৌদ্ধমত (ক্ষণিকবাদ) খণ্ডনে।

বস্তুবাদের দুটি মাত্র দিক এই বিতর্কে এসেছে : (এক) দেহ থেকে আলাদা আত্মা বলে কিছু নেই, (দুই) প্রত্যক্ষই সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এর প্রথমটিকে বলা হয় দেহাত্মবাদ বা ভূত-চৈতন্যবাদ, দ্বিতীয়টিকে প্রত্যক্ষ-র প্রমাণজ্যেষ্ঠতা।

এর মধ্যে ৭-সংখ্যক শ্লোকটি বিশেষ করে লক্ষ্য করার মতো। জড় থেকেও চৈতন্যর উৎপত্তি হতে পারে— এর সপক্ষে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এগুলির কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যমূল্য নেই; কিন্তু দেহাত্মবাদী মত প্রতিষ্ঠার তাগিদেই চুম্বক ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে।

আস্তিকও এগুলি অস্বীকার করেন নি। তাঁর বক্তব্য এই : জড় পদার্থর ক্ষেত্রে যা-ই ঘটুক, ক্ষয়শীল বস্তু থেকে অক্ষয় আত্মা দেখা দিতে পারে না। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না— এ কথা মেনে নিয়েও তিনি আত্মার অস্তিত্বর কথা বলেন। এর ফলে তিনি কিন্তু আত্মাশ্রয় দোষে (ইওরোপীয় যুক্তিবিদ্যার পরিভাষায়, *petitio principii,* arguing in a circle) দোষী হয়ে পড়েন। দেহ ছাড়াও আত্মা আছে— এর পক্ষে তাঁর যুক্তি : কেউ মারা গেলেও আত্মার কর্ম শেষ হয় না, এতেই প্রমাণ হয় যে, দেহছাড়া আত্মা আছে। অর্থাৎ, যার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে, তাকেই স্বীকার করে তিনি তাঁর সপক্ষে যুক্তি দেন।

তেমনি, লোকে দেবতার কাছে প্রার্থনা করে— এতেই কি দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ হয়? আত্মবাদী কিন্তু সেই সিদ্ধান্তই করেন। (নীলকণ্ঠ তাঁর টীকায় 'লোক' বলতে লোকায়তিককেই ধরেছেন। অসুস্থ হলে সে-ও নাকি দেবতার কাছে রোগ সারানোর জন্যে প্রার্থনা করে)।[১০]

৭-সংখ্যক শ্লোকটি নিয়ে হপকিন্‌স্‌ একটি প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, এর বক্তব্য নাস্তিকের চেয়ে আস্তিকের মুখেই ঠিক হতো।[১১] তবে নীলকণ্ঠ এটিকে নাস্তিকের

উক্তি বলেই ধরেছেন, তাই হপকিন্‌স্‌ তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। হপকিন্‌স্‌-এর যুক্তি এই : অয়স্কান্তমণি বা চুম্বকের কথা উপমার সূত্রে *মহাভারত*-এরই অন্যত্র এসেছে।[১২] আর তার ঠিক আগেই আছে ফুল থেকে বিশাল গাছ জন্মানোর কথা। একে বলা হয়েছে : অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত-র জন্ম। হপকিন্‌স্‌ এ প্রসঙ্গে *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌* (৩।৯।২৮), *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌* (১।১৫) ইত্যাদির কথাও এনেছেন।

হপকিন্‌স্‌-এর বক্তব্য মানতে একটু অসুবিধে আছে। ব্যক্ত-অব্যক্ত-র ধারণা সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে যুক্ত।[১৩] এখানে কিন্তু বিশেষভাবে দেহাত্মবাদকে খণ্ডন করা হচ্ছে। জৈনরা এই মতকে বলতেন : যা দেহ তা-ই আত্মা— এই মত (তজ্জীব-তচ্ছরীরবাদ)।[১৪] জীব বা আত্মা বলতে এখানে মূলত বোঝায় : চেতনা, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যা শেষ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, যাঁরা দেহ ছাড়াও আত্মার নিজস্ব অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা দেহকে 'জড়' আর দেহ-সংলগ্ন আত্মাকে 'জীব' বলে মনে করেন। তার জন্যে কর্মফলের ধারণাও তাঁদের মানতে হয়। আত্মার দরকার পড়ে কর্মফল ভোগ করার জন্যে (যতদিন-না পাপ-পুণ্যর হিসেব চুকছে ততদিন পুনর্জন্ম হয়ে চলবে)। দেহ তো মৃত্যুর পরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে (হিন্দু প্রথায় শব দাহ করা হয়), অবিনাশী আত্মা না থাকলে কর্মফল ভোগ করবে কে? সে-ক্ষেত্রে তাই প্রত্যক্ষ দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে না, অনুমান ও আগম (= শাস্ত্র, বিশেষ করে বেদ)-এর আশ্রয় নিতে হবে।

মহাভারত-এর এই অংশে দেহাত্মবাদী কিন্তু অনুমানকে নাকচ করে দেন নি। তিনি শুধু বলেছেন, অনুমানের মূলে যদি প্রত্যক্ষ না-থাকে, সে-অনুমান কোনো কাজের নয় (আদালতেও এ ধরণের অনুমানকে স্বীকার করা হয় না)। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ (= যথার্থজ্ঞানের উপায়) বলা হচ্ছে না, যে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ-র ভিত্তিতে অনুমান করা হয়েছে, সেগুলি মানতে দেহাত্মবাদীর কোনো আপত্তি নেই।

এই বিতর্ক হয়েছে মূলত জ্ঞানতত্ত্ব (এপিস্‌টেমলজি)-র চৌহদ্দিতে। মূল দুটি বিষয় ছাড়া, ইহসুখবাদ বা অন্য কোনো নীতি-ঘটিত কথা এখানে ওঠে নি। সরাসরি বেদপ্রামাণ্য-র কথা নেই বটে, কিন্তু আগমে যা আছে তা-ই সত্য— এই মতকে নাস্তিকের মুখ দিয়ে গোড়াতেই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

এককথায়, দেহাত্মবাদ এখানে একটি দার্শনিক মত, কোনো বিকৃতির চেষ্টা করা হয় নি। এর পরে বৌদ্ধমত খণ্ডনের উদ্যোগ থেকে বোঝা যায় এ বিতর্ক খুব পুরনো নয়; দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ক্ষণিকবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রশ্নটি আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। যাঁরা অবিনাশী আত্মায় বিশ্বাসী, তাঁদের কাছে দেহাত্মবাদের মতো বৌদ্ধমতও খুব বড় শত্রু। সেখানেও কোনো স্থায়ী আত্মা স্বীকার করা হয় না;

মানুষের চৈতন্যকে (বৌদ্ধ পরিভাষায় : 'বিজ্ঞান') ক্ষণিক, অর্থাৎ সর্বদাই পরিবর্তনশীল বলে ধরা হয়। আত্মবাদীকে তাই দু-এরই মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

এই অধ্যায়ে, বৌদ্ধদের পরে খণ্ডন করা হয়েছে আর-একটি মত। কোনো নাম না থাকলেও, সেটি ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সঙ্গেই মেলে।[১৫] সব মিলিয়ে বলা যায়: এই অধ্যায়ে মহর্ষি পঞ্চশিখ-এর মুখ দিয়ে যে-আলোচনা করা হলো, তা খ্রিস্ট-উত্তর যুগের তর্ক।

---

১. *মহাভারত*, শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সং., ২১১।২২-৩০; প্রচলিত সং., ২১৮।২৩-৩১। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমান রাজবাড়ি-র অনুবাদেও তা-ই। সিদ্ধান্তবাগীশ সং., ২১৫। ২৫-৩২।

২. প্রামাণিক সং., ১১৬৮-তে উদ্ধৃত।

৩. প্রামাণিক সং., ২১১।২২ ও ২১১। ৩১ সম্পর্কে (প্রচলিত সং., ২১৮।৩২-এর টীকা)। *মহাভারত*-এর যাবতীয় অনুবাদই নীলকণ্ঠ-র টীকা অনুসারে করা হয় (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অবশ্য নিজের টীকা অনুসরণ করেছেন)। শান্তিপর্ব-র প্রামাণিক সংস্করণের সম্পাদক, বেলবলকর সাবধান করে দিয়েছিলেন : নীলকণ্ঠ প্রায়ই আগে-থাকতে-ধরে-নেওয়া ধারণার ভিত্তিতে এমন সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা মানা যায় না (প্রামাণিক সং., সম্পাদকীয় টীকা, একশ সাতান্ন)। অর্জুনমিশ্র প্রমুখের টীকা আজও ছাপা হয় নি। প্রামাণিক সং.-এ এগুলি থেকে যেটুকু উদ্ধৃত হয়েছে সেইটুকুই আমাদের সম্বল।

৪. যে-তর্জমা দেওয়া হলো, একমাত্র সেটিই ঠিক— এমন দাবি করা হচ্ছে না। *মহাভারত*-এর প্রথম ইংরিজি অনুবাদক কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীর মনে হয়েছিল : এই শ্লোককটি হলো ব্যাসকূট : গণেশকে হোঁচট খাওয়ানোর জন্যে ব্যাস এইভাবে এগুলি রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও বর্ধমান রাজবাড়ি— দুটি বাঙলা অনুবাদ সম্পর্কেই তাঁর আপত্তি ছিল, কারণ গোটা মোক্ষধর্ম-পর্বাধ্যায়েই অনুবাদকরা ফাঁকি মেরেছেন : "Of the two Bengali versions, K. P. Singha is undoubtedly better. But there the scholars employed by Babu Singha chose to proceed on a very objectionable plan. They systematically ignored all such passages as gave them any difficulty. It is true they have sins of commission to answer for as well as for sins of omission. But then the latter are so many in number as to have made their labours incomplete. The Burdwan version is very faulty. It is replete with errors of every description." *The Mahabharata,* Santiparva. Vol. II (1891). Notice (I).

বেলবলকরও বলেছেন, নীলকণ্ঠ-র মতো সনাতনী টীকাকাররা সাংখ্যদর্শন বিষয়ে অনেক মৌলিক পার্থক্য এড়িয়ে যান, আর অদ্বৈত বেদান্ত-র সঙ্গে মিলিয়ে সেগুলি ব্যাখ্যা করেন। টীকাকাররা তাঁদের ব্যাখ্যানে কোনোভাবেই একমত হন না।

' "Sāṃkhya" metaphysics for instance occurs, even in the chapters so far published, more than half-a-dozen times with crucial differences in nomenclature and details. Orthodox commentators like Nīlakaṇṭha gloss those differences and interpret them all in consonance with Advaita Vedānta. The commentators by no means agree in their interpretation' (প্রামাণিক সং., সম্পাদকীয় মন্তব্য, আট)।

প্রসঙ্গত বলা উচিত, কিশোরীমোহন গাঙ্গুলীও নীলকণ্ঠকে অনুসরণ করেই অনুবাদ করেছেন, আর অতিব্যাখ্যা ও তর্জমা ছেড়ে দেওয়ার দোষে তিনিও সমান দোষী (প্রচলিত সং., ২১৮।২৮দ্র.। 'নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ'-র কোনো তর্জমা করা নেই)।

৫. এই শ্লোকটির প্রসঙ্গে কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী অভিযোগ করেছেন : কালীপ্রসন্ন সিংহ-র অনুবাদ ভুল, বরং বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদটি ঠিক (সূত্র ৪, ১৭০ টী.)। ঘটনা তা-ই। এই শ্লোকটি নাস্তিকদের মতই প্রকাশ পেয়েছে, যাঁর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, সেই পঞ্চশিখ-এর নয় (কালীপ্রসন্ন সিংহ-র নিযুক্ত অনুবাদক ভুল করে তা-ই ধরেছেন)।

৬. পরমানন্দ ভট্টাচার্যর টীকা (১৩৬০ খ্রি-র পরে) অনুসারে বেলবলকর এই অংশটির (২১১।২৫-২৭) ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : "তা সত্ত্বেও যদি কেউ তর্ক করে : লোকে তার প্রমাণ দিতে না পারলেও কোনো জিনিস থাকতে পারে, ঠিক যেমন আমাদের রাজা এখানে (অর্থাৎ জনক) মনে করেন আত্মা অজর ও অমর, আমরা প্রশ্ন করি, 'আছে' বা 'নেই'-এর অর্থ কী, যেখানে ধারণাটিরই দাঁড়াবার মতো ভিত নেই? জগতের প্রক্রিয়াকে কী করে তা ব্যাখ্যা করবে? তার ভিত্তি কী হতে পারে? প্রত্যক্ষই একমাত্র ভিত্তি যা আমরা [নিজেরা] যুক্তি দিয়ে বার করেছি ও নিশ্চিত হয়েছি, আর তাতেই আমাদের বিশ্বাস করতে বলা হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষ = আগম (শাস্ত্র); আর যুক্তি-দিয়ে-পাওয়া সত্য (কৃতান্ত) প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।" (২১৭১ টী.)

প্রসঙ্গত বলে রাখি, ২১১।২৫ শ্লোকটিকে, নীলকণ্ঠ-র টীকা অনুযায়ী, অনেকেই আস্তিকের বক্তব্য বলে ধরেছেন। কিন্তু ওপরের ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে বোঝা যায় : এখানে নাস্তিকের বক্তব্যই চলছে।

৭. পরমানন্দ ভট্টাচার্যর *মোক্ষধর্ম-টীকা*-য় এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "অতএব প্রত্যক্ষ থেকে আগমও অভিন্ন। আগমও অপ্রত্যক্ষমূলক নয় [অর্থাৎ, শাস্ত্রের মূলেও প্রত্যক্ষ থাকে]। সেটি (যদি প্রত্যক্ষমূলক না-হয়, তবে সেই) কৃতান্ত বা ঐতিহ্য কিছুই না, প্রবাদমাত্র, অপ্রমাণ এই অর্থে।"

৮. এই শ্লোকটির প্রচলিত পাঠ প্রামাণিক সংস্করণে অনেকটাই বদলে গেছে। প্রচলিত অনুবাদগুলির সঙ্গে এটি তাই একেবারেই মিলবে না। এখানে পরমানন্দ ভট্টাচার্যর টীকা অনুসারে তর্জমা করা হলো। নীলকণ্ঠ-র টীকায় বিরক্ত হয়েও হপকিন্‌স্ সেটি মেনে অনুবাদ করেছিলেন :

"Enough of making assumptions based on this or that inference. In the opinion of (us) unbelievers there is no other 'spirit' than the body." (১৯০১, ১৯৭৮), ১৪৬।

প্রচলিত সংস্করণের পাঠে আছে :

যত্র যত্রানুমানে'স্মিন্ কৃতম্ ভবয়তো'পি চ।
নান্যো জীবঃ শরীরস্য নাস্তিকানাং মতে স্থিতঃ।।

প্রামাণিক সংস্করণের পাঠ :

যত্র তত্রানুমানে'স্তি কৃতং ভাবয়তে'পি বা।
অন্যো জীবঃ শরীরস্য নাস্তিকানাং মতে স্মৃতঃ।।

বেলবলকর দেখিয়েছেন, 'অন্যো'-র জায়গায় 'নান্যো'— এই পাঠভেদের কারণ হলো 'নাস্তিকানাং = ন + আস্তিকানাং'— এটি বুঝতে না-পারা। 'কৃতং ভাবয়তে'-র অর্থ, তাঁর মতে, "one reaches the conclusion of non-eternity (কৃতং)"। পরমানন্দ ভট্টাচার্যর টীকায় আছে: "কৃতম্ অনিত্যম্ অচেতনং শরীরং ভাবয়তে সাধয়তি।" অর্থাৎ কৃত = অনিত্য অচেতন শরীর।

অনুমানের ধরণটি ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন : দেহো নাত্মা দৃশ্যত্বাৎ পরবদ্ ইত্যাদ্যনুমানে (যা দেখা যায় (তা-ই আছে)— এই হেতু দেহ আছে, আত্মা নেই— পরবৎ ইত্যাদি অনুমানে)।

পরবৎ (শেষবৎ) অনুমান মানে : কার্য (ফল) থেকে কারণের অনুমান, যেমন ভরা নদী দেখে বৃষ্টির অনুমান। *ন্যায়সূত্র,* ১।১।৫ দ্র.। *চরকসংহিতা* (১।১১।২২)-র দৃষ্টান্ত : গর্ভ দেখে মৈথুনের অনুমান।

৯. সূর্যকান্ত (আক্ষরিক অর্থে : সূর্যের প্রিয়) : এক ধরণের (কাল্পনিক) মণি, যা সূর্যের আলোয় তাপ বিকিরণ করে। হপকিন্‌স্ এর অর্থ করেছেন : আতস কাচ। তাঁর তর্জমায় : "The burning glass (makes fire and so the fiery, active, soul is but a physical Phenomenon)" (টী. ৮, ১৪৭)।

মূলে আছে 'অম্বুভক্ষণম্' (জল খাওয়া)। নীলকণ্ঠ এর অর্থ করেছেন : বড়বানল। (সমুদ্রে হঠাৎ যে-আগুন দেখা যায় তাকে বড়বাগ্নি বা বড়বানল বলে)। বড়বানল-এর বদলে পরমানন্দ বলেছেন : যেমন গরম লোহা ইত্যাদি জলকে শুষে নেয়, তেমনি শরীরও জল ও খাবার খায়। আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগরের (আনু. ১৩৫০ খ্রি) টীকায় বড়বাগ্নি ও গরম বালি ইত্যাদির জল টেনে নেওয়া— দু-এর কথাই রয়েছে।

১০. নীলকণ্ঠ-র কথায় আপত্তি করে বেলবলকর বলেছেন : "This can hardly suit the Lokāyatikas. What is obtained as favour from the deity is really either accidental or the result of strong will-power. Anyhow the fact, being vouchsafed by experiences, has to be admitted, but one need not bring in any supernatural factor: that seems to be the sense" (২১৭১ টী.)।

১১. সূত্র ৮, ১৪৬ টী. ২ ও ১৪৭ টী. ১।

১২. শান্তিপর্ব, প্রচলিত সং., ২১১।৩; প্রামাণিক সং., ২০৪।৩।

১৩. *চরকসংহিতা,* ১।১১।২২-এ এটি হলো সামান্যতো দৃষ্ট (সাধারণত দেখা) অনুমানের নমুনা। বীজ ও অঙ্কুরের উপমাটি *সা-প্র-সূ*-এ নানা প্রসঙ্গে এসেছে (৫।১৫, ৪৮; ৬।৬৭)। 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত'-র পরিভাষা আদি সাংখ্যে দেখা যায়। দাসগুপ্ত, ১ : ২১৪, ২১৬ দ্র.।

পঞ্চশিখ-জনক সংবাদ-এ যে-সাংখ্যদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, *মহাভারত*-এর অন্যত্র তার কিছু উল্লেখ চোখে পড়ে (শান্তিপর্ব, অধ্যায় ২০৩-২১০, ২২৮)। দুটি ক্ষেত্রেই 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' এই পারিভাষিক শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'অব্যক্ত' অর্থে প্রকৃতি, 'ব্যক্ত' অর্থে পুরুষ। তেমনি মনু-বৃহস্পতি-সংবাদ-এ 'অক্ষর' (আত্মা)-কেও 'অব্যক্ত' বলা হয়েছে (১৯৪।২৪,১৯৭।১০)। প্রসঙ্গত বলা যায় : আগুন, বাতাস ইত্যাদি উপাদান স্বভাব-এর ফলেই নিহিত হয় ও বিলীন হয়— এমন কথাও এখানেই (২১২।৭) আছে। *মহাভারত*-এর এই অংশটি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ই. এইচ. জনস্টন বলেছেন, 'স্বভাব' বলতে এখানে জগৎ-কারণ বোঝানো হচ্ছে না, এটি দিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রকৃতিকেই বোঝানো হয়েছে, যার তাড়নায় উপাদানগুলি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, আবার ভৌতশরীরগুলির বিনাশের উদ্দেশ্যে আলাদা হয়ে যায় (প্রামাণিক সংস্করণের ভূমিকা, পৃ. দুশ ছত্রিশ-এ উল্লিখিত)।

১৪. *সূ-কৃ-সূ*, ২।২।৯, ১৮৫।

১৫. অর্জুনমিশ্র মনে করেন, শ্লোক ৩১ থেকে আত্মা বিষয়ে চার্বাকদের আপত্তির (শ্লোক ৩০) জবাব দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে নীলকণ্ঠ বলেছেন, এখান থেকেই বৌদ্ধমতকে পূর্বপক্ষ হিসেবে হাজির করা হলো। তেমনি অর্জুনমিশ্র-র মতে শ্লোক ৪২ থেকে সাংশয়িকদের মত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মনে করেন, বৌদ্ধমতের প্রধান অংশ নিরস্ত করে এবার ন্যায়-বৈশেষিক মতের কিছু অংশ নিরসন করা হচ্ছে। (তাঁর সংস্করণের ২১৫।৪১ প্রসঙ্গে *ভারতকৌমুদী*-টীকা, ২১৪১)।

অধ্যায় ১২

পুরাণে চার্বাক / লোকায়ত

এতগুলি পুরাণ আছে, কিন্তু আশ্চর্যর বিষয়, চার্বাকের নাম তার খুব কম জায়গাতেই এসেছে।[১] কিন্তু বেদ-বিরোধী মতের *বিষ্ণুপুরাণ* (৩।১৮)-এ ভালোভাবেই পাওয়া যায়। তার থেকে একটি শ্লোক (সামান্য পাঠভেদ সমেত) সায়ণ-মাধবের *স-দ-স-য়* উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানেও লেখা আছে : বৃহস্পতি এটি বলেছেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরার মতে, *বিষ্ণুপুরাণ*-এর ঐ অংশটি প্রক্ষিপ্ত।[২] খ্রি ৩৫০-এর পরে কোনো এক সময়ে ঐ পুরাণে এটি ঢোকানো হয় (তার পরের বাক্যেই তিনি অবশ্য বলেছেন, এমনও হতে পারে যে ৫০০ খ্রি-র আগে এটির উৎপত্তি হয় নি)। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, *বিষ্ণুপুরাণ*-এর এই অংশে নাম করে নিন্দে করা হয়েছে দিগম্বর জৈন ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের। বিষ্ণুর তৈরি মায়ামোহ বলে একটি জীব জৈন ও বৌদ্ধ বেশ ধরে দানবদের বিপথে নিয়ে যায়। বৈদিক ধর্ম ও তপস্যা ছেড়ে তারা নিজেরাই বেদ-বিরোধী কথা বলতে থাকে। সেই সুযোগে দেবতারা তাদের আক্রমণ করে হারিয়ে দেন।[৩]

পদ্মপুরাণ-এর সৃষ্টিখণ্ড-য় একটি নতুন গল্প ফাঁদা হয়েছে।[৪] সেখানেও আক্রমণের মূল লক্ষ্য দিগম্বর জৈন, তারপরে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ। বিশেষ করে জৈন-বৌদ্ধ নিন্দার ক্ষেত্রে এখানে *বিষ্ণুপুরাণ*-কেই হুবহু নকল করা হয়েছে।[৫] *পদ্মপুরাণ*-এর গল্পটি বেশ মজাদার। সেটি এবার দেখা যাক।

শুক্রাচার্য মায়াবলে অদৃশ্য হয়েছিলেন। সেই ফাঁকে দেবতাদের অনুরোধে শুক্র সেজে দানবালয়ে হাজির হলেন বৃহস্পতি। একদিন শুক্র সেখানে এসে বৃহস্পতিকে দেখে খাপ্পা। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন : তাঁর রূপ ধরে বৃহস্পতিই দানবদের মায়ামোহিত করে রেখেছেন। বৃহস্পতি হেসে বললেন :

> সন্তি চোরাঃ পৃথিব্যাং যে পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
> এবং বিধা ন দৃষ্টশ্চ রূপদেহাপহারিণঃ।
> বৃত্রঘাতেন চেন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যা পুরাভবৎ।
> লোকায়তিকশাস্ত্রেণ ভবতা সা তিরস্কৃতা।। (১৩।২৯১-৯২)

যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করে, পৃথিবীতে এরূপ চোর অনেক আছে; কিন্তু এরূপ চোর কখনও দেখি নাই, যাহারা রূপ এবং দেহ পর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে। পূর্ব্বে বৃত্রবধে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছিল। তুমিই না, লোকায়তিক শাস্ত্রের আলোচনায় তাহা দূরীকৃত করিয়াছিলে!

(পঞ্চানন তর্করত্ন-র তর্জমা)

দানবরা একবার তাঁকে বললেন : এই অসার সংসারে আমাদের কিছু জ্ঞান দিন, যাতে, হে সুব্রত, আপনার প্রসাদে আমরা মোক্ষ পেতে পারি। শুক্ররূপী বৃহস্পতি তাঁদের উপদেশ দিলেন :

এই যে ঋক্ যজুঃ ও সাম সংজ্ঞক (= নামক) বৈদিকী শ্রুতি আছে, বৈশ্বানরের অর্থাৎ জঠরানলের প্রসাদেই ইহার অবস্থিতি। বস্তুতঃ প্রাণিগণের ইহা দুঃখদায়ক। ঐহিক স্বার্থপর নীচ জনেরাই যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধকার্য্যের প্রবর্ত্তক। সংসারে যে বৈষ্ণব ও সৌরধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ঐ সকল হিংস্রপ্রায় কুধর্ম্ম; কতকগুলি সস্ত্রীক লোক কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। দেখ রুদ্র অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া কিরূপে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন? তিনি ভূতগণে পরিবৃত, এবং যথেষ্ট অস্থিমালায় ভূষিত; সুতরাং তৎসেবী লোকসকল কেবল ক্লেশই অনুভব করে, তাহাদের ভাগ্যে স্বর্গ বা মোক্ষ কিছুই ঘটে না। বিষ্ণু হিংসাকার্য্যে নিরত; তিনিই বা কিরূপে মোক্ষলাভ করিবেন? ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, নিজের সৃষ্টিই তাঁহার উপজীবিকা। বৈদিক পক্ষাবলম্বী অন্য যে সকল দেবর্ষি আছেন; তাঁহারাও হিংসাবহুল, ক্রূর, মাংসাশী ও নিত্য পাপকারী, এতদ্ভিন্ন দেব ও ব্রাহ্মণরাও মদ্যপায়ী ও মাংসাশী। সুতরাং ইহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম দ্বারা কে কিরূপে স্বর্গ বা মোক্ষ লাভ করিবে? শ্রুতিস্মৃতিবিহিত যে সকল যজ্ঞাদি ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম আছে, তাহাতে অপবর্গ (= মোক্ষ) লাভ নাই। এ সম্পর্কে এই প্রকার প্রবাদ শুনা যায় যে যজ্ঞে পশু মারিয়া রুধির কর্দ্দম প্রস্তুত করিয়া যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে নরকে যাইবে কে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসী ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধদান করিলে, তাহার কি অপর খাদ্য আহরণ করিতে হয় না? (হে) দানবগণ! বিপ্রগণ আকাশগামী ছিল, তাহারা মাংসভক্ষণে পতিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের স্বর্গ কিম্বা মোক্ষ কিছুই নাই। জন্মিয়ামাত্র জীবন সর্ব্ব জন্তুর প্রিয় হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি আত্মমাংসোপম অন্য মাংস কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? এই সকল প্রাণী যোনি হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে যোনিসেবা করে? হে দানবেশ্বর! মৈথুন দ্বারা কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে? মৃত্তিকা এবং ভস্ম দ্বারা শুদ্ধি হয়, সেখানে শুদ্ধি কিরূপে থাকে? হে দানব! লোকের বিপরীত ব্যবহার দেখ! যে স্থান হইতে বিষ্ঠা এবং মূত্র ফেলিয়া দিতে হয়, লোকে মৃত্তিকা জল দ্বারা সেই আপান এবং শিশ্নেরই শোধন করিয়া থাকে, পরন্তু যে পথে মল ও মূত্রের উপাদান উদরে প্রবেশ করে, মৃত্তিকা ও জল দ্বারা সেই মুখের তো

তেমন শোধন লোকে করে না। সুতরাং এ কেমন বিপরীত ব্যবহার! যেখানে প্রক্ষালন করা উচিত, সেখানে তাহারা তা করে না। চন্দ্র বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তারার গর্ভে বুধ জন্মিলেন। বৃহস্পতি আবার সেই তারাকেই গ্রহণ করিলেন। গৌতম মুনির পত্নী অহল্যা, স্বয়ং ইন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখ, এ ধর্ম্ম কি প্রকার ও জগতে এইরূপ এবং অন্যরূপ অনেক পাপকর কার্য্য দেখা যায়। ধর্ম্ম যেখানে এই প্রকার, সেখানে আর পরমার্থ কী?

গুরুর মুখে এই 'পরমার্থযুক্ত' কথা শুনে দানবদের কৌতূহল হলো। তাঁরা মুক্তির উপায় জানতে চাইলেন।

প্রচ্ছন্নরূপী দেবগুরু দানবদের এই কথায় চিন্তা করিলেন, আমি এই কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ করিব? কিরূপে আমি এই পাপিষ্ঠদিগকে নরকবাসী করিব? কিরূপ বিড়ম্বনায় ইহাদিগকে বেদ বহির্ভূত করিয়া ত্রৈলোক্যে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিব? বৃহস্পতি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া কেশবকে চিন্তা করিলেন। জনার্দ্দন তাঁহার চিন্তার বিষয় অবগত হইয়া মায়ামোহ উৎপাদন পূর্ব্বক বৃহস্পতিকে দান করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, এই মায়ামোহ নিখিল দৈত্যের মোহোৎপাদন করিবে এবং আপনার সহিত ইহাদের সকলকেই বেদবহির্ভূত করিয়া দিবে। ভগবন এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। এদিকে সেই মায়ামোহ তপোনিরত অসুরগণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বৃহস্পতি অসুরগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন— তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতিভরে এই মুণ্ডিত বর্হিপত্র (= ময়ূরপুচ্ছ) ধারী যোগী দিগম্বর পুরুষ আগমন করিয়াছেন।

গুরু এই কথা বলার পরে মায়ামোহ জৈন ও বিজ্ঞানবাদী (= চরম ভাববাদী) বৌদ্ধমত প্রচার করলেন। যে দুটি শুনে অসুররা বলতে থাকলেন :

হিংসা করিলে ধর্ম্ম হয়, এবাক্য যুক্তিসহ নহে। ঘৃতরাশি অনলে দগ্ধ হয়, ফলপ্রাপ্ত হয় কোবিদকুল (= পণ্ডিত, দক্ষরা)। যজ্ঞহত পশুর জন্য যদি স্বর্গপ্রাপ্তি বিহিত হয়, তবে যজমান কেন স্বীয় পিতাকে নিহত করে না? একজন ভোজন করিলে যদি অপরের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসীর জন্য শ্রাদ্ধ করিলে কৈ প্রবাসীরা তো তাহা গ্রহণ করে না। বহু যজ্ঞ করিয়া দেবত্ব পাইয়া ইন্দ্র তাহা ভোগ করেন একথাও অযৌক্তিক, শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ যদি পবিত্র বস্তু হয়, তবে পত্রভোজী পশুও তো শ্রেষ্ঠ। [গুরু তখন তাদের বললেন:] এই সকল বাক্য লোকের অশ্রদ্ধেয়, তাহা বুঝিয়া এবং তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া মৎকথিত শ্রেয়োনিমিত্ত বাক্যে আস্থা স্থাপন কর। মহাসুরগণ, আপ্তবাক্যসকল আকাশ হইতে নিপতিত হয় না। আমিই বলি আর অন্যেরা বলুক ভবদ্বিধ (=

আপনাদের মতো) ব্যক্তিগণের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বাক্যই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (১৩। ৩৬৬-৭১)

গল্পটি বেশ। বেচারা অসুরেরা ভালো মনে মোক্ষলাভের উপায় জানতে চাইলেন, আর তাঁদের সরলতার সুযোগ নিয়ে বঞ্চনা করলেন দেবগুরু বৃহস্পতি (রজির ছেলেদের নিয়ে এমন ছলনার গল্প *হরিবংশ*-এও আছে)।[৬]

যা-ই হোক, এ গল্পর সমস্যা কিন্তু অনেক। যেমন, বৃত্রাসুরকে ছলে ও কৌশলে মারার দরুন ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল—এ গল্প সকলেরই জানা। কিন্তু 'লোকায়তিকশাস্ত্র' বলতে এখানে নিশ্চয়ই চার্বাকমত বোঝাচ্ছে না, কোনো সম্মানজনক বিষয় বোঝাচ্ছে।[৭] অথচ বৃহস্পতির সঙ্গে 'লোকায়তিকশাস্ত্র'-র একটা যোগও দেখা যাচ্ছে।

পরের অংশটিতে বৃহস্পতি নিজেই দানবদের বিপথে নিয়ে যান। বৈদিক ধর্মর নিন্দা করে তিনি যা বলেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক। বৈদিক ধর্মর কয়েকটি ত্রুটি দেখান তিনি:

১. যজ্ঞে পশুহত্যা ও মদ্যপান।
২. কুৎসিত আচার-আচরণ।
৩. সস্ত্রীক ধর্মপালন।
৪. দেবতাদের অবৈধ যৌনাচার।

এখানেও একটি শ্লোক বিশেষ উল্লেখযোগ্য : "যদি একজনে ভোজন করিলে অন্যের তৃপ্তি হয়, তবে প্রবাসী ব্যক্তিকে শ্রাদ্ধ দান করিলে তাহার কি অপর খাদ্য আহরণ করিতে হয় না?" (শ্লোক ৩২৪)। এই বক্তব্যই অন্য ভাষায় চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে।[৮]

মজার ব্যাপার হলো, মায়ামোহ-র উক্তিতে (বা, মায়ামোহ-র মায়ায় ভুলে দানবরা যখন বেদ, শ্রাদ্ধ ও শাস্ত্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার করতে থাকে) কোথাও অবাধ যৌনাচার ও দেহসুখের সপক্ষে একটি কথাও বলা হয় নি। সেখানে মূল প্রশ্ন : কেন আমরা বৈদিক ধর্ম মানব? তা অযৌক্তিক; কোনো আপ্তবাক্যই নির্বিচারে গ্রহণ করা ঠিক নয়, যুক্তিযুক্ত বাক্যকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত—কে তা বলেছেন সে-কথা অবান্তর।

অথচ পরবর্তীকালে চার্বাক/লোকায়ত দর্শনের প্রবক্তাদের মুখ দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচার করানো হয়েছে ইহসুখবাদ, আর তারই জের টেনে যথেচ্ছ যৌনাচার। হরিভদ্র সূরি, হেমচন্দ্র, কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীহর্ষ ও সায়ণ-মাধব—এঁরা সকলেই চার্বাকদর্শনের সঙ্গে দেহসুখের প্রসঙ্গটি কমবেশি বড় করে দেখিয়েছেন।[৯] অথচ শান্তরক্ষিত ও *স-ম-স*-কার লোকায়ত প্রসঙ্গে তেমন কোনো কথার উল্লেখ করেন নি। জয়ন্তভট্ট চার্বাকদের তীব্র বিরোধী, তাঁদের বিতণ্ডাবাদী বলে নিন্দে করেছেন, বরাক (হীন)

বলে অবজ্ঞা করেছেন, কিন্তু তার পুরোটাই দার্শনিক বিতর্ক প্রসঙ্গে, যৌন শিথিলতার অভিযোগ তিনি আনেন নি।

অন্যদিকে বৃহস্পতি যখন দৈত্যদের বিভ্রান্ত করেন, দেবতাদের অবাধ যৌনসঙ্গম তার অন্যতম বিষয়। মনে হয়, পরবর্তীকালে এই অভিযোগটিই চার্বাক/ লোকায়ত-র ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা আত্মা মানেন না, তাই পরলোক অর্থাৎ স্বর্গ-নরকও মানেন না। সেই সুযোগেই এমন একটা অভিযোগ খাড়া করা হলো : যেহেতু এরা ইহ-স্বর্বস্ব, ইহলোকেই সব সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেয়, সুতরাং এরা কোনো ধর্মর বিধান মানে না, ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে সব রকম অনাচার করে বেড়ায়, আর লোককেও তা-ই করতে বলে। এর সপক্ষে কোনো সূত্র কেউ উদ্ধৃত করেন নি (যেমন করেছেন পরলোক না-থাকা ইত্যাদি বিষয়ে), লোকচলতি একটা ছড়াই একমাত্র সম্বল।[১০] সেখানেও যথেচ্ছ যৌনাচারের কথা বলা হয় নি।

পরে দেখানো হবে, ‘‘যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ’’ ইত্যাদি শ্লোকটিকে নিয়ে তার আদি বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে—দ্বিতীয় পাদ-য় ‘‘নাস্তিমৃত্যোরগোচরম্’’-এর জায়গায় ‘‘ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ’’ বসিয়ে।[১১] এমন অনুমান তাই একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, এক্ষেত্রে জৈন ও বৌদ্ধদের বৈদিক ধর্মাচরণের বিরোধিতাকে চার্বাকমতের অংশ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ পাঠকদের মতো বিদ্বান্‌রাও তাতে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

---

১. *চা-শা-স*-এ পুরাণে উল্লিখিত প্রায় সব উক্তিই পাওয়া যায়। *বি-পু* ও *প-পু* ছাড়া আর কোনো পুরাণের নাম সেখানে নেই।

বি-পু, ৩।১৮-য় ও তারই থেকে নকল করে *প-পু,* সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ১৩-য় চার্বাক / লোকায়তমতের কিছু কথা পাওয়া যায়, কিন্তু *বি-পু*-তে চার্বাক বা লোকায়ত-র নাম নেই। মায়ামোহ-র প্রভাবে, দিগম্বর জৈন ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতবাদ শুনে অসুররা বেদ-যজ্ঞ-পরকাল-এ বিশ্বাস হারালেন—এইটুকুই সেখানে বলা হয়েছে।

তবে *বিষ্ণুধর্মোত্তর* (খ্রি ৪০০-৫০০) ও *দেবীভাগবত* উপপুরাণে (খ্রি ৯৫০-১২০০-র মধ্যে) দুটি নামই আছে। প্রথমটি ‘লোকায়তিকবাক্য’ শব্দটি পাওয়া যায় (১।১০৮।৮), আর রাজা বেন-এর মুখ দিয়ে এই সুপরিচিত বচনটি *বি-ধ*-এই বলানো হয়েছে :

যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্ নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরম্।
ভস্মীভূতস্য শান্তস্য পুনর্ আগমনং কুতঃ। (১।১০৮।১৮ গঘ-১৯ কখ)

পরে যাবতীয় উদ্ধৃতিতেই এই রকমফের দেখা যায় (‘অগোচরম্’-এর জায়গায় ‘অগোচরঃ’, ‘শান্তস্য’-র জায়গায় ‘দেহস্য’)। জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*-তে অবশ্য ‘শান্তস্য’ পাঠও আছে (খণ্ড ২, আহ্নিক ৭, ২৫৭)।

দেবীভাগবত, স্কন্ধ ১২, অধ্যায় ৮-এ 'বেদশ্রদ্ধা-বিবর্জিত'-দের তালিকায় নাম রয়েছে এই কটি সম্প্রদায়ের : বৈষ্ণব, গাণপত্য (= গণেশের উপাসক), কাপালিক, চীন-মার্গরত (= এক ধরণের তান্ত্রিক), দিগম্বর (= জৈন), বৌদ্ধ ও চার্বাক (শ্লোক ৩-৪)।

প-পু, উত্তরাখণ্ড, অধ্যায় ২৩৬ (বঙ্গবাসী সং.; আনন্দাশ্রম সং., অধ্যায় ২৬৩)-এ শিব পার্বতীকে বলছেন, "হে দেবী। তামস শাস্ত্রসমূহের নাম যথাক্রমে কহিতেছি, শ্রবণ কর; এই সকল শাস্ত্রের স্মরণ মাত্রেই জ্ঞানিগণেরও মোহ হয়। প্রথমে আমি পাশুপতাদি শৈব শাস্ত্র কীর্ত্তন করি। তারপর সেই সকল বিপ্র আমার শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া যে সকল শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। কণাদ বৈশেষিক নামক মহাশাস্ত্র কীর্ত্তন করেন; এইরূপ গৌতম ন্যায়, কপিল সাংখ্য এবং বৃহস্পতি অতি গর্হিত চার্ব্বাক শাস্ত্র প্রচার করেন (ধিষেণন তথা প্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতম্)।" শ্লোক ২-৫ গঘ (আনন্দাশ্রম সং.-এ ২৬৩।৬৬-৬৯)।

লক্ষণীয় যে, *দেবীভাগবতপুরাণ*, ১২।৮।৩-৪-এ 'চার্বাক' শব্দটি আছে।

একটি প্রবন্ধে আর.এন.দণ্ডেকর দেখিয়েছেন, পুরাণকাররা জৈনদের যতটা চিনতেন, বৌদ্ধদের (বা অন্য কোনো অবৈদিক সম্প্রদায়কে) ততটা চিনতেন না। লোকায়ত সম্পর্কে আলাদা কোনো কথা পুরাণে খুঁজে পাওয়া শক্ত। 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' এমন কথাও জৈনদের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে। অর্থাৎ, পুরাণকারদের কাছে জৈনরাই ছিলেন বৈদিক ধর্মর প্রধান প্রতিপক্ষ (দণ্ডেকর (১৯৯৩), ৭৩৭-৭৫৩)।

২. হাজরা (১৯৪০/১৯৮৭), ২৫।

৩. *বি-পু*, ৩।১৮।১-২৯।

৪. *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, বঙ্গবাসী সং. (১৩১০), ১২৬-১৩১। ড. হাজরার মতে, আনন্দাশ্রম, পুণা থেকে প্রকাশিত সংস্করণটির (১৮৯৩-৯৪) চেয়ে এই সংস্করণের পাঠ (মূল) পুঁথির সঙ্গে আরও বেশি মেলে (টী. ২, ১২২)।

৫. ড. হাজরার মতে, *মৎস্যপুরাণ* (২৪।৪৩-৪৯), *দেবীভাগবত উপপুরাণ* (৪।১৩) আর *বি-পু* (৩।১৭-১৮) মিশিয়ে *প-পু*-র গল্পটি খাড়া করা হয়েছে (টী. ২, ২৫)। তাঁরই গবেষণা থেকে জানা যায়, এর প্রথমটি সঙ্কলিত হয়েছিল সম্ভবত খ্রি ২৭৫-৩২৫-এ, দ্বিতীয়টি খ্রি ৯৫০-১২০০-য়, তৃতীয়টি খ্রি ১০০-৩৫০-এর মধ্যে (টী. ২, ২৪-২৫, ৩২; হাজরা (১৯৬৩), ২ : ৩৪৩, ৩৪৫) আর, *প-পু*-র এই অংশে *দেবীভাগবত*-এর প্রভাব থাকলে, অংশটি অন্তত খ্রি দশ শতকের পরে রচিত হওয়ার কথা। তেমন অনুমান বোধহয় সঙ্গত হবে না। স্বয়ং এক্ষেত্রে *দেবীভাগবত*-ই অন্য পুরাণগুলির কাছে ঋণী—এমন সিদ্ধান্ত করাই ঠিক।

৬. রজির ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বৃহস্পতি "প্রথমত এরূপ একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রস্তুত করিলেন যাহাতে ঈশ্বরের ও অর্থশাস্ত্রের প্রসঙ্গও নাই। উহা কেবল ধর্ম্মদ্বেষে পরিপূর্ণ (নাস্তিবাদার্থশাস্ত্রং হি ধর্মবিদ্বেষণং পরম্)। ক্ষীণবুদ্ধি রাজেয়গণ (= রজির ছেলেরা) সতত বৃহস্পতিকৃত ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিত। যে তর্কশাস্ত্র নিতান্ত

অসৎ, তাহাই তাহাদিগের একান্ত মনোরম হইল। কথাপ্রসঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইলে তাহাতে তাঁহাদিগের অভিরুচি হইত না। এইরূপে বৃহস্পতিকৃত নব্য গ্রন্থ শ্রবণ করাতে আর তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রহিল না। উপদেষ্টার নিকৃষ্ট উপদেশকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ক্রমশ তাঁহারা যখন নিতান্ত বিমূঢ়, রাগোন্মত্ত ও একান্ত অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির প্রসাদবলে সেই কামক্রোধ-পরায়ণ রাজপুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় দুষ্প্রাপ্য ত্রৈলোক্য রাজ্যে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়া নিবৃতি লাভ করিলেন।" (কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন-র তর্জমা। *মহাভারত*, খিল হরিবংশ পর্ব্ব, অধ্যায় ২৮, পৃ. ৪৬-৪৭)। বলে রাখা ভালো, *হরিবংশ*-র প্রচলিত সং.-এ (বঙ্গবাসী (১৩১২)) ও আর্য্যশাস্ত্র (১৯৭৫-৭৯) সং.-এ এই অংশটি (২৮।৩০ গঘ ৩৪) থাকলেও প্রামাণিক সংস্করণে (পুণা) এটি বর্জিত হয়েছে (২১, ৩২৭*, ১৪৮)। গল্পটি আরও সাঁটে *মৎস্যপুরাণ*-এ আছে। সেখানে অবশ্য বৃহস্পতি কোনো ধর্মশাস্ত্র তৈরি করেন নি, 'বেদবাহ্য হেতুবাদ-সমন্বিত জিনধর্ম' অর্থাৎ বেদছাড়া জৈন তর্কবিদ্যা দিয়ে রজি-র ছেলেদের তিনি মোহগ্রস্ত করেন ('মোহমায়াস')। অধ্যায় ২৪।৪৭-৪৮ দ্র.। এই একই ধরণের গল্প *শিবপুরাণ* ও *লিঙ্গপুরাণ*-এও পাওয়া যায়, সেখানে বিষ্ণু নিজেই নিজের শরীর থেকে মায়াপুরুষ নামে একজন জৈনমুনি সৃষ্টি করেন (দণ্ডেকর (১৯৯৩), ৭৩৮ দ্র.)।

এই ধরণের যাবতীয় গল্পেরই উৎস হলো *মৈত্রী* (মৈত্রায়ণী) *উপনিষৎ*, ৭।৯।

৭. 'নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে' ইত্যাদি। *বি-পু*, ৩।১৮।২৮ = *স-দ-স* (অভ্যংকর-সম্পা. সং.), ১৩, শ্লোক ৩ (অল্প পাঠভেদ আছে)। *শার্দূলকর্ণাবদান*, ১৯-এ অন্য ভাষায় একই কথা পাওয়া যায়।

৮. *প্র-চ*, অঙ্ক ২, শ্লোক ২১ কখ = *স-দ-স*, শ্লোক ৫ ('গচ্ছতামিহ জন্তূনাং' ইত্যাদি)। সামান্য পাঠভেদ আছে।

৯. *ষ-দ-স*, শ্লোক ৮২; *ত্রি-শ-পু-চ*, ১।১।৩৪০-৪৪; *প্র-চ*, ২।২২; *নৈ-চ*, ১৭।৫০, ৬৮, ৬৯; *স-দ-স*, শ্লোক ১ কখ। কিন্তু *নৈ-চ*, ১৭।৪২-৪৩, ৫৮-য় *পদ্মপুরাণ*-এর মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীনিন্দার সমালোচনা করা হয়েছে।

১০. *স-দ-স*, শ্লোক ১ কখ : 'অঙ্গনালিঙ্গনাজ্জন্য সুখম্ এব পুমর্থতা', নারীকে আলিঙ্গন করলে যে সুখ জন্মায় তা-ই পুরুষার্থ (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ)। এর পরের চরণে বলা হয়েছে : 'কন্টকাদি-ব্যথা-জন্যং দুঃখং নিরয় উচ্যতে', কাঁটা ইত্যাদি (ফোটার) ব্যথা থেকে যে দুঃখ জন্মায় তাকেই নরক বলে। এক্ষেত্রে 'পুমর্থতা'র অনুবাদে স্বর্গ লিখলেও ভুল হয় না। এর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট : স্বর্গ বা নরক বলে কিছু নেই। ইহকালে শরীরে যে সুখ-দুঃখের অনুভূতি তা-ই স্বর্গ-নরক। শ্লোকটি উদ্ধৃত করার একটু আগে সায়ণ-মাধব লিখেছেন : নারীকে আলিঙ্গন ইত্যাদি করলে যে সুখ জন্মায় তা-ই পুরুষার্থ (= ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ)। এই সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশে আছে বলে তা পুরুষার্থ নয় এমন মনে করা অনুচিত, অবর্জনীয় দুঃখ (= যে-দুঃখ না পেলে ফল

জন্মায় না) পরিহার করলে যে সুখমাত্র পাওয়া যায় তা-ই সকলের ভোগ করার যোগ্য হয় (৩)। অর্থাৎ, ঐহিক সুখের দৃষ্টান্ত হিসেবেই সায়ণ-মাধব নারী-আলিঙ্গন ইত্যাদির কথা এনেছেন (যেমন তারপরেই এনেছেন কাঁটা বেছে মাছ খাওয়ার দৃষ্টান্ত)। এই দৃষ্টান্তগুলি দিয়ে যথেচ্ছ স্ত্রী-সম্ভোগ বোঝায় না।

১১. এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.।

অধ্যায় ১৩

কামসূত্র-য় লোকায়ত

অনেকেই মনে করেন, লোকায়ত-মত জানার সবচেয়ে পুরনো উৎস—বাৎস্যায়ন-এর *কামসূত্র*।[১] *কামসূত্র*-তেই প্রথম 'লৌকায়তিকরা এই বলেন' (ইতি লৌকায়তিকাঃ) এই বলে ছ-টি সূত্র দেওয়া আছে।[২] এই কটিকে তাই 'বার্হস্পত্যসূত্র' বলে শনাক্ত করা হয়েছে।[৩] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত থেকে শুরু করে সর্বানন্দ পাঠক ও মামোরু নামাই পর্যন্ত প্রায় সকলেই *কামসূত্র*-র অন্তর্গত ছ-টি সূত্রকে খাঁটি বার্হস্পত্যসূত্র বলে মেনে নিয়েছেন।[৪]

কিন্তু এগুলি কি সত্যিই প্রামাণিক?

বাৎস্যায়ন-এর ছ-টি সূত্র

প্রথমে সূত্র ছ-টি দেখা যাক :

১। ধর্ম আচরণ করবে না। ১।২।২৫

২। যেহেতু তার ফল ভবিষ্যতে পাওয়া যায়। ১।২।২৬।

৩। যেহেতু (তা) অনিশ্চিতও। ১।২।২৭।

৪। কোন্ বুদ্ধিমান লোক হাতের জিনিস পরের হাতে দেয়? ১।২।২৮।

৫। আগামীকাল ময়ূর পাওয়ার চেয়ে আজকের পায়রা ভালো। ১।২।২৯।

৬। অনিশ্চিত (= সন্দেহজনক) সোনার টাকার চেয়ে নিশ্চিত (= আসল) রুপোর টাকা ভালো। ১।২।৩০।

কামসূত্র-র পটভূমি

এই সূত্রগুলি বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে *কামসূত্র*-য় এই প্রসঙ্গর পটভূমিটি দেখে নেওয়া ভালো।

প্রথমেই 'কাম' শব্দটি ঠিকমতো বোঝা দরকার। নানা অর্থে শব্দটির ব্যবহার আছে। যেমন, অভিলাষ, ইচ্ছা—সাধারণভাবে এই অর্থে।[৫] আবার পরিভাষা,

techbnical term হিসেবেও শব্দটি ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ দু-ভাবেই দেখা যায়। বাৎস্যায়ন বলেছেন : আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত যে-মন তা পরিচালনা করছে চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়াকে। নিজের নিজের বিষয়ে এদের অনুকূলভাবের যে প্রবৃত্তি, তাকেই কাম বলে (১।২।১১)।[৬] অর্থাৎ কিছু দেখার, শোনার, শোঁকার, খাওয়ার ও ছোঁয়ার জন্যে মনে যে ঝোঁক আসে, সেটি-ই কাম।

আর সঙ্কীর্ণ অর্থে স্ত্রী-পুরুষের যৌন সংযোগের প্রবৃত্তিকেও কাম বলা হয়। *কামসূত্র*-য় শব্দটি এই সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু বইটির গোড়ায় ধর্ম ও অর্থ-র সঙ্গে যখন কাম-এর কথা বলা হয়, তখন সেটি ব্যাপক অর্থেই বসে। অর্থাৎ যে-কোনো রকমের ইন্দ্রিয়সুখই তার আওতায় পড়ে।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে জীবনের তিনটি বর্গ বা বিভাগের কথা বলা হয় : ধর্ম, অর্থ ও কাম। 'ধর্ম' মানে বেদ ও শাস্ত্র মেনে নিত্যকর্ম করা; 'অর্থ' মানে ধনসম্পদ, আর 'কাম' হলো ব্যাপক অর্থে যাবতীয় ইন্দ্রিয়সুখ। পরে এই তিনটি বর্গ-র সঙ্গে 'মোক্ষ' বলে একটি চতুর্থ বর্গ যোগ করা হয়েছিল। যাবতীয় বেদ-অনুগামী দর্শনকে বলা হতো 'মোক্ষশাস্ত্র'। কেউ কেউ অবশ্য মোক্ষকে ধর্ম-রই অংশ (বা ফল) বলে ধরে নেন। জীবনের এই তিনটি (বা চারটি) লক্ষ্যকে বলে 'পুরুষার্থ'।

ত্রিবর্গ : ধর্ম অর্থ কাম

বাৎস্যায়ন হলেন ত্রিবর্গবাদী; ধর্ম, অর্থ, কাম—তিনটিকেই তিনি সমান গুরুত্ব দেন। *কামসূত্র*-র প্রথম অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্রই হলো : ধর্ম, অর্থ, কামকে নমস্কার, ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ। ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রর মতো কামশাস্ত্রও কেন আলোচনার যোগ্য—একথাও তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি কয়েকটি বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করতে বসেন। তার প্রথমটিই হলো লৌকায়তিকদের মত। তারপরে এসেছে কালকারণবাদ (= যে-মত অনুযায়ী কাল অর্থাৎ সময়ই সবকিছু করে; কোনো কিছুর জন্যেই উদ্যোগ বা চেষ্টা বৃথা) ও অর্থচিন্তা (= যে-মতে অর্থকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করা হয়)। এই তিনটি মত খণ্ডন করতে হয়েছে একটিই কারণে : এগুলি ত্রিবর্গবাদী নয়। লৌকায়তিকদের মতো এঁদের মতকেও সূত্র-আকারে উপস্থিত করা হয়েছে। ভাষা ও ভঙ্গি সবক্ষেত্রেই এক।

যেমন, কালকারণবাদীদের ক্ষেত্রে প্রথম সূত্র হলো : অর্থ আচরণ করবে না (১। ২।৩২)। এর পরে আরও পাঁচটি সূত্রে (১।২।৩৩-৩৭) পূর্বপক্ষ হিসেবে তাঁদের মত জানানো হয়। শেষে দুটি সূত্রে (১।২।৩৮-৩৯) আসে তার খণ্ডন।

অর্থচিন্তকদের বেলায়ও প্রথম সূত্র হলো : কাম আচরণ করবে না (১।২।৪০)। এটিও কিন্তু বাৎস্যায়নেরই ভাষা। লৌকায়তিক ও কালচিন্তকদের পূর্বপক্ষ হিসেবে হাজির করার সময়ে একইভাবে তিনি বলেছিলেন : ধর্ম আচরণ করবে না, অর্থ

আচরণ করবে না। আগের মতোই ছটি সূত্রে (১।২।৪০-৪৫) অর্থচিন্তকদের মত বলে পরের দুটি সূত্রে (১।২।৪৬-৪৭) তা খণ্ডন করা হয়েছে।

ধর্ম, অর্থ ও কাম-বিরোধী তিনটি মত বাতিল করে বাৎস্যায়ন একটি শ্লোকে নিজের মতটি রেখেছেন :

> যে কাজ তিন বর্গ-র কাজে দেয় বা দু-বর্গ বা এক বর্গ-র কাজে দেয়, তা করবে। যে কাজ দুটি বর্গকে বাধা দেয় ও এক বর্গ-র কাজ দেয়, তা করবে না।[৭]

এর থেকেই বোঝা যায়, কালকারণিক ও অর্থচিন্তকদের বক্তব্যর মতো লৌকায়তিকদের বক্তব্যও বাৎসায়ন নিজের ভাষায় ও ভঙ্গিতে উপস্থিত করেছেন। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ—দুই-ই বাৎস্যায়নের নিজের রচনা। লৌকায়তিক, কালকারণিক, ও অর্থচিন্তকদের সূত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তিনি দেন নি। তাঁদের বক্তব্য নিজের মতো করে হাজির করেছেন—এইমাত্র।

অথচ এ যাবৎ সকলেই *কামসূত্র,* ১।২।২৫-৩০-কে 'বার্হস্পত্যসূত্র' থেকে অবিকল নেওয়া হয়েছে—এমনই ধরে নিয়েছেন। এই সূত্রগুলির প্রামাণিকতা বা মৌলিকতা নিয়ে কেউই কোনো প্রশ্ন তোলেন নি।

জয়মঙ্গলা-টীকার বিশ্লেষণ

কামসূত্র-র একটি টীকা আছে। সেটির নাম *জয়মঙ্গলা*। রচনাকাল বলা শক্ত। এই টীকাকার ঐ ছ-টি সূত্রর পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে বেশ সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১।২।২৯ হলো ১।২।২৬-এর সঙ্গে যুক্ত একটি 'লোকপ্রসিদ্ধি', অর্থাৎ সকলেরই চেনা প্রবচন। তেমনি ১।২।৩০ হচ্ছে ১।২।২৭-এর সঙ্গে যুক্ত দ্বিতীয় লোকপ্রসিদ্ধি।[৮] তার মানে, ধর্ম আচরণের ফল ভবিষ্যতে পাওয়া যায়, সুতরাং তার জন্যে চেষ্টা করে লাভ নেই—এর সপক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছে একটি প্রবচন : কালকের ময়ূর পাওয়ার চেয়ে আজকে পায়রা পাওয়া ভালো। আর ধর্মাচরণের ফল অনিশ্চিত—এর সপক্ষে আসে অন্য একটি প্রবচন : সন্দেহজনক সোনার টাকার চেয়ে আসল রুপোর টাকা ভালো। ১।২।২৯ ও ৩০ আদৌ কোনো সূত্র নয়, দুটি প্রবচন মাত্র। দুটি বক্তব্যর সমর্থনে এগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ধরণের দৃষ্টান্তকে বলে 'লৌকিক ন্যায়'।[৯] দার্শনিক আলোচনায়, বিতর্কে, টীকাভাষ্যে এমন বহু লৌকিক ন্যায়-এর ব্যবহার দেখা যায়।

লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায়ে চার্বাকদর্শন প্রসঙ্গে সায়ণ-মাধব-ও একটি লৌকিক ন্যায় ব্যবহার করেছেন।[১০] লৌকায়তিকদের দিয়ে সায়ণ-মাধব বলিয়েছেন : "হরিণ আছে বলে কেউ শালিধান বোনো না, এমন নয়; ভিখিরি

আছে বলে কেউ (উনুনে) হাঁড়ি চড়ায় না এমন নয়।" এটি সম্ভবত *কামসূত্র* থেকেই নেওয়া।[১১] অর্থচিন্তকদের মত খণ্ডন করতে গিয়ে বাৎস্যায়নও এই লৌকিক ন্যায়টি উল্লেখ করেছিলেন। *স-দ-স*-য় বাক্যদুটি পরম্পরা পাল্‌টেছে, আর 'যব'-এর বদলে এসেছে 'শালিধান'।

এখানে অন্য একটি সমস্যাও আছে। সায়ণ-মাধব-এর মতে, চার্বাকরা অর্থ ও কাম—দুটিকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন (মতান্তরে, তাঁরা শুধু কামকেই পুরুষার্থ বলতেন)।[১২] তাহলে অর্থচিন্তকদের মত (যাঁরা নাকি বলতেন : কাম আচরণ করবে না) খণ্ডনে যে লৌকিক ন্যায়টি বাৎস্যায়ন উল্লেখ করেছিলেন, সেটি চার্বাক-এর মত হবে কী করে? চার্বাক তো অর্থ-বিরোধী ছিলেন না। প্রসঙ্গত বলা যায়, *জয়মঙ্গলা*-টীকায় ঐ দুটি বাক্যকেও লৌকিক ন্যায় বলেই ধরা হয়েছে।[১৩]

সূত্রগুলি অপ্রামাণিক

তাহলে *কামসূত্র* থেকে লোকায়তমত সম্পর্কে নিখাদ কিছু পাওয়া গেল না। আমরা দেখিয়েছি, লৌকায়তিকদের মত বলে যে ছ-টি সূত্র সেখানে আছে তার দুটি হলো লৌকিক ন্যায় বা প্রবচন, বাকি চারটি বাৎস্যায়ন-এর নিজের রচনা। তার মধ্যেও ১। ২।২৮ আদৌ কোনো সূত্র নয়—আলঙ্কারিক প্রশ্ন মাত্র (বাক্যটির সাদামাটা অর্থ : কোনো বুদ্ধিমান লোকই নিজের হাতের জিনিস পরের হাতে দেয় না)। ১।২।২৭-কেও খাঁটি লৌকায়তিক সূত্র বলে মনে হয় না। চার্বাকরা পরলোকে বিশ্বাসই করতেন না, তাঁদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল : পরলোকের বাসিন্দা নেই তাই পরলোক নেই।[১৪] স্বর্গ-নরক-যজ্ঞের ফল ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁদের মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাঁরা নিশ্চিত জানতেন : এসবই ভুয়ো। এক্ষেত্রেও বাৎস্যায়ন পূর্বপক্ষ হিসেবে তাঁদের বক্তব্য নিজের মতো করেই লিখেছেন।

তবে নিশ্চিত বলা যায় : খ্রি চার শতকে লৌকায়তিক মত বলতে ধর্ম-আচরণের বিরোধী একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বোঝাত।[১৫] ত্রিবর্গ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বাৎস্যায়ন তাই ধর্ম, অর্থ, কাম-এর বিরোধী হিসেবে যথাক্রমে লৌকায়তিক, কালকারণিক ও অর্থচিন্তকদের বেছে নিয়ে, তাঁদের মত খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

কামসূত্র-য় বৃহস্পতি

কামসূত্র-য় বৃহস্পতির নামও এসেছে, তবে লৌকায়তিকদের প্রসঙ্গে নয়। অর্থশাস্ত্র বলতে বাৎস্যায়ন বোঝেন বৃহস্পতি-র অর্থশাস্ত্র, কৌটিল্য-র নয় (ধর্মশাস্ত্র বলতে যেমন শুধু *মনুসংহিতা*)।[১৬] বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্র এখনও পাওয়া যায় নি, তবে কৌটিল্য একাধিকবার তার উল্লেখ করেছেন, মতভেদও জানিয়েছেন।[১৭] তাঁর লেখা

থেকে জানা যায়, বৃহস্পতি সম্প্রদায়ের অর্থশাস্ত্রীরা ত্রয়ী (তিন বেদ)-কে 'বিদ্যা' বলে স্বীকার করতেন না। তবে মুখে সে-কথা বলতেন না, বেদ ছিল তাঁদের সম্প্রদায়ের কাছে 'সংবরণ' (= ঢাকা দেওয়ার উপায়) মাত্র।[১৮] কিন্তু বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রীরা যে খোলাখুলি ধর্মবিরোধী ছিলেন না—এও স্পষ্ট। আসলে সব অর্থশাস্ত্রকারই বোধহয় বাৎস্যায়ন-এর মতো ত্রিবর্গবাদীই ছিলেন। কৌটিল্যও তিন বর্গ-র গুরুত্ব স্বীকার করেন কিন্তু অর্থ-ই তার মধ্যে প্রধান, কারণ ধর্ম ও কাম অর্থর ওপরেই নির্ভর করে।[১৯] কাম আচরণ করবে না—এমন কথা তিনি বলেন নি; বরং বলেছেন, ধর্ম ও অর্থ-র সঙ্গে বিরোধ না-করে কাম-এর সেবা করবে।[২০] অর্থাৎ কৌটিল্যও একবর্গ-বা দ্বিবর্গবাদী নন। তিনি আরও বলে রাখেন : সমানভাবেই তিন বর্গ-র সেবা করা উচিত; কোনো একটি বর্গ-র বেশি সেবা করলে তিন বর্গ-রই ক্ষতি হয়।[২১] কিছু বিষয়ে মতের অমিল থাকলেও, ত্রিবর্গ-র ক্ষেত্রে সব অর্থশাস্ত্রকারই বোধহয় এই কথাই বলতেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মর আওতায় বেদবিশ্বাসী সব অর্থশাস্ত্রকার ও কামশাস্ত্রকারও ত্রিবর্গবাদী ছিলেন।

কালকারণবাদ

কালকারণিক বলতে বাৎস্যায়ন কাদের বুঝতেন? এর কোনো নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*-এর সময় থেকেই জগৎ-কারণ হিসেবে ছ-টি মতের কথা জানা যায় : কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতানি (মাটি, জল, বাতাস, আগুন—এই চারটি ভূত বা তার সঙ্গে শূন্য/আকাশ/ব্যোম-এই পাঁচটি) ও পুরুষ (আত্মা)-বাদ।[২২] পরবর্তীকালে প্রথম পাঁচটি অনীশ্বরবাদী দর্শনকে আর আলাদা চেহারায় দেখা যায় না।[২৩] ঈশ্বরবাদী দর্শনও বৈদিক রূপ ছাড়িয়ে পৌরাণিক রূপ নেয়। তবে বাৎস্যায়ন-এর সময়েও হয়তো কালবাদীরা ছিলেন। *কামসূত্র* থেকে এইটুকু জানা বা বলা যায় : তাঁরা অর্থসংগ্রহর জন্যে উদ্যোগ বা চেষ্টায় বিশ্বাস করতেন না। যদৃচ্ছাবাদী/আকস্মিকত্ববাদী ও নিয়তিবাদী/দিষ্টবাদীদের সঙ্গে তাঁদের তফাত নামমাত্র।[২৪]

তাহলে *কামসূত্র* থেকে লৌকায়তিকদের সম্বন্ধে সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। নতুন করে *বার্হস্পত্যসূত্র* সঙ্কলন বা পুনর্গঠন করতে হলে *কামসূত্র*-র ঐ ছ-টি সূত্রকে বাদ দেওয়াই ঠিক হবে।

সংযোজন

ওয়ার্ডার বলেছেন, লোকায়ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে কামশাস্ত্র-র একটি 'বিশেষ যোগ', special connection ছিল, যদিও কামশাস্ত্র-র সবচেয়ে আগের যে বইটি পাওয়া যায় সেই *কামসূত্র*-য় পরম্পরাগত ব্রাহ্মণদের স্বীকৃত সনাতনী মতই দেওয়া আছে

(ওয়ার্ডার, ৩৮)। ওয়ার্ডার-এর মতে লৌকায়তিকরা অর্থ ও কাম—এই দুটিকেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন, তাই *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-ও 'নিশ্চয়ই লোকায়ত দর্শন থেকে প্রেরণা পেয়েছিল' (৩৯)।

এই দুটি অভিমতই অনুমান মাত্র, প্রমাণ করার মতো কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। বরং এর একটা উল্‌টো ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। লোকায়তমতের কোনো প্রামাণিক বিবরণ হাতের কাছে না থাকায় তার বিরুদ্ধবাদীরা নিজেদের মতো করে একটি কাল্পনিক লোকায়তমত খাড়া করেছিলেন। অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র দুই-ই ইহলোক নিয়ে কারবার করে। এর থেকেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন : লোকায়তিকরা দ্বিবর্গবাদী। সায়ণ-মাধব তা-ই লিখেছেন (টী. ১৬ দ্র.)। অন্যদিকে নীলকণ্ঠ (*গীতাভাষ্য* ১৬।১১) ও কাশ্মীরক সদানন্দ (*অ-ব্র-সি*, ৯৯) বৃহস্পতির নাম করে একটি সূত্র উদ্ধৃত করেন : কাম-ই পুরুষার্থ। ওয়ার্ডার এই প্রভেদকে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি; সায়ণ-মাধব-এর মত সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "Perhaps this is from a different Lokāyata source, giving a slightly different view. Otherwise we must understand that wealth is necessary as a means to pleasure" (৩৯)।

কিন্তু এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, লোকায়তমতের দুটি আলাদা সূত্র না মিললেও তার মত সম্পর্কে প্রামাণিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। লোকায়তিকরা আদৌ পুরুষার্থ-র নিরিখে ভাবতেন কিনা সে-নিয়েই সন্দেহ আছে। আসলে নিজের নিজের অভিরুচি অনুযায়ী, ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে, তারই পরিভাষায় লোকায়তমতের পরিচয় দিতে গিয়ে এই ধরণের মতের অমিল ঘটেছে। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র* ও *কামসূত্র*-য় চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্য ভাবধারাই প্রকাশ পেয়েছে। দুটির লেখকই ত্রিবর্গবাদী। ধর্মবিরোধিতার কোনো লক্ষণই সেখানে নেই—যা কিনা লোকায়তমতের মূল কথা। মজার ব্যাপার হলো, কৌটিল্য ও বাৎস্যায়ন-কে ধর্মশাস্ত্রীরা কখনও দুষেছেন বলে জানা যায় না। অথচ তাঁদের বই-তে নৈতিকতার যে নমুনা দেখা যায় (রাজকোষের স্বার্থে যে-কাউকে খুন করা যেতে পারে, বেশ্যা সঙ্গমে কোনো আপত্তি নেই) তাতে ধার্মিক লোকদের অস্বস্তি হওয়ার কথা। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রীদের সমস্ত কোপই নাস্তিকদের ওপর পড়েছে, কারণ বেদনিন্দাই সবচেয়ে বড় পাপ।

---

১. *কামসূত্র*-র ক্ষেত্রে *জয়মঙ্গলা*-টীকা চৌখম্ভা সং. ও বঙ্গবাসী সং. ব্যবহার করা হলো। মহেশচন্দ্র পাল সম্পা. সংস্করণটি (১৩১৩ ব) হালে আবার ছাপা হয়েছে (নবপত্র, ১৯৮০)। মূল পাঠ মোটের ওপর এক হলেও সর্বদা সূত্রসংখ্যা মিলবে না।

২. ১।২।২৫-৩০ (নবপত্র সং.-এ ১।২।২১-২৪)। ওয়ার্ডার-ও মনে করেন, "The *Kāmasūtra* (1.2.25-30) quotes as Lokāyata a series of succinct prose

statements which may well have been from the original Sūtra, near the point we have now reached" (৩৮)। প্রসঙ্গত বলা যায়, সোমদেব সূরি তাঁর *য-তি-চ-য়* *কামসূত্র* থেকে এই ছ-টি সূত্র প্রায় হুবহু উদ্ধৃত করেছেন (উত্তরখণ্ড, ১২)। শুধু ১।২।২৮-এ 'পরগতং'-এর জায়গায় আছে 'পাদগতং', অর্থাৎ 'কে হাতের জিনিস পায়ে ঠেলে'।

৩. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০ দ্র.।

৪. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *C/L*, ৩৭৭-৮৩-তে পুনর্মুদ্রিত; দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯২৮), সংস্কৃত অংশ, ২-৩; সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ৩ : ৫৫০; নামাই (১৯৭৬), ২৯-৭৪।

৫. *অমরকোষ*, পঙ্‌ক্তি ৪১৭ (২৬১১)।

৬. ইংরিজি অনুবাদে 'কাম'-কে তাই pleasure-ও লেখা হয়। মনিএর-উইলিয়ম্‌স্‌-এর অভিধান দ্র.।

৭. ত্রিবর্গ সাধকং যৎ স্যাদ্ দ্বয়োরেকস্য বা পুনঃ।
কার্যং তদপি কুর্বীত ন ত্বে কার্যং দ্বিবাধকম্।। ১।২।৫১।

৮. চৌখম্ভা সং., ১৯; নবপত্র সং., ৩৬-৩৭। আশ্চর্যর বিষয়, আচার্য বি.প্র. লিময়ে এই ১।২।২৯-৩০-কেই লোকায়তসূত্র বলে উল্লেখ করেছেন, অন্য চারটিকে নয়। গণেশ থিটে সম্পা. (১৯৭৮), ২৯।

৯. "ন্যায় শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। যখন যে কোন ব্যাপার নির্ব্বাহ হয়, তার কোন উপমা প্রদর্শন করিলে, ঐ ব্যাপার তার ন্যায় বলা গিয়া থাকে। ...সংস্কৃতাদি ভাষার মধ্যে কাকতালীয় ইঃ [ইত্যাদি] যে সকল ন্যায়ের উল্লেখ দেখা যায়, উপমারূপ অর্থ লইয়া তাহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বচন রচনা বা বাক্যবিন্যাসকালে কোন ন্যায় প্রয়োগ করিলে ঐ রচনার গাম্ভীর্য্যাদি গুণ প্রকাশ হইতে পারে।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান (১৯৩৭), 'ন্যায়' প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।

জেকব, *লৌকিকন্যায়াঞ্জলি*, প্রথম ভাগ, ৪৪-এ দুটি লোক-প্রসিদ্ধিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পঞ্চানন তর্করত্ন ১।২।২৯-কে " 'অদ্য-কপোতীয়' ন্যায়" বলে উল্লেখ করেছেন (৪০)।

১০. *স-দ-স*, ৪। অন্য প্রসঙ্গেও সায়ণ-মাধব এ ধরণের লৌকিক ন্যায় ব্যবহার করেছেন।

১১. *কামসূত্র*, ১।২।৪৮ : 'বৌদ্ধব্যং তু দোষেষ্বিব ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি যবা নোপান্তে ইতি বাৎস্যায়নঃ।' এই লৌকিক ন্যায়টি বেশ প্রাচীন। পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য*-য় এটি পাওয়া যায়। *লৌকিকন্যায়াঞ্জলিঃ*, দ্বিতীয় ভাগ (টী. ৯), ৪২ দ্র.। জেকব অবশ্য *কামসূত্র*-র কথা বলেন নি। তবে পতঞ্জলি ছাড়াও বাচস্পতিমিশ্র-র *ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্যটীকা* ও *ভামতী* উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন : "The same passage, with a good deal of the preceding context, reappears, without acknowledgement, in the Chārvāka chapter of Sarvadarsanasangraha" (৪২)।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীও এটি লক্ষ্য করেছেন। তবে 'ইতি বাৎস্যায়নঃ, 'বাৎস্যায়ন এই কথা বলেছেন'— এই বাক্যাংশ থেকে তিনি ধরে নেন : উক্তিটির রচয়িতা বাৎস্যায়ন স্বয়ং (টী. ৪, ৪২-৪৩ দ্র.)।

চিমনভট্ট-র *আর্যবিদ্যাসুধাকর*-এ চার্বাকদর্শন-অংশে *স-দ-স*-র পাঠই উদ্ধৃত হয়েছে (৮০)।

১২. *স-দ-স*, ২ : '...নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ মন্যমানাঃ ....চার্বাকমতম্ অনুবর্তমানা এবানুভূয়ন্তে', '...নীতিশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র অনুসারে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ মনে করিয়া... চার্বাকমতের অনুবর্তন দেখা যায়' (পঞ্চানন শাস্ত্রীর তর্জমা)। নীতিশাস্ত্র বলতে অর্থশাস্ত্রই বুঝতে হবে। সদানন্দ (কাশ্মীরক), *অ-ব্র-সি* (৯৯) : 'কামই একমাত্র পুরুষার্থ', কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ।

১৩. 'অয়ং চ ন্যায়ো লোকেষ্বপ্যস্তীতি দর্শয়তি', চৌখম্বা সং., ২৫; নবপত্র সং., ৪৯।

১৪. প্রসঙ্গত বলা যায় *কামসূত্র*, ১।২।২৬ সূত্রটিতে মীমাংসকদের মত উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা বলতেন : অতীতে যে-যজ্ঞ করা হয়েছে, তা ভবিষ্যতে ফল পাওয়ার জন্যে, 'ভূতং ভব্যায়'। বিশদ বিবরণের জন্যে জেকব, তৃতীয় ভাগ, ১০৫-০৬ দ্র.।

১৫. জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*-তে লোকায়তমতের দুটি সূত্র উদ্ধৃত হয়েছে : 'ধর্ম (আচরণ) করার যোগ্য নয়' (ধর্মো ন কার্যঃ), 'তার উপদেশ বিশ্বাস করা উচিত নয়' (তদুপদেশেষু ন প্রত্যেতব্যম্), আহ্নিক ৪ : ৩৮৮। এতকাল যাঁরা বার্হস্পত্যসূত্র পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা কেউই এই দুটি সূত্র ধরেন নি।

১৬. *কামসূত্র*, ১।১।৬-৭।

১৭. কৌটিল্য এমন কয়েকটি অর্থশাস্ত্র-র কথা বলেছেন : বার্হস্পত্য (ছ-বার), ঔশনস (সাতবার), মানব (পাঁচবার), পারাশর (ছ-বার), আম্ভীয় (একবার)। এ ছাড়া নাম করে (যেমন, ভারদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তীপুত্র), বা নাম না-করে (ঊনষাটবার)-'আচার্যাঃ', 'একে' (কেউ কেউ), 'অপরে' (অন্য কেউ কেউ) বলে অন্যান্য মতের উল্লেখ আছে। কঙ্গলে, ৩ : ৪২।

১৮. *কৌ-অ*, ১।২।৫। *কামসূত্র*-র *জয়মঙ্গলা*-টীকায় ১।২।৩১ প্রসঙ্গে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। চৌখম্বা সং., ২১, নবপত্র সং., ৪০। সেখানে কিন্তু এটিকে লৌকায়তিকদের মত হিসেবে হাজির করা হয়। সম্ভবত অর্থশাস্ত্র ও লোকায়তমতের দুই বৃহস্পতিকে এক ধরার ফল।

১৯. ঐ, ১।৭।৬-৭।

২০. ঐ, ১।৭।৩।

২১. ঐ, ১।৭।৫।

২২. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ১।২, ৬।১০; *মৈত্রী (মৈত্রায়ণী) উপনিষদ্*, ৬।১৪-১৫। বরাহমিহির, *বৃ-স*, ১।৭; *ত-র-দী*, প্রস্তাবনা।

কালবাদ ও স্বভাববাদ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯১), ২ : ৪৭-৭০ দ্র.। জ্যোতির্বিদ্ ও আয়ুর্বেদীরা কালকে অদৃষ্টের সঙ্গে এক করে দেখতেন না (ঐ. ৪৮-৫১ দ্র.)। অর্থাৎ লোকায়তিকরা তাহলে একবর্গবাদী।

২৩. র‍্যান্‌ড্‌ল্ অনুমান করেছিলেন, এ সবই লুপ্ত দর্শন : "Some of these 'lost philosophies' (so to speak) were probably fathered by Brahmanical tradition on the Lokāyata or Cārvāka school and some of them are

possibly to be found in the strange assortment of doctrines reviewed in [*Nyāyasūtra*, 4.1]" (১৯৩০), ১৬৭ টী. ৩।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীও অনুমান করেছেন, "কালক্রমে স্বভাব, যদৃচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক মতবাদ আপন স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বার্হস্পত্য মতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল" ((১৯৮২), ২০৩)। অবশ্য যদৃচ্ছাবাদ-ও যে বার্হস্পত্য বা চার্বাকমতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তা বলা যায় না। স্বভাব- ও ভূতবাদ-এর ক্ষেত্রে সে-সম্ভাবনা আরও বেশি।

২৪. বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৬ দ্র.।

অধ্যায় ১৪

হরিভদ্র। *ষড়্-দর্শন-সমুচ্চয়*

ষ-দ-স-এ ছ-টি দর্শনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। গোড়ায় তার তালিকা ছিল এই রকম : বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক ও জৈমিনীয় (= মীমাংসা)। জৈমিনীয় দর্শন নিয়ে আলোচনার শেষে হঠাৎই হরিভদ্র বলেন : কেউ কেউ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক-এর পার্থক্য স্বীকার করেন না; তাঁদের মতে, আস্তিক দর্শন পাঁচটি। সেই অনুযায়ী, ষড়্দর্শনের সংখ্যা পূরণ করার জন্যে তিনি লোকায়তমতের কথা বলেছেন।[১]

একই বই-এর গোড়ায় ও শেষে দু ধরণের সিদ্ধান্ত দেখে একটু অবাক লাগে। তার ওপরে বৌদ্ধ ও জৈনদের আস্তিক বলে ধরাটা আরও আশ্চর্য। *ষ-দ-স*, শ্লোক ৮০-র টীকায় মণিভদ্র/সোমতিলক সূরি[২] আস্তিক-নাস্তিকের ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে : লোকায়তরা নাস্তিক, কারণ তাঁদের বিচারে সর্বজ্ঞ কেউ নেই, মোক্ষ নেই, ধর্ম-অধর্ম নেই, পুণ্য-পাপ, ধর্ম-অধর্ম-র ফলে স্বর্গ-নরকও নেই। এই অর্থেই লোকায়তরা নাস্তিক।

যাই হোক, এবার হরিভদ্র-র চার্বাক-ব্যাখ্যান দেখা যাক। মণিভদ্র/সোমতিলক সূরি-র পাঠই অনুসরণ করা হয়েছে, কারণ তিনি *ষ-দ-স*-র অন্য টীকাকার, গুণরত্ন-র আগের লোক।

১. লোকায়তরা বলেন, দেবতা নেই, নির্বৃতি (= মোক্ষ) নেই, ধর্ম-অধর্ম নেই, পুণ্য-পাপের ফল নেই। ৬।৮০।।

২. এই লোক (= জগৎ) ততদূরই আছে যতদূর তা ইন্দ্রিয়গোচর (= চোখ, কান ইত্যাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়)।

হে ভদ্রে, বহুবিদ্বান্ লোকরা যা বলেন তা 'নেকড়ের পা (-এর ছাপ) দ্যাখো'-র মতোই (অবাস্তব)। ৬।৮১।। [পরে এটি ব্যাখ্যা করা হবে]।

৩. হে জাতশোভনে (= যে আরও সুন্দরী হয়েছে), পান করো, খাও। হে

বরগাত্রি (= যার দেহ সুন্দর), যা অতীত (= হয়ে গেছে) তা তোমার জন্যে নয়। হে ভীরু, যা গত হয়েছে তা আর ফিরে আসে না। এই শরীর (চারটি ভূত-এর) সমুদয় (= সমাহার, মিলন) মাত্র। ৬।৮২।।

৪. তার ওপরে, মাটি, জল, আগুন ও বাতাস—এই চারটিই ভূত। তাঁদের (= লোকায়তিকদের) মতে এই চারটিই চৈতন্যভূমি (= চেতনার ভিত বা উৎপত্তিস্থান), প্রত্যক্ষই প্রমাণ। ৬।৮৩।।

৫. মাটি ইত্যাদি ভূতগুলির সংহতি যেখানে হয় সেখানে দেহ ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। সুরার বিভিন্ন অঙ্গ (= উপাদান) থেকে যেমন মদশক্তি (= মত্ত করে তোলার মতো ক্ষমতা) আসে, তেমনি (ঐ চার ভূত থেকেই) আত্মতা (= আত্মার লক্ষণ অর্থাৎ চেতনার স্থিতি) হয়। ৬।৮৪।।

৬. এইভাবে চার্বাকরা প্রতিপাদন করেন যে মানুষের পক্ষে দেখা জিনিস ছেড়ে না-দেখা জিনিস (পাওয়ার) চেষ্টা নিছক বোকামি। ৬।৮৫।।

৭. তাঁদের (= লোকায়তিকদের) মতে, বাঞ্ছিত বস্তু পাওয়া ও (অবাঞ্ছিত বস্তু) না-পাওয়ার ফলে লোকের যে প্রীতি হয় তা অর্থহীন। (ঐ প্রীতির অনুভূতি) শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। ৬।৮৬।।

৮. সংক্ষেপে এইভাবে লোকায়তমতও নিবেদন করা হলো। সুবুদ্ধি লোকেরা এই বক্তব্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা করবেন। ৬।৮৭।।

রাজশেখর সূরি-ও *ষ-দ-স* নামেই আর একটি বই লিখেছিলেন। সেখানে চার্বাক বিষয়ে হরিভদ্র-র প্রথম পাঁচটি শ্লোক (৮০-৮৪) অল্প পাঠভেদ সমেত দেখা যায়। এরপর পনেরোটি শ্লোকে লোকায়তমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাববাদী বৌদ্ধদের মতোই জৈনরা চার্বাক-বিরোধী ছিলেন। তার মূল কারণ : চার্বাকরা জন্মান্তর-পরলোকে বিশ্বাস করতেন না। এ ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গেই বৌদ্ধ-জৈনদের মিল (যদিও তিন সম্প্রদায়ের পরলোক সংক্রান্ত ধারণা এক নয়)।

এ ছাড়া লোকায়ত প্রসঙ্গে হরিভদ্র একটি দিকের কথা এনেছেন বৌদ্ধদের লোকায়ত আলোচনায় যেটি আসে নি। তা হলো : ইহসুখবাদ (শ্লোক ৮২ দ্র.)। ধর্মীয় বাধানিষেধ না-মেনে ইচ্ছেমতো খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির কথা এখানেই প্রথম এসেছে। পরে জৈন আচার্য হেমচন্দ্র, ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রীহর্ষ থেকে আঠেরো শতকে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য পর্যন্ত অনেকেই ইহসুখবাদকে যথেচ্ছ যৌনাচারের সঙ্গে এক করে হাজির করেছেন।

ইহসুখবাদ ছাড়া আর যে কটি দিকের কথা *ষ-দ-স*-য় এসেছে তার সবই অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে মেলে।

যেমন,

১. দেবতা, মোক্ষ, ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক ইত্যাদিতে অবিশ্বাস (আলাদা করে বেদপ্রামাণ্য অস্বীকারের কথা বলা হয় নি, কারণ জৈনরাও তা অস্বীকার করেন)।

২. দেহাত্মবাদ ও ভূতচৈতন্যবাদ। সুরায় মদশক্তির দৃষ্টান্তটি অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৩]

৩. একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণে আস্থা।

শ্লোক ৮৬-র বক্তব্যটি একটু নতুন : এতে এক ধরণের নির্লিপ্তিবাদী (স্টোইক) মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত স্বভাববাদীদের মধ্যে থেকে এই ধারণাটি নিয়ে লোকায়তমতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[৪] হরিভদ্র যে-ধরণের ইহসুখবাদের কথা বলেছেন (শ্লোক ৮২), তার সঙ্গে এটি পুরোপুরি খাপ খায় না।

এবার শ্লোক ৮১ প্রসঙ্গে টীকাকাররা যে-গল্পটির কথা বলেছেন সেটি দেখা যাক। গুণরত্ন-র গল্পটি এইরকম : একটি লোক তাঁর স্ত্রীকে আস্তিক থেকে নাস্তিক করতে চাইতেন, রোজ তাই নিয়ে অনেক যুক্তি দিতেন। তাতেও স্ত্রী বুঝছেন না দেখে তিনি একটি উপায় বার করলেন। তিনি বললেন, "প্রিয়ে, এই শহরের লোকরা পরোক্ষ বিষয়ে (= যা প্রত্যক্ষ করা যায় না) অনুমান ইত্যাদিকে প্রামাণ্য বলে মনে করেন। লোকে তাঁদের বিরাট বিদ্বান্ বলে ভাবে। তাঁদের বিচারের চাতুরী দ্যাখো।" এই বলে, শহরের দরজা থেকে আরম্ভ করে চৌমাথার মোড় পর্যন্ত রাজপথে, হাওয়ায় সমান হয়ে যাওয়া মসৃণ ধুলোর ওপর, নিজের শরীরের দুপাশে, দুহাতের তিনটি আঙুল দিয়ে তিনি নেকড়ের পা আঁকলেন।

পরের দিন সকালে আস্তিকরা রাজপথে সেই পা-এর ছাপ দেখলেন। বহুবিদ্বান্ লোকরা তাঁদের বললেন, "অন্যভাবে যখন এর ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, তাহলে নিশ্চয়ই রাত্তিরে বন থেকে কোনো একটা নেকড়ে এসেছিল", ইত্যাদি। তখন সেই লোকটি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "প্রিয়ে, নেকড়ের পা দ্যাখো।"

এরপর গুণরত্ন বলেছেন : 'দ্যাখো' মানে 'নিরীক্ষণ করো'। দ্যাখার কী আছে? একজন লোক যেমন বহু লোককে ঠকাতে পারেন, তেমনি যাঁরা ধার্মিক ছদ্মধূর্ত পরবঞ্চনাপ্রবণ (= অন্যদের ঠকানোর দিকে যাঁদের ঝোঁক আছে) তাঁরাও অনুমান, আপ্তবাক্য ইত্যাদি দিয়ে আত্মা ইত্যাদির অস্তিত্বর কথা বলেন। তাঁরাও বহু লোককে স্বর্গলাভ ইত্যাদি সুখের লোভ দেখান; কী খাবে আর কী খাবে না, কে গম্যা (= যৌন সঙ্গমের যোগ্যা), কে অগম্যা, কী হেয় আর কী উপাদেয় ইত্যাদি বলে তাঁদের বিভ্রান্ত করেন। সাধুলোকেরা এসব কথায় কান দেন না। স্বামীর কথা শুনে সেই স্ত্রী সে-মত স্বীকার করলেন।[৫]

সোমতিলক সূরি-র গল্পটি একটু আলাদা, তবে আকাশ-পাতাল তফাত নেই। সেখানে স্ত্রীর জায়গায় আছে প্রেমিকা। তাঁর একবার নেকড়ের পা দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। প্রেমিকটি তখন ধুলোয় নিজের আঙুল দিয়ে নেকড়ের পা এঁকে বললেন, "ভদ্রে, নেকড়ের পা দ্যাখো।" এর পরের অংশটি গুণরত্ন-র ব্যাখ্যার তুলনায় সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বক্তব্য একই। অর্থাৎ লৌকিক বিষয়েও অনুমান যদি ভ্রান্ত হয়, তবে অলৌকিক বিষয়ে কি তার ওপর ভরসা করা যাবে? গুণরত্ন বলেছেন, এর পরের শ্লোকটি (৮৩)-ও ঐ একই পুরুষের উক্তি। স্ত্রীকে তিনি বোঝাচ্ছেন : খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার, কোন্ কাজের কী ফল হবে (অর্থাৎ অতীতে পাপ করলে ভবিষ্যতে নরকে যেতে হবে কিনা)—এইসব নিয়ে ভেবো না। দেহ চতুর্ভূতের সমাহার। মৃত্যুতেই তার শেষ।—এখানেও ঠিক অবাধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের কথা বলা হয় নি; বৃথা পাপের ভয়ে আত্মবঞ্চনা করতে বারণ করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে তাহলে এই দাঁড়াল : চার্বাক/লোকায়ত বলতে খ্রি আট শতকের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট দর্শন গড়ে উঠেছিল। ধর্মশাস্ত্রর বিধি-বিধানকে তা গ্রাহ্য করত না। প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকলে অনুমান যে লৌকিক বিষয়েও ভুল দৃষ্টান্তের কারণ হতে পারে—চমৎকার একটি গল্প দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। ইহলোক ও চতুর্ভূত ছাড়া আর অলৌকিক কিছু এ-দর্শনে স্বীকার করা হয় নি। চেতনাকে জীবদেহের একটি বিশেষ লক্ষণ বলে মনে করা হতো।

এগুলোই প্রাচীন বস্তুবাদের মূল কথা। লোকায়ত-র নাম না-করে এই ধরণের কথা উপনিষদ্ ও অন্যান্য সূত্রেও দেখা যায়।[৬] তারই একটা তত্ত্বগত চেহারা হরিভদ্র-র বিবরণে এক জায়গায় পাওয়া গেল।

আর-একটি কথা। বস্তুবাদী অর্থে চার্বাক শব্দটি জৈনদের মধ্যে হরিভদ্র-ই প্রথম ব্যবহার করেছেন, বৌদ্ধদের মধ্যে যেমন তাঁরই সমকালীন লেখক, কমলশীল।[৭]

---

১. *য-দ-স,* শ্লোক ৭৮-৭৯ (সুআলি সং., ২৯৯)।

২. আগে এই টীকাকারকে মণিভদ্র নামেই জানা ছিল। কিন্তু দলসুখ মালবণিয়া ((১৯৬৯), ২১) জানিয়েছেন এই টীকার লেখক সোমতিলক সূরি।

৩. শঙ্করাচার্য, *শা-ভা,* ৩।৩।৫৩; কেউ কেউ পান, সুপুরি, চুন ইত্যাদির সহযোগে পিচ-এর দৃষ্টান্তও দিয়েছেন (*অ-ব্র-সি,* ৯৯)।

৪. *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সং., ১৭২।১১ (প্রচলিত সং., অধ্যায় ১৭৯) ও ২১৫। ১৫-৩৫ (প্রচলিত সং., অধ্যায় ২২২) দ্র.।

৫. *ত-র-দী,* ৩০৩-৩০৪। গল্পটি মহাযানী-বৌদ্ধদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। *লোকতত্ত্বনির্ণয় / মধ্যমকাবতার* ও *মধ্যমকবৃত্তি*-তে এটি পাওয়া যায়। এ ছাড়া

নাগার্জুন-এর *মধ্যমকশাস্ত্র*, ১৬১ ও ১৮৬-র বৃত্তি (= ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-তে ভাববিবেক ও চন্দ্রকীর্তি-ও এটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। *মধ্যমকশাস্ত্র*, ২ : ৬৪-৬৫ দ্র.। *সাংখ্যকারিকা* ১৭-র *মাঠরবৃত্তি*-তেও শ্লোকটির প্রথম চরণ উদ্ধৃত হয়েছে। *মহাভারত*-এও পরোক্ষে এই গল্পটির কথা আছে (শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সং., ১৩২।১ গ ঘ-২ কখ; প্রচলিত সং., ১৩৪।২। বৃকপদ-র গল্পটি না-জানায় নীলকণ্ঠ এই শ্লোকটির ভুল ব্যাখ্যা করেছেন (প্রচলিত সং., ১৫০৫)।

৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ১১৫-৩০; হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৩), ৬৯-৮৬ দ্র.।

৭. এই বই-এর অধ্যায় ১৫ দ্র.।

অধ্যায় ১৫

শান্তরক্ষিত ও কমলশীল। *তত্ত্বসঙ্গ্রহ ও পঞ্জিকা*

বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত-এর *তত্ত্বসঙ্গ্রহ (ত-স)* ও তার টীকা কমলশীল-এর *পঞ্জিকা* প্রথম ছেপে বেরয় ১৯২৬-এ।[১] ভারতীয় দর্শন গবেষণার ইতিহাসে এই দুটি রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। আট শতকে কোন্ কোন্ দর্শনতন্ত্র ভারতে প্রচলিত ছিল, কারা ছিলেন সেগুলির প্রতিনিধি, ঠিক কী বলেছিলেন তাঁরা—এই সমস্ত বিষয় জানার পক্ষে *ত-স* ও *ত-স-প* এক খনিবিশেষ।[২]

শান্তরক্ষিত-এর জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তা তিব্বতী ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে। আট শতকের মধ্যভাগে পূর্বভারতে রাজত্ব করতেন গোপাল ও ধর্মপাল। সেই সময়ে শান্তরক্ষিত ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়। এরপর তিনি চলে যান তিব্বতে। ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতের রাজাকে বুঝিয়ে ওদন্তপুরী মহাবিহারের আদলে সেখানে তিনি একটি মহাবিহার স্থাপন করান। প্রথম যুগের তিব্বতী বৌদ্ধ দার্শনিকরা এখান থেকেই বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা পেতেন, মূল সংস্কৃত রচনার তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়েছিল এখান থেকেই। শান্তরক্ষিত ন শতকের প্রথম দশকে তিব্বতে মারা যান।

ত-স বইটি বিশাল—মোট শ্লোকসংখ্যা ৩৬৪৬ (বা ৩৬৪৫, বারাণসী সং. দ্রষ্টব্য)। তার মানে চরণসংখ্যা ৭২৯২ বা ৭২৯০। অধ্যায় সংখ্যা ২৬। এই পুরো বইটির প্রতিটি শ্লোক ধরে ধরে টীকা লেখেন শান্তরক্ষিত-এর শিষ্য ও তিব্বতযাত্রায় তাঁর একমাত্র সঙ্গী, কমলশীল। কমলশীল এরকম আরও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছিলেন।

শান্তরক্ষিত ছিলেন যোগাচারপন্থী বৌদ্ধ দার্শনিক।[৩] যোগাচার দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি তাঁর সমকালীন যাবতীয় দর্শনতন্ত্র খণ্ডন করেছেন। প্রথমে এসেছে জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলি—যেমন প্রকৃতি (নিরীশ্বর সাংখ্য), ঈশ্বর, একই সঙ্গে প্রকৃতি ও ঈশ্বর (সেশ্বর সাংখ্য), স্বভাব, শব্দব্রহ্ম (বৈয়াকরণ মত), পুরুষ (বেদপন্থী)। এর পরে এসেছে আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের (ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা, সাংখ্য, দিগম্বর জৈন, অদ্বৈত বৈদান্তিক, বৌদ্ধ বাৎসীপুত্রীয়)

ধারণা বিচার। এরপর এমন নানা প্রসঙ্গ পেরিয়ে এসেছে বিপক্ষর মত খণ্ডন। অধ্যায় ২২-এর নাম হলো : 'লোকায়ত-পরীক্ষা'। এর প্রথম পনেরোটি শ্লোকে[৪] আছে লোকায়ত মতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তারপর তিরানব্বইটি শ্লোক জুড়ে চলেছে তার খণ্ডন। চার্বাকমত সম্পর্কে শান্তরক্ষিত লিখেছেন :

> যদি এখানে (এই লোকে) এমন কোনো অনুগত ভাব (= যার অস্তিত্ব অব্যাহত) না থাকে, তাহলে পরলোকী (= পরলোকের অধিবাসী, আত্মা)-র অভাবে (না থাকায়) পরলোকও থাকবে না।। ১৮৫৬।।
>
> দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি প্রতিক্ষণেই বিনাশ পায়, তাহলে পরলোকিত্বও ঠিক নয়। আপনারা (বৌদ্ধরা) তো আর কিছু (যেমন, অনাদি অনন্ত আত্মা) মানেন না।।১৮৫৭।।
>
> তাহলে বিশেষ কয়েকটি ভূত থেকে যেমন শুক্ত (অম্ল), টক, সুরা (= মাতাল করার শক্তি) ইত্যাদি (দেখা দেয়), তেমনি সেগুলি (বিশেষ ভূতগুলি) থেকে জ্ঞান জন্মায় বা ব্যক্ত হয় (প্রকাশ পায়)।।১৮৫৮।।
>
> মাটি ইত্যাদির বিশেষ সন্নিবেশকেই দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়; এ ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব (= মূল বস্তু) নেই।।১৮৫৯।।

এই কটি শ্লোকে দেহছাড়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে, জ্ঞান বা চেতনাকে ধরা হয়েছে কয়েকটি ভূত-এর 'বিশেষ সন্নিবেশ' বলে। আর দেহছাড়া আত্মা না-থাকলে পরলোক বলেও কিছু থাকে না। এইভাবে একই সঙ্গে পরলোক ও পরলোকী—দুটি ধারণাকেই বাতিল করা হয়।

> বিবাদের বিষয় এমন দুটি (= অতীত দেহ ও বর্তমান দেহ) চেতঃ (= চিত্ত, মন—ব্যাপক অর্থে চেতনা)-র মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই, কারণ তারা দুটি আলাদা দেহে রয়েছে, যেমন গরু আর ঘোড়া-র জ্ঞান (= চেতনা)-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।। ১৮৬০।।
>
> বিজ্ঞান (চেতনা) বিজ্ঞান-এরই কার্য (ফল) হতে পারে না, কারণ সে-জ্ঞান অন্য সন্তান (= প্রবাহ)-এর সঙ্গে যুক্ত।। ১৮৬১।।

এই দুটি শ্লোকে পূর্বজন্মর ধারণাকে বাতিল করা হয়। যুক্তিটি এই : প্রতিটি দেহর সঙ্গেই তার জ্ঞান অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। এক দেহ থেকে অন্য দেহে একই জ্ঞান যেতে পারে না। যেমন গরুর জ্ঞান আর ঘোড়ার জ্ঞান আলাদা-আলাদা ব্যাপার, তেমনই দুটি আলাদা মানুষের জ্ঞানও আলাদা।

> রাগ (= আসক্তি) সমেত মরণ-উন্মুখ চিত্ত অন্য একটি চিত্তের সন্ধি (= মিলন) ঘটায় না, কারণ এটি ক্লেশ-শূন্য (কোনো ব্যক্তির) মরণজ্ঞানের মতোই [যে-চিত্তর আর পুনর্জন্ম হয় না]।। ১৮৬২।।

এখানে ভবিষ্যৎ জন্মও বাতিল করা হলো।

প্রাণ, অপান ইত্যাদি (বায়ু) অধিষ্ঠিত আছে এমন কায়া (দেহ) থেকেই জ্ঞান জন্মায়—কম্বলাশ্বতর যে-কথা বলেছেন তা-ই ঠিক।।১৮৬৩।।

কলল (আদি-ভ্রূণ) ইত্যাদির মধ্যে বিজ্ঞান (= চেতনা) আছে—এ কথা বলতে সাহস লাগে (কারণ তা মিথ্যে)। ইন্দ্রিয়ত্ব না সঞ্জাত হলে সেখানে (ভ্রূণ ইত্যাদির মধ্যে) কোনো অর্থ (= বিষয়) অবগত হওয়া যায় না।। ১৮৬৪।।

অর্থ অবগত হওয়া ছাড়া জ্ঞান (চেতনা)-এর অন্য কোনো রূপ নেই। এর জন্যই মূর্ছা ইত্যাদি অবস্থায় কোনো সম্ভাব (চেতনার অস্তিত্ব) উৎপন্ন হয় না।। ১৮৬৫।।

(নিহিত) শক্তি রূপেও ধী (চেতনা) তখন (ভ্রূণ অবস্থায়) থাকে না। কোনো আশ্রয় না-থাকলে শক্তির স্থিতি কল্পনা করা যায় না।। ১৮৬৬।।

জ্ঞান (চেতনা)-এর আধার এমন কোনো আত্মা যেহেতু নেই, দেহই তার (চেতনার) আশ্রয়। সবশেষে দেহ নিবৃত্ত হলে (মারা গেলে) জ্ঞানবৃত্তি কাকে আশ্রয় করবে?।। ১৮৬৭।।

অপর দেহ যদি দেখা না যায়, কী করে জানা যাবে যে অন্য দেহটি সেই আত্মারই আশ্রয়?।। ১৮৬৮।।

সেই বিজ্ঞান (চেতনা), যা অন্য দেহে রয়েছে তা কেমন করে একই সন্ততি (প্রবাহ)-তে যুক্ত হবে? হাতি, ঘোড়া ইত্যাদির চিত্তর মতোই (সেই চিত্ত-ও তো আলাদা)।। ১৮৬৯।।

সেই কারণে জ্ঞানের আশ্রয় রূপে উৎপত্তিহীন, বিনাশহীন (দেহ থেকে দেহান্তরে) চলমান মানুষ (আত্মা) বা চূড়ান্ত নাস্তিকতা (পরলোক নেই এই মত)—(এই দু-এর একটিকে) মানতে হবে।। ১৮৭০।।

বোঝাই যাচ্ছে, চার্বাকমতের সঙ্গে বৌদ্ধমতের মূল তফাত এক জায়গায় : পরলোক স্বীকার করা হবে, না হবে না। বৌদ্ধরা অমর আত্মায় বিশ্বাস করেন না, তাঁদের দর্শনকে তাই বলা হয় অনাত্মবাদী।[৫] কিন্তু তাঁরা জন্মান্তর মানেন! প্রত্যেক ব্যক্তির যে চিত্ত, সেটি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে চলে। সেই পরিবর্তমান চিত্তই এক দেহ থেকে আর-এক দেহে যায়।[৬] চার্বাকরা প্রশ্ন তুলেছেন : সেই চেতনা যদি ক্ষণিকও হয়, এক দেহ থেকে আর-এক দেহে তা যায় কী করে? অমন দেহ থেকে দেহান্তরগামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতে গেলে ক্ষণিক আত্মার চেয়ে চিরন্তন অমর আত্মায় বিশ্বাস করা ভালো। তা না-পারলে পুরোপুরি নাস্তিক (পরলোক ও পরলোকী—দু-এতেই অবিশ্বাসী) হতে হবে। এরই খেই ধরে চার্বাকরা বলেছেন : দেহ না থাকলে, ক্ষণিক বা অমর কোনো চেতনাই থাকে না। সপ্রাণ দেহ থেকেই জ্ঞান অর্থাৎ চেতনার উৎপত্তি হয়। মাটি, জল, বাতাস আর আগুন—এই চারটি ভূতের মিলনেই দেহ, বুদ্ধি (চেতনা) আর ইন্দ্রিয় জন্মায় বা ব্যক্ত হয়।

১৮৬৪-১৮৬৬-এই তিনটি শ্লোক আসলে সরাসরি উদ্ধৃতি। *শ্লোকবার্ত্তিক* বইটিতে মীমাংসাপন্থী দার্শনিক, কুমারিলভট্ট যা লিখেছিলেন, শান্তরক্ষিত সেই কথাগুলো এখানে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন।[৭]

আবার এও দেখার, দেহ থেকে দেহান্তরে বুদ্ধি (চেতনা) কী করে সঞ্চারিত হয়—সে-সম্পর্কে বৌদ্ধদের মত নিয়ে নৈয়ায়িকদেরও আপত্তি ছিল। *ন্যা-ম*-তে জয়ন্তভট্ট এ বিষয়ে যা লিখেছেন, চার্বাকের মুখ দিয়ে শান্তরক্ষিত-ও অন্য ভাষায় সেই কথাগুলোই বলিয়েছেন। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছেন এলি ফ্রাঙ্কো।[৮]

এখন, চার্বাকদেরই কোনো বই থেকে কুমারিলভট্ট ঐ শ্লোক-কটি (অন্তত তাদের ভাবটুকু) নিয়েছিলেন, নাকি কুমারিল-এর শ্লোকগুলোই শান্তরক্ষিত হুবহু উদ্ধৃত করেছিলেন, অথবা কুমারিল ও শান্তরক্ষিত দুজনেই একই উৎস থেকে শ্লোকগুলি পেয়েছিলেন—এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত করার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে একটি কথা পরিষ্কার : ধর্মকীর্তি ও তাঁর টীকাকাররা সকলেই বিরোধীপক্ষ হিসেবে চার্বাকদের স্থির করেছিলেন। শান্তরক্ষিত-ও এক্ষেত্রে তাঁদেরই অনুসরণ করবেন—এমন হওয়াই স্বাভাবিক।

দেহছাড়া আত্মা, অতীত জন্ম, অনাগত জন্ম আর শরীর থেকে চিত্ত (চেতনা)-র উৎপত্তি—এর প্রথম তিনটির সমর্থনে আর চতুর্থটির বিরোধিতা করে শান্তরক্ষিত ১৮৭১ থেকে ১৯৬৩—মোট তিরানব্বইটি শ্লোক খরচ করেছেন। তার টীকায় ও চার্বাকমত-স্থাপন অংশে (শ্লোক ১৮৫৬-৭০) কমলশীল মোট ন-টি চার্বাকসূত্র উদ্ধৃত করেছেন। তার সাতটি এর মধ্যেই দুটি বার্হস্পত্যসূত্র-সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৯]

১. পরলোকের বাসিন্দা নেই, তাই পরলোক নেই।
২. মাটি, জল, আগুন আর বাতাস-ই চারটি তত্ত্ব।
৩. সেগুলি থেকেই চৈতন্য (আসে)।
৪. সেগুলির মিলিত রূপেরই নাম : বিষয় ও ইন্দ্রিয়।
৫. কায়া থেকেই (চিত্ত দেখা দেয়)।
৬. ততদূর অবধিই পুরুষ (আত্মা) যতদূর তা ইন্দ্রিয়গোচর।
৭. ইহলোক আর পরলোকের শরীরের ভিন্নতার কারণে সেই দু-এর চিত্ত একই সন্তান (= প্রবাহ) নয়।

এর মধ্যে একমাত্র শেষটিই শুধু *ত-স-প*-য় পাওয়া গেছে, বাকি সবকটি (একই ভাষায় বা একটু অন্য ভাষায়) অন্যত্রও পাওয়া যায়।

কমলশীল আরও দুটি চার্বাকবচন উদ্ধৃত করেছেন, কোনো অজানা কারণে সেগুলি এতকাল বিদ্বান্‌দের নজর এড়িয়ে গেছে :

৮. অন্য দেশ, অন্য কাল ও অন্য অবস্থাই পরলোক। (শ্লোক ১৮৭১-এর টীকা প্রসঙ্গে)

৯. (অতীত) জন্মর স্মরণ অসিদ্ধ; যেহেতু এক গ্রাম থেকে আসা সকলের স্মরণই (এক হয়)। (শ্লোক ১৯৪৫-এর টীকা প্রসঙ্গে)

শেষেরটির ক্ষেত্রে পরিষ্কার "চার্বাক যেমন বলেছেন" (যদুক্তং চার্বাকেণ) লেখা সত্ত্বেও কেন এটি এতকাল কারও নজরে পড়ে নি তা খুবই আশ্চর্য।

চার্বাকের কথা আবার এসেছে অনুমান-পরীক্ষা অধ্যায়ে (অধ্যায় ১৮)। শান্তরক্ষিত এখানে এমন অনেক দার্শনিকের মোকাবিলা করেছেন অনুমানকে যাঁরা পাকা প্রমাণ বলে মানতে রাজি নন। এই প্রসঙ্গে তিনটি শ্লোকে (১৪৮১-১৪৮৩) একটি মত খণ্ডন করা হয়েছে। কমলশীল-এর টীকা থেকে জানা যায় : সেটি পুরন্দর-এর মত। পুরন্দর নামে একজন চার্বাকপন্থী দার্শনিকের নাম অন্যত্রও পাওয়া গেছে। তিনি একটি 'চার্বাকসূত্র' সঙ্কলন করেছিলেন; সেটিকে 'পৌরন্দসূত্র' বলে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া, তার একটি বৃত্তিও (সংক্ষিপ্ত টীকা) তিনি রচনা করেছিলেন—এমন কথাও বলা হয়েছে। কমলশীল তাঁর টীকায় সম্ভবত সেই বৃত্তি থেকেই একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন।

এ ছাড়া একটি শ্লোকে অনুমান প্রসঙ্গে অন্য একটি মত উল্লেখ করেই পরের একটি শ্লোকে সেটিকে খণ্ডন করা হয়েছে (শ্লোক ১৪৮৪-৮৫)। কমলশীল-এর টীকা থেকে জানা যায় : এখানে শান্তরক্ষিত-এর লক্ষ্য ছিলেন অবিদ্ধকর্ণ নামে এক দার্শনিক। অবিদ্ধকর্ণ-র বইটির নাম *তত্ত্বটীকা*। শ্লোক ১৪৫৮-র ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে কমলশীল বইটির নাম উল্লেখ করেছেন, ১৪৮৪-র টীকায় তার থেকে উদ্ধৃতও করেছেন।

অবিদ্ধকর্ণ-র নাম অন্যত্রও পাওয়া গেছে। সেখানে তাঁকে নৈয়ায়িক বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে একই অবিদ্ধকর্ণ প্রথমে নৈয়ায়িক পরে লোকায়তিক হয়েছিলেন (বা তার উল্‌টো), নাকি দুজন আলাদা অবিদ্ধকর্ণ ছিলেন—এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। পুরন্দর-এর মতো অবিদ্ধকর্ণ-রও কোনো বই এখনও পাওয়া যায় নি। তাই জোর দিয়ে কোনো মতের সপক্ষেই কিছু বলা শক্ত।

অনুমান-পরীক্ষা অধ্যায়ে, শ্লোক ১৪৫৫-৬৬ অংশের সম্পাদকীয় শিরোনাম দেওয়া হয়েছে "অনুমান প্রামাণ্য বিষয়ে বার্হস্পত্যাদির মত"। ১৪৫৫-র গোড়াতে বলা হয়েছে : "কেউ কেউ কিন্তু বলেন যে অনুমান প্রমাণ নয়।" 'কেউ কেউ'-এর ব্যাখ্যায় কমলশীল লিখেছেন : "বার্হস্পত্য প্রমুখ" (বার্হস্পত্যাদয়ঃ)। এর পরের শ্লোকটির ব্যাখ্যায় কমলশীল বলেন : "সব চার্বাকরাই যুক্তি দেন" (তাবচ্ চার্বাকাঃ প্রমাণয়ন্তি)। এরও পরে, ১৪৫৯, ১৪৬০, ১৪৬১—এই তিনটি শ্লোক আসলে ভর্তৃহরি-র *বা-প* থেকে হুবহু উদ্ধৃতি (ঠিক যেমন কুমারিল-এর *শ্লোকবার্ত্তিক* থেকে

তিনটি শ্লোক 'লোকায়তপরীক্ষা' অধ্যায়ে উদ্ধৃত হয়েছিল। কমলশীল কিন্তু তাঁর টীকায় বলেন নি যে এগুলি কুমারিল-এর বই থেকে নেওয়া)।[১০]

ত-স-প-য় কমলশীল একটি সূত্র উদ্ধৃত করেছেন : "অনুমান প্রমাণ নয়" (শ্লোক ১৪৫৫ প্রসঙ্গে), যদিও এটি চার্বাকের নাম করে উদ্ধৃত হয় নি। আবার অন্য একটি অধ্যায়ে ('স্বতঃপ্রামাণ্য-পরীক্ষা', অধ্যায় ২৫) লোকায়তিকদের নাম করেই "প্রত্যক্ষই প্রমাণ, অনুমান (কোনো প্রমাণ) নয়" এমন একটি বচনও উদ্ধৃত হয়েছে (শ্লোক ২৯৬৮-র টীকা প্রসঙ্গে)। *ন্যায়বিন্দু-পূর্বপক্ষ-সংক্ষেপ* বইটিতে এই কমলশীল-ই "অনুমান প্রমাণ নয়" সূত্রটিকে বৈয়াকরণদের (অর্থাৎ ভর্তৃহরি-র অনুগামীদের) উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন, চার্বাক বা লোকায়তিকদের নাম ঘুণাক্ষরেও করেন নি।[১১] সুতরাং ঐ তথাকথিত বার্হস্পত্যসূত্রগুলি (দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীয় সঙ্কলনে সূত্র ৬, ২০, ২৫; নামাই-এর সূত্র A 14, A 13) আদৌ প্রামাণিক কিনা—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে।

এর আগে পুরন্দর-এর কথা বলা হয়েছে। তাঁর রচনা থেকে কমলশীল একটি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। সেটি এই : "লোক-প্রসিদ্ধ অনুমানকে চার্বাকরাও স্বীকার করেন, কিন্তু লৌকিক মার্গ ছাড়িয়ে যা অনুমান করা হয় তাঁদের আপত্তি সেইখানে।"[১২]

এই পরিষ্কার বক্তব্য সত্ত্বেও চার্বাক-বিরোধীরা নির্বিকারচিত্তে বলে যান : চার্বাকরা নাকি কোনোরকমের অনুমানই মানেন না। অথচ এর পরেও চার্বাকদের সাধারণভাবে অনুমান-বিরোধী বলা অসঙ্গত।[১৩]

স্বভাববাদ বিষয়ক অধ্যায়টিকে ('স্বাভাবিক-জগদ্বাদ-পরীক্ষা', অধ্যায় ৪) কেউ কেউ চার্বাক-খণ্ডনের অঙ্গ বলে মনে করেন।[১৪] কিন্তু স্বভাববাদ বলতে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল বোঝেন কার্যকারণ-সম্পর্কহীনতাকে, উপনিষদের যুগে যাকে যদৃচ্ছাবাদ ও আরও পরে আকস্মিকত্ববাদ বলা হয়েছে। একথা ঠিক যে, আদিতে 'স্বভাব' ছিল কাল, নিয়তি, যদৃচ্ছা ইত্যাদির মতোই এক নিরীশ্বরবাদী দর্শন। অবশ্য তা কতটা প্রণালীবদ্ধ রূপ পেয়েছিল বা আদৌ পেয়েছিল কিনা—তা বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। একটা সময়ের পরে স্বভাববাদের বস্তুবাদী দিকটি ক্রমেই পেছনে পড়ে যায়—হঠবাদ বা ঐ ধরণের নামে এটি *মহাভারত*-এ বারে বারে আসে। স্বভাববাদ বলতে হাত-পা ছেড়ে বসে থাকা, আবার উদ্যোগী হওয়া—দুই-ই বোঝানো হয়েছে। বিশেষ করে উদ্যোগ নেওয়ার সঙ্গে বৃহস্পতি নামটিও যুক্ত।[১৫] সব মিলিয়ে তাই স্বভাববাদ বলতে কেউ কেউ চার্বাকমতকেই বোঝান, যদিও প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে অনেক প্রাচীন।

অধ্যায় ৪-এ শান্তরক্ষিত আসলে অহেতুবাদ-এরই বিচার করেছেন—তার সঙ্গে চার্বাকমতের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অধ্যায় প্রসঙ্গে কমলশীল-এর টীকাতেও

চার্বাকপন্থী কোনো দার্শনিকের নাম বা উদ্ধৃতি নেই। সুতরাং চার্বাক প্রসঙ্গে এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করা বেকার।

সব মিলিয়ে একটি কথা অবশ্যই বলা যায় : অন্য যে-কোনো দার্শনিকের চেয়ে শান্তরক্ষিত অনেক বেশি বিষয়মুখী (অব্জেকটিভ)। চার্বাকমতকে তিনি কোথাও বিকৃত করেন নি (অন্তত স্থাপনের সময়)। তাঁর লেখাতেই আমরা কম্বলাশ্বতর বলে এক দার্শনিকের নাম পাই।[১৬] তাঁর রচনা থেকেই প্রথম জানা যায় যে আট শতকের মধ্যেই *চার্বাকসূত্র*-র অন্তত দুজন টীকাকার দেখা দিয়েছিলেন। "সেগুলি থেকেই চৈতন্য"—এই সূত্রটির শেষে কোন্ ক্রিয়াপদ বসবে এ বিষয়ে দুটি মত চালু ছিল। কেউ বলতেন : 'জন্মায়' (জায়তে), অন্য কেউ কেউ বলতেন : ব্যক্ত হয় (ব্যজ্যতে)।[১৭]

আর কমলশীল-এর কাছে তো আমাদের ঋণ আরও বেশি। তিনিই পুরন্দর-এর একটি সম্পূর্ণ বাক্য উদ্ধৃত করেছেন, মোট এগারোটি লোকায়তসূত্র/লোকায়ত-বচন উদ্ধৃত করেছেন (তার মধ্যে দুটি অবশ্য নিঃসংশয় নয়)।[১৮] বিশেষ করে ভাববাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে চার্বাকদের যে কতটা বিরোধ বেধেছিল— *ত-স-প* না- থাকলে তা আন্দাজই করা যেত না। অবিদ্ধকর্ণ-র নাম অন্যত্র পাওয়া গেলেও তাঁর বইটির নাম একমাত্র কমলশীল-ই উল্লেখ করেছেন, আর তার থেকে উদ্ধৃতি তো উপরি লাভ। যে-কোনো ব্রাহ্মণ্য বা জৈন সূত্রর চেয়ে এই বৌদ্ধ রচনাদুটি চার্বাকমত পুনর্গঠনের কাজে বেশি সাহায্য করে।

---

১. ১৯৬৮-তে বইটির অন্য এক সংস্করণ বার করেছেন পণ্ডিত দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী (বারাণসী সং.)। ১৯৮১-তে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বরোদা সংস্করণের ইংরিজি অনুবাদ করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট থেকেই বেরিয়েছিল (দুখণ্ডে) ১৯৩৭-৩৮-এ। মোতীলাল বনারসীদাস, দিল্লী থেকে ১৯৮৬-তে এটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

২. *ত-স*-র ইংরিজি অনুবাদ শেষ করে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা-র মনে হয়েছিল : বইটি খানিক হতাশ করে, কারণ এতে শুধুই তর্কাতর্কির খবর আছে; পরমত খণ্ডন করে গোঁড়া বৌদ্ধ মতবাদ স্থাপন করা ছাড়া বইটিতে আর কিছু নেই! (ভূমিকা, দশ)।

৩. বৌদ্ধ দর্শন কালক্রমে চারটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মধ্যমক। এদের প্রথম দুটি বাস্তববাদী (রিয়ালিস্ট), বস্তুজগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়; পরের দুটি একান্ত ভাববাদী, বস্তুজগতের অস্তিত্বই মানা হয় না। মধ্যমকদের তাই শূন্যবাদীও বলা হয়, আর যোগাচারদের বলা হয় বিজ্ঞানবাদী। এই 'বিজ্ঞান' মানে 'চেতনা', *সায়েন্স* নয়।

৪. বরোদা সং.-এ শ্লোকসংখ্যা ১৮৫৭ থেকে ১৮৭১, আর বারাণসী সং.-এ ১৮৫৬ থেকে ১৮৭০। এরপর বারাণসী সং.-এর শ্লোকসংখ্যাই উল্লেখ করা হবে।

৫. বেদপন্থী ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের তফাত বোঝাতে রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিনটি দিকের ওপর জোর দিয়েছিলেন : অ-সৎ (অনিত্য), অ-চিৎ (অন্-আত্মা) ও অন্-আনন্দ (দুঃখ) : উপনিষদের সচ্চিদানন্দ (সৎ+চিৎ+আনন্দ)-এর ঠিক উল্‌টো ধারণা। কেউ কেউ (যেমন, সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ) বৌদ্ধ দর্শনকে হিন্দু দর্শনের রকমফের বলে চালাতে চান। তাঁদের লক্ষ্য করে রাহুল ন্যায্যতই খানিক বিদ্রূপ করেছেন ((১৯৭৪), ১০৫-০৬ দ্র.)।

৬. চিত্ত-র জায়গায় অনেক সময় 'বুদ্ধি' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে; এটিও চিত্ত, চেতনা, চৈতন্য ও বিজ্ঞান শব্দর সমার্থক।

৭. *মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিক*, আত্মবাদ, অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৬৫-৬৭, (১৯৭৯), ৬৫৬।

৮. *প্রমাণবার্ত্তিক*-এ পুনর্জন্মবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মকীর্তি যাঁদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, তাঁরা আসলে চার্বাকপন্থী—এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, ধর্মকীর্তি ও তাঁর টীকাকাররা একই সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিক আর মীমাংসকদের তাঁদের শত্রুপক্ষ বলে গণ্য করেছেন—এই হলো ফ্রাঙ্কো-র অভিমত। তিনি লিখেছেন, "Even though the Nyāya-Vaiśeṣikas and Mimāṃsakas admitted the doctrine of *rebirth*, they nevertheless criticized the Buddhists with arguments that bear a baffling resemblance to those of the Cārvākas". ফ্রাঙ্কো (১৯৯৭), ৯৯।

৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৫৯/১৯৮২), ২০০-০১ ও নামাই (১৯৭৬), ২৯-৪৪।

১০. ত-স-র অন্যত্র কুমারিল-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি থাকলে কমলশীল কিন্তু তার লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন, নিজেও বহুবার বহু প্রসঙ্গে কুমারিল থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। লোকায়ত-খণ্ডন প্রসঙ্গে শ্লোক ১৯১৯-এ তিনি আবার ১৮৬৪ (*শ্লোকবার্ত্তিক*, ১৮৬৫) অংশত উদ্ধৃত করেছেন (শান্তরক্ষিত যেমন করেছিলেন), কিন্তু সেখানেও কুমারিল-এর নাম নেই।

১১. মূল সংস্কৃত বইটি আর পাওয়া যায় না, তবে *তন্‌জুর*-এর তিব্বতী তর্জমায় এটি পাওয়া গেছে। তার থেকে সংস্কৃত রূপ পুনরুদ্ধার করেছেন সঞ্জিতকুমার সাধুখাঁ (এখনও অপ্রকাশিত)। তাঁর সৌজন্যে এই অংশটি দেখার সুযোগ হয়েছে। কমলশীল লিখেছেন : "অনুমানে'পি বিপ্রতিপত্তির্যথা—নানুমানং প্রমাণং ভ্রান্তিসম্ভবাদ্ ইতি বৈয়াকরণাঃ' (*পিকিং তন্‌জুর*, পত্র ১১৫ ক। ড. সাধুখাঁর পাণ্ডুলিপিতে, ১৭)।

১২. পুরন্দর-এর বাক্যটিতে 'চার্বাক' শব্দটি লক্ষ্য করার মতো। খ্রিস্টীয় যুগে ভারতীয় বস্তুবাদীরা নিজেদের 'চার্বাক' বলে পরিচয় দিতেন—এই তথ্য এর থেকে স্পষ্ট হয়। শুধু নামের মিল দেখে *মহাভারত*-এর চার্বাকের সঙ্গে একটি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করা খুবই কাঁচা ভুল—যদিও বহু বিদ্বান্ এই ভুলটি করে আসছেন।

১৩. এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৯), ৪৮৫-৯৭ দ্র.।

১৪. *C/L*-এ ত-স-র অধ্যায় ৪, ১৮, ২২ তিনটিই স্থান পেয়েছে।

১৫. এই বই-এর অধ্যায় ৮ দ্র.।

১৬. এঁর পরিচয় সম্পর্কে অবশ্য কিছুই বলা যায় না। ফ্রাঙ্কো অনুমান করেছেন : ইনি

আনুমানিক খ্রি ৫৪০-এ তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখে থাকতে পারেন ((১৯৯৭), ৯৯)।

১৭. পরে জৈন দর্শনবিদ প্রভাচন্দ্র একই কথা জানিয়েছেন। *C/L*, ৩০৪-৩১৮ দ্র.।

১৮. "প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ" আর "অনুমান প্রমাণ নয়"—এই দুটি সূত্র খাঁটি 'চার্বাকসূত্র' না হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয়টি ভর্তৃহরি তথা বৈয়াকরণ দার্শনিকদের মত; প্রথমটি চার্বাকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ তাঁরা প্রত্যক্ষ ছাড়াও লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার করতেন।

অধ্যায় ১৬

শঙ্করাচার্য। *শারীরকভাষ্য* ও অন্যান্য রচনা

লোকায়ত সম্বন্ধে যেটুকু জানা যাচ্ছে তার এক প্রধান উৎস—শঙ্করাচার্য-র রচনা। ঘটনা ও রটনা মিলিয়ে তাঁর জীবন সম্পর্কে অনেক কথা চালু আছে।[১] তিনিই নাকি ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত করেন, দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় (গিরি, পুরী, ভারতী, অরণ্য ইত্যাদি) তাঁরই সৃষ্টি, ভারতের চার প্রান্তে চারটি কেন্দ্রীয় মঠ ও কুম্ভমেলাও তিনিই আরম্ভ করেন। এ ছাড়া প্রধান কয়েকটি উপনিষদ্ ও *গীতা*-র বিস্তৃত ভাষ্যরচনাও তাঁরই কীর্তি। আরও কিছু বই তাঁর নামে চলে। কিন্তু তার সবকটি প্রামাণিক কিনা—সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

দার্শনিক দিক থেকে শঙ্কর ছিলেন বৈদান্তিক অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের প্রবক্তা। বাদরায়ণ-এর *ব্রহ্মসূত্র* হলো বেদান্তদর্শনের মূল সূত্রগ্রন্থ। এর বহু ভাষ্য লেখা হয়েছে। সব ভাষ্যকার সব বিষয়ে একমত নন। তাই এক-এক ভাষ্যকারকে কেন্দ্র করে বেদান্ত দর্শনের এক-একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে—অদ্বৈতবাদী, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ইত্যাদি। শঙ্কর হলেন অদ্বৈতবাদী ধারার গুরু। তাঁর অনুগামীরা সসম্ভ্রমে তাঁকে 'ভগবৎপাদ' বলে উল্লেখ করেন।[২] তাঁরই প্রভাবে বেদান্ত বলতে অনেকে শুধু অদ্বৈত বেদান্তকেই বোঝেন। শঙ্করাচার্য-র *ব্র-সূ-ভা*-কে নতুন করে পরিচিত করান রাজা রামমোহন রায়। তাঁরই সম্পাদনায় *ব্র-সূ*-র *শারীরকভাষ্য* প্রথম ছেপে বেরয় বাঙলা হরফেই (১৮১৮)। এটিই হলো *শা-ভা*-র আদি সংস্করণ, *editio princeps*।

ভাষ্য-র নাম 'শারীরক' কেন? চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "শরীর শব্দের উপর কুৎসার্থে কণ্ প্রত্যয় করিয়া শারীরক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শারীরক শব্দের অর্থ কুৎসিত শরীরবাসী জীবাত্মা"[৩] এর থেকেই বোঝা যায় লোকায়ত দর্শন সম্পর্কে শঙ্করের মনোভাব কী হবে। লোকায়তমতের আর-এক নাম দেহাত্মবাদ। তার মানে, দেহ ছাড়া আত্মা (চেতনা) থাকতে পারে না; দেহর মৃত্যু হলে 'আত্মা' বলে আর কিছু থাকে না। আর শঙ্কর এই জীবজগতের সব কিছুকেই মনে করেন মায়া। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তা-ই পরমাত্মা। জীবের যে আত্মা, তা-ও আলাদা কিছু নয়—সেই পরমাত্মারই অংশ। আত্মা-ই একমাত্র সত্য, আর সব কিছু

মিথ্যা। এর জন্যেই এই মতকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ; আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে তিনি 'মায়া' বলেছেন (মায়া = জাদুকরের ভেলকি), তাই তাঁর মতকে মায়াবাদ-ও বলা হয়। ফলে লোকায়ত আর অদ্বৈত বেদান্ত-র ফারাক একেবারে আকাশ-পাতাল।

শঙ্করের মতবাদকে অনেকে ভারত-আত্মার শ্রেষ্ঠ বাণীরূপ বলে মনে করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সুলেখক ছিলেন, উপমার হাত ছিল অসাধারণ, বিতর্কেও পেছপা ছিলেন না। সাংখ্য আর ন্যায়-বৈশেষিক-কে তিনি আক্রমণ করেছেন কোনো কিছুর রেয়াত না-করে। তবু মনে রাখা ভালো ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অদ্বৈত বৈদান্তিকরা একটি উপসম্প্রদায়মাত্র। এমনকি বেদান্তদর্শনের অন্যান্য সব উপসম্প্রদায়ও তার বিরোধী। এ ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায় শঙ্করের প্রভাবে শুকিয়ে মরে যায় নি। পরে, বিশেষ করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের অনুগামীরা অদ্বৈত বেদান্তর বিরুদ্ধে বিতর্কে যোগ দেন। তার থেকেই সৃষ্টি হয় নব্যন্যায়-এর।[৪] তেমনি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়েরও (বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ইত্যাদি) নিজস্ব দর্শনতন্ত্র ছিল। অদ্বৈত বেদান্তকে কোনোদিনই দর্শনের সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া হয় নি।

শঙ্কর যে-মত প্রচার করেছিলেন তা খুব মৌলিক নয়। বৌদ্ধ দর্শনের এক ভাববাদী ধারা, শূন্যবাদ থেকেই ভারতে তার সূচনা। এর জন্যে *পদ্মপুরাণ*, উত্তরখণ্ডে মায়াবাদ-কে 'অসৎ শাস্ত্র' ও 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়েছে।[৫] রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা অনুমান করেছেন, এমন আখ্যা দেওয়ার পেছনে দ্বৈতবাদী রামানুজপন্থীদের হাত থাকতে পারে।[৬] এ ছাড়া *ব্র-সূ*, ২।২।২৯-এর *অণুভাষ্য*-য় আচার্য মধ্ব-ও বলেছেন, শূন্যবাদীদের শূন্যর সঙ্গে মায়াবাদীদের ব্রহ্মর কোনো তফাত নেই। মীমাংসকদের মধ্যে পার্থসারথিমিশ্র ও নৈয়ায়িকদের মধ্যে জয়ন্তভট্টও মহাযান বৌদ্ধমতের সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের মিল লক্ষ্য করেছেন।[৭]

মীমাংসক ও পৌত্তলিক উপাসকদের সঙ্গে কোনো কোনো ব্যাপারে শঙ্কর আপস করেছেন। পরমাত্মাকে একমাত্র সত্য (পারমার্থিক) বলে মানলেও, 'ব্যাবহারিক সত্য' বলে একটি ধারণাকেও তিনি স্বীকার করে নেন। আর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কুমারিলভট্ট-র মতকেই তিনি মেনে চলতে বলেন ('ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ')। একদল বৈদান্তিক আবার সত্যর এই দুটি রূপ—প্রাতিভাসিক (ব্যাবহারিক) ও পারমার্থিক (পরমার্থ বিষয়ক)— মানতে রাজি নন। তাঁরা শঙ্করেরও এককাঠি বাড়া। এই সম্প্রদায়ের নাম 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী'। পারমার্থিক সত্তা ছাড়া আর কোনো সত্তাকে তাঁরা স্বীকার করেন না।[৮]

শঙ্কর সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে মূল কথাগুলি বলা হলো। এতে হয়তো সকলের মন ভরবে না। কিন্তু এখানে শঙ্কর নিয়ে আলোচনা করতে বসি নি। শঙ্কর কী চোখে লোকায়ত দর্শনকে দেখেছিলেন—এইটুকুই বোঝার। এবার আমরা সে-আলোচনায় যাব।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, খ্রি আট শতকেই 'লোকায়ত' অর্থে 'চার্বাক' নামটি দেখা যায়, কিন্তু শঙ্কর কোথাও ঐ নামটি ব্যবহার করেন নি। দেহাত্মবাদ বা ভূতচৈতন্যবাদ-এর প্রসঙ্গে তিনি 'লোকায়তিক' শব্দটি ব্যবহার করেন। *ব্র-সূ-ভা*-য় লোকায়তিক/লৌকায়তিক ছাড়া আর কোনো শব্দ আসে নি। *গীতাভাষ্য*-তেও লৌকায়তিক শব্দটি এসেছে। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্* (৪।৩।৬)-এর ভাষ্যে তিনি স্বভাববাদীদের কথা তুলেছেন। তাঁর টীকাকার আনন্দগিরি-র মতে, এখানে লোকায়তিকদের মত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৯]

এক-এক করে এগুলি দেখা যাক।

লোকায়তিক = অজ্ঞ লোক!

ব্র-সূ, ১।১।১-এর ভাষ্যে শঙ্কর বলেছেন : লোকে ব্রহ্ম-আত্মার কথা জানে বটে, কিন্তু তার বিশেষ স্বরূপ সম্পর্কে নানা মত আছে। নমুনা হিসেবে তিনি বলেছেন : প্রাকৃতজন (সাধারণ লোক) ও লোকায়তিকরা ঠিক করে রেখেছেন : চৈতন্যবিশিষ্ট দেহটুকুই আত্মা। অন্যরা বলেন : সচেতন ইন্দ্রিয়গুলি আত্মা। অন্যরা বলেন : মন (-ই আত্মা)। কেউ কেউ বলেন : ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্রই আত্মা। কেউ কেউ বলেন : শূন্য, ইত্যাদি।

এই অংশটি নিয়ে খুবই সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম কথা, লোকায়তিকদের মতকে শঙ্কর কোনো গুরুত্বই দেন নি। প্রাকৃতজন বলতে তাঁর ব্যাখ্যাকাররা ধরে নিয়েছেন 'জ্ঞানচর্চাহীন অজ্ঞ মানুষেরা'।[১০] এর ইংরিজি তর্জমা করেছিলেন থিবো (Thibaut) 'unlearned people'। অথচ, অন্যদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মার্কসবাদী পণ্ডিতও লিখেছেন : "...শঙ্করাচার্য চার্বাকের বিরুদ্ধে ক্রোধপ্রকাশ করেননি কিন্তু বৈশেষিক ও সাংখ্যের বিরুদ্ধে তিরস্কার বর্ষণ করেছেন।"[১১] 'প্রাকৃতজনাঃ লোকায়তিকাশ্চ'—এইভাবে এক বন্ধনীর ভেতরে দু দলকে রাখা হয়তো তিরস্কার নয়, কিন্তু এতে তাচ্ছিল্যের ভাবই প্রকাশ পায়। একইভাবে জয়ন্তভট্ট-ও চার্বাকদের 'বরাক' (= নীচ, হীন) বলে হেয় করেছিলেন।[১২]

দ্বিতীয় কথা, দেহাত্মবাদের পর যে দুটি মতের কথা বলা হয়েছে—ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও মনআত্মবাদ—এ দুটি কাদের মত? তার পরেরগুলি নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী মানে এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ, শূন্যবাদীরাও তা-ই। এঁদের পরে মীমাংসক, সাংখ্য, নৈয়ায়িক—নাম না-করে এঁদের কথাই বলা হয়েছে। শনাক্ত করা যায় না ইন্দ্রিয়াত্মবাদী ও মনআত্মবাদীদের। শঙ্করের ব্যাখ্যাকাররা কিন্তু মনে করতেন এঁরাও লোকায়তিক সম্প্রদায়েরই দুটি শাখা।[১৩] সেই অনুযায়ী সদানন্দ যোগীন্দ্র ও সদানন্দ কাশ্মীরক-ও এঁদের এক-এক ধরণের চার্বাকপন্থী বলেই ধরে নিয়েছেন (এঁরা আবার আর-এক দলের কথা বলেছেন যাঁরা ছিলেন প্রাণ-আত্মবাদী, অর্থাৎ

প্রাণকেই আত্মা বলে মনে করতেন)।[১৪] অন্যদিকে, ব্যোমশিবাচার্য প্রথম তিনটি মতের কথা বললেও একমাত্র দেহচৈতন্যবাদীদেরই লোকায়তিক বলে শনাক্ত করেছেন।[১৫]

দেহ আর আত্মা : সাংখ্যখণ্ডন প্রসঙ্গে

ব্র-সূ, ২।২।২-এর ভাষ্যে শঙ্কর মোকাবেলা করেছেন সাংখ্যদর্শনের। পূর্বপক্ষ হিসেবে সাংখ্যকে নিয়েই তিনি বলিয়েছেন :

> দেহ প্রত্যক্ষ হলে চৈতন্য দেখা যায় আর দেহ প্রত্যক্ষ না থাকলে চৈতন্য দেখা যায় না—লৌকায়তিকরা তা প্রতিপন্ন করেছেন।

উত্তরে শঙ্কর বলেন :

> লৌকায়তিকরা মানেন, চেতন দেহই অচেতন রথ ইত্যাদির প্রবর্তক (= চালক)—এমন দেখা যায়, তাই চেতনের প্রবর্তকতা (= চেতনই অচেতনের প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে নিমিত্তকারণ) নিষিদ্ধ নয়।

প্রসঙ্গটি জটিল, কিছুটা বিস্তৃত ব্যাখ্যার দরকার আছে। আগেই বলা হয়েছে, শঙ্কর এখানে লড়াই করেছেন সাংখ্য-র বিরুদ্ধে। সাংখ্যমতে অচেতন প্রধান (প্রকৃতি)-ই জগতের কারণ, চেতন আত্মা নয়। তাঁদের সপক্ষে প্রথমে চার্বাক / লোকায়তিকদের মতটি উল্লেখ করা হয়েছে। চার্বাকরা প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী, দেহছাড়া চেতনার অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তার উত্তরে পরের অংশে শঙ্কর বলেছেন : লৌকায়তিকরাও চেতনার ভূমিকাকে অস্বীকার করেন নি। রথ আপনা থেকে চলে না, তাকে চালানোর জন্যে সারথির দরকার। সারথি হলো রথ চলার নিমিত্তকারণ। সাংখ্যকে বিদ্রূপ করে শঙ্কর যেন বলছেন, লৌকায়তিকরাও যা স্বীকার করে, তোমরা কি তা-ও বোঝ না?

শঙ্কর অবশ্য বুঝেছিলেন, এতে একটু সমস্যা দেখা দিতে পারে। চেতনা ছাড়াও এখানে প্রবৃত্তির কথা এসেছে। যার নিজের কোনো প্রবৃত্তি নেই সে কি কখনও প্রবর্তক হতে পারে? শঙ্কর তাই বলেছেন, চুম্বক যেমন জড় অচেতন বস্তু হলেও লোহাকে টানতে পারে, তেমনি ঈশ্বরও সর্বগত, সকলের আত্মা-ও সর্বশক্তিমান বলে সকলকেই প্রবৃত্ত করতে পারেন। অর্থাৎ, শঙ্করের মূল প্রতিপাদ্য হলো : চেতন আত্মাই জগতের নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি অচেতন বলে তা জগৎকারণ নয়।

এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে লৌকায়তিকদের টানা হয়েছে সাংখ্যকে খারিজ করার জন্যে। তবে মূল বক্তব্য একই : লৌকায়তিকরা দেহছাড়া আত্মায় বিশ্বাস করেন না, একমাত্র সচেতন দেহেই প্রবৃত্তি থাকে—এই তাঁদের মত।

দেহ আর আত্মা : মীমাংসাখণ্ডন প্রসঙ্গে

ব্র-সূ, ৩।৩।৫৩-য় লড়াইটা মূলত মীমাংসকদের সঙ্গে। প্রধান প্রশ্ন হলো : দেহছাড়া আত্মা আছে না নেই। সেই সূত্রে প্রথমেই এসেছে লৌকায়তিকদের প্রসঙ্গ। শঙ্কর লিখছেন :

> এখানে কেউ কেউ, (যেমন) লৌকায়তিকরা—দেহকেই যাঁরা আত্মা বলে দেখেন—মনে করেন : দেহছাড়া আত্মা নেই। মিলিত ও পৃথকভাবে বাহ্য মাটি ইত্যাদিতে (অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন ও বাতাসে) চৈতন্য দেখা না গেলেও শরীর-আকারে পরিণত ঐ ভূতগুলিতে চৈতন্য থাকে। এই কথা প্রতিপাদন করে তাঁরা বলেন : 'সেগুলি (চারটি ভূত) থেকেই চৈতন্য', 'বিজ্ঞান (= চৈতন্য) মদশক্তির মতো', 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ' (= আত্মা)। (তাঁরা বলেন) স্বর্গে যাওয়া আর মোক্ষলাভ করায় সমর্থ (এমন) দেহছাড়া আত্মা নেই, যার সঙ্গে যুক্ত হলে দেহে চৈতন্য আসবে। দেহই চেতন ও আত্মা—এই তাঁদের স্বীকৃত মত ('প্রতিজ্ঞা')। তার হেতু হিসেবে তাঁরা বলেন : 'শরীরে থাকলে তবেই' (আত্মা থাকে)। যা থাকলে (অন্যটি) থাকে, না থাকলে (অন্যটি) থাকে না, তাকে (প্রথমটির) ধর্ম বলে স্থির করা যায়, যেমন আগুনের ধর্ম উষ্ণতা ও প্রকাশ (আলো)। প্রাণ, চেষ্টা (নিশ্বাস-প্রশ্বাস), চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি আত্মার ধর্ম হিসেবে আত্মবাদীরা স্বীকার করেন। সেগুলিও দেহর ভেতরেই উপলব্ধি করা যায়, দেহর বাইরে নয়। দেহ ছাড়া অন্য কোনো ধর্মী (ধর্মের আশ্রয়) অসিদ্ধ হলে সেই ধর্মগুলি দেহরই ধর্ম হবে। এই কারণে দেহছাড়া আত্মা নেই।

এর পরের সূত্রটির ব্যাখ্যায় শঙ্কর এই মত খণ্ডন করেছেন। খণ্ডনে যাওয়ার আগে *ব্র-সূ,* ৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা দরকার। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত ও কমলশীল-এর পরে শঙ্করের লেখাতেই কয়েকটি খাঁটি লোকায়তসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। যেমন : (১) 'সেগুলি থেকেই চৈতন্য', (২) 'বিজ্ঞান মদশক্তির মতো', (৩) 'চৈতন্য-বিশিষ্ট কায়াই পুরুষ', (৪) 'শরীরে থাকলে তবেই'।[১৬] এর প্রত্যেকটিই অন্যত্র একই বা অন্য ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাখ্যার তফাতও দেখার মতো।

প্রথমটির ক্ষেত্রে কমলশীল, জৈন দার্শনিক প্রভাচন্দ্র ও বাদিদেব সূরি জানাচ্ছেন, এই সূত্রটির ব্যাখ্যা নিয়ে লোকায়তিকদের মধ্যেই দুটি মত প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতিসূত্র-র একটি বৃত্তি (= সংক্ষিপ্ত ভাষ্য)-তে বলা হয়েছিল : সেগুলি থেকেই চৈতন্য জন্মায়। অন্য একটি বৃত্তিতে আছে : চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। প্রভাচন্দ্রও লিখেছেন : কেউ বলেন অভিব্যক্তি, কেউ বলেন প্রাদুর্ভাব। বাদিদেব সূরি ব্যবহার করেছেন অভিব্যক্তি ও উৎপত্তি—এই দুটি পদ।[১৭]

শঙ্কর অবশ্য এ আলোচনায় যান নি। কিন্তু (আট শতকের আগেই) এই সূত্রটি নিয়ে লোকায়তিকদের মধ্যেই দুটি মত প্রচলিত ছিল—এই ঘটনা লক্ষ্য করার মতো।

এমনিতে মনে হতে পারে : এ আর কী এমন তফাত? কিন্তু তফাতটা খুব গভীরে। বাক্য হিসেবে সূত্রটি সম্পূর্ণ করতে গেলে একটি ক্রিয়াপদ লাগবে (এর পারিভাষিক নাম 'অধ্যাহার')। এখানে কোন্ ক্রিয়াপদ দেওয়া হবে? 'জন্মায়' বা 'প্রাদুর্ভূত হয়' দিলে বোঝাবে : চৈতন্য বলে আগে কিছু ছিল না, চারটি ভূতের এক বিশেষ মিশ্রণে তা উৎপন্ন হলো। আর 'অভিব্যক্ত হয়' এই ক্রিয়াপদ দিলে, তার মানে দাঁড়াবে : চারটি ভূতের মধ্যেই চৈতন্যর সম্ভাবনা ছিল, তাদের বিশেষ মিশ্রণের ফলে তা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় প্রথমটিকে বলে 'অসৎকার্যবাদ', অর্থাৎ কার্য বা ফল আগে থেকে কারণের মধ্যে নিহিত ছিল না, আর দ্বিতীয়টিকে বলে 'সৎকার্যবাদ', অর্থাৎ কারণের মধ্যেই ফলটি নিহিত ছিল। দর্শন ছাড়াও অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদির প্রসঙ্গেও এই সৎকার্য- ও অসৎকার্যবাদ-এর কথা ওঠে।

দ্বিতীয় সূত্রটি সব বই-এ একই ভাষায় থাকে না। চৈতন্য অর্থে 'বিজ্ঞান' শব্দটি একেবারে অপ্রচলিত নয়। হীনযানী বৌদ্ধদের রচনায় এই শব্দটিই ব্যবহার হয় (লোকায়তিকদের মতো এঁরাও অক্ষয় আত্মায় বিশ্বাস করতেন না)। অন্যত্র কিন্তু সূত্রটির রূপ থাকে : 'কিণ্ব (মদ তৈরির উপাদান, যেমন ভাত, গুড়) ইত্যাদি থেকে মদশক্তির মতো'।[১৮]

তৃতীয় সূত্রটির কথা আগেই বলা হয়েছে (*ব্র-সূ*, ১।১।১ প্রসঙ্গে)। চতুর্থ সূত্রটি কেন চার্বাকসূত্র-সঙ্কলনে এখনও ঠাঁই পায় নি তা বোঝা যায় না। এর বক্তব্য পরিষ্কার, লোকায়তমতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে, শঙ্করও উদ্ধৃতির মতো করেই এটি দিয়েছেন।এর বদলে জয়রাশিভট্ট, শান্তরক্ষিত ও কমলশীল-এর লেখায় অন্য আকারে যা পাওয়া যায় ('শরীর থেকেই'/'কায়া থেকেই') সেই রূপটিই উল্লেখ করেছেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও মামোরু নামাই।[১৯]

পুনর্জন্ম ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব

ব্র-সূ, ৩।৩।৫৪-য় লোকায়তমত খণ্ডন করতে গিয়ে শঙ্কর বলেছেন :

> দেহ থেকে আত্মা আলাদা নয়—একথা ঠিক নয়। দেহ থেকে এটি আলাদাই, কারণ দেহ থাকলেও আত্মা থাকে না (যেমন মৃতদেহে)। দেহ থাকলে তবেই আত্মা থাকে এমন ধরে নিয়ে যদি আত্মার ধর্মকেই দেহর ধর্ম বলে মনে করা হয়, তা হলে মৃত্যুর পর দেহ থাকলেও আত্মার ধর্ম থাকে না কেন? আসলে দেহধর্ম আর আত্মধর্ম দুটো আলাদা ব্যাপার। রূপ ইত্যাদি হলো দেহের ধর্ম; প্রাণ, চেষ্টা (নিশ্বাস-প্রশ্বাস), চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি আত্মারই ধর্ম, দেহর নয়। তাই দেহ না থাকলেও আত্মা থাকে।

চৈতন্য ইত্যাদি যে দেহধর্ম নয়, এর সপক্ষে শঙ্কর বলেছেন : দেহর যা ধর্ম (রূপ ইত্যাদি) তা অন্যেও বুঝতে পারে (কারণ তা বাইরে থেকেও দেখা যায়), কিন্তু আত্মার ধর্ম (প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি ইত্যাদি) কেউ বাইরে থেকে বুঝতে পারে না। আত্মার ধর্মগুলো যে আছে তা দেহ থাকলে নিশ্চিত বলা যায়, কিন্তু দেহ না-থাকলে বলা যায় না। এর কারণ হলো : দেহর মৃত্যু হলেও আত্মার ধর্মগুলো পরের শরীরে চলে যেতে পারে।

শঙ্কর এ প্রসঙ্গে আর-একটি মজার কথা বলেছিলেন : "সংশয়টুকু হলেও পরপক্ষ খারিজ হয়ে যায়"! এর অর্থ : জাতিস্মর বা পুনর্জাত ব্যক্তি কোনো শরীরের ধর্ম অনুযায়ী তাঁর পূর্বজন্মর স্মৃতির কথা ভাবছেন—নাকি সেই স্মৃতি তাঁর পূর্বসূরিদের আত্মার ধর্ম—এই সংশয় হতে পারে। শঙ্কর বলছেন, এই যে সংশয় হলো—এর থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় : স্মৃতি দেহধর্ম না-হয়ে আত্মধর্মও হতে পারে।

এরপর শঙ্কর জানাচ্ছেন :

> ভূতগুলি থেকে যার উৎপত্তি তিনি ইচ্ছা করছেন এই চৈতন্যকে তিনি কী মনে করেন—এই প্রশ্ন তোলা উচিত। লোকায়তিকরা চারটি ভূত ছাড়াও আর কোনো তত্ত্ব (= মূল বস্তু) স্বীকার করেন না। ভূত ও ভৌতিক পদার্থর যে অনুভব তা-ই কি চৈতন্য? তাহলে ভূতগুলি বিষয় হওয়ায় চৈতন্য সেগুলির ধর্মও পায় না, তাতে নিজেতেই সেটি নিজে ক্রিয়া করছে—এই বিরোধ হবে। গরম বলে আগুন নিজেকে পোড়াতে পারে না, শিক্ষিত হলেও কোনো নট (অভিনেতা) নিজের কাঁধে চড়তে পারে না।

এইভাবে শঙ্কর শেষ পর্যন্ত দেহছাড়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন (৩।৩।৫৪-র ভাষ্যেও, আর-একবার 'দেহ থাকলে তবেই (আত্মা) আছে—এই হেতু' সূত্রটির উল্লেখ আছে অন্য ভাষায় : 'দেহভাবে ভাবাৎ')।

শঙ্করের আসল প্রতিপক্ষ কারা?

লোকায়তিক / লৌকায়তিক প্রসঙ্গে *শা-ভা*-য় আর কিছু নেই। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, শঙ্করের মূল প্রতিপক্ষ সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা ইত্যাদি আস্তিক (বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী) দর্শন। এ ছাড়াও এসেছে বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই নাস্তিক দর্শনের প্রসঙ্গ। সাংখ্যর পেছনেই শঙ্কর কথা খরচ করেছেন সবচেয়ে বেশি, কারণ তাঁর কাছে সাংখ্যই হলো তাঁর মতের প্রধান প্রতিপক্ষ। বড় কুস্তিগিরকে হারাতে পারলে যেমন অন্য কুস্তিগিররা ভেগে যায়, সাংখ্যকে খণ্ডন করতে পারলে তেমনি অন্য সব দর্শনকে হারিয়ে দেওয়া যাবে (একে বলে 'প্রধানমল্ল-নির্বহণ ন্যায়'। *ব্র-সূ*, ২।১।১২ দ্র.)।

এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন—এ তিনের সঙ্গে শঙ্করের সম্পর্ক সাপ আর নেউলের মতো। প্রায় কোনো ব্যাপারেই এঁদের সঙ্গে তাঁর একমত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাঁর আসল লড়াই তাই আস্তিক দর্শনগুলির সঙ্গে, যেগুলি বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করে। এ ছাড়াও এগুলির মধ্যে মিলের জায়গা অনেক। শঙ্কর তাই সাংখ্য, মীমাংসা ইত্যাদির খণ্ডনেই বেশি ব্যস্ত হয়ে থাকেন। অন্য যুক্তি ছাড়াও তাঁর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো : এই দর্শনগুলিকেও বেদ-বিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া। বারে বারেই তিনি সেটি করেন। লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন-র ক্ষেত্রে ঐ অভিযোগ তোলা বৃথা, কারণ তাঁরা নিজেরাই নিজেদের বেদ-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছেন। ফলে *ব্র-সূ*-কার বাদরায়ণ ও তাঁর ভাষ্যকার শঙ্কর বেদান্তদর্শনকেই একমাত্র খাঁটি বেদসম্মত দর্শন বলে হাজির করতে চেয়েছেন। অন্যান্য বৈদিক দর্শনকে মূলত অবৈদিক বলে প্রমাণ করতে না-পারলে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। লোকায়ত-র প্রসঙ্গও তাই আসে সাংখ্য-ও মীমাংসা-খণ্ডনের সূত্রে। লোকায়ত-খণ্ডনই শঙ্করের মূল লক্ষ্য নয়। অন্যদিকে শান্তরক্ষিত কিন্তু আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে অন্য সব দর্শনকে খণ্ডন করার উদ্যোগ নিয়েছেন; সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক ও লোকায়ত তাঁর কাছে তুল্যমূল্য।

সব মিলিয়ে শঙ্করের আলোচনা থেকে তাহলে কী জানা গেল?

১. খ্রি ন শতকে চার্বাকদের একটি সূত্রগ্রন্থ যে পাওয়া যেত, শঙ্করের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়।

২. লোকায়তমতের একটিমাত্র দিকই শঙ্করের লেখায় এসেছে। সেটি হলো : দেহাত্মবাদ। *প্রশ্ন-উপনিষদ্‌*, ৬।২-এর ভাষ্যে শঙ্কর লিখেছেন : লৌকায়তিকরা মনে করেন চৈতন্য হলো ভূতধর্ম। আনন্দগিরি ব্যাখ্যা করে বলেছেন : দেহ-আকারে সংহত (চারটি ভূতের) ধর্ম। জ্ঞানতত্ত্বর অন্যান্য দিক, যেমন, প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ ও প্রমাণজ্যেষ্ঠ কিনা—তাঁর আলোচনায় আসে নি। দেহছাড়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্যে যথারীতি তাঁকে পুনর্জন্মর মতো ধারণার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু আত্মবাদীদের কাছে এর বেশি কিছু আশাও করা যায় না। এই যুক্তির মধ্যে যে একটি পরস্পর-আশ্রয়-দোষ থেকে যাচ্ছে (আত্মা আছে তার প্রমাণ পরলোক ও পুনর্জন্ম : পরলোক ও পুনর্জন্মর প্রমাণ আত্মা)—সেটি তাঁরা খেয়াল করেন না (ইচ্ছে করেই?)।

অসুরমত ও লোকায়ত

এবারে শঙ্করের *গীতাভাষ্য*-য় যাওয়া যাক।

অসুরদের মত আলোচনা প্রসঙ্গে শঙ্কর লোকায়তিকদের কথা এনেছেন। *গীতা*, ১৬।৮-এ বলা হয়েছে :

> তারা [অসুর প্রকৃতির লোকেরা] বলে, জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত, ও কামহৈতুক—এছাড়া আর কী?

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেছেন, 'অসত্য' মানে : আমরা যেমন মিথ্যাচার করি, জগৎও তেমনি সবটাই মিথ্যাচারে ভরা; 'অপ্রতিষ্ঠ' মানে এর ধর্ম-অধর্ম নেই, আর ধর্মাধর্ম নেই দেখে বোঝা যায় এর শাসক কোনো ঈশ্বরও নেই। স্ত্রী-পুরুষের কামনায় পরস্পরের সংযোগ থেকে সারা জগতের জন্ম হয়—এ ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে? তারপর শঙ্কর লিখেছেন : জগতের অন্য কারণ হিসেবে ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি কোনো অদৃষ্ট কারণ নেই। কামনাই প্রাণীদের কারণ—এই হলো লোকায়তিক দৃষ্টি।

শঙ্করের অনুসরণে আরও কয়েকজনের টীকাকার (সকলে নয়) এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় লোকায়ত-র প্রসঙ্গ এনেছেন।[২০] *গীতা*-য় অবশ্য লোকায়ত-র কথা নেই, সর্বত্রই অসুরের কথা বলা হয়েছে।

কাম-ই প্রাণীদের কারণ—এই বাক্যটিকে কেউ কেউ 'বৃহস্পতিসূত্র' বলে ধরে নিয়েছেন।[২১] কিন্তু এটিকে খাঁটি চার্বাকমত বলে মানতে একটু অসুবিধে আছে। তার প্রধান কারণ : অন্যান্য কয়েকটি সূত্রর মতো এই 'সূত্র'টি অন্যভাবে বা ভাষায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, শঙ্করের অনুগামী নন এমন টীকাকাররা এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লৌকায়তিকদের কথা তোলেন নি। সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যাই একমাত্র সঠিক ব্যাখ্যা—এমন না-ই হতে পারে।

ফলে *ব্র-সূ-ভা* থেকে লোকায়ত সম্পর্কে যেমন কিছু কাজের কথা পাওয়া যায়, *গীতাভাষ্য*-র ক্ষেত্রে তার ঠিক উলটো ঘটে। এখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাই প্রবল।

লোকায়ত / স্বভাববাদ

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৩।৬-এর ভাষ্যে স্বভাব-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। শঙ্কর অবশ্য এই প্রসঙ্গে 'লোকায়ত' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেন নি। তবে তাঁর ভাষ্যর টীকায় আনন্দগিরি বলেছেন, এখানে লোকায়তদের নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

বিষয়টি বেশ জটিল। জনক জিগেস করলেন : হে যাজ্ঞবল্ক্য, সূর্য অস্ত গেলে, চাঁদ অস্ত গেলে, আগুন নিভে গেলে আর বাক্ প্রভৃতি বাইরের জ্যোতি থেমে গেলে, কোন্ বস্তু এই পুরুষের জ্যোতি হয়? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন : আত্মাই তখন এর জ্যোতির স্বরূপ হয়। তখন এই পুরুষ আত্মজ্যোতির সাহায্যে সব কিছু করেন।

এর সূত্র ধরে শঙ্কর এসেছেন আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে। আত্মাকে চোখে দেখা যায় না, যদিও সূর্য ইত্যাদি জ্যোতিগুলিকে চোখে দেখা যায়—এই তাঁর মত।

এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে : অন্যান্য জ্যোতিগুলি যেমন ভৌত, তেমনি দেহ-ইন্দ্রিয়-র সঙ্ঘাতের মতো কোনো ভৌতিক জ্যোতি অনুমান করতে হবে।

অর্থাৎ চোখের জ্যোতি আভ্যন্তরীণ ও অপ্রত্যক্ষ হলেও ভৌতিক। এর বাইরে অন্য ধরণের কোনো আত্মজ্যোতির অস্তিত্ব নেহাতই কাল্পনিক।

এর পরে এসেছে ন্যায়ের প্রসঙ্গ। যে ধরণের অনুমানকে বলা হয় 'সামান্যতো দৃষ্ট' (সাধারণত দেখা যায়, যেমন সূর্যের গতি) সেই অনুমান দিয়ে নিঃসন্দেহে কিছু প্রমাণ করা যাবে না। তার কারণ : এই অনুমান কখনোই অব্যভিচারী হয় না (এটি থাকলে ওটি আছে—এমন দেখা যায়, কিন্তু এটি না-থাকলে ওটি নেই—এর কোনো নমুনা পাওয়া যায় না)। এখানে 'সামান্যতো দৃষ্ট' অনুমানের সাহায্যে সূর্য ইত্যাদির জ্যোতির দৃষ্টান্ত ধরে দেহ-ইন্দ্রিয়-র অতিরিক্ত একটি জ্যোতির কথা বলা হচ্ছে। প্রায়ই এটি অসিদ্ধ। অনুমানের চেয়ে প্রত্যক্ষ অনেক বড় প্রমাণ। সূর্য ইত্যাদির জ্যোতি যেমন আত্মা নয়, তেমনি ঐ অতিরিক্ত জ্যোতিঃপদার্থটিও আত্মা নয়। যা সরাসরি দেখা, শোনা ইত্যাদির কাজ করে সেই দেহ-ইন্দ্রিয়-র সঙ্ঘাতই আত্মা হতে পারে, আর কিছু নয়। জগতের বস্তুগুলির মধ্যে স্বভাবগত বৈষম্য আছে। আগুন স্বভাবতই গরম, জল ঠান্ডা। এর কারণ এই যে এগুলোই তাদের স্বভাব। আগুন স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এর উত্তরে শঙ্কর বলেন : দেখা, শোনা ইত্যাদি কাজ যদি দেহরই ধর্ম হতো তবে স্বপ্নর সময়ে শুধু আগে-দেখা জিনিসেরই দর্শন হতো না। অন্ধ যখন স্বপ্ন দেখে, তখনও সে শুধু আগে-দেখা জিনিসই দেখতে পায়, অদেখা জিনিস সে দেখে না।

এই দিয়েই শঙ্কর প্রমাণ করতে চেয়েছেন : দেখার কাজ দেহ করে না, করে আত্মা।

এখানেও দেখা যাচ্ছে : মূল বিতর্কটি দেহ আর আত্মা নিয়ে। লোকায়তিকরা দেহ ছাড়া আত্মার আলাদা অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আর শঙ্কর সেই দেহছাড়া আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চান। তার জন্যেই অন্ধর স্বপ্ন দেখার প্রসঙ্গটি এসেছে। তাঁর কাছে এটি হয়তো খুব মোক্ষম যুক্তি। চোখ চলে গেলেও লোকে যে স্বপ্ন দেখে, আর চোখ যা যা দেখেছিল, শুধু সেগুলিই সে দেখতে পায়—এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন : দেখার কাজ দেহ করে না, করে আত্মা।

কিন্তু একটি প্রশ্ন এখানে অনিবার্যভাবেই আসে : চক্ষুষ্মান বা অন্ধ লোক স্বপ্নে কি শুধু আগে-দেখা জিনিসই দেখতে পান? ঘটনা হচ্ছে, স্বপ্নে মানুষ এমন অনেক কিছু দেখেন যা তিনি বাস্তবে দেখেন নি। আসলে বাস্তবে দেখা একাধিক জিনিস স্বপ্নের মধ্যে মিলে গিয়ে নতুন চেহারা পায়।

দ্বিতীয় কথা, শঙ্কর যখন স্বীকারই করে নিচ্ছেন যে, আগে দেখা না-থাকলে স্বপ্নে সে-জিনিস দেখা যায় না, তখন তাঁকে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, জন্মান্ধ কখনও স্বপ্ন দেখেন না। বাহ্যবস্তু ও ইন্দ্রিয়র যোগ এতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অন্ধরা যে-স্বপ্ন দেখেন তাতে অন্য ইন্দ্রিয়র, যেমন স্পর্শর বা শব্দর ভূমিকাই বেশি। মূক-বধিরদের ক্ষেত্রে

তার উলটোটাই সত্যি—সেখানে শব্দর ভূমিকা নেই।[২২] অর্থাৎ যে-ইন্দ্রিয় কম সক্রিয় বা অক্রিয়, স্বপ্নেও তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এর জন্যে ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে কোনো আত্মার কল্পনা করতে হয় না, বরং স্বপ্নর ইন্দ্রিয়নির্ভরতাই প্রমাণ হয়।

অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে : স্বপ্ন সম্পর্কে পরীক্ষালব্ধ যেসব সিদ্ধান্ত আমরা বিশ শতকে জানতে পেরেছি, শঙ্করের তার কিছুই জানার সুযোগ ছিল না। কিন্তু স্বপ্নর দৃষ্টান্তটি যে খুবই দুর্বল—তা-ও এর থেকে ধরা পড়ে। যে-কারণে স্বপ্নে প্রচুর খেলেও বাস্তবে পেট ভরে না, সেই একই কারণে স্বপ্নে কিছু দেখা বা না-দেখা দিয়ে বাস্তবে দেখা বা না-দেখার কিছু যায় আসে না।

উপসংহার

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে, *স্বভাব*-এর ধারণাটি দেহাত্মবাদের সঙ্গে ন শতক বা তার আগেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। হয়তো *মহাভারত*-এর সাক্ষ্যে বলা যায় : এই যোগ আরও প্রাচীন।[২৩] খ্রি চার শতকের আগেই স্বভাব-এর ধারণাটিই 'ভূতচিন্তক'রা নিজেদের মতবাদের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। বরাহমিহির-এর *বৃহৎসংহিতা,* ১।৭ প্রসঙ্গে উৎপলভট্ট-র টীকায় তারই আভাস পাওয়া যায়। শঙ্কর এখানে দেহাত্মবাদ-স্বভাববাদ সমন্বয়ের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। চোদ্দো শতকে সায়ণ-মাধব সেটিকেই স্বীকৃত মত হিসেবে হাজির করেন।[২৪]

তাহলে চার্বাক/লোকায়ত সম্পর্কে শঙ্কর যা লিখেছেন, তার থেকে নতুন কিছু না-জানা গেলেও, ন শতকে লোকায়তমত বলতে কী বোঝাত তার খানিক ধারণা করা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো : শঙ্কর কোথাও লোকায়তকে ইহসুখবাদের সঙ্গে এক করে দেখান নি, চলিত একটি দার্শনিক মত ধরে নিয়েই তিনি দেহাত্মবাদ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। লৌকায়তিকদের প্রাকৃতজন বলে অবজ্ঞা করলেও, তাঁর পরবর্তী অনুসারীদের (কৃষ্ণমিশ্র ও শ্রীহর্ষ) মতো এই দর্শনটিকে অন্যভাবে হেয় করার চেষ্টা তাঁর রচনায় নেই।[২৫] অথচ *গীতাভাষ্য*-য় তার সুযোগ ছিল। এর থেকে একটি অনুমান আরও জোরদার হয় : ইহসুখবাদ চার্বাকমতের অংশ ছিল না, বিরুদ্ধপক্ষই এটি তার ঘাড়ে চাপিয়েছে।

---

১. শঙ্কর বিষয়ে নানা লোকশ্রুতি ও তাঁর দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানার জন্যে টি. এস. পি. মহাদেবন দ্র.। অন্য মতের বৈদান্তিকরা অবশ্য তাঁর সম্পর্কে অনেক অকথা-কুকথা লিখে গেছেন (বিশেষত মাধ্ব সম্প্রদায়)। দাসগুপ্ত, ৪ : ৫২ দ্র.।

২. বিশদ আলোচনার জন্যে পউল হাকার, ৪১-৫৮ দ্র.।

৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮০), ১২-য় উদ্ধৃত।

৪. বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য, ২৮০-৮১, ২৯১ দ্র.।

৫. *প-পু,* উত্তরখণ্ড, আনন্দাশ্রম সং., ২৬৩।৭০ গঘ; ঐ, বঙ্গবাসী সং., ২৩৬।৭ কখ।

৬. হাজরা (১৯৪০/১৯৮৭), ১২৬।

৭. এ বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৫), ১৬৭ টী. ৯ দ্র.।

৮. হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৩), ৯৪-৯৬ দ্র.।

৯. *বৃহদারণ্যকোপনিষৎ* (১৩২৭ ব), ১০৮২ ('সংপ্রতি লোকায়তশ্চোদয়তি-নেত্যাদিনা')।

১০. *বে-দ,* কালীবর বেদান্তবাগীশ সং., ৫২।

১১. হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৩), ২৭-২৮।

১২. *ন্যা-ম,* ভাগ ১, ১ : ৯।

১৩. টী. ১০, ৫২।

১৪. *বেদান্তসার* (১৩৭০ ব), ১৪৭-৪৯; *অ-ব্র-সি,* ১০১ দ্র.।

১৫. *ব্যোমবতী,* বারাণসী সং., ২ : ১২৬। জয়ন্তভট্ট-ও আলাদা করে ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদ ও মনসশ্চেতনত্ববাদ-এর কথা বলেছেন (*ন্যা-ম,* ২ : ২১৮-১৯)।

১৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০, সূত্র ৩, ৪, ৭ ও ২২; নামাই (১৯৭৬), ৩৯, ৪২; সূত্র A4, A5, A10 ও C1।

১৭. *ত-স-প,* ৬৩৩-৩৪ (*ত-স,* শ্লোক ১৮৫৮ প্রসঙ্গে); *ন্যা-কু-চ,* ৩৪২; *স্যা-বা-র,* ১০৭৩, ১০৮১-৮২।

১৮. 'কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ' (টী. ১৬ দ্র.)।

১৯. টী. ১৬ দ্র.। দক্ষিণারঞ্জন ও নামাই এই সূত্রর পাঠটি পেয়েছেন *ত-উ-সি,* ৮৮ থেকে। শান্তরক্ষিত-কমলশীল, ৬৩৫ (শ্লোক ১৮৬৩-তে অন্য পাঠ পাওয়া যায় ('কায়াদেব'))।

২০. শঙ্করেরই প্রতিধ্বনি করেছেন শ্রীধর, মধুসূদন সরস্বতী ও বিশ্বনাথ; নীলকণ্ঠ বলেছেন স্বভাববাদের কথা।

২১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), সূত্র ১৬। নামাই এই সূত্রটিকে স্বীকার করেন নি।

২২. "Do blind people see images in the their dreams?
Though they do not use vision to relate to their dream world, people blind from birth report dreams in which other senses, such as touch, take the place of sight. One woman, for instance, heard the sound of a washing machine in her dreams. Those who were born with sight but later lost it report varying degrees of visual imagery in their dreams. Researchers have recorded some eye movement during REM [Rapid Eye Movement] cycle in the congenitally blind. Moreover, eye movements have been observed in the blind who were born sighted."
ABC's of the Human Mind, 105.

২৩. *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, প্রামাণিক সং., ২২৪।৫০ : 'স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ'।

২৪. *স-দ-স,* ১৩ : 'স্বভাবাদেব তদুৎপত্তেঃ'।

২৫. *প্র-চ,* অঙ্ক ২; শ্রীহর্ষ, *নৈ-চ,* সর্গ ১৭।

অধ্যায় ১৭

ব্যোমশিবাচার্য। *ব্যোমবতী*

বৈশেষিক দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যোমশিবাচার্য-র *ব্যোমবতী* বইটি খুবই বিখ্যাত। প্রশস্তপাদ-র *পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ*-কে কণাদ-এর *বৈশেষিক-সূত্র*-র ভাষ্য বলে ধরা হয়। *ব্যোমবতী* আবার *পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহ*-র ভাষ্য। ব্যোমশিব ছিলেন সিদ্ধান্ত শৈব সম্প্রদায়ের আচার্য। অবন্তীতে পুরন্দর দুটি মঠ স্থাপন করেছিলেন। ব্যোমশিব ছিলেন তাঁরই উত্তরসাধক। গোয়ালিয়র-এর রণোদ পুরালেখ-এ বলা হয়েছে, তিনি শুধু বৈশেষিক দর্শনেরই বিশেষজ্ঞ ছিলেন না; মীমাংসা, সাংখ্য, লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল।[১]

ব্যোমবতী-তে নানা প্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক মতের কথাও এসেছে। সবচেয়ে বেশি এসেছে সাংখ্য, বৌদ্ধ ও জৈন মত। ব্যোমশিব বড় একটা কারও নাম করেন না, 'একে' (কেউ কেউ), 'অন্যে', 'অপরে' ইত্যাদি বলেই কাজ সারেন। লোকায়তমতের কোনো বই বা তার লেখকের উল্লেখও নেই। তবে প্রসঙ্গত সে-মতের কথা এসেছে। এখানে সেইটুকু নিয়েই আলোচনা করব।

'লৌকায়তিক' শব্দটি বইটির মাত্র দু-জায়গায় আসে।[২] শরীরকেই যাঁরা আত্মা বলে মনে করেন (অর্থাৎ, শরীরছাড়া আত্মার অস্তিত্ব যাঁরা স্বীকার করেন না), ব্যোমশিব তাঁদেরই বলেন 'লৌকায়তিক'। এ ছাড়া 'ভূতচৈতন্য' শব্দটিও আছে।[৩] চারটি ভূত—মাটি, জল, আগুন আর বাতাস-এর বিস্তারেই চৈতন্য দেখা যায় : এই ছিল চার্বাক/লোকায়ত দর্শনের গোড়ার কথা। আত্মা বলে অ-ভৌত কোনো পদার্থে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। সেই সূত্রেই *ব্যোমবতী*-তে লৌকায়তিক ও ভূতচৈতন্যবাদ-এর কথা এসেছে।[৩]

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ভূতচৈতন্যবাদ ছাড়াও ব্যোমশিব আরও দুটি সমান্তরাল মতের কথা বলেছেন : ইন্দ্রিয়-চৈতন্যবাদ (যে-মতে ইন্দ্রিয়গুলিকেই চৈতন্য বলে ধরা হয়) ও মনশ্চৈতন্যবাদ (মন-ই আত্মা—এই মত)।[৪] এ ধরণের মতও যে চালু ছিল তা অন্যান্য রচনা (মূলত বৈদান্তিকদের) থেকেও জানা যায়।[৫]

ব্যোমশিব শুধু ভূতচৈতন্যবাদকেই লোকায়তমতের সঙ্গে এক করে দেখেছেন, অন্য দুটিকে নয়।

স-বে-সি-সা-তেও তাই ধরা হয়েছে।[৬] কিন্তু সদানন্দ যতি (বা যোগীন্দ্র) চার ধরণের চার্বাক-এর কথা বলেছেন : আত্মা বলতে যাঁরা যথাক্রমে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে বোঝেন।[৭] কাশ্মীরক সদানন্দ-ও, *অ-ব্র-সি*-র চার্বাকখণ্ডন অংশে, দেহাত্মবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মনআত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদ-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এগুলিও যে চার্বাকমতের বিভিন্ন সম্প্রদায়—স্পষ্ট করে এমন কথা বলেন নি (ইঙ্গিত যদিও সেইরকম)।[৮]

আত্মা সম্পর্কে এই ধরণের বিভিন্ন মতের তালিকা শঙ্করাচার্য-র *শা-ভা*-তে পাওয়া যায়। যেখানে লোকায়তিকদের মত বলতে বোঝানো হয়েছে : সাধারণ মানুষের ('প্রাকৃতাজনাঃ') যেমন ধারণা থাকে—চৈতন্যবিশিষ্ট দেহটুকুই আত্মা।[৯] বাকি মতগুলির ক্ষেত্রে (যেমন, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মন-আত্মবাদ ইত্যাদি) কোনো বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম করা হয় নি। শঙ্করের ভাষ্যকাররা সেগুলি শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন।[১০]

ব্যোমবতী এ সবেরই বহু আগে লেখা, তার থেকে অন্তত এইটুকু জানা যাচ্ছে : লৌকায়িতক/চার্বাকদের সঙ্গে একমাত্র দেহাত্মবাদ/ভূতচৈতন্যবাদ-এরই যোগ ছিল। ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে যাঁরা আত্মা বলে মনে করতেন, তাঁরা আর যা-ই হোন, লৌকায়তিক ছিলেন না। এগারো-বারো শতকের পরে লোকায়তমতের আর কোনো বই (সূত্রগ্রন্থ বা ভাষ্য) পাওয়া যেত না। পরের লেখকরা তাই গুরুশিষ্য-পরম্পরায় যা শুনেছিলেন, তাকেই চার্বাকমত বলে মনে করতেন। দেহাত্মবাদের মতো এই কটি মতেও যেহেতু শরীরেরই কোনো-না-কোনো অঙ্গ বা তার সঙ্গে যুক্ত বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, তাই এগুলিকে তাঁরা নানা সম্প্রদায়ের চার্বাক বলে ধরে নিতেন।

তেমনি এও লক্ষ্য করার যে, লোকায়তমত থেকে আলাদা করে স্বভাববাদ-এর কথা বলেছেন ব্যোমশিব।[১১] মোটামুটি ন-দশ শতক থেকে কিন্তু স্বভাববাদকে লোকায়তরই অংশ বলে ধরা হয়।

বরাহমিহির-এর *বৃহৎসংহিতা,* ১।৭ গ-ঘ-য় বলা হয়েছে : জগতের কারণ হিসেবে কেউ বলেন কাল, কেউ বলেন স্বভাব, কেউ বলেন কর্ম (কালং কারণম্ একে, স্বভাবম্ অপরে, পরে জগুঃ কর্ম)। দশ শতকে তার টীকায় উৎপলভট্ট (ভট্টোৎপল) লিখেছেন : অন্যরা (অর্থাৎ) লৌকায়তিকরা স্বভাবকে জগতের কারণ বলেছেন।[১২] উৎপলভট্ট-র আগে খ্রি আট ও ন শতকেও কিন্তু স্বভাববাদ ও লোকায়তকে দুটি আলাদা মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩] উৎপলভট্ট-র পরেই দেখা যায় লোকায়তিকদের দিয়েও স্বভাববাদের কথা বলানো হচ্ছে। জ্ঞানশ্রীভদ্র তাঁর *আর্যলঙ্কাবতারবৃত্তি*-তে যে কটি লোকায়ত-সূত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার শেষ দুটি

স্বভাববাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়।[১৪] আর একটি সূত্র ('সব জীবই জলবুদ্‌বুদের মতো') লোকায়ত প্রসঙ্গেই হরিভদ্র-র *উ-ভ-প্র-ক* ও অন্যান্য জৈন বইতেও পাওয়া যায়।[১৫] তার কারণ বোধহয় এই যে, স্বভাববাদ বলতে বোঝায় : কর্তা (অর্থাৎ ঈশ্বর বা অদৃষ্ট বা কোনো জগৎকারণ) ছাড়াও জগতের উৎপত্তি ও বৈচিত্র্য সম্ভব। বস্তুর স্ব-ভাব অর্থাৎ নিজ সত্তার দরুন তা হতে পারে। এই মতকে ব্যোমশিব খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন এইভাবে : সচেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া কোনো কার্য (ফল) পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি মীমাংসক ও বৌদ্ধমতও খারিজ করে দিয়েছেন।

আরও একটি প্রসঙ্গে, লোকায়ত-র নাম না করেও, তার কথা এসেছে।[১৬] প্রশ্ন হলো : যখন 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', বা 'আমি রোগা', 'আমি মোটা' বলা হয়, তখন 'আমি' বলতে কাকে বোঝায় : দেহ না আত্মা? লৌকায়তিকরা স্বভাবতই বলবেন 'আমি' বলতে এখানে দেহকেই বোঝায়। তাহলে 'আমার শরীর' বলে কেন? এখানে তো 'আমি' আর 'শরীর' দুটি আলাদা সত্তা হয়ে যাচ্ছে। উত্তরে লৌকায়তিকরা বলেন, এখানে 'আমার শরীর' বলতে ঔপচারিক (= আলঙ্কারিক বা গৌণ) অর্থ ধরতে হবে।[১৭] 'আমার চাকর' বলতে যেমন দুটি আলাদা সত্তা বোঝায়, এ ক্ষেত্রে তা বোঝায় না।

ব্যোমশিব অবশ্য দেহ-র বদলে আত্মাকেই 'আমি'-র মুখ্য অর্থ বলে মনে করেন। *বৈশেষিকসূত্র*, ৩।২।৯-১৮ ও প্রশস্তপাদ-র ভাষ্যেও তা-ই বলা হয়েছে। বৈদান্তিক ও জৈনরাও একই কথা বিশ্বাস করেন। *প্র-ক-মা*-য় প্রভাচন্দ্র লিখেছেন : 'মদীয় ভৃত্যঃ' আর 'মদীয়ং শরীরম্'—দু ক্ষেত্রেই মদীয়-র মুখ্য অর্থই ধরতে হবে।[১৮] দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে এটিই পৃথগ্-আত্মবাদীদের একমাত্র যুক্তি। যদিও এ দিয়ে 'আমি রোগা' বা 'আমি মোটা'-র ব্যাখ্যা হয় না, কারণ এখানে 'আমি' বলতে শরীরকেই বোঝাতে হবে।

ব্যোমবতী-তে লোকায়ত সম্পর্কে আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে অন্য একটি কারণে বইটির গুরুত্ব আছে। 'চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই আত্মা' (চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ) এই বাক্যটিকে অন্যতম চার্বাকসূত্র বলে সকলেই স্বীকার করেন।[১৯] এর উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে সদানন্দ কাশ্মীরক-এর *অ-ব্র-সি*-কে (শঙ্করাচার্য-র *ব্র-সূ-ভা*, ১।১।১-এ এটি পাওয়া যায়)। হুবহু একই ভাষায় সূত্রটি প্রথম পাওয়া যাচ্ছে *ব্যোমবতী*-তে,[২০] সদানন্দ-র অন্তত হাজার বছর আগে। এ যাবৎ এটি কেউ লক্ষ্য করেন নি।

আরও একটি কারণে চার্বাকচর্চার ক্ষেত্রে *ব্যোমবতী* পরোক্ষ-উপকারে লাগে। জয়রাশিভট্ট-র *ত-উ-সি* বইটির একটি বচনকে চার্বাকসূত্র বলে ধরা হয়েছে।[২১] কিন্তু *ব্যোমবতী*-তে সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গে ঐ বচনটি দুবার পাওয়া যায়।[২২] দু-ক্ষেত্রেই ব্যোমশিব বলেছেন, এটি হলো 'ন্যায়' অর্থাৎ লোকোক্তি বা প্রবাদ। এলি ফ্রাঙ্কো প্রথম

এটি লক্ষ্য করেন।[২৩] তিনিই প্রশ্ন তোলেন : এ ধরণের ন্যায়কে বৃহস্পতিসূত্র বলে ধরা ঠিক কিনা।[২৪] মনে হয়, ঐ বচনটি চার্বাকসূত্র-সঙ্কলন থেকে বাদ দেওয়াই উচিত।

---

১. *ব্যোমবতী* (গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.), প্রথম ভাগ (১৯৮৩) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯৮৪)। বইটি প্রথম সম্পাদনা করেন গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ঢিরাজ শাস্ত্রী (বারাণসী সং. (১৯৩০), *প্রশস্তপাদ-ভাষ্য*-র সঙ্গে)। (পরের সব টীকায় বন্ধনীর মধ্যে এই সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যাও দেওয়া হবে)।

ব্যোমশিবাচার্য-র আবির্ভাবকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। গৌরীনাথ শাস্ত্রী ধরেছেন, খ্রি ৬২৫-৬৪০ (ঐ, ১ : পাঁচ)। কিন্তু ভি. বরদাচারীর মতে, খ্রি ৯৫০ (পটার, ২ : ৪২৪)। গৌরীনাথ শাস্ত্রীর যুক্তিই আমাদের কাছে গ্রাহ্য মনে হয়েছে। রণোদ পুরালেখ-এ ব্যোমশিব-এর উল্লেখের জন্য *JAS (B)*, ১৮৪৭, ১৬ : ১০৮২ দ্র. (শাস্ত্রী সং., ১ : আট ও 'আ'-তেও এটি উদ্ধৃত হয়েছে)। সম্পূর্ণ পুরালেখটির জন্যে *E.I.*, খণ্ড ১, ৩৫২ ইঃ দ্র.।

২. শাস্ত্রী সং., ২ : ১২৬ ও ১৩০ (কবিরাজ সং., ৫৪২ ও ৫৪৬)।

৩. ঐ, ১ : ১৫৫ (৪১১)।

৪. ঐ, ২ : ১২৬ (৫৪২)।

৫. যেমন, শঙ্করাচার্য, *শা-ভা*, ১।১।১ প্রসঙ্গে; *স-বে-সি-সা*, শ্লোক ৫২৩-৮৬। অন্যান্য সূত্র পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. *স-বে-সি-সা*, শ্লোক ৫৩৬-এ শুধু দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গেই চার্বাক-এর নাম করা হয়েছে।

৭. সদানন্দ যতীন্দ্র/যোগী, *বেদান্তসারঃ* (১৩৭৫), ১৪৬-৫৫ (অনুচ্ছেদ ৯৮-১০০) দ্র.।

৮. *অ-ব্র-সি*, দ্বিতীয় মুদ্গর-প্রহারঃ (চার্বাক-খণ্ডন), ১০১-১০২।

৯. এই বই-এর অধ্যায় ১৬ দ্র.।

১০. *বে-দ*, ১ : ৫২-৫৩ দ্র.। ইন্দ্রিয়াত্মবাদী ও মনআত্মবাদীদেরও দুর্গাচরণ চার্বাকদেরই 'অন্যতম শাখা' ও ঐ সম্প্রদায় অন্তর্ভূত বলে ধরেছেন।

১১. ২ : ১২৬ (৫৪২-৪৩)।

১২. *বৃ-স*, প্রথম ভাগ, ৯।

১৩. যেমন শান্তরক্ষিত, *ত-স*, অধায় ৪ ও ২২-এ দুটি মতকে আলাদা করে দুভাবে খণ্ডন করেছেন। অন্যান্য বৌদ্ধ রচনাতেও স্বভাববাদ বলতে কার্যত যদৃচ্ছাবাদ বা আকস্মিকত্ববাদকেই বোঝানো হয়েছে। *ব্র-সূ-ভা*-য় শঙ্কর লোকায়তিকদের নাম করে উল্লেখ করেছেন (১।১।১, ২।২।২, ৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে), কিন্তু *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৪।৩। ৬ প্রসঙ্গে বলেছেন স্বভাববাদীদের কথা (শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি (১২৬০-১৩২০) অবশ্য তার অর্থ করেছেন 'লোকায়তিক')। আবার *ব্র-সূ*, ২।১।৩৩ প্রসঙ্গে শঙ্কর লিখেছেন, 'বাহ্য কোন প্রয়োজনের অভিসন্ধি ছাড়াও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বভাব-এর কারণেই হয়'। তার টীকা-য় অমলানন্দ 'যদৃচ্ছা' আর 'স্বভাব'-এর তফাতটিও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন : যখন নিয়ত নিমিত্ত নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কখনও উদয় হয়, কখনও উদয় হয় না, তা হলো যদৃচ্ছা : স্বভাব হলো যা সমস্ত বস্তুর ভাব, যেমন শ্বাস ইত্যাদি।

১৪. 'জন্মবৈচিত্র্যের ভেদ হেতু জগৎও বিচিত্র' আর 'ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রকচিহ্নের মতো'—এই দুটি

আসে স্বভাববাদের সূত্রে : আর চারটি সূত্র ('মাটি, জল, আগুন ও বাতাস—বস্তু ('তত্ত্ব') এই চারটি', 'তার মিলনেই শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, নাম', 'সেগুলি থেকেই চৈতন্য' ও 'কিণ্ব (= মদ তৈরির উপকরণ) থেকে মদশক্তি (= মাতাল করার শক্তি)-র মতো') আরও বহু উৎসেই পাওয়া যায়। এই চারটিকেই অবিসংবাদিত চার্বাকসূত্র বলে ধরা সম্ভব। জ্ঞানশ্রীভদ্র-র সংস্কৃত রচনাটি পাওয়া যায় নি। তার তিব্বতী অনুবাদ থেকে এগুলি আহরণ করেছেন মামোরু নামাই ((১৯৭৬), সূত্র A 2-4, ৩৮-৩৯ দ্র.)।

১৫. *উ-ভ-প্র-ক,* প্রস্তাব ৪, ৬৬৮; *ন্যা-কু-চ,* ১ : ৩৪২; *য-তি-চ,* ২ : ২৫৩; *সি-বি-টী,* ১ : ৪। ১৪, ২৮৩, ২৯১; *ত-র-দী,* ৩০০। এই সূত্রটির ক্ষেত্রে, নামাই শুধু *ন্যা-কু-চ* ও *ত-র-দী*-র নাম করেছেন; কিন্তু তাঁদের আগেই, আট থেকে দশ শতকের মধ্যে তিনটি জৈন উৎসে এই সূত্রটি পাওয়া যাচ্ছে।

১৬. ১ : ১৩৫ (৩৯১)।

১৭. *স-দ-স,* প্রথম অধ্যায়ে সায়ণ-মাধব এর আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। '"মম শরীরং" এইরূপ ব্যবহারের ন্যায় [ইহা] ঔপচারিক' (পঞ্চানন শাস্ত্রীর তর্জমা, ৩৮)। অর্থাৎ, রাহু বলতে শুধু 'মাথা' বোঝালেও লোকে যেমন 'রাহুর মাথা' বলে, এখানেও তেমনি 'আমি' আর 'শরীর'-এর মধ্যে কোনো ভেদ নেই (এরই পারিভাষিক নাম : সমানাধিকরণ্য)। *স-দ-স*-য় এর পরে একটি শ্লোকে (ঐ, ৪২) ও *স-সি-স*-র একটি শ্লোকে একই কথা বলা হয়েছে (এন. রঙ্গাচার্য সম্পা. (১৯০৯), ৫)। *স-ম-স*-এ চার্বাক প্রসঙ্গে গোড়াতেই বলা হয়েছে : 'আমি মানুষ', 'আমি মোটা', 'আমি রোগা'—প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও চৈতন্য (নামক) গুণের আশ্রয় (স্বরূপ) দেহই প্রমাতা (= প্রমাণের কর্তা)। গণপতি শাস্ত্রী সম্পা., ১৫।

১৮. *প্র-ক-মা,* ১১২ দ্র.।

১৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০ (সূত্র ৭); মামোরু নামাই (১৯৭৬), ৩৯ (সূত্র A 10)। দক্ষিণারঞ্জন দুটি উৎসরই—শঙ্করাচার্য ও সদানন্দ কাশ্মীরক—উল্লেখ করেছেন (২০১), নামাই করেছেন একমাত্র দ্বিতীয়টির (৩৮)।

২০. ১ : ১৩৭ (৩৯৩)।

২১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০১ (সূত্র ৫৪); নামাই (১৯৭৬), ৪১ (সূত্র B1)। সূত্রটি হলো : 'লোকব্যবহারং প্রতি সদৃশৌ বালপণ্ডিতৌ', পার্থিব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বালক (= অজ্ঞ) ও পণ্ডিত একই ধরণের (আচরণ করেন)। এর অন্য অর্থও প্রস্তাব করা হয়েছে : "[F]ools and the wise are alike in the eye of the world"। জয়তিল্লেকে (১৯৬৩/১৯৮০), ৮১।

২২. ২ : ১০৮ ও ১৭২ (৫২৬ ও ৫৮৫)।

২৩. ফ্রাঙ্কো (১৯৮৭ / ১৯৯৪), ভূমিকা, ৪৩-৪৪।

২৪. ঐ, ২৯৯ টী, ৪। ফ্রাঙ্কো এই ন্যায়টির তর্জমা করেছেন : "In respect to everyday practice the fool and the wise are the same" (ঐ, ৬৯)।

অধ্যায় ১৮

সিদ্ধর্ষি। *উপমিতি-ভব-প্রপঞ্চা-কথা*

কয়েকটি জৈন কাব্যে ও চম্পূ (= গদ্য-পদ্য মিলিয়ে লেখা)-তেও চার্বাকমতের কথা পাওয়া যায়। তারই একটি হলো জৈন কবি সিদ্ধর্ষি-র *উপমিতি-ভব-প্রপঞ্চা-কথা* (রচনাকাল : খ্রি ৯০৬)।

চার্বাকমতের পরিচয় দিতে গিয়ে সিদ্ধর্ষি লিখেছেন : "লোকায়তরা বলে নির্বৃতি (= মোক্ষ) নেই, আত্মা নেই, পরলোক নেই, পাপপুণ্য নেই। মাটি, জল, আগুন ও বাতাস—এই চারটি হলো তত্ত্ব (মূল বিষয়), সেগুলি মিললে শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, সংজ্ঞা (= নাম) হয়। মদ তৈরির উপাদান থেকে মদশক্তি (= মাতাল করার ক্ষমতা)-র মতো ঐ চারটি মূল বিষয় থেকে চৈতন্য (দেখা দেয়)। সব জীব জলবুদ্‌বুদের মতো। প্রবৃত্তি (= বাঞ্ছিত জিনিসের দিকে ঝোঁক) ও নিবৃত্তি (= অবাঞ্ছিত জিনিস এড়ানো) থেকে যে-প্রীতি (= সুখ) তা-ই পুরুষার্থ (জীবনের লক্ষ্য)। সেই পুরুষার্থ হলো কাম, মোক্ষ ইত্যাদি অন্য কিছু নয়। মাটি ইত্যাদি (চারটি মূল বিষয়) ছাড়া আর কোনো মূল বিষয় নেই, কারণ দৃষ্টকে ছেড়ে অদৃষ্ট (= পূর্বজন্মর পাপপুণ্য) কল্পনা করা অসম্ভব। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এই হলো লোকায়তমতের সার কথা।"[১]

অন্য ভাষায় এই কথাগুলিই সোমদেব সূরি-র *য-তি-চ* বইতেও আছে ('তথাচ পরলোকাভাবে জলবুদ্‌বুদ স্বভাবেষু জীবেষু মদশক্তি প্রতিজ্ঞানে' ইত্যাদি)।[২]

এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করার আগে সিদ্ধর্ষি-র বইটি সম্পর্কে দু-এক কথা বলে নেওয়া ভালো। ভারতীয় সাহিত্যে (সংস্কৃত সাহিত্যে তো বটেই) *উ-ভ-প্র-ক*-ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপক রচনা বা *অ্যালেগরি*।[৩] *প্র-চ*-র প্রায় দু শতক আগে এটি লেখা হয়েছিল। সিদ্ধর্ষি-র আগেও পুরাণে ও অন্যত্র রূপক-চরিত্র পাওয়া যায় (যেমন, *বি-পু*, ৩।১৭-১৮-য় মায়ামোহ), কিন্তু আগাগোড়া এমন টানা রূপক আর কেউ লেখেন নি। তা ছাড়া, এই বইতে শুধু যে লোকায়তমতের কথা আছে তা-ই নয়। খ্রি ন-দশ শতকে জৈনরা যে কটি দর্শনকে খণ্ডন করতে চাইতেন তার সবকটির কথাই এখানে পাওয়া যায়।

রূপক কাব্যে এত সব কথা এল কী করে? উত্তর সহজ : রূপকেরই সূত্র ধরে। এই কাব্যর সব চরিত্রই কোনো নৈতিক গুণ বা দোষের নামে। যেমন এক রাজার নাম মহামোহ, রানির নাম মহামূঢ়তা, প্রধানমন্ত্রীর নাম মিথ্যাদর্শন, তাঁর স্ত্রী-র নাম কুদৃষ্টি। তিনিই যাবতীয় অ-জৈন মতবাদের ধাত্রী। এরকম বহু মতবাদের এক বিরাট তালিকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ৪৬টি শব্দ কোনো সংস্কৃত অভিধানে ঐ বিশেষ অর্থে পাওয়া যায় না।[৪] কোন্ কোন্ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে তা-ও এখন ধরা যায় না। যেমন, অম্বর, কন্টকমর্দক, গোদেহ, চুঞ্চুণ, মুংখ, হস্তিতাপস—এরা কারা? তালিকায় কিছু চেনা নামও আছে—বৌদ্ধ, ত্রিদণ্ডী, শৈব, গৌতম, আজীবক, কাপালিক, লোকায়ত।[৫]

এরপরে বলা হয়েছে ভবচক্র নামে এক রাজ্যর কথা। সেটি মিথ্যাদর্শন ও কুদৃষ্টি-রই সৃষ্টি। সেই রাজ্যে ছটি পুর (শহর) আছে। তাদের নাম : নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, বৌদ্ধ, মীমাংসক ও লোকায়ত। প্রথম পাঁচটি শহরের লোকদের নাম একই; শুধু লোকায়তপুর-এর বাসিন্দাদের বলে বার্হস্পত্য। প্রথম পাঁচদল নির্বৃতি বা মোক্ষে বিশ্বাস করেন, শুধু বার্হস্পত্য-রাই তা করেন না।

এই বলে সিদ্ধর্ষি এবার ছটি দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। লোকায়ত-মতকে কীভাবে হাজির করা হয়েছে তা আগেই দেখানো হয়েছে।

মীমাংসকদের সম্পর্কে সিদ্ধর্ষি একটি মজার কথা বলেছেন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও লোকায়ত-কে তিনি দর্শন বলে স্বীকার করেন। কিন্তু মীমাংসা, তাঁর মতে, হালে তৈরি হয়েছে; তার্কিকদের আক্রমণের হাত থেকে বেদকে বাঁচানোই তার লক্ষ্য। আবার, একথাও তিনি বলতে ভোলেন নি যে, লোকায়ত ছাড়া আর পাঁচটি মত নির্বৃতিনগরে (= মোক্ষপুরীতে) যাওয়ার রাস্তা বানিয়েছে বটে, কিন্তু জৈনরা ছাড়া আর কেউ তার পথ জানে না।

সব মিলিয়ে বলা যায়, সিদ্ধর্ষি-র বিবরণটি তাঁর পরম্পরাগত গুরু হরিভদ্র-র বিবরণের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে।[৬] তফাতের মধ্যে হরিভদ্র লিখেছিলেন শ্লোকে, আর সিদ্ধর্ষি-র বইটির বেশির ভাগই পদ্যে লেখা হলেও প্রতিটি দর্শনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে গদ্যে। আর, এই সময়েও (দশ শতকে) লোকায়তকে জৈনরা যে প্রতিপক্ষ বলে মনে করতেন—এমন সিদ্ধান্ত করাই যেতে পারে।

---

১. *উ-ভ-প্র-ক*, প্রস্তাব ৪, ৬৬৮।

২. *য-তি-চ*, ২ : ২৫৩।

৩. *উ-ভ-প্র-ক*, ভূমিকা, ১৫-১৬ দ্র.।

৪. ঐ, ৫৪৭-৪৮ দ্র.। ইত্তাকবি এমন আরও বহু শব্দর তালিকা দিয়েছেন। ঐ, ভূমিকা, ২৭-৩৫ দ্র.।

৫. ঐ, ৫৪৭।

৬. *য-দ-স,* ৩০০-১০। এ ছাড়া হরিভদ্র-র প্রাকৃত কাহিনীমালা, *সমরাইচ্চ কহা* (*সমরাদিত্য কথা*)-র এক জায়গায় নাম না-করে 'নাহিয়বাদ' অর্থাৎ লোকায়তমত খণ্ডন করা হয়েছে (১৬৩-১৮১ দ্র.)।

অধ্যায় ১৯

জয়ন্তভট্ট। *ন্যায়মঞ্জরী*

জয়ন্তভট্ট ছিলেন কাশ্মীরের দার্শনিক, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এক প্রধান লেখক। শুধু ঈশ্বর নয়, বেদ ও যাগযজ্ঞেও তাঁর আস্থা ছিল অগাধ। তাঁর বিখ্যাত বই-এর নাম *ন্যায়মঞ্জরী*। গৌতম-এর *ন্যা-সূ* ধরে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মূল কথাগুলি এতে বেশ ছড়িয়ে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া তিনি একটি নাটকও লিখেছিলেন : *আগমডম্বর*।

ন্যা-ম-তে নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা এসেছে। জয়ন্ত শুধু নিজের মতই হাজির করেন না, অন্যদের মত নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেন। এ ব্যাপারে তাঁর উৎসাহও ছিল খুব। মীমাংসা, শব্দব্রহ্মবাদ, বৌদ্ধ, চার্বাক—কারুকেই তিনি রেয়াত করেন না। বিশেষ করে চার্বাকদের সম্পর্কে তাঁর বিরাগ খুব বেশি। *ন্যা-ম*-র নানা জায়গায় তিনি এমন ভাব করেন যেন চার্বাকরা কোনো আলোচনারই যোগ্য নন। তাঁদের সম্পর্কে তাঁর প্রিয় বিশেষণ : বরাক।[১] মানে 'নীচ'। তবু *ন্যা-ম*-র অনেক জায়গা জুড়ে তিনি চার্বাকমত খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। সে-নিয়ে আলোচনা না করলে চার্বাকচর্চার ধারা সম্পর্কে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চার্বাকমত বলতে জয়ন্ত বোঝেন : ভূতচৈতন্যবাদ আর শরীরাত্মবাদ বা দেহাত্মবাদ। আরও একটি বিষয়ে তিনি চার্বাকদের পূর্বপক্ষী করেন। সেটি হলো অনুমান-অপ্রামাণ্যবাদ (আনুমানকে যথার্থজ্ঞানের উপায় হিসেবে স্বীকার করা যায় না—এই মত)।

দেহাত্মবাদের আলোচনায় জয়ন্তভট্ট প্রথমেই একটি ভুল কথা লেখেন। তাঁর মতে, চার্বাকরা চৈতন্যখচিত দেহকেই আত্মা বলে মনে করেন। এটি একেবারেই অপব্যাখ্যা। চার্বাকরা অবশ্যই বলতেন : মাটি, আগুন, বাতাস আর জল—এই চারটি হলো মূল উপাদান। এদেরই এক বিশেষ পরিণামের ফলে প্রাণীর দেহ তৈরি হয়, আর সেই দেহ থেকেই জন্মায় (বা অভিব্যক্ত হয়) চেতনা।[২] দেহছাড়া অজর, অমর আত্মা বলে কিছু থাকে না। এর মানে এই নয় যে, দেহই আত্মা বা চৈতন্যখচিত দেহই আত্মা। একা জয়ন্তভট্ট-ই নন, অনেক চার্বাকবিরোধীই চার্বাকমতকে এইভাবে বিকৃত করেন।

অনুমান বিষয়ে চার্বাকদের কী মত? জয়ন্তভট্ট এ বিষয়ে নিজেই দুরকম কথা বলেন। একবার তিনি লেখেন : চার্বাকরা শুধু একটিই প্রমাণ মানেন; সেটি হলো প্রত্যক্ষ।[৩] কয়েক পাতা পরে তিনি লেখেন : সুশিক্ষিত চার্বাকরা বলেন প্রমাণ-এর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।[৪] আর এক জায়গায় তিনি লেখেন : চার্বাকদের মতে অনুমান কোনো প্রমাণই নয়।[৫] তারপরে আবার তিনিই বলেন, 'সুশিক্ষিততর'দের কথা, যাঁরা বলতেন : দু ধরণের প্রতীতি আছে, উৎপন্নপ্রতীতি আর উৎপাদ্যপ্রতীতি।[৬] জয়ন্তই ব্যাখ্যা করে বলেছেন : প্রথমটি হলো এমন জ্ঞান যা সাধারণ মানুষ নিজেরাই অনুমান করে নিতে পারেন। যেমন, ধোঁয়া দেখে তাঁরা অনুমান করে নেন : আগুন আছে। কিন্তু আত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ পুরুষ, পরলোক ইত্যাদি ব্যাপারে এ ধরণের জ্ঞান হয় না; কূটতার্কিকরা লোককে এগুলি কসরত করে বোঝান।[৭] স্বাভাবিকভাবে এসব না-দেখা ব্যাপারে জ্ঞান হওয়ার নয়।

চার্বাকরা কিন্তু সবরকম অনুমানের বিরোধী ছিলেন না, যা লোকব্যবহারে, প্রতিদিনই বারবার দেখে মানুষ অনুমান করতে পারেন—সে ধরণের অনুমানে তাঁদের কোনো আপত্তি ছিল না। পুরন্দর নামে এক চার্বাক দার্শনিক সে-কথা খুব পরিষ্কার করে বলে গেছেন।[৮] জয়ন্ত-র সমসাময়িক, সম্ভবত কাশ্মীরেরই বাসিন্দা আর এক চার্বাকপন্থী দার্শনিক, উদ্ভটভট্ট তাই দু ধরণের হেতুর মধ্যে তফাত করেছেন : লোকসিদ্ধহেতু আর শাস্ত্রসিদ্ধহেতু।[৯] লোকসিদ্ধহেতু হলো উৎপন্নপ্রতীতি যা মানুষের স্বাভাবিকভাবে হয়; আর শাস্ত্রসিদ্ধহেতু হলো উৎপাদ্যপ্রতীতি, যেগুলো স্বাভাবিকভাবে হয় না (যেমন, অমর আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদির অস্তিত্ব), শাস্ত্রর দোহাই পেড়ে যেগুলোকে বিশ্বাস করাতে হয়।

জয়ন্ত এসব কথা জানতেন না—এমন নয়। উদ্ভট-র রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। *ন্যা-ম*-র টীকা *গ্রন্থিভঙ্গ*-য় চক্রধর জানিয়েছেন : 'সুশিক্ষিত চার্বাক' ও 'চার্বাক ধূর্ত' বলতে জয়ন্ত ঐ উদ্ভট-কেই বুঝিয়েছেন।[১০] তবু, জেনে-বুঝে জয়ন্ত পাঠকদের ভুল পথে নিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন : নারী, শিশু, রাখাল বা চাষিও বোঝে যে দুটি ঘটনা সর্বদাই ঘটতে দেখা গেলে দু-এর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। [এর মানে হলো : চার্বাকরা এত বোকা যে এটুকুও তারা বোঝে না]। তারপর তিনি লিখেছেন : অনুমান-এর প্রামাণ্য অস্বীকার করলে লোকযাত্রা অচল হয়ে যাবে; শুধু প্রত্যক্ষ দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। এমনকি প্রত্যক্ষর ক্ষেত্রেও লোকে তার থেকে অনুমান করে : কোন্‌টা সুখের, কোন্‌টা দুঃখের আর তার থেকেই ঠিক করে কোন্‌টা হেয়, কোন্‌টা উপাদেয়।[১১] [যেন চার্বাকরা এগুলোও ঠাওর করতে পারে না!]

অর্থাৎ চার্বাকরা যে-লোকব্যবহারকে কোনোদিনই অস্বীকার করেন নি,[১২] জয়ন্ত (ও আর-এক ভাববাদী দার্শনিক, বাচস্পতিমিশ্র) তাঁদের দিয়ে সেই কথাই অস্বীকার করিয়েছেন ও তারপরে সেই নিয়ে অবান্তর মশ্‌করা করেছেন।

এইখানে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : চার্বাকদের শিখণ্ডী খাড়া করে জয়ন্ত আসলে আর কোনো দার্শনিক সম্প্রদায়কে আক্রমণ করছেন না তো? ঘটনা তা-ই। অনুমান কেন, প্রত্যক্ষকেও প্রমাণ বলে মানতে চাইতেন না, মানতেন শুধু আগম বা বেদবাক্যকে—এমন এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন ভর্তৃহরি। চার্বাকদের নাম করে জয়ন্ত আসলে খণ্ডন করছিলেন ভর্তৃহরি-কেই।[১৩] তাই অনুমানকে খারিজ করার সময়ে চার্বাকদের মত হিসেবে তিনি কোনো চার্বাকসূত্র বা শ্লোক (আভাণক/লোকগাথা) উদ্ধৃত করেন নি। তার বদলে তিনি উদ্ধৃত করেছেন ভর্তৃহরি-র *বা-প* থেকে তিনটি শ্লোক।[১৪] সেগুলি এই :

> হস্তস্পর্শের সাহায্যে দুর্গমপথে বিচরণশীল অন্ধের ন্যায় যে পুরুষ অনুমানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাহার পক্ষে পতন দুর্লভ নহে (অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী)।
>
> অবস্থাভেদ, দেশভেদ এবং কালভেদ বশতঃ যেহেতু পদার্থ সমূহের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, সেইহেতু অনুমানের সাহায্যে তাহাদের (অর্থাৎ পদার্থের সেই সেই শক্তির) নিশ্চয় [= নির্ণয়] অতীব দুর্লভ।
>
> নিপুণ অনুমাতৃপুরুষগণ [অনুমানে দক্ষ মানুষদের] কর্তৃক যত্নসহকারে কোনো অর্থের অনুমান করা হইলেও, অভিযুক্ততায় অন্য পুরুষগণ কর্তৃক তাহা অন্যরূপে উপপাদিত হইয়া থাকে।[১৫]

এখানে এ কথাও বলা দরকার যে, একা জয়ন্ত-ই নন, শান্তরক্ষিত, বাচস্পতিমিশ্র, শীলাঙ্ক প্রমুখ বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধারার আরও কোনো কোনো দার্শনিকও, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাককে উপস্থিত করার সময়ে, উদ্ধৃত করেছেন ভর্তৃহরি-র শ্লোক।[১৬] সকলেরই বক্তব্য এক : চার্বাকরা অনুমানকে প্রমাণ বলে মানে না। অথচ চার্বাকরা প্রথম দু ধরণের অনুমানের কথা বলেছেন : লোকসিদ্ধ বা উৎপন্নপ্রতীতি আর শাস্ত্রসিদ্ধ বা উৎপাদ্যপ্রতীতি। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে অনুমানের এই দুটি বিভাগ তাঁদের অন্যতম কৃতিত্বর নিদর্শন। জয়ন্ত সে-কথা জানতেন, তাই উৎপন্ন- ও উৎপাদ্য-প্রতীতির আলোচনায় চার্বাক নামটি ব্যবহার না-করে 'সুশিক্ষিততর' বলে ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা একটু ঝাপসা রেখেছেন।[১৭]

অনুমানকে প্রত্যক্ষরই মতো প্রধান একটি প্রমাণ বলে প্রতিষ্ঠা করতে জয়ন্ত এত উৎসাহী কেন? আমরা দেখেছি, চার্বাকরা লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুমানকে মানতে রাজি ছিলেন, কিন্তু লোকব্যবহারের বাইরে তার ক্ষেত্রকে ছড়ানোয় তাঁদের আপত্তি ছিল। ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি আছে না নেই এই প্রশ্ন উঠলে চার্বাকরা বলতেন : প্রমাণকে হতে হবে অগৌণ, অর্থাৎ প্রধান, আর কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়।[১৮] *ন্যা-*

সূ-তে অনুমান-এর সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে : অনুমান হলো তৎপূর্বক (জ্ঞান)।[১৯] তৎ বলতে বোঝানো হচ্ছে তার আগের সূত্রে যে-প্রমাণের কথা বলা আছে সেই প্রত্যক্ষকে।[২০] অর্থাৎ অনুমান-এর আগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকতে হবে। সুতরাং প্রমাণ হিসেবে অনুমান গৌণ। সেই কারণেই অনুমান থেকে অর্থ নিশ্চয় দুর্লভ।

এইখানেই নৈয়ায়িকরা পড়েছেন ফাঁপরে। তাঁরা ঈশ্বর, পরলোক সবই মানেন। কিন্তু সেগুলো তো চোখে দেখা যায় না। তার জন্য চাই অনুমান আর আপ্ত-উপদেশ বা বিশ্বাসযোগ্য লোকের বচন।[২১] ফলে অনুমান আর শব্দপ্রমাণ দুই-ই তাঁদের দরকার। তার জন্যেই *ন্যা-সূ*-তে শব্দপ্রমাণ-কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : দৃষ্ট বিষয় আর অদৃষ্ট বিষয়।[২২] আর এই অদৃষ্ট বিষয়ের জন্যেই শাস্ত্র ও শাস্ত্রভিত্তিক অনুমান-এর দরকার পড়ে। চার্বাকরা আবার সেটি মানতে নারাজ। জয়ন্ত তাই মনে করেন : পরলোক ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই চার্বাকদের দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানানো যাবে।[২৩] এর জন্যেই অদৃষ্ট বিষয়ে অনুমান-এর সাহায্যে জানার সপক্ষে জয়ন্তভট্ট-র এত চেষ্টা।

এর সঙ্গে আমরা আর-একটি প্রশ্নর সমাধান করে নিতে পারি। আগেই বলা হয়েছে : জয়ন্ত চার্বাকদের কখনও সুশিক্ষিত চার্বাক, কখনও বা চার্বাক ধূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী প্রমুখ বহু বিদ্বান্‌ই এর থেকে অনুমান করেছেন : চার্বাকদের দুটি আলাদা সম্প্রদায় ছিল। সুশিক্ষিত চার্বাকরা ছিলেন কিছুটা নরমপন্থী বা 'শোধনবাদী' আর চার্বাক ধূর্তরা একেবারেই বেপরোয়া বা স্থূল বাস্তুবাদী।

এই ধারণা কি ঠিক? মনে রাখতে হবে : যখন ঐ অনুমান করা হয়েছিল তখন অবধি *গ্রন্থিভঙ্গ*-টীকা ছাপা হয় নি। নগীনদাস জীবনলাল শাহ সেটি প্রথম বার করেন ১৯৭২-এ।[২৪] তাতে দেখা যাচ্ছে : ঐ দুটি নাম দিয়েই জয়ন্ত বুঝিয়েছেন উদ্ভটভট্ট প্রমুখ বস্তুবাদী দার্শনিকদের।[২৫] তার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগির ইঙ্গিত নেই।

আমার মনে হয় : চক্রধর-ই এখানে ঠিক কথা বলেছেন। 'সুশিক্ষিত' 'সুশিক্ষিততর'—এ ধরণের শব্দপ্রয়োগের পেছনে লুকিয়ে আছে বিদ্রূপ। প্রভাকরপন্থী মীমাংসকদেরও জয়ন্ত দুবার 'সুশিক্ষিত' বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬] আসলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন 'অশিক্ষিত', খুব বোকা লোককে যেমন ঠাট্টা করে বলা হয় : 'তুমি দেখছি ভারি বুদ্ধিমান।'[২৭]

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা তুলেছেন। তাঁর মতে, জয়ন্ত তো চার্বাকদের 'বরাক' (= নীচ)-ও বলেছেন। "তাহলে কি এই নজির থেকেই চার্বাকদের আরও এক সম্প্রদায় কল্পনা করতে হবে?"[২৮] ফলে, জয়ন্ত চার্বাকদের

একাধিক দলের কথা বলেছেন—এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। চার্বাক বলতে তিনি একটিই সম্প্রদায় বোঝেন—যে-সম্প্রদায় পরলোক মানে না, ঈশ্বর মানে না, অদৃষ্ট ও অদৃশ্য বিষয়ে শাস্ত্রভিত্তিক অনুমানকে এক কথায় খারিজ করে দেয়, কারণ তার পেছনে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কোনো কোনো সূত্রর ব্যাখ্যায় অবশ্য উদ্ভট প্রমুখ টীকাকার চিরন্তন (প্রাচীন) চার্বাকাচার্যদের থেকে আলাদা ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯] কিন্তু তাতে মূল দৃষ্টিভঙ্গির কোনো রদবদল হয় না। 'সেগুলো থেকেই চৈতন্য'—এই সূত্রটির টীকায় অন্তত তিন রকমের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৩০] কিন্তু জড় যে জীবের আগে আসে, জড় না-থাকলে জীব থাকে না, তার কোনো অশরীরী অস্তিত্ব নেই—এ ব্যাপারে *চার্বাকসূত্র*-র টীকাকারদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না।

জয়ন্ত সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে একটি কথা চালু ছিল : তিনি নাকি ভারি উদার ছিলেন, পরমতের নিন্দায় কখনও মুখর হন নি (যেমন ছিলেন বাচস্পতিমিশ্র), ইত্যাদি।[৩১] বহুদিন আগেই এর প্রতিবাদ করে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ লিখেছিলেন : "কিন্তু তাঁহার (=জয়ন্ত-র) সেই উদারতা কিরূপ? তিনি কি জাতিভেদ বা চণ্ডালাদি স্পর্শ-দোষ মানিতেন না?"[৩২] ফণিভূষণ দেখিয়েছেন জয়ন্তভট্ট তাঁর বই-এ বৌদ্ধ প্রভৃতিদের দুরাত্মা ইত্যাদি বলে দিব্যি গাল দিয়েছেন। "আরও অনেক স্থলে জয়ন্তভট্টের অনেক কথা বুঝিলে তাঁহার উদার মত কিরূপ, তাহা বুঝা যাইবে।"[৩৩] আসলে জয়ন্ত-র সব উদারতাই বেদমূলক দর্শনের ক্ষেত্রে, কিন্তু বেদ-এর প্রামাণ্য যাঁরা মানেন না তাঁদের কিন্তু কোনো ছাড় দিতে বা রেয়াত করতে রাজি নন। সম্ভবত তাঁরই সম্প্রদায়ের কোনো লোক বলেছিলেন : যদি সব বেদবচনকেই প্রামাণ্য বলতে হয় তবে লোকায়ত ইত্যাদি দর্শনের মতকেও তো প্রামাণ্য বলেই স্বীকার করতে হবে। সেখানেও তো বেদ-এর কথাই আছে। জয়ন্ত তার উত্তরে বলেছেন : না, তা নয়। লোকায়তরা নেহাতই বৈতণ্ডিক। তাঁরা অন্যের মত খণ্ডন করতেই ব্যস্ত, নিজেদের মত বলতে তাঁদের কিছু নেই।[৩৪]

প্রশ্ন উঠতেই পারে : এ আবার কী কথা? চার্বাকমতে কি বলা হয় নি : "যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে।"[৩৫] এই তো একটা স্পষ্ট উপদেশ পাওয়া গেল। উত্তরে জয়ন্ত বলেন : না, এটা তো স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার (অর্থাৎ লোকে স্বভাবতই সুখী হতে চায়), এর জন্যে উপদেশ দেওয়া বৃথা।[৩৬] আর অন্য যেসব কথা লোকায়ত দর্শনে বলা হয়েছে, "ধর্ম আচরণ কোরো না", "তার উপদেশে বিশ্বাস কোরো না"—এইসব উপদেশও পূর্বপক্ষ-বচনমূলক, অর্থাৎ বেদ-উপনিষদে পূর্বপক্ষ হিসেবে যেসব মত হাজির করা হয়েছে চার্বাকরা সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে।[৩৭] অতএব চার্বাকদর্শন বেদমূলক—এমন ভাবা একেবারেই অমূলক।

চার্বাক প্রসঙ্গে জয়ন্ত আরও অনেক কটূক্তি করেছেন, তার যুক্তিপদ্ধতিকে অবজ্ঞা

করেছেন 'ক্ষুদ্রতর্ক' বলে।[৩৮] কিন্তু সে-নিয়ে কথা তুলে লাভ নেই। তর্কাতর্কির সময়ে অনেকেই মাত্রা ছাড়িয়ে উল্‌টোপাল্‌টা বলে থাকেন। জয়ন্ত-ও তাঁদের থেকে আলাদা কিছু নন। চার্বাকমত খণ্ডনে নেমে তিনি দেখা দিয়েছেন তার্কিকের ভূমিকায়, তথ্য বা যুক্তিতে না কুলোলে, জল্প ও ছল-এর আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হন নি।[৩৯] ১৮৯৫-এ *ন্যা-ম* বইটি ছেপে বেরনোর পর থেকেই চার্বাকদর্শনের আলোচনায় সেটিকে নানাভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে বইটি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। তার প্রধান কারণ : জেনে শুনে এতে চার্বাকদর্শনের বিকৃত রূপ দেওয়া আছে। চার্বাকদের সম্পর্কে শঙ্করাচার্য-ও প্রসন্ন ছিলেন না। লৌকায়তিকদের তিনি 'প্রাকৃতজনাঃ' (অজ্ঞ, মূর্খ লোক) বলে অবজ্ঞা করেছেন, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখের সময়েও চার্বাকমতকে বিকৃত করেন নি।[৪০] জয়ন্তভট্ট ঐ অপরাধে অপরাধী।

---

১. *ন্যা-ম*, আহ্নিক ১, ভাগ ১, ৭; আহ্নিক ৩, ২৯৯ ইত্যাদি। উদয়ন-ও চার্বাককে একই ভাবে 'বরাক' বলেছেন (*ন্যা-কু*, ৩।৬, গদ্য অংশ)। *ন্যা-ম* থেকে যাবতীয় উল্লেখ-উদ্ধৃতি বারাণসী সং, (*গ্রন্থিভঙ্গ*-টীকা সমেত) থেকেই দেওয়া হবে। পুরো বইটির কোনো ইংরিজি বা বাঙলা তর্জমা পাওয়া যায় না (তবে প্রথমদিকের কয়েকটি আহ্নিকের তর্জমা আছে)। বিস্তৃত গবেষণামূলক কাজ করেছেন নগীনদাস জীবনলাল শাহ (আমেদাবাদ, ১৯৯৩-৯৭)। চক্রধর-এর *গ্রন্থিভঙ্গ* টীকা-টি তিনিই আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন। মূল বইটির বেশ কয়েকটি অধ্যায়ের গুজরাতী অনুবাদও করেছেন তিনি। সম্প্রতি একটি হিন্দী তর্জমাও বেরিয়েছে (এখনও দেখার সুযোগ হয় নি)। *ন্যা-ম*-র চার্বাক সংক্রান্ত অংশগুলির ইংরিজি তর্জমা পাওয়া যাবে *C/L*, ১১১-৫৭-য়।

২. *স-দ-স* (অধ্যায় ১) সমেত আরও বহু জায়গায় এই চার্বাকসূত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে। এ ছাড়া *চার্বাকসূত্র*-র এক টীকাকার, উদ্ভটভট্ট মনে করতেন : 'তেভ্যশ্চৈতন্যম্'-এই সূত্রটির প্রথম শব্দটিকে পঞ্চমীবিভক্তি-অন্ত পদ বলে না-ধরে চতুর্থীবিভক্তি-অন্ত পদ বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ 'সেগুলি থেকে চৈতন্য দেখা দেয়'-এর বদলে সূত্রটির মানে দাঁড়াবে : 'সেগুলির নিমিত্ত চৈতন্য দেখা দেয়'। 'সেগুলি' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে : মাটি, বাতাস, আগুন আর জল—এই চারটি ভূত বা মূল উপাদান। উদ্ভট-এর এই মতটি উদ্ধৃত হয়েছে *ন্যা-ম*-র টীকা, *গ্রন্থিভঙ্গ*-য় (*ন্যা-ম*, আহ্নিক ৭, ২৫৭-৫৮)।

৩. *ন্যা-ম*, আহ্নিক ১, ৪৩।

৪. ঐ, ৫২।

৫. ঐ, আহ্নিক ৭, ২০১।

৬. ঐ, আহ্নিক ২, ১৮৪।

৭. ঐ।

৮. কমলশীল তাঁর *ত-স-প*-য় এটি উদ্ধৃত করেছেন (খণ্ড ২, ৫২৮)। আরও কেউ কেউ এই কথাই সমর্থন করেছেন। বিস্তৃত আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৯), ৪৮৮-৮৯ দ্র.। সুখলালজী সংঘবী তাঁর হিন্দী প্রবন্ধে একই মত ব্যক্ত করেছেন (১৯৪১, *দর্শন* ও

চিন্তন-এ সঙ্কলিত; *ত-উ-সি* (১৯৮৭)-র পরিশিষ্ট অংশে পুনর্মুদ্রিত)। 'ইন্দ্রিয়াধিপত্য পক্ষ'-র ব্যাখ্যায় সেখানে লেখা হয়েছে : "ইসকা তাৎপর্য য়হ নহী কি চার্বাক অনুমান য়া শব্দব্যবহার রূপ আগম আদি প্রমাণোকো, জো প্রতিদিন সর্বসিদ্ধ ব্যাবহারকী বস্তু হৈ, ন মানতা হো; ফির ভী চার্বাক অপনেকো জো প্রত্যক্ষমাত্রবাদী—ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষমাত্রবাদী কহতা হৈ, ইসকা অর্থ ইতনা হি হৈ কি অনুমান, শব্দ আদি কোই ভী লৌকিক প্রমাণ ক্যোঁ ন হো, পর উসকা প্রামাণ্য ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে সংবাদকে সিবায় কভী সম্ভব নহী। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষসে বাধিত নহী ঐসা কোই ভী জ্ঞান ব্যাপার যদি প্রমাণ কহা জাএ তো ইসমে চার্বাককো আপত্তি নহী" ((১৯৮৭), ২৩-২৪)।

৯. *স্যা-বা-র*, ২৬৬-তে উদ্ধৃত।
১০. *ন্যা-ম*, আহ্নিক ১, ৫২, ১০০; আহ্নিক ৭, ২৫৭।
১১. ঐ, আহ্নিক ২, ১৭৯; তু. *আ-ড*, অঙ্ক ৩, শ্লোক ২২, ৬২।
১২. উদয়নাচার্য তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*-তে পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন : নানা নামে সকলেই ভগবান মানেন। যেমন, চার্বাকদের কাছে লোকব্যবহারসিদ্ধ-ই ভগবান (চৌখম্বা সং., ৫)। উদয়ন-এর টীকাকাররা 'লোকব্যবহারসিদ্ধ' বলতে বুঝিয়েছেন : (ক) দেবদেবীদের বিগ্রহ, (খ) রাজা স্বয়ং। আমার কিন্তু মনে হয়, শব্দটি দিয়ে বোঝাচ্ছে : লৌকিক জীবনের অভিজ্ঞতায় বারবার দেখে যা প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে একটি লৌকিক ন্যায় বা প্রবাদবচন মনে করা যায় : 'লোকব্যবহারের বিষয়ে শিশু (অর্থাৎ অজ্ঞ) আর পণ্ডিত একই রকম' (জয়রাশি তাঁর বই-এর প্রথমেই এটি উদ্ধৃত করেছেন)। এই বই-এর অধ্যায় ১৭, টী. ২১-২৪ দ্র.।
১৩. *ন্যা-ম*-র অন্যত্র ভর্তৃহরি-র শব্দব্রহ্মবাদ খণ্ডন করা হয়েছে (আহ্নিক ৬, ১০৭ ইঃ দ্র.)।
১৪. *বা-প*, ব্রহ্মকাণ্ড-র প্রথম কয়েকটি কারিকায় ভর্তৃহরি-র বক্তব্য পাওয়া যায়। জয়ন্ত উদ্ধৃত করেছেন ৪২, ৩২ ও ৩৪ সংখ্যক কারিকা। এমন উল্‌টোপাল্‌টা উদ্ধৃতির কারণ বোঝা যায় না। *ন্যা-ম*, আহ্নিক ২, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৩ ও *আ-ড*, অঙ্ক ৩, ৫৯ দ্র.।
১৫. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যর তর্জমা, *বা-প* (১৯৮৫), ১ : ৭১, ৭৬, ৯৫ দ্র.।
১৬. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৯), ৪৮৯ দ্র.।
১৭. একটু পরে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।
১৮. 'প্রমাণস্যাগৌণত্বাদ্ অনুমানাদ্ অর্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ'। 'পৌরন্দরং সূত্রং' বলে এটি উল্লেখ করেছেন বাদিদেব সূরি (*স্যা-বা-র*, ২৬৫)।
১৯. *ন্যা-সূ*. ১।১।৫; *ন্যা-দ*, ১ : ১৫০।
২০. ঐ, ১।১।৪।
২১. নৈয়ায়িকরা চারটি প্রমাণ (= যথার্থ জ্ঞানের উপায়) স্বীকার করেন : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য লোকের কথা (*ন্যা-সূ*, ১।১।৩), তবে গোটা *ন্যা-সূ*-তে ও তার ভাষ্যটীকা পরম্পরায় অনুমানই প্রায় সব জায়গা দখল করে থাকে। সেই সঙ্গে এও বলবার : শব্দপ্রমাণের ওপরেও নৈয়ায়িকরা চূড়ান্ত নির্ভরশীল। বেদ-এর প্রামাণ্য তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন আয়ুর্বেদ-এর প্রামাণ্য দিয়ে (*ন্যা-সূ*, ২।১।৬৮ দ্র.)। এ বিষয়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "ভূমিকা", *ন্যা-সূ* (১৯৯২), পৃ. তিরিশ-তেত্তিরিশ দ্র.।
২২. ঐ, *ন্যা-সূ* ১ : ১৯২ দ্র.।

২৩. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৩, ২৭৫ দ্র.।
২৪. *ন্যা-ম-গ্র-ভ,* ১৯৭২।
২৫. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ১, ৫২, ১০০ দ্র.।
২৬. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৩, ২৪৯; আহ্নিক ৫, ৪।
২৭. ইওরোপীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে এর নাম 'আয়রনি' (irony), শ্যামাপদ চক্রবর্তী যার বাঙলা তর্জমা করেছিলেন 'বক্রাঘাত' (*অলঙ্কার-চন্দ্রিকা,* ২২৯)।
২৮. (১৯৯৩), ৭২ (ভুল করে ৮৮ ছাপা হয়েছে)। তবে 'উদ্ভট' নামধারী কোনো টীকাকারের অস্তিত্ব নিয়েই দেবীপ্রসাদ যে-সংশয় প্রকাশ করেছেন (৭০, ভুল করে ৮৬ হয়ে আছে), তারও কোনো ভিত্তি নেই। *গ্রন্থিভঙ্গ* ছাড়াও *স্যা-বা-র*-তেও উদ্ভট-এর *তত্ত্ববৃত্তি* থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।
২৯. *গ্রন্থিভঙ্গ, ন্যা-ম,* আহ্নিক ৭ প্রসঙ্গে, ২৫৭-৫৮।
৩০. টী, ২ দ্র.।
৩১. *ন্যা-ম*-র বাঙলা অনুবাদের (অসম্পূর্ণ, ১৯৩৯), ভূমিকায় পঞ্চানন তর্কবাগীশ লিখেছিলেন, "বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গুরু জয়ন্তের মত উদার মতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি বৌদ্ধ জৈন নিন্দায় মুখর" (২৬)। এখনও কেউ কেউ একই কথা বলেন, যদিও জয়ন্ত-র উদারতা বেদভক্তদের মধ্যেই আটকে থাকে।
৩২. *ন্যা-প,* ভূমিকা, [৪১]।
৩৩. *ঐ*।
৩৪. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৪, ৩৮৮।
৩৫. ঐ।
৩৬. ঐ। লক্ষ্য করার এই যে, জয়ন্ত এই সূত্রে চার্বাকদের ইহসুখবাদী (*হেডনিস্ট*) বলে গাল পাড়েন নি—যেমন পেড়েছেন শ্রীহর্ষ ও হেমচন্দ্র।
৩৭. ঐ। এই প্রসঙ্গে জয়ন্ত উদ্ধৃত করেছেন *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,* ৪।৫।১৩ থেকে। মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন : "এই সব ভূত থেকেই বিজ্ঞানঘন (= আত্মা) ওঠে, সেইগুলিতেই বিনাশ পায়। মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা (চেতনা) থাকে না।" এমন উল্‌টো কথা শুনে বেচারা মৈত্রেয়ী খুবই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন বিমূঢ় মৈত্রেয়ীকে তিনি বুঝিয়ে বলেন : "আমি তোমাকে মোহগ্রস্ত করতে চাই না। আত্মার বিনাশ নেই" (ঐ, ৪।৫।১৪)। জয়ন্ত বলতে চাইছেন : যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমে যা বলেন তা পূর্বপক্ষর বচন, পরে যেটি বলেন সেটিই তাঁর আসল মত। *বৃহদ্. উপ.*-র অন্যত্র (২।৪।১২)-ও একই কথা আছে। সায়ণ-মাধব-ও চার্বাকদের দিয়ে উপনিষদের ঐ বচনটিই উদ্ধৃত করিয়েছেন। *স-দ-স,* অধ্যায় ১ দ্র.।
৩৮. *ন্যা-ম,* আহ্নিক ১, ৯।
৩৯. নিজের কোনো বক্তব্য প্রতিষ্ঠা না করে শুধু প্রতিপক্ষর যুক্তির ফাঁক ধরার নাম 'বিতণ্ডা'। জল্প বলতে বোঝায় : লোকঠকানো জবাব দিয়ে প্রতিপক্ষকে কোনোভাবে চুপ করিয়ে দেওয়া, তারপর নিজের মত স্থাপন করা। আর 'ছল' হলো বক্তার উদ্দেশ্য ইচ্ছে করে ভুল বোঝা (*ন্যা-সূ,* ১।২। ২-৩, ১১-১৭ দ্র.)।
৪০. *শা-ভা, ব্র-সূ,* ১।১।১ প্রসঙ্গে। বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ১৬ দ্র.।

অধ্যায় ২০

জয়ন্তভট্ট। *আগমডম্বর*

ন্যায়মঞ্জরী ছাড়াও ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে জয়ন্তভট্ট একটি নাটকও লিখেছিলেন। তার নাম *আগমডম্বর* বা *ষন্মত নাটক*। এই নাটকটির কথা জানা ছিল অনেকদিন, কিন্তু ১৯৬৪-র আগে এটি ছেপে বেরয় নি।[১] সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রর বিচারে এটিকে কোনো শ্রেণীতেই ফেলা যায় না, অভিনয়যোগ্য তো নয়ই। জয়ন্তভট্ট নিজেও সে-কথা জানতেন, নাটকের প্রস্তাবনায় তা বলেওছেন।[২] বিতর্কর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অবৈদিক দর্শন ও ধর্ম সম্প্রদায়কে প্রথমে এই নাটকে হেয় করা হয়। কিন্তু সবশেষে সব ধর্মকেই নিজের নিজের আগম (শাস্ত্র) অনুসরণ করার অধিকারও দেওয়া থাকে।

নাটকটি নিয়ে আলোচনার একটিই কারণ আছে : এর তৃতীয় অঙ্কে বৃদ্ধাম্ভি নামে এক চার্বাকপন্থীকে হাজির করা হয়েছে।[৩] বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে জয়ন্তভট্ট-র অনেক বিরোধ থাকলেও, চার্বাকরাই তাঁর আসল চক্ষুশূল। কীভাবে বৃদ্ধাম্ভি-কে নাকাল করা হয়—এই নাটকে তাই সেইটুকু দেখার।

এই নাটকের নায়ক এক তরুণ ব্রাহ্মণ সংকর্ষণ। বেদ শিক্ষা শেষ করে তিনি সবে স্নাতক হয়েছেন। নাটকের গোড়ায় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু, ধর্মোত্তর-এর সঙ্গে তাঁকে তর্ক করতে দেখা যায়। যথারীতি ধর্মোত্তর হেরে যান। দ্বিতীয় অঙ্কে জিনরক্ষিত নামে এক জৈন-গুরু আর নীলাম্বর নামে একটি ধর্মসম্প্রদায়ের কথা আছে। তৃতীয় অঙ্কে আসে শৈব তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ। এই অঙ্কেরই শেষে উপস্থিত হন বৃদ্ধাম্ভি। সব ধর্মকেই তিনি উচ্ছেদ করতে চান। প্রথমে তাঁর সঙ্গে তর্কে নামেন ধর্মশিব ভট্টারক নামে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের এক বিশেষজ্ঞ। তর্কে বৃদ্ধাম্ভি হেরে যান। ব্যাপারটি তাতেও শেষ হয় না। সেই তর্কর খেই ধরে বৃদ্ধাম্ভিকে দ্বিতীয়বার হারিয়ে দেন সংকর্ষণ।

বিতর্কর প্রথম বিষয় ছিল : অনুমানকে আদৌ প্রমাণ (= যথার্থজ্ঞানের উপায়) বলে মানা হবে কিনা। বৃদ্ধাম্ভি তা মানতে রাজি নন, কারণ অবস্থা, দেশ, কাল-ভেদে বিভিন্ন বস্তুর শক্তিতে নানা পরিবর্তন দেখা যায়; তাই অনুমান দিয়ে কিছু স্থির করা

কঠিন। এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে চলার সময়ে অন্ধ লোক হাত ইত্যাদি দিয়ে ছুঁয়ে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে বলে তাদের পড়ে যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। আর, অনুমান দিয়ে একজন যা ঠিক করেন, তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত লোক সেটি ছাড়াও অন্য সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। এই সব কারণে অনুমানকে প্রমাণ বলা যায় না।

এই বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে তিনটি শ্লোকের আকারে। তিনটিই কিন্তু নেওয়া হয়েছে ভর্তৃহরি-র *বা-প* থেকে।[৪] ভর্তৃহরি ছিলেন শব্দব্রহ্মবাদী, একমাত্র বেদ ও বেদ-অনুগামী শাস্ত্রকেই তিনি প্রমাণ বলে স্বীকার করতেন। তাঁকে তাই আগমৈকপ্রমাণবাদী বলা যায়।

চার্বাকদের সম্পর্কে বলা হয় : তাঁরা প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমান, আগম ইত্যাদি কোনো প্রমাণই মানেন না।[৫] এটাই সাধারণভাবে চালু ধারণা হলেও বিষয়টি একেবারে নিঃসংশয় নয়। পুরন্দর নামে একজন চার্বাকের কথা জানা যায়, যিনি বলেছিলেন : চার্বাকরাও লৌকিক ক্ষেত্রে (যেমন ধোঁয়া দেখে আগুনের অস্তিত্ব) অনুমান মানেন; কিন্তু লৌকিক পথ ছাড়িয়ে, অলৌকিক বিষয়ে (যেমন, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি) অনুমান মানতে তাঁদের আপত্তি আছে।[৬] তবু যদি ধরেও নেওয়া যায় আদি-চার্বাকরা আদপেই কোনো ধরণের অনুমান স্বীকার করতেন না, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে : তাঁদের নিজেদের রচনায় এমন একটি সূত্র বা শ্লোকও কি পাওয়া গেল না যেটি বৃদ্ধান্তির মুখে বসানো যায়?

শুধু যে জয়ন্তভট্ট একাই ভর্তৃহরি-র কথা উদ্ধৃত করেছেন এমন নয়। তাঁর আগেও শান্তরক্ষিত নামে এক বৌদ্ধ দার্শনিকও অনুমান বিষয়ে আলোচনার সময়ে ভর্তৃহরি-র কথাই উদ্ধৃত করেন।[৭] তাঁর টীকাকার, কমলশীল বলেছেন, শান্তরক্ষিত এখানে 'বার্হস্পত্য ইত্যাদি' (বার্হস্পত্যাদয়ঃ)-র মত খণ্ডন করছেন।[৮] এই ইত্যাদি বলতে একমাত্র বোঝায় বৈয়াকরণ অর্থাৎ ভর্তৃহরি সম্প্রদায়কে (এ ছাড়া শান্তরক্ষিত ঐ একই অধ্যায়ে (১৮) পাত্রস্বামী বলে এক দার্শনিকের অনুমান বিষয়ে আপত্তির জবাব দিয়েছেন)।[৯] কমলশীল-ও একটি সূত্র-র উল্লেখ করেছেন : অনুমান প্রমাণ নয়। *ন্যায়-বিন্দু-পূর্বপক্ষ-সংক্ষেপ* (বা সংক্ষিপ্তি) বইটিতে কমলশীল ঐ একই বাক্যকে বৈয়াকরণদের মত বলেছেন।[১০] পুরন্দর-এর কথাও তাঁর অজানা ছিল না। তবু বারে বারে চার্বাকদের মুখে কেন ভর্তৃহরি-র কথাই বসানো হয়? এর একটিই কারণ থাকতে পারে। চার্বাকরা অনুমানকে একটা সীমার মধ্যে স্বীকার করতেন—যে-অনুমান লোকপ্রসিদ্ধ, অর্থাৎ বহুবার যা প্রত্যক্ষ করা গেছে।[১১] অন্যদিকে, ভর্তৃহরি তথা বৈয়াকরণ সম্প্রদায় অনুমানকে লৌকিক-অলৌকিক কোনো ক্ষেত্রেই মানতে রাজি নন, কারণ প্রত্যক্ষও তাঁদের কাছে প্রমাণ নয়।[১২] চার্বাক-বিরোধীরা সুকৌশলে চার্বাক ও ভর্তৃহরি-র মতকে এক ও অভিন্ন বলে চালাতে

চেয়েছেন। ফলে তাঁরা যখন আক্রমণ করেন ভর্তৃহরি-কে, তখন শিখণ্ডী খাড়া করেন চার্বাককে। অনুমান না মানলে জীবন চালানো অসম্ভব—এমন কথা চার্বাকদের নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই।[১৩] কাল যে-অন্ন খিদে মিটিয়েছে, আজও তা মেটাবে, এর থেকে অন্যের খিদে মেটানোর ক্ষমতা অনুমান করতে তাঁরা তৈরিই ছিলেন।[১৪] তার কারণ : এ ধরণের অনুমান প্রত্যক্ষসিদ্ধ, গতকাল যে-অনুমান করা হয়েছিল আজ তা পরখ করে দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই, সুতরাং অপ্রত্যক্ষপূর্বক অনুমান দিয়ে সেগুলির অস্তিত্ব দাবি করা চলবে না।

যেমন *ন্যা-ম*-তে, তেমনি *আ-ড*-এও জয়ন্তভট্ট চার্বাক ও ভর্তৃহরি-র মধ্যে মূল তফাতটি উপেক্ষা করেছেন। ফলে বৃদ্ধাম্ভি-র খণ্ডনে যা বলা হয় তা আদৌ পুরন্দর-এর মতো চার্বাকপন্থীকে এতটুকু বিব্রত করে না। অথচ এতকাল ধরে জয়ন্তভট্ট-র কথাগুলিকেই আস্তিকরা শেষ সত্য বলে ধরে নিয়েছেন।

এরপর আসে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ। কর্ম আর পুনর্জন্ম-র ধারণা দিয়ে ধর্মশিব ভট্টারক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। বৃদ্ধাম্ভি তার জবাব দিতে পারেন না।

কর্মফল আর তার পরিণামে পুনর্জন্ম—এ দুটি ধারণাই অনুমাননির্ভর। এর কোনোটিরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণেই জয়ন্তভট্ট আগে অনুমানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। ধর্মশিবও সেই সুযোগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এখানেই না-থেমে তিনি আবার বলেন, ন্যায় ছাড়াও আগম (শাস্ত্র) দিয়েও তিনি ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু এতক্ষণ বকে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ধর্মশিব সে-দায়িত্ব দিলেন সংকর্ষণকে।

এটাও খুব অদ্ভুত ব্যাপার। সংকর্ষণকে বলা হচ্ছে মীমাংসক, অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনের অনুগামী। তাঁদেরও একাধিক সম্প্রদায় ছিল, কিন্তু তাঁদের কেউই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। বেদকেই তাঁরা একমাত্র সত্য বলে মানতেন, আর বেদ তাঁদের মতে অপৌরুষেয় (= কোনো ব্যক্তির রচনা নয়)। ন্যায়-বৈশেষিকরা বেদকে পৌরুষেয় (= ঈশ্বর-রচিত) বলে মনে করেন। তাই ঈশ্বরের সমর্থনে বলার অধিকার তাঁদেরই আছে, মীমাংসকদের নয়। অথচ জয়ন্তভট্ট সে-দায়িত্ব চাপালেন একজন মীমাংসকের ঘাড়ে।

বোঝা যায়, ঈশ্বর থাকা না-থাকা মূল প্রশ্ন নয়, বেদ-এর প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাই জয়ন্ত-র একমাত্র উদ্দেশ্য। তার জন্যেই সংকর্ষণকে মীমাংসক হিসেবে হাজির করা।

বৃদ্ধাম্ভি এখানেও সুবিধে করতে পারেন না। ধর্মশিব তখন সংকর্ষণকে বলেন, বেদ প্রমাণ না প্রমাণ নয়—সেটা আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া (স্বগৃহকলহোয়ম্ অস্মাকম্)। তোমাদের উচিত : বেদবিরোধী দূর করে দেওয়া। সংকর্ষণও সবিনয়ে বলেন, আপনি যেমন আদেশ করেন।

তাহলে দেখা গেল, দার্শনিক দিক থেকে অনুমান-প্রামাণ্য আর ধর্মীয় দিক থেকে বেদ তথা ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই দুটি বিচারে চার্বাককে খারিজ করা হয়। তর্কটা আদৌ জুতসই হয় নি। যে-কোনো তর্ক শুরু করার আগে ঠিক করে নিতে হয় : কোন্ কোন্ বিষয়ে দুপক্ষই একমত, তবেই তর্ক আরম্ভ করা যায়। এখানে কিন্তু চার্বাককে দিয়ে প্রথমেই একটি অচার্বাক মত স্বীকার করানো হয়েছে (লৌকিক-অলৌকিক নির্বিশেষে অনুমানমাত্রই বাতিল) আর তারপরে, চার্বাক-খণ্ডনের নামে ভর্তৃহরি-খণ্ডন করে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে ন্যায় আর আগমের ভিত্তিতে। অথচ লৌকিক ক্ষেত্র ছাড়া চার্বাকরা ন্যায়কে প্রমাণ বলে স্বীকার করতেন না, আর আগমকে তাঁরা সব ক্ষেত্রেই প্রমাণ বলতে গররাজি ছিলেন।[১৫] জয়ন্তভট্ট তাই চার্বাকমতকেই ঠিকমতো হাজির করেন নি। পূর্বপক্ষকে বিকৃত করে তাকে খণ্ডন করা উচিত কাজ নয়। এতে নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

নাটকের শেষে দেখা যায় : সব দর্শন সম্প্রদায়কে (চার্বাক বাদে) ডেকে ধৈর্যরাশি নামে এক মহানৈয়ায়িক বলেন : বৈদিক তো বটেই, সেই সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈনরাও সমানভাবে নিজের নিজের শাস্ত্র মেনে চলবেন, তবে ধর্মর নামে দুরাচার যাতে বন্ধ হয়—সেটাও দেখতে হবে। সব সম্প্রদায়ের (এর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, ভাগবত ইত্যাদিও আছেন) প্রতিনিধিরা একমত হয়ে বললেন : সেটা আমাদের হাতে নয়, রাজনিযুক্ত হয়ে সংকর্ষণকেই তা করতে হবে। সংকর্ষণ জানালেন : বর্ণাশ্রম-মর্যাদাচার্য রাজার কাছে তিনি তখনই যাবেন, তবে ঐ সম্প্রদায়গুলিকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

জয়ন্তভট্ট-র সময়ে কাশ্মীরের রাজা ছিলেন শঙ্করবর্মা ওরফে যশোবর্মা। কল্হণ তাঁর *রাজতরঙ্গিণী*-তে এই রাজাটি সম্পর্কে খারাপ ছাড়া ভালো কথা লেখেন নি। জয়ন্তভট্ট যে-ভাবে সেই রাজার সুখ্যাতি করেছেন তাতে তাঁর রাজনীতিক মত সম্পর্কে শ্রদ্ধা হয় না। কোনো একসময়ে তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল, সেখানে বসে (মান্দালয়ের জেলে বসে টিলক-এর *ওরিয়ন* লেখার মতো) তিনি *ন্যা-ম* লেখেন—এমন ধারণাও এর থেকে মিথ্যে প্রমাণ হয়।[১৬]

মনে হয় ন শতকের দ্বিতীয় ভাগে কাশ্মীরে দুটি সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল : (এক) বিভিন্ন বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অনাচার, ভোগবিলাস ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, আর তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় (দুই) যাবতীয় ধর্মমতের বিরুদ্ধেই প্রবল বিরাগ ও আপত্তি। জয়ন্তভট্ট-র মতো লোকেরা পড়েছিলেন ফাঁপরে। ধর্মবিরোধী মনোভাবকে রুখতে হলে ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে আচারে-আচরণে সৎ ও শালীন হতে হয়। কাশ্মীরে তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা সম্প্রদায় ছাড়াও জৈন ও বৌদ্ধরাও ছিলেন। তাঁদের দলবলও নেহাত কম ছিল না। বড়লোকরা ছিলেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষক। ফলে শুধু অবৈদিক সম্প্রদায়গুলিকে দমন

করলেই কাজ হতো না, বরং পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেত। অন্যদিকে আবার দমনমূলক ব্যবস্থা না-নিলে সব ধর্মসম্প্রদায়ই আরও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। ফলে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার কোনো উপায় ছিল না। বল প্রয়োগ করে কতটা কাজ হবে, কতটুকু স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে—সে বিষয়েও জয়ন্তভট্ট-র সন্দেহ ছিল। তাই তিনি একই সঙ্গে রাজকীয় হস্তক্ষেপ ও প্রতিটি সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ চেষ্টা দিয়ে দুরাচার রোধ করার কথা ভেবেছিলেন।

ন্যা-ম-তেও বৈদিক সব আগম (অবশ্যই চার্বাক বাদে) সম্পর্কে জয়ন্তভট্ট এই উদারতা দেখিয়েছিলেন।[১৭] এখনকার বিদ্বান্‌রা তার জন্যে তাঁকে সাধুবাদ জানান। কিন্তু এই উদারতার পেছনে যে কোন্ অসহায়তা কাজ করছে *আ-ড* না পড়লে তা বোঝা যায় না।

আরও একটি বিষয় বিশেষ করে দেখার মতো। এই নাটকে বৃদ্ধাম্ভি-কে ধর্মবিরোধী তার্কিক হিসেবে হাজির করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে ইহসুখবাদ বা ভোগসর্বস্বতা প্রচার করানো হয় নি। বরং বৌদ্ধদের দেখানো হয়েছে চূড়ান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হিসেবে। তাঁরা থাকেন সুন্দর প্রাসাদে; ভিক্ষুদের খাবার পরিবেশন করেন স্থূলস্তনী দাসীরা। পক্করস-এর নাম করে তাঁরা দিব্যি মদ খান, মাংসও খান। জৈনদেরও দেখানো হয় কামুক ও ভোজনবিলাসী হিসেবে। যতরকমের নিরামিষ সুখাদ্য থাকতে পারে—চর্ব্য-চূষ্য-লেহ-পেয়—সবই তাঁদের জোটে ধনী ভক্তদের কল্যাণে। এ ছাড়াও নাটকে আছে নীলাম্বর নামে এক ধর্মসম্প্রদায়ের কথা। একটিই নীলকাপড়ে গা ঢেকে স্ত্রী পুরুষ-মিথুন নেচে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন। এ নাটকে চার্বাকদের কিন্তু 'ইহসুখবাদী' হিসেবে দেখানো হয় নি। এমন নয় যে তাঁদের সম্পর্কে জয়ন্তভট্ট-র কোনো সহানুভূতি ছিল। তবু কৃষ্ণমিশ্র, হেমচন্দ্র, ও শ্রীহর্ষ-র মতো করে চার্বাকপন্থীদের তিনি ইহসুখবাদী মার্কা মারেন নি। এ ব্যাপারে বরং শান্তরক্ষিত ও শঙ্করাচার্য-র সঙ্গেই তাঁর মিল। এঁরাও খালি জ্ঞানতত্ত্বর ব্যাপারেই চার্বাকমতের বিরোধিতা করেছেন; ইহসুখবাদ, লাম্পট্য ইত্যাদির কথা তোলেন নি। এর থেকেও বোঝা যায় : ইহসুখবাদ চার্বাকমতের অংশ ছিল না—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো মহল থেকে এটি তাঁদের ওপর চাপানো হয়েছে।

---

১. বে. রাঘবার্য (রাঘবন) ও অনন্তলাল ঠাকুর-সম্পা., দরভাঙ্গা, ১৯৬৪। এটিই সর্বাদি সংস্করণ, *editio princeps* (এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ)।

২. ঐ, ২-৩।

৩. বৃদ্ধাম্ভি নামটি প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন : এর সঙ্গে *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, ১।১৭।২৯-এ উল্লিখিত আম্ভীয় সম্প্রদায়ের যোগ থাকতে পারে। জগদীশ্বর পাণ্ডেয় তো আম্ভীয়দের

একটি লোকায়ত সম্প্রদায় বলেই ধরে নিয়েছেন। আন্তি নামটি পাণিনি-র *অষ্টাধ্যায়ী*, ৪।১।৯৬-এ পাওয়া যায় কিন্তু আন্তি (বা তাঁর অনুসারী, আন্তীয়দের) সম্পর্কে কোনো কিছুই জানা যায় না (কঙ্গলে (১৯৭২), ২ : ৪১ টী.; (১৯৬৫), ৩ : ৪৪, ৪৮ দ্র.)। শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর জানিয়েছেন, "আলেকজান্ডারের সমকালীন আন্তি চার্বাক ছিলেন কিনা জানা নাই। থাকিলেও তাহাদের অক্ষুণ্ণ পরম্পরা জয়ন্তভট্টের কাল পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল বলিতে সাহস হয় না" (ব্যক্তিগত চিঠি, ১৪.১০.১৯৯৭)।

৪. *বা-প*, ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ৩২, ৪২, ও ৩৪ (এই ক্রমেই জয়ন্ত কারিকা তিনটি উদ্ধৃত করেছেন : ৭১, ৭৬ ও ৯৫ দ্র.। *ন্যা-ম*, আহ্নিক ২-এও ভর্তৃহরি-র এই তিনটি কারিকা একই ক্রমে উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হয়েছে। *ন্যা-ম*, ১ : ১৭৭, ১৭৯ ও ১৮৩ দ্র.)। বাচস্পতিমিশ্র তাঁর *ভামতী* (*ব্র-সূ-ভা*, ৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে)-তে চার্বাকমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে *বা-প*-র ৩২ সংখ্যক কারিকাটি উদ্ধৃত করেছেন (অল্প পাঠভেদ আছে)।

৫. সুরেশ্বর (বিশ্বরূপ) আচার্য তাঁর *মানসোল্লাস সংগ্রহ*-তে বলেছেন :

> চার্বাক কেবল প্রত্যক্ষ-কে, কণাদ ও বৌদ্ধ আবার অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই দুইটিকে এবং সাংখ্য শব্দ [= আপ্তবাক্য] ও পূর্বোক্ত দুইটিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণের সম্প্রদায় বিশেষ উক্তরূপ বলেন, কোনো কোনো নৈয়ায়িক উপমানকেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, প্রভাকর অর্থাপত্তি-র সঙ্গে এই চারটি প্রমাণের কথা বলিয়াছেন। ভাট্টমীমাংসকগণ [= কুমারিল ভট্ট-র অনুসারী] এবং বেদান্তিগণ ষষ্ঠ 'অভাব' নামক প্রমাণ এবং পৌরাণিকগণ 'সম্ভব' ও 'ঐতিহ্য' তাহাদের সঙ্গে যোগ করিয়া বলিয়া থাকেন।

স্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরি-অনূ., ১৭-১৯, ২০-২১। বরদরাজ/বরদাচার্য, *তার্কিকরক্ষা* ও *স-ম-স*-কারও এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন। পরে দেখা যাবে : চার্বাকদের প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী বলা ঠিক নয়, যদিও তাঁদের বিরোধীরা সেইরকমই ভজাতে চেয়েছেন।

৬. *ত-স-প*, অধ্যায় ১৮, শ্লোক ১৪৮১ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত। ভাগ ১, ৫২৮।

৭. *ত-স*, অধ্যায় ১৮, শ্লোক ১৪৫৯-৬১ = *বা-প*, ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ৩২-৩৪।

৮. ঐ, (শ্লোক ১৪৫৫ প্রসঙ্গে)।

৯. ঐ, (শ্লোক ১৩৬৪-৭৯ (স্থাপন); ১৩৮০-১৪৩৭ (খণ্ডন)। পাত্রস্বামী ছাড়াও ঐ একই অধ্যায়ে উদ্দ্যোতকর, অবিদ্ধকর্ণ, কুমারিল প্রমুখের মত স্থাপন ও খণ্ডন করা হয়েছে। পুরো অধ্যায়টিই তথ্যর খনি।

১০. *ত-স*, ৫২০ (শ্লোক ১৪৫৫ প্রসঙ্গে)। *সাংখ্যকারিকা* ৫-এর ভাষ্যে বাচস্পতিমিশ্র (*ত-কৌ*)-ও চার্বাক প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন : নামুমানং প্রমাণম্। *ত-বো-বি*, ৭৩-এও চার্বাক প্রসঙ্গে 'অনুমানম্ অপ্রমাণম্' বাক্যটি উদ্ধৃত হয়েছে। কমলশীল-এর *ন্যায়বিন্দু-পূর্বপক্ষ-সংক্ষেপ* বইটি মূল সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, তবে এর একটি তিব্বতী অনুবাদ রয়েছে। অধ্যায় ১৫ টী. ১১ দ্র.।

১১. উৎপন্নপ্রতীতি প্রসঙ্গে জয়ন্তভট্ট একই কথা বলেছেন (*ন্যা-ম*, ২ : ১৮৪)। এ ছাড়া টী. ১৪ দ্র.।

১২. *বা-প*, ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা ৩০-৪৩ ও সেগুলির প্রসঙ্গে হেমরাজ, বৃষভদেব ও পুণ্যরাজ-এর টীকাভাষ্য দ্র.।

১৩. অথচ বাচস্পতিমিশ্র-র *ভামতী* (*ব্র-সূ-ভা*, ৩।৩।৫৩ প্রসঙ্গে) আর জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*, ২ : ১৭৮-৭৯-তে চার্বাকদের নিয়ে বিস্তর ঠাট্টা-ইয়ারকি করা হয়েছে, কারণ গবাদি পশু ও অনপড় লোকেও যা বোঝে, চার্বাকরা সেটুকুও বোঝেন না। এই একই কথা *আ-ড*, অঙ্ক ৩-এও আছে।

১৪. *স-ম-স*, ১৫।

১৫. *স-দ-স*-য় চার্বাকদের দিয়ে সায়ণ-মাধব বলিয়েছেন : "আমরা মনু-র বচনেই বিশ্বাস করি না, অন্যদের তো কথাই নেই"।

১৬. *ন্যা-ম*, ভূমিকা, [৯]-[১১] ও *আ-ড*, ভূমিকা, ছয়-সাত। অবশ্য জয়ন্তকে অতিরাজভক্তির অভিযোগ থেকে বাঁচানোর জন্যে রাঘবন বলেছেন : জয়ন্ত নিশ্চয়ই রাজা শঙ্করবর্মা ও রানি সুগন্ধাদেবীর রাজত্বর প্রথম ভাগ সম্পর্কেই এমন সুখ্যাতি করেছেন।

১৭. *ন্যা-ম*, ৪ : ৩৮৬-৮৯।

অধ্যায় ২১

কৃষ্ণমিশ্র। *প্রবোধচন্দ্রোদয়*

খ্রিস্টীয় এগারো শতকে কৃষ্ণমিশ্র যতি একটি রূপক-নাটক রচনা করেন : *প্রবোধচন্দ্রোদয়*। নাটকের মধ্যেই কিছু আভাস আছে যার থেকে মনে হয় : ইনি রাঢ় বা দক্ষিণ বাঙলার লোক[১] (যদিও নাটকটি লেখা হয়েছিল মধ্য ভারতে)। দার্শনিক মতের দিক দিয়ে ইনি ছিলেন শঙ্করাচার্য-র অনুগামী অদ্বৈত বৈদান্তিক। নাটকের চরিত্ররা রক্তমাংস-র মানুষ নয়, সাদা-কালো কিছু নৈতিক ধারণা আর কয়েকটি দর্শন। ভালোর দিকের চরিত্র হলো মৈত্রী, শ্রদ্ধা, বস্তুবিচার, প্রবোধচন্দ্র, উপনিষদ্ ইত্যাদি; খারাপের দিকের—অহঙ্কার, মহামোহ, দম্ভ, চার্বাক, ভিক্ষু (বৌদ্ধ), ক্ষপণক (জৈন) ইত্যাদি।[২] কৃষ্ণমিশ্র-র উদ্দেশ্য ছিল একটিই : সব অবৈদিক দর্শনকেই হেয় করা, আর পরিণামে নিজের দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্গে প্রভাকরপন্থী মীমাংসক (কুমারিলভট্ট-কে তিনি ভালোর দিকে ধরেন), নৈয়ায়িক (বহুবচনে নাস্তিকতর্কাঃ-র কথাও আলাদা করে আছে), সাংখ্য—এঁদেরও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে আসল চাঁদমারি : চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ (আর ধর্মমতের ক্ষেত্রে কাপালিক)।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই যেহেতু নাটকটি লেখা, তাই নিরপেক্ষ সাজার কোনো চেষ্টা নেই। বিরোধীপক্ষকে যতটা ভুষো মাখিয়ে হাজির করা যায়, ততটাই তিনি করেছেন। এরকম নাটকে চার্বাকদর্শনের কী পরিচয় পাওয়া যাবে তা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

উনিশ শতক থেকেই সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*, *প্র-চ* আর শ্রীহর্ষ-র *নৈ-চ* এই তিনটি বই-এর ভিত্তিতে বহু লোক চার্বাকদর্শন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা গড়ে তুলেছেন। তাই কৃষ্ণমিশ্র যে-ভাবে ঐ দর্শনকে হাজির করেছেন সে-নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার। বহু ভারতীয় ও ইওরোপীয় ভাষায় নাটকটির অনুবাদ হয়েছে। বাঙলাতেও একাধিক তর্জমা পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এটির অনুসরণে *বোধেন্দুবিকাস* নামে গানে-ভরা এক যাত্রাপালাও লেখেন।[৩]

এবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আসা যাক। চার্বাক মঞ্চে দেখা দেওয়ার আগে রাজা মহামোহ তার অনুচরদের নিয়ে ঢোকে আর হাসতে হাসতে স্বগতোক্তি করে :

> আশ্চর্য! এই জড়বুদ্ধিরা স্বেচ্ছাচারী। (এরা ভাবে) দেহছাড়া আত্মা আছে আর পরলোকে গিয়ে সেই আত্মা কর্মফল ভোগ করে। কেউ কি আশা করে : আকাশতরুর ফুল থেকে স্বাদু ফল জন্মাবে? [অর্থাৎ আকাশে যেমন কোনো গাছ গজায় না, ফুল-ফলও হয় না, তেমনি দেহছাড়া আত্মা, পরলোক ও কর্মফলের ভাবনাও মিথ্যে।]

এই সব নিজের-ধারণা-দিয়ে-তৈরি জিনিস আশ্রয় করে ধূর্তরা জগৎকেই বঞ্চনা করে। তাই বলা হয়েছে :

> যা নেই তা আছে—এই মিথ্যে কথা বলে বাচাল আস্তিকরা সত্যবাদী নাস্তিকদের নিন্দার যোগ্য করে তোলে।
> অদ্ভুত! তত্ত্বর দিক থেকে দেখে বলো, (চারটি ভূতের) পরিণামস্বরূপ আত্মাকে কেউ কি কখনও (দেহ থেকে) আলাদা অবস্থায় দেখেছে?

এরা কেবল জগৎকেই বঞ্চনা করে না, নিজেদেরও বঞ্চনা করে। তাই বলা হয়েছে :

> মুখ ইত্যাদি শরীরের সমস্ত অঙ্গ সমান হলেও বর্ণক্রম (= ব্রাহ্মণ-শূদ্র ইত্যাদি ভেদ) কী রকমের? অর্থাৎ এরকম কোনো ভেদ থাকতে পারে না। এই স্ত্রী, এই সম্পদ অপরের—এই ভেদ আমরা মানি না।
> জোর করে বা যেমন ইচ্ছে নারীসঙ্গম, পরের জিনিস আত্মসাৎ করা কার্য না অকার্য (= উচিত না অনুচিত)—পৌরুষহীন লোকেরাই এ-বিচার করে।
> (একটু ভেবে, প্রশংসা সহকারে) সব দিক দিয়েই লোকায়ত একমাত্র শাস্ত্র, যেখানে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; মাটি জল, আগুন আর বাতাস—এই (চারটি) হলো তত্ত্ব (= মূল বিষয়); অর্থ আর কাম (সুখ)-ই পুরুষার্থ (= জীবনের লক্ষ্য); চারটি ভূতই চেতন হয় [চারটি ভূত থেকেই চেতনা দেখা দেয়]; পরলোক নেই; মৃত্যুই অপবর্গ (= মোক্ষ বা মুক্তি)। আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বাচস্পতি (= বৃহস্পতি) এই তত্ত্ব রচনা করে চার্বাককে সমর্পণ করেছেন। তিনি তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য-র মাধ্যমে এই লোকে সেই তন্ত্র (= শাস্ত্র) ব্যাপক প্রচার করেছেন।
>
> (এর পরে এক শিষ্যকে নিয়ে চার্বাক-এর প্রবেশ)

চার্বাকদর্শনের মূল কথাগুলি এইভাবে প্রথম বলা হয়েছে। বিষয়টি শুধু জ্ঞানতত্ত্বে আটকে থাকে নি, তার সঙ্গে দুটি নৈতিক প্রসঙ্গও আনা হয়েছে : যেমন ইচ্ছে যৌনসঙ্গম আর পরের জিনিস আত্মসাৎ করা। চার্বাকদের শুধু দার্শনিক দিক থেকে

ইহলোকসর্বস্ব বলা হয় নি, তাঁদের নির্বিচার ইহসুখবাদী বলে দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণমিশ্র-র আগে যাঁরা লোকায়ত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগটি (অর্থাৎ চুরি) তোলেন নি। কৃষ্ণমিশ্র থেকেই এর শুরু। পরে এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা যাবে।

চার্বাকমতের বিরুদ্ধে চাতুর্বর্ণ্য-প্রথা অস্বীকারের অভিযোগ আনা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে আপত্তি। এক শ্রীহর্ষ ছাড়া আর কেউ চার্বাকদের সম্পর্কে এ দুটি কথা বলেন নি।[৪] বর্ণব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি—অন্যান্য অনেক প্রাচীন সমাজের মতো এই ছিল ভারতীয় সমাজের ভিত। চার্বাকরা কি এই মূল জায়গাতেই ধাক্কা মেরেছিলেন, তার জন্যেই তাঁদের নীতিহীন বলে হাজির করা?

মহামোহ-র মুখ দিয়ে সবশেষে যে-কটি কথা বলানো হয়েছে ('লোকায়ত একমাত্র শাস্ত্র' ইত্যাদি), তার কয়েকটি অন্যান্য উৎসেও পাওয়া যায়। প্রশ্ন ওঠে দুটি সূত্র নিয়ে : অর্থ আর কামই পুরুষার্থ ও মৃত্যুই অপবর্গ। অনেক পরের দুজন লেখক, নীলকণ্ঠ ও সদানন্দ কাশ্মীরক, বৃহস্পতির নাম করেই একটি 'সূত্র' উদ্ধৃত করেন : কামই পুরুষার্থ। সায়ণ-মাধব এক্ষেত্রে কৃষ্ণমিশ্র-কেই অনুসরণ করেছেন।[৫] ফলে দুটি মত সম্পর্কেই সংশয়ের সুযোগ থাকে। চার্বাকরা আদৌ অপবর্গ, পুরুষার্থ ইত্যাদির নিরিখে ভাবতেন কিনা তা-ই সন্দেহ।

মহামোহ-র উক্তির শেষে আর একটি বিষয় দেখার আছে। *প-পু*-র গল্পে দেবগুরু বৃহস্পতিকেই লোকায়তমতের আদি উৎস বলে ধরা হয়। অসুরদের ছলনা করার জন্যেই তিনি এই নাস্তিক মতবাদ প্রচার করেন। তারই ফলে অসুররা উচ্ছন্নে গেল।[৬] ইঙ্গিতটা এইরকম : বৃহস্পতিমতে যারা বিশ্বাস করবে তাদেরও একই অবস্থা হবে।

বৃহস্পতি যদি এই দর্শনের স্রষ্টা হন, তবে চার্বাক আসেন কোত্থেকে? কৃষ্ণমিশ্র তাঁকে উপস্থিত করেন ঐ দর্শনের *প্রচারক* হিসেবে, *প্রবর্তক* হিসেবে নয় (সেই সঙ্গে আছে কলি; তারা দুজনেই আবার মহামোহ-র অনুচর)।

এর পরের অংশে চার্বাক তাঁর শিষ্যকে জ্ঞান দেন :

> বৎস দণ্ডনীতিকেই বিদ্যা বলে জেনো। বার্তা (= কৃষি ও বাণিজ্য) এরই অন্তর্ভূত। ত্রয়ী (= তিন বেদ) ধূর্তর প্রলাপ। দুই-ই (= বেদ ও ধূর্তর প্রলাপ) স্বর্গের উৎপাদক, তাই এদের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দ্যাখো, যজ্ঞ করে যজ্ঞকর্তা, যজ্ঞক্রিয়া ও যজ্ঞীয় দ্রব্য বিনাশে স্বর্গলাভ হয়, তাহলে দাবানলে পুড়ে যাওয়া গাছগুলোও প্রচুর ফল দেবে।
>
> আর—

যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গলাভ করে—এমন যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে যজমান কেন নিজের বাবাকে হত্যা করে না?
আর—
শ্রাদ্ধ যদি মৃত প্রাণীদের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে নিভে-যাওয়া প্রদীপে তেল দিলে তার শিখা বাড়বে।

কৃষ্ণমিশ্র-র চার্বাক কামশাস্ত্রকে 'বিদ্যা'-র মধ্যে ধরেন না (যদিও মহামোহ অর্থ-র সঙ্গে সঙ্গে কামকেও পুরুষার্থ বলে ধরেছে—এটি বেশ আশ্চর্যর। দণ্ডনীয় (বা সংক্ষেপে 'নীতি') অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনব্যবস্থা একটি আলাদা বিদ্যা। বার্তা তার থেকেও আলাদা অন্য-একটি বিদ্যা। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*-য় 'বিদ্যা' (অর্থাৎ রাজার শিক্ষণীয় বিষয়) বলতে বোঝানো হয়েছে চারটি বিষয়কে—ত্রয়ী, দণ্ডনীয়, বার্তা ও আন্বীক্ষিকী (সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত)।[৭] চার্বাক এর থেকে দুটিকে বেছে নিয়েছেন, তাও বার্তাকে আলাদা করে বিদ্যা-র মর্যাদা দেন নি। 'আন্বীক্ষিকী' কেন বাদ গেল তা জানতে কৌতূহল হয়। অবশ্য কৌটিল্য ছাড়া আরও অনেক কটি সম্প্রদায়ের আলাদা অর্থশাস্ত্র ছিল। তাঁদের কেউ তিনটি, দুটি, কেউ বা একটিকে বিদ্যা বলে স্বীকার করতেন। যেমন বার্হস্পত্য, অর্থাৎ বৃহস্পতি-র অনুগামীরা বিদ্যা বলতে বুঝতেন দুটি—দণ্ডনীতি ও বার্তা। অন্যদিকে ঔশনস, অর্থাৎ উশনা (শুক্র)-র অনুগামীরা মনে করতেন : বিদ্যা মানে দণ্ডনীতি, আর কিছু নয়।[৮]

মনে হয়, বৃহস্পতির সঙ্গে যোগ আছে বলে কৃষ্ণমিশ্র তাঁর মতকেই চার্বাকমতের অংশ বলে ধরে নিয়েছেন। তফাতের মধ্যে এই যে, বার্তা-কে তিনি উপবিদ্যা বলে ধরেন। আর কৌটিল্য বলেছেন, বৃহস্পতির অনুগামীরা ত্রয়ী অর্থাৎ তিন বেদকে 'সংবরণমাত্র' (= নিজেদের মত ঢেকে রাখার উপায় মাত্র) বলে মনে করতেন।[৯] তার মানে, মুখে মানলেও, মনে মনে তাঁরা বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করতেন না।

মুশকিল হচ্ছে, 'বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্র' নামে কোনো বই আজ অবধি পাওয়া যায় নি। তাই বৃহস্পতির অনুগামীরা কী মনে করতেন তা জানার কোনো উপায় নেই। আদৌ এই অর্থশাস্ত্র-র বৃহস্পতির সঙ্গে চার্বাকমতের কোনো যোগ ছিল কিনা তা-ও সন্দেহ। 'বৃহস্পতি' বলতে একজন লোক বোঝায় না। 'বৃহস্পতি'র নামে একটি ধর্মশাস্ত্রও প্রচলিত ছিল। পুরো বইটি পাওয়া যায় নি, কিন্তু পরবর্তীকালে বহু রচনায় তার থেকে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।[১০] সে-বৃহস্পতি তো মনুকেই মাথায় করে রাখেন। আর মনু হচ্ছেন ঘোরতম বেদভক্ত। তেমনি *মহাভারত*-এ যে-বৃহস্পতির কথা আছে, তিনিও বেশ রক্ষণশীল।[১১] সুতরাং 'বৃহস্পতি' নামটি দেখলেই তার সঙ্গে চার্বাকমতকে যুক্ত করার কোনো কারণ নেই।

চার্বাক-এর মুখ দিয়ে যে-তিনটি শ্লোক বলানো হয়েছে সেগুলি সম্ভবত

কৃষ্ণমিশ্র-র রচনা নয়, এগুলি আভাণক (প্রবচন) বা লোকগাথা মাত্র। সায়ণ-মাধব এর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বৃহস্পতির বচন বলে উদ্ধৃত করেছেন। মূলত যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের অযৌক্তিকতা নিয়েই এতে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় শ্লোকটির বক্তব্য অন্য ভাষায় একটি বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনা, *শার্দূলকর্ণাবদান*-এ আগেই পাওয়া যায়। পশুবলির ব্যাপারে আপত্তি জৈন-বৌদ্ধ রচনাতেই বেশি দেখা গেছে। *প-পু,* সৃষ্টিখণ্ডেও একই কথা পাওয়া যায়। *সাংখ্যকারিকা*-র *মাঠরবৃত্তি*-তেও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে।[১২] তারও আগে, *রামায়ণ*-এর অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালিও শ্রাদ্ধের নিষ্ফলতা নিয়ে একই কথা বলেন।[১৩] অর্থাৎ, এই কথাগুলি চার্বাকমতের অংশ হতেও পারে। অন্তত নাস্তিক-মতের তো বটেই।

কিন্তু চার্বাকরা 'বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র' মেনে চলতেন—আর কোথাও এর কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া বেদ-এর বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তিও তাঁরা কখনও গোপন করেন নি ('বৃহস্পতি অর্থশাস্ত্র'-র অনুগামীরা প্রকাশ্যে সে-কথা বলতেন না)।

এবার শিষ্য প্রশ্ন করেন (প্রাকৃত ভাষায়) :

> আচার্য, যেমন ইচ্ছে খাওয়া ও পান করাই যদি মানুষের পুরুষার্থ (- জীবনের লক্ষ্য) হয়, তবে তপস্বীরা সংসার-সুখ ত্যাগ করে ঘোর ও ঘোরতর পরাক, সান্তপন ও ষষ্ঠকাত্মাশন প্রভৃতি দুঃখে নিজেদের নিক্ষেপ করেন কেন? [পরাক ইত্যাদি হলো বিভিন্ন ব্রত-র নাম, উপোস ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন তার অঙ্গ।]
>
> চার্বাক : ধূর্তদের লেখা শাস্ত্রে প্রতারিত হয়ে আশা-মোদকেই মূর্খদের তৃপ্তি হয়। দেখো, দেখো—
> কোথায় আয়তলোচনা নারীর আলিঙ্গন যা দুই বাহু দিয়ে বাহুমূলকে পীড়া দেয়, উন্নত স্তনমর্দনে যা মনোহর, আর কোথায় ভিক্ষা, উপবাস ও নিয়ম-রূপ সূর্যের তাপে কুবুদ্ধিদের দেহকে শোষণ করার বিধি।
>
> শিষ্য : আচার্য, তীর্থিকরা (= তপস্বীরা) বলেন— দুঃখমিশ্রিত যে সংসারসুখ তা পরিহার করা উচিত।
>
> চার্বাক : (হেসে) আঃ, এটা নরপশুদের দুর্বুদ্ধিরই প্রকাশ। ইন্দ্রিয়-মিলনে মানুষের যে-সুখ হয়, তার সঙ্গে দুঃখ মিশে আছে, তাই সেটি ত্যাগ করা উচিত—এটি মূর্খদের বিচার। তুষের কণা আছে বলে কোন্ হিতার্থী সাদা চমৎকার চালে-ভরা ধান ত্যাগ করে?

এই অংশেও চার্বাকমতকে অবাধ ইহসুখবাদের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়। এখানে জোর দেওয়া হয়েছে ধর্ম-বিরোধিতার ওপরে। বিষয়টি হয়ে ওঠে নৈতিক : সাধুসন্ন্যাসীরা জোর দেন ত্যাগের ওপর; কৃষ্ণমিশ্র-র চার্বাক, ভোগের ওপর।

এই দুই মতবাদের পেছনে রয়েছে একটি দার্শনিক প্রশ্ন : জগৎ কি শুধুই দুঃখময়, নাকি সুখ-দুঃখ দুই-ই মিলে আছে? চার্বাক দ্বিতীয় মতটিকেই জোর গলায় প্রচার করেন; শুধু তা-ই নয়, সুখ বলতে তিনি দৈহিক কামনা চরিতার্থ করাই বোঝেন। তারই দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছে নারী-আলিঙ্গনের কাম-উদ্দীপক বর্ণনা।

ঘটনা এই যে, কৃষ্ণমিশ্র-র অন্তত তিনশ বছর আগে থেকে চার্বাকমত সম্পর্কে এই অভিযোগটি ঠারে ঠোরে তোলা হয়েছে,[১৪] কিন্তু মূল দার্শনিক প্রশ্নটি কোনো মোকাবেলা করা হয় নি। জন্ম মানেই দুঃখ, জন্মান্তরের চাকা না-থামা পর্যন্ত সুখ নেই—এই ধারণাকেই কেন স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিতে হবে? তার সপক্ষে কোনো যুক্তি বা তথ্য কেউ দেন না।

দেহকে পীড়া দিয়ে তপস্যা করে মোক্ষলাভ হয় না—বহুদিন কৃচ্ছ্রসাধন করে একথা উপলব্ধি করেন গৌতম বুদ্ধ। এর বিরুদ্ধে তিনি বলেন মধ্যম পন্থা (মজ্‌ঝিমা পটিপদা)-র কথা—ত্যাগ আর ভোগের মাঝামাঝি এক রাস্তা। শরীরকে কষ্ট দিয়ে, উপোস করে কোনো ফল হয় না—এমন কথা বললেই তাকে ভোগসর্বস্ব মনে করার কারণ নেই। অথচ চার্বাকমতকে এইভাবেই স্থূল ইহসুখবাদী বলে হাজির করা হয়েছে।

আসলে ইহকাল ছাড়া পরকালে যাঁদের বিশ্বাস নেই, তাঁদের সম্পর্কে এই অভিযোগ খুবই পুরনো। বুদ্ধ-র সময়ে অজিত কেসকম্বল (কেশকম্বলী) বলে এক প্রচারক বলতেন : মৃত্যুর পরে আত্মাও উচ্ছেদ হয়ে যায়; দান, আহুতি ইত্যাদি করে কোনো লাভ হয় না। ইনি কম্বলের তৈরি পোশাক পরতেন—গ্রীষ্মে ও শীতে সমান কষ্ট হতো। কৃচ্ছ্রসাধনই ছিল এঁর জীবনের ব্রত।[১৫] তবু জৈন ধর্মগ্রন্থ, *সূ-কৃ-সূ*-তে এঁর অনুগামীদেরই ইহসুখবাদী বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন সম্পর্কেও একই কথা বলা হতো।[১৬] এর থেকে মনে হয় : যে-কোনো ঈশ্বর- বা পরকাল-বিরোধী মতকেই হেয় করা হয় ইহসুখবাদের অভিযোগ তুলে। তাই এটিকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই।

এবার রাজা মহামোহ-র সঙ্গে চার্বাক-এর কথা শুরু হয় :

মহামোহ (স্বগত) : আরে, বহুদিন পরে (এমন) প্রমাণবন্ত বচন কানে সুখ দিচ্ছে। (দেখে, সানন্দে) আরে, আমার প্রিয় বন্ধু চার্বাক।

চার্বাক (দেখে) : এই যে, মহারাজ মহামোহ। (কাছে গিয়ে) জয় হোক, মহারাজের জয় হোক। এই যে চার্বাক (আপনাকে) প্রণাম করছে।

মহামোহ : চার্বাক, তোমায় স্বাগত। এইখানে বসো।

চার্বাক (বসে) : এই কলির সাষ্টাঙ্গ প্রণাম!

মহামোহ : ওহে কলি, বিনা ব্যাঘাতে ভালো (আছ) তো?

চার্বাক : দেবপ্রসাদে [= অর্থাৎ মহামোহ-র প্রসাদে] সব জায়গাই ভালো। যা
কিছু করার ছিল তা শেষ করে দেবতার পাদমূল সে দেখতে চায়।
কারণ,
আপনার আদেশ পেয়ে আপনার শত্রুদের নিপাত করে এসে এখন
সে সুখ ও প্রসাদ লাভ করেছে। আপনার দর্শনে খুবই প্রমোদ
পেয়ে সে ধন্য। এখন প্রভুর চরণকমলে সে নমস্কার জানাচ্ছে।

মহামোহ: আর কলি কতদূর সফল হয়েছে?

চার্বাক : দেব,
সে (কলি) মহাজনদের (= প্রচুর লোককে) বৈদিক পথ থেকে
সরিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমনি পথে নিয়ে গেছে। তবে এ ব্যাপারে
কলিও তার হেতু নয়, আমিও হেতু নই। প্রভুর প্রসাদেই পৌরুষ
বিস্তৃত হয়েছে।
উত্তরাপথ ও পাশ্চাত্যের [= পশ্চিম ভারতের] লোকে তিন
বেদকে ত্যাগ করেছে। শম, দম ইত্যাদির কথা কী? অন্যত্রও
প্রায়শ তিন বেদ কেবল জীবিকামাত্র ফলই হয়ে উঠেছে। যেমন
আচার্য (= বৃহস্পতি) বলেছেন :

অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড, ছাই দিয়ে গা ঢাকা—বৃহস্পতি
বলেন, (এগুলো হলো) প্রজ্ঞা ও পৌরুষহীনদের জীবিকা।

তাই কুরুক্ষেত্র ইত্যাদি জায়গায় বিদ্যা ও প্রবোধ [= আত্মজ্ঞান]-
এর উদয় নিয়ে দেবের (= মহামোহ-র) স্বপ্নেও ভয় পাওয়ার
কিছু নেই।

মহামোহ : ভালো করেছ। সেই মহৎ তীর্থকে ব্যর্থ করে দিয়েছ।

এর পরেও চার্বাক ও মহামোহ-র মধ্যে আরও কথা হয়। ইতোমধ্যে উৎকল দেশ থেকে চিঠি নিয়ে এক দূত এসে হাজির। মহামোহ চার্বাককে বলেন, 'চার্বাক, যাও। কর্তব্যে অবহিত হয়ে থাকবে।'

চার্বাক : দেব যেমন আদেশ করেন। (চার্বাক-এর প্রস্থান)

দর্শনের দিক থেকে এই অংশে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। এইটুকু দেখার : চার্বাক আর কলিকে দুটি আলাদা সত্তা হিসেবে দেখানো হয়। *নৈ-চ*-য় লোকায়ত-কে কলির বন্দনাকারী বলা হয়েছে (১৭।৯৭, ১০৮)। সম্ভবত কৃষ্ণমিশ্র থেকেই শ্রীহর্ষ এটি পেয়ে থাকবেন। অথচ মহামোহকে প্রণাম করার পর রাজা তাকেই 'কলি' বলে সম্বোধন করে। বোঝা যায়, কলি-র ওপরেও কৃষ্ণমিশ্র রেখেছেন মহামোহ-কে। কলি আর চার্বাক তারই অনুচর। তাদের তাই এক বলেও ধরা হয়।

চার্বাকমতকে যতদূর হেয় করা যায়, তার চেষ্টায় কৃষ্ণমিশ্র ত্রুটি করেন নি। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর চরিত্রগুলিকে উপস্থিত করা হয়। শুধু চার্বাক নয়, এর পরের অঙ্কে বৌদ্ধ, দিগম্বর জৈন ও কাপালিককেও একইভাবে দুশ্চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেই সঙ্গে এও দেখা যায় : এগারো শতকে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৈদিক ধর্ম পিছু হঠছিল। বৌদ্ধ, জৈন বা চার্বাকরা তার মূল কারণ বলে মনে হয় না। আসলে তন্ত্র-র প্রসারের ফলেই এই দশা।

এমনিতেই কাব্য বা নাটক থেকে কোনো দার্শনিক মতের যথার্থ পরিচয় পাওয়া দুর্ঘট। লেখকের লাইসেন্‌স্ বলে একটা কথা আছে; শিল্পের প্রয়োজনে লেখকরা ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন সবকিছুই ওলট-পালট করে থাকেন। আরিস্তোফানেস-এর *মেঘমালা* নাটকটি পড়ে কেউ যদি সোক্রাতেস-এর দার্শনিক মত বুঝতে চান, তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন—আশা করি এ বিষয়ে অন্যমত হবে না। *প্র-চ* পড়ে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ মত জানার চেষ্টাও একই রকমের ভুল হবে। অথচ খোদ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বহু প্রভাবশালী বইটিতে মন্তব্য করেছেন : চার্বাকমতের সার কথা এই নাটকের একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে।[১৭] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিবাদে বলেন, "...এই নাটকটিতেই কৃষ্ণমিশ্র বৌদ্ধ ও জৈন মতেরও ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছেন। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করে বৌদ্ধ বা জৈন মতের সারমর্ম শনাক্ত করার প্রস্তাব কেউ করেন না, রাধাকৃষ্ণণও অবশ্যই তা করেন নি। কিন্তু লোকায়তর বেলায় অন্যরকম। মতটির সারমর্ম এবং মতটি নিয়ে প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে সচেতন থাকার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নি। কেননা, তাঁর রুচি ও বিচার অনুসারে মতটিই প্রহসনের মতো।"[১৮]

অবশ্যই কেউ বলতে পারেন : বৌদ্ধ বা জৈন মত জানার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উৎসর অভাব নেই। বৌদ্ধ ও জৈনরা নিজেদের মত নিজেরাই লিখে গেছেন। চার্বাকদের ক্ষেত্রে কোনো প্রামাণিক বই-ই পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে তাই সব রকমের পরোক্ষ উৎসই কাজে লাগাতে হবে।

এর উত্তরে বলা যায় : বিরোধীপক্ষর (বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য) দার্শনিক রচনাতেও চার্বাকমতের যে-ব্যাখ্যান পাওয়া যায়, সেগুলোই কি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য? তার বাইরে, কাব্য, নাটক, আভাণক, লোকগাথা—এই সবের আশ্রয় নিলে তো আরও বেশি বিভ্রান্ত হতে হবে। বিশেষ করে চার্বাকমতকে হেয় করাই যার লক্ষ্য তেমন ক্ষেত্রে তা আরও সাবধান হওয়া উচিত। যেমন, ভোগসর্বস্বতার প্রসঙ্গটি এসেছে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোকে, আর কাব্যে ও নাটকে। শান্তরক্ষিত, কমলশীল, শঙ্করাচার্য, প্রভাচন্দ্র প্রমুখ দর্শনবিদ্ তাঁদের চার্বাকখণ্ডনে এ অভিযোগ তোলেন

নি—জ্ঞানতত্ত্বর ক্ষেত্রেই আলোচনা সীমাবদ্ধ থেকেছে।[১৯] ফলে *প্র-চ*-য় চার্বাক-এর মুখ দিয়ে যা যা বলানো হয়েছে তার সবকিছুকেই চার্বাকমতের সঠিক বিবরণ বলে মনে করার কোনো হেতু নেই।

বার্হস্পত্যসূত্র সঙ্কলনের সময়ে (ও তার আগেও, *চার্বাকষষ্টি*-তে) দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী *প্র-চ* থেকে কয়েকটি বাক্য ও শ্লোক গ্রহণ করেছিলেন। সর্বানন্দ পাঠকও তাঁকেই অনুসরণ করেছেন।[২০] মামোরু নামাই কিন্তু বার্হস্পত্যসূত্র সঙ্কলনে কৃষ্ণমিশ্র-কে একেবারেই বাদ দিয়েছেন।[২১] তাতেও অবশ্য শেষ রক্ষা হয় নি। সতেরো শতকের এক অদ্বৈত বৈদান্তিক, সদানন্দ কাশ্মীরক-এর *অ-ব্র-সি* বইটি থেকে তিনটি সূত্র তিনি গ্রহণ করেছেন (দক্ষিণারঞ্জনও সেগুলি নিয়েছিলেন)।[২২] তার একটি হলো : মরণই অপবর্গ (= মোক্ষ)। সতেরো শতকে চার্বাকদর্শনের কোনো সূত্রগ্রন্থ পাওয়া যেত না। সদানন্দ কাশ্মীরক সবই পেয়েছিলেন হাত-ফেরতা উৎস থেকে। 'মরণই অপবর্গ' এই 'সূত্র'টিও *প্র-চ* থেকেই নেওয়া (সেখানে আছে : মৃত্যুই অপবর্গ)। এটি আদৌ খাঁটি চার্বাকমত না-হওয়াই সম্ভব।

সব মিলিয়ে বলা যায়, *প্র-চ*-য় চার্বাকমতকে যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে তার খুব অল্পই মানা যায়। একেবারে গোড়ার চারটি সূত্র ছাড়া আর কোনো কথাই প্রামাণিক নয়।[২৩] উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি অন্যত্রও পাওয়া গেছে। এগুলির প্রভাবও কম নয়। সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-য় *প্র-চ* থেকে তিনটি শ্লোক (২।২০, ২৩, ২৬) উদ্ধৃত হয়েছে।[২৪] *স-ম-স*-তেও এই নাটক থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে (২।১৯ ও ২।৪)—প্রথমটি চার্বাক-এর উক্তি, দ্বিতীয়টি অহঙ্কার-এর।[২৫] অহঙ্কার কিন্তু চার্বাকপন্থী নয়, প্রাভাকর-মীমাংসার অনুগামী। জীবন দুঃখময় না সুখ-দুঃখময়—এ বিষয়ে সায়ণ-মাধব-এর বক্তব্য *প্র-চ*-র চার্বাক-শিষ্য সংবাদের অনুসরণে।[২৬] কিন্তু এ নাটকে এমন কোনো সত্যবস্তু নেই যা চার্বাকচর্চায় সত্যিকারের উপকারে লাগে।

---

১. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৩৮৬ ব), ২৮-৪৭ ও (১৯৮৮), ৯৭-১০৭ দ্র.।

২. এ ধরণের রূপক-চরিত্র কৃষ্ণমিশ্রই প্রথম রচনা করেন নি। *বি-পু*, ৩।১৭-১৮-য় মায়ামোহ বলে একটি চরিত্র আছে। জৈন লেখক সিদ্ধর্ষি তাঁর *উ-ভ-প্র-ক*-য় (৪।২) ভারতীয় দর্শনগুলিকে নিয়ে এই ধরণের রূপক সৃষ্টি করেছেন (এই বই-এর অধ্যায় ১৮ দ্র.)।

৩. অনুবাদ ছাড়াও, *প্রকাশ* ও *চন্দ্রিকা* টীকা সমেত *প্র-চ*-এর মূল ও ব্যাখ্যা সহ একটি ছাত্রপাঠ্য সংস্করণও বাঙলায় আছে।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা যায়। "ও কথা আর বোলো না আর বোলো না/বলছ, বঁধু,

কিসের ঝোঁকে"—একটি কৌতুকনাট্য-র অন্তর্গত এই গানটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দাদা, দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা বলে ধরেছিলেন (*জীবনস্মৃতি* (১৩৬৩ ব), ৬৬)। বিশ্বভারতী-সম্পাদকদের মতে গোটা কৌতুকনাট্যটিই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা (ঐ, ১৭০)। ঐ গানটি কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র *বোধেন্দু বিকাস* থেকেই নেওয়া (*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনাবলী*, ২ : ১৬৮ দ্র.)। *প্র-চ*-য় অবশ্য এরকম কোনো গান নেই। এটি গুপ্তকবিরই অবদান।

৪. *নৈ-চ*, ১৭।৫০, ৬৮, ৭২, ৮৩ দ্র.।
৫. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৬ দ্র.।
৬. এই বই-এর অধ্যায় ১২ দ্র.।
৭. *কৌ-অ*, ১।২।১।
৮. ঐ, ১।২।২-৭।
৯. ঐ, ১।২।৫।
১০. আয়েঙ্গর (১৯৪১)।
১১. ঐ, ২৭।৩ ও ৭৯, ইঃ দ্র.।
১২. *শার্দূলকর্ণাবদান*, ১৯ ("মাংসং খাদিতুকামৈস্তু" ইত্যাদি); *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ১৩; *মাঠরবৃত্তি, সাংখ্যকারিকা* ২ প্রসঙ্গে।
১৩. এই বই-এর অধ্যায় ৯ দ্র.।
১৪. *ষ-দ-স*, শ্লোক ৮২ দ্র.।
১৫. গুণসেকেরে, ১ : ৩২৫-২৭-এ অজিত কেসকম্বল (কেশকম্বলী) সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।
১৬. *সু-কৃ-সূ*, ২।১।১৭; *মাঠরবৃত্তি, সাংখ্যকারিকা* ৩৭ প্রসঙ্গে "হস পিব লল" ইত্যাদি শ্লোকটি দ্র.।
১৭. রাধাকৃষ্ণণ, ১ : ২৭৮ টী.।
১৮. *লো-দ* (১৯৬৯), ১ : ৪৯।
১৯. *ত-স* ও *ত-স-প*, অধ্যায় ২২; *শা-ভা, ব্র-সূ* ১।১।১, ২।২।২, ৩।৩।৩, ৫৩-৫৪ প্রসঙ্গে; *প্র-ক-মা*, ২।১।
২০. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী [১৯২৮], সূত্র ৫৯, ৭০, ৮৬; (১৯৮২), ২০০-২০১ (সূত্র ২৪-৩৪); *চা-শা-স*, ১৩৯-৪১।
২১. নামাই (১৯৭৬), ২৯-৪৪।
২২. নামাই, সূত্র A10, 12, 15; দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, সূত্র ৫, ৭, ৮।
২৩. যেমন, "প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ", "মাটি, জল, আগুন আর বাতাস—এই (চারটি) হলো তত্ত্ব", "চারটি ভূতই চেতন হয়", আর "পরলোক নেই"—এই সূত্র কটি বহু জায়গায় নানা ভাষায় পাওয়া গেছে। এই বই-এর অধ্যায় ৬ দ্র.।
২৪. *স-দ-স* (১৯৭৮), ৪।৩৯-৪২; ৫।৫০-৫১; ১৩।১১৬-১৭। "নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে" ইত্যাদি শ্লোকটি *বি-পু* (৩।১৮) থেকে নেওয়া—কৃষ্ণমিশ্র (২।২০) ও সায়ণ-মাধব (১৩। ১১৪-১৫) দুজনেই এটি উদ্ধৃত করেছেন (অল্প পাঠভেদ আছে)।
২৫. *স-ম-স*, ১৬, শ্লোক ৩-৪।
২৬. *স-দ-স*, ৩-৪ (পঙ্‌ক্তি ৩০-৪২)।

অধ্যায় ২২

হেমচন্দ্র। *ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত*

শ্বেতাম্বর জৈন আচার্য হেমচন্দ্র-র *ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত* বা-*চরিত্র*-য় চার্বাকমত বিষয়ে বেশ কিছু কথা পাওয়া যায়। জৈন ঐতিহ্যে যে তেষট্টিজন দৈবব্যক্তি ও মানুষকে স্বীকার করা হয় তাঁদের নাম 'শলাকা-পুরুষ'। হেমচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কারশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর অনেক বই আছে। তাঁকে বলা হতো 'কলিকাল-সর্বজ্ঞ'।[১] চার্বাক নিয়েও তিনি কিছু লিখবেন—এ তো স্বাভাবিক।

ত্রি-শ-পু-চ-র "পরিশিষ্টপর্ব" বা "স্থবিরাবলী-চরিত" প্রথম ছাপিয়ে বার করেন জার্মান ভারতবিদ্ হেরমান ইআকবি।[২] গোড়ার দশটি পর্ব প্রথম বেরয় ১৯০৫-এ।[৩] ১৯৩১-৪৯-এ তার ইংরিজি তর্জমা বেরয়।[৪] ১৯৩৬-এ বইটির প্রথম পর্ব, প্রথম ভাগ-এর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণও বেরিয়েছিল।[৫] তবু, আমার দেখার মধ্যে, একমাত্র সর্বানন্দ পাঠক[৬] ছাড়া, আর কেউই চার্বাক প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র-র কথা আনেন নি।

ত্রি-শ-পু-চ বইটি *স-দ-স*-র তুলনায় দুষ্প্রাপ্য—এটিই অবহেলার একমাত্র কারণ নয়। সায়ণ-মাধব-এর লেখায় চার্বাক-এর সমাজদর্শন, বেদবিরোধিতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে তার জ্ঞানতত্ত্ব, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণ সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য। তার কতটা চার্বাক থেকে পাওয়া আর কতটা সায়ণ-মাধব-এর মনগড়া—তা বলা শক্ত। হেমচন্দ্র-র লেখায় এতসব বিষয় আসে নি। চার্বাক বলতে বারো শতকের জৈন ভাববাদীরা কী বুঝতেন সেটুকুই এখানে পাওয়া যায়। দার্শনিক বিচারে তা খুব বেশি কাজে লাগে না।

হেমচন্দ্র-র আগে হরিভদ্র তাঁর *ষ-দ-স*-য় চার্বাকমত সম্পর্কে অল্প কিছু লিখেছিলেন।[৭] তাঁর তুলনায় হেমচন্দ্র লিখেছেন আরও বেশি। তবে সবই এসেছে একটি গল্পর সূত্রে।

ত্রি-শ-পু-চ একটি বিরাট গল্প-সঙ্কলন। তারই প্রথম পর্বে দেখা যায়, সদ্ভিন্নমতি নামে এক মন্ত্রী স্বয়ম্বুদ্ধ বলে আর এক মন্ত্রীকে শাসাচ্ছেন : ধর্মর নাম করে রাজাকে

তিনি নাকি ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছেন। সদ্‌ভিন্নমতি-র মতে :

১. ইহলোকের ভোগ ত্যাগ করে পরলোকের জন্যে যত্ন নেওয়া—এ হলো চাটবার জিনিস হাতে পেয়েও সেটি ছেড়ে কনুই চাটার মতো। ১।১।৩২৯।।

২. ধর্মের ফল পরলোকে পাওয়া যায়—এ কথা বলা অসঙ্গত। পরলোকের বাসিন্দা (= আত্মা) নেই, (তাই) পরলোকও নেই। ৩৩০।।

৩. মাটি, জল, আগুন, বাতাস—এর থেকেই চেতনার উদ্ভব হয়; যেমন গুড়, ময়দা, জল ইত্যাদি থেকে মদশক্তি (মাতাল করে তোলার ক্ষমতা) আপনা থেকেই আসে। ৩৩১।।

৪. শরীর থেকে আলাদা কোনো শরীরী (= আত্মা) নিশ্চয়ই নেই যা শরীর ত্যাগ করে পরলোকে যাবে। ৩৩২।।

৫. তাই নির্ভয়ে বৈষয়িক (= ইন্দ্রিয়গত) সুখ ভোগ করা উচিত, নিজের আত্মাকে (= নিজেকে) বঞ্চিত করা উচিত নয়; নিজের ভালো-কে ধ্বংস করা মূর্খতা। ৩৩৩।।

৬. ধর্ম আর অধর্ম—সুখের বিঘ্নর জন্যে এসব ভয় করা ঠিক নয়; গাধার যেমন শিং নেই, তেমনি ধর্ম-অধর্মও নেই। ৩৩৪।।

৭. একটা পাথরকে চান করিয়ে অঙ্গরাগ (= চন্দন ইত্যাদি) মাখিয়ে, মালা, কাপড় ও গয়না পরিয়ে যে পুজো করা হয়, সেই পাথরটা কোন্ পুণ্য করেছে? ৩৩৫।।

৮. অন্য একটা পাথরের ওপরে বসে লোকে তো পেচ্ছাপ-পাইখানা করছে। ঐ পাথরটা কোন্ পাপ করেছে? ৩৩৬।।

৯. প্রাণীরা যদি কর্মর কারণেই জন্মায় ও মরে, কোন্ কর্মর কারণে বুদ্‌বুদ্ জন্মায় ও মরে? ৩৩৭।।

১০. অতএব, চেতনা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ইচ্ছেমতো সেটি (= চেতনা) কিছু করার চেষ্টা করে। চেতনা নষ্ট হলে আর কোনো পুনর্জন্ম হয় না। ৩৩৮।।

১১. যে প্রাণী মরে সে-ই আবার জন্মায়—এ কেবল কথার কথা, (কারণ) এ যুক্তি সবদিক দিয়েই ভুল। ৩৩৯।।

১২. শিরীষ ফুলের মতো নরম শয্যায় রূপ-লাবণ্যবতী নারীদের সঙ্গে আমাদের প্রভুর (= রাজার) অসঙ্কোচে রমণ করা উচিত। ৩৪০।।

১৩. যেমন রুচি হবে তেমন অমৃতর মতো খাদ্য ও পানীয় তাঁর ইচ্ছেমতো গ্রহণ করা উচিত। যে তা বারণ করে, সে শত্রু। ৩৪১।।

১৪. দিনরাত কর্পূর, অগরু, কস্তুরী ইত্যাদি মেখে সৌরভময় হয়ে থাকো। ৩৪২।।

১৫. উদ্যান, যান, লোকজন ও চিত্রশালায় যা যা দেখার আছে, হে রাজা, চোখের প্রীতির জন্যে প্রতিক্ষণ তা-ই দেখো। ৩৪৩।।

১৬. বাঁশি, বীণা, মৃদঙ্গ ইত্যাদির শব্দের সঙ্গে যে গীতধ্বনি, হে প্রভু, দিনরাত তোমার কানে তা রসায়ন (= অমৃত) হোক। ৩৪৪।।

১৭. যতদিন বাঁচবে, বৈষয়িক (= ইন্দ্রিয়গত) সুখ নিয়ে সুখে বাঁচবে। ধর্মকার্যর জন্যে কষ্ট কোরো না; ধর্ম-অধর্মর ফল কোথায় (আছে)? ৩৪৫।।

চার্বাকমতের সমর্থনে সদ্‌ভিন্নমতি যা বলেন, তা কিন্তু চার্বাককে দার্শনিকভাবে সমর্থন করার জন্যে নয়। হেমচন্দ্র-র মূল উদ্দেশ্য ঐ মত খণ্ডন করা। তাই পূর্বপক্ষ হিসেবে তার উপস্থাপনা। পরলোক, আত্মা, ধর্ম—এ সব নাকচ করা হয়েছে একটাই উদ্দেশ্যে। তা হলো : যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখ আর ভোগসর্বস্বতার পক্ষে যুক্তি খাড়া করা। পরলোক, ধর্ম ইত্যাদি না থাকলে ইচ্ছেমতো ভোগবিলাসের পথে কোনো বাধা থাকে না, পরলোকে গিয়ে জবাবদিহির দায়ও পড়ে না। অর্থাৎ, হেমচন্দ্র মনে করেন, পরকালের ভয় দেখালে তবে মানুষকে ন্যায়নীতির পথে আনা যায়। আর স্বর্গ-নরক যে মানে না, সে কিছুতেই ভালো লোক হতে পারে না। ১২ থেকে ১৭ সংখ্যক শ্লোকে তাই 'খাও দাও ফুর্তি করো'-কেই চার্বাকমত বলে চালানো হয়েছে। চার্বাক-এর ব্রাহ্মণ্য বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে হেমচন্দ্র-র কোনো তফাত নেই।

সায়ণ-মাধব যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে বড় জায়গা জুড়ে ছিল বেদ ও যজ্ঞর বিরোধিতা। হেমচন্দ্র ছিলেন জৈন। তাই বেদ বা যজ্ঞর হয়ে কোনো সাফাই গাওয়ার দরকার তাঁর পড়ে নি। তিনি বরং তাঁর সময়কার ধর্মাচরণ—শালগ্রাম শিলাকে 'নারায়ণ' জ্ঞানে পূজা—নিয়েই চার্বাক-এর বিদ্রূপকে গুরুত্ব দিয়েছেন। শ্রীহর্ষ *নৈ-চ*-য় চার্বাকমত খণ্ডনের প্রসঙ্গে, শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য সমেত নানা লৌকিক কুসংস্কারকেও সমর্থন করা হয়েছে। হেমচন্দ্র কিন্তু সে-পথে যান নি। কারণ সেগুলো জৈন কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে না।

আরও বেশি লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো : লোকায়তর নিরীশ্বরবাদ নিয়ে হেমচন্দ্র একটি কথাও বলেন নি। তার কারণও স্পষ্ট; তত্ত্বর দিক থেকে জৈনরাও নিরীশ্বরবাদী।

চার্বাক-খণ্ডনে হেমচন্দ্র জোর দিয়েছেন অন্য বিষয়ে, যেগুলি জৈন মতাদর্শর বিরোধী। তিনি 'প্রমাণ' করতে চেয়েছেন : ১. পুনর্জন্ম হয়, ২. শরীর ছাড়াও আত্মা থাকে, ৩. ধর্ম-অধর্ম অনুযায়ী ইহলোক ছাড়াও অন্যলোক আছে, আর ৪. কৃচ্ছ্রসাধন (= শরীরকে কষ্ট দেওয়া)-ই ধর্মের পথ (১।৩৪৬-৭৪)।

এর পরে, মন্ত্রী স্বয়ম্বুদ্ধ-র বকলমে হেমচন্দ্র আরও দুটি দার্শনিক মত খণ্ডন করেছেন : বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ (১।৩৭৭-৮৩) ও বৈদান্তিক মায়াবাদ (১।৩৯০-৯৪)। গল্পর শেষে দেখা যায়, রাজা শেষ পর্যন্ত স্বয়ম্বুদ্ধ-র কথাতেই সায় দেন।

হেমচন্দ্র-র এই বিরূপ বিবরণেও কয়েকটি জিনিস দেখার আছে।

১. ২-সংখ্যক শ্লোকটিতে যা বলা হয়েছে তা আসলে একটি খাঁটি চার্বাকসূত্র-র প্রতিধ্বনি। কমলশীল তাঁর *ত-স-প*-য় এটি আগেই উল্লেখ করেছেন।[৮]

২. ৩-সংখ্যক শ্লোকটিও অন্য ভাষায় পাওয়া যায় শান্তরক্ষিত ও হরিভদ্র-র *লেখায়* : জয়রাশিভট্ট, কৃষ্ণমিশ্র ও আরও কেউ কেউ এটির উল্লেখ করেছেন।[৯] শঙ্করাচার্য ও ভট্টভাস্কর *ব্রহ্মসূত্র*, ৩।৩।৫৩-র ভাষ্যে লোকায়ত-মত হিসেবে এই মদশক্তির উপমাটি উল্লেখ করেছেন।

৩. ৬-সংখ্যক শ্লোকটিও হরিভদ্র-র প্রতিধ্বনি।[১০]

৪. ১৭-সংখ্যক শ্লোকটিও অন্য আকারে পাওয়া যায় জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*-তে। এর প্রথম পাদটি অবিকৃত রেখে বাকি তিনটি পাদ (বিশেষ করে দ্বিতীয় পাদটি) নানাভাবে পাল্‌টে এই শ্লোকটি অন্যত্রও উদ্ধৃত বা নতুন করে রচিত হয়েছে।[১১]

ত্রি-শ-পু-চ-এ হেমচন্দ্র চার্বাক প্রসঙ্গে আর দার্শনিক আলোচনায় যান নি। *অ-ব্য-দ্বা*-য় ২০-সংখ্যক শ্লোকে তিনি এককথায় চার্বাককে নাকচ করে দিয়েছেন : "অনুমান ছাড়া যে-নাস্তিক পরের অভিসন্ধি জানতে পারে না, (তার সম্পর্কে) কিছু বলাই উচিত নয়; কোথায় বা চেষ্টা, কোথায় বা তাকানো মাত্র! হায়, প্রমাদ!"[১২]

চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, আর কোনো প্রমাণ (অনুমান ইত্যাদি) মানেন না—এই ভুল ধারণাকেই হেমচন্দ্র এইভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। 'ভুল' বলছি এই জন্যে যে, চার্বাকরা লৌকিক বিষয়ের বাইরে, আত্মা পরলোক ইত্যাদি ব্যাপারে, অনুমান-কে স্বীকার করতেন না, ঠিকই। কিন্তু তাঁদের বিরোধীরা প্রচার করতেন : লৌকিক অলৌকিক কোনো বিষয়েই প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণই এরা মানে না। চার্বাকমতকে পূর্বপক্ষ হিসেবে উপস্থিত করার সময়ে যাবতীয় ভাববাদীই এই বিকৃত ধারণাটি নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।[১৩]

হেমচন্দ্র আরও একটি বিভ্রান্তি তৈরি করে দিয়েছেন। তাঁর *অভিধানচিন্তামণি*-তে বলা হয়েছে, এই ছ'রকমের তার্কিক সম্প্রদায় আছে :

১। আর্হত বা জৈন
২। সৌগত বা বৌদ্ধ
৩। নৈয়ায়িক বা আক্ষপাদ
বা যৌগ
৪। সাংখ্য বা কাপিল
৫। বৈশেষিক বা ঔলূক্য
৬। বার্হস্পত্য বা নাস্তিক
বা চার্বাক বা লৌকায়িতক।[১৪]

হেমচন্দ্র-র মতামতের বৈশিষ্ট্য কী? জৈনরা চার্বাকমতকে কী চোখে দেখতেন, কোন্ কোন্ দিক খণ্ডনের চেষ্টা করতেন—তার একটা নমুনা এখানে পাওয়া যায়। প্রথাগত বেদবাদী হিন্দুদের থেকে তা আলাদা—এইটুকুই দেখার। কিন্তু চার্বাক যে সব ধর্মসম্প্রদায়েরই চক্ষুশূল ছিলেন তাও পরিষ্কার।

---

১. হেমচন্দ্র বিষয়ে সংক্ষেপে জানার জন্যে রাঘবন, ৮৭-৯৪ দ্র.।

২. ইআকবি (১৮৯১/১৯৩২)।

৩. ভাবনগর (কাঠিয়াবাড়) : জৈনধর্ম-প্রসারক সভা, ১৯০৫। ১৯০৯-এ পুরো বইটিই বেরিয়ে যায়।

৪. হেলেন জনসন অনু. (১৯৩১, ১৯৩৭, ১৯৪৯)। প্রথম পর্ব-র একটি হিন্দী তর্জমা করেন মুনিরাজ প্রতাপমুনি (ইন্দোর, তারিখ নেই); *Jaina Jatakas* নামে প্রথম পর্ব-র ইংরিজি তর্জমা করেন বি.ডি.জৈন (লাহোর, ১৯২৫)।

৫. মুনি চরণবিজয়-সম্পা., প্রথম পর্ব, প্রথম ভাগ। আমি এই সংস্করণটিই ব্যবহার করেছি। পাঠক-এর *চা-শা-স-এ* প্রাসঙ্গিক অংশের মূল ও হিন্দী তর্জমা পাওয়া যাবে।

৬. *চা-শা-স*, ১৭৭-৮০।

৭. এই বই-এর অধ্যায় ১৪ দ্র.। এ ছাড়াও জিনভদ্র অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ প্রমুখ জৈন দর্শনগ্রন্থকারদের লেখায় চার্বাক-এর কথা এসেছে।

৮. *ত-স*, শ্লোক ১৮৫৬, ৬৩৩ আর *ত-স-প*, ৬৩৩ ও ৬৩৭।

৯. *ত-স*, শ্লোক ১৮৫৮, ৬৩৩-৬৩৪; *ষ-দ-স*, শ্লোক ৮৩-৮৪, ৩০৬; ত-উ-*সি*, ৬৮; *প্র-চ*, অঙ্ক ২।

১০. *ষ-দ-স*, শ্লোক ৮০, ৩০২।

১১. এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.।

১২. *অ-ব্য-দ্বা*, ১৩০। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মল্লিষেণ সূরি বলেছেন, "চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মনে করে" (ঐ)।

১৩. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩), ৫১-৮৮-তে এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাবে।

১৪. *অ-চি*, অধ্যায় ৩; মর্ত্যকাণ্ড, শ্লোক ৮৬১-৮৬৩ ক-খ।

অধ্যায় ২৩

শ্রীহর্ষ। *নৈষধচরিত*

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী-র *চার্বাকষষ্টি*-তে শ্রীহর্ষ-র *নৈষধচরিত* কাব্য থেকে ৪৭টি শ্লোক নেওয়া হয়েছিল। রাজা নল ও দময়ন্তীর কাহিনীর মধ্যে লোকায়ত দর্শন আসার কোনো উপলক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, যে-কোনো কারণেই হোক, একটি সর্গ (১৭) জুড়ে শ্রীহর্ষ সেই দর্শন স্থাপন ও খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা থেকে ফেরার পথে ইন্দ্র-যম-বরুণ এই তিন দেবতার সামনে হাজির হন কলি। তিনি চার্বাকেরই প্রতিনিধি। তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করেন ঐ তিন দেবতা।

বার্হস্পত্যসূত্রম্-এ কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী *নৈষধ* থেকে আর একটি শ্লোকও নেন নি। তাঁর পরেও লোকায়ত-আলোচনায় *নৈষধ* কমই ব্যবহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে শেষ বড় কাজ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত *চার্বাক/লোকায়ত*।[১] তাতেও *নৈষধ* থেকে কোনো উদ্ধৃতি নেই।

এর কারণ বোধহয় এই যে, *নৈষধ*-এ, ঠিকমতো বলতে গেলে, দর্শনের প্রসঙ্গ—জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি দিক—খুব একটা আসে নি। যা এসেছে তা হলো : ধর্মীয় ও সামাজিক আচার, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস ইত্যাদি যে ভুল ও বৃথা—এই ধরণের বিষয়। শ্রীহর্ষ-র আগে ও পরে চার্বাকমত বলতে যা বোঝানো হয়েছে—তার থেকে খুব কিছু নতুন কথা এখানে নেই। তাই *নৈষধ*-কে বাদ দেওয়া অসঙ্গত নয়।

আমার কিন্তু মনে হয়, *নৈষধ*-এ যেভাবে চার্বাকমত স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ জাগায় সেটি খণ্ডনের উদ্যোগ। এই দিকটি নিয়ে, যতদূর জানি, একমাত্র ই. বি. কাওয়েল[২] ছাড়া আর কেউই আলোচনা করেন নি। অথচ এখানে চার্বাকচর্চার একটি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। চার্বাকমত বলতে বারো শতকে কী বোঝাত, কোন্ কোন্ দিক দিয়ে তার খণ্ডনের দরকার পড়েছিল—এ সবের এক চমৎকার নমুনা এখানে ধরা আছে। দুঃখের বিষয়, শ্রীহর্ষ-র সময়টি আন্দাজ করা গেলেও, ভারতের কোন্ প্রান্তে তিনি থাকতেন তা জানা যায় না। তবে,

তাঁকে পূর্ব-ভারতের লোক মনে করার মতো কিছু নিদর্শন আছে।[৩]

এবার শ্রীহর্ষ-র বক্তব্য বিচার করা যাক।[৪]

নৈষধ-এ চার্বাক যা বলেন (শ্লোক ৩৭-৮৩) তা মোটামুটি এইরকম :

১. ইহসুখবাদ—মুক্তপ্রেম, ব্রহ্মচর্য-বিরোধী, ইহলোকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখের পক্ষে মতপ্রচার।

২. জাতিবর্ণভেদের বিরোধিতা [প্রসঙ্গত স্ত্রী-পুরুষের সমতা-র কথাও এসেছে (শ্লোক ৪২, ৫৮)]।

৩. বেদ, যজ্ঞ, আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক, অদৃষ্ট, মুক্তি ইত্যাদিতে অবিশ্বাস।

৪. প্রত্যক্ষজ্ঞানের ওপর আস্থা।

৫. বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করার মনোভাব। (পরিশিষ্ট দ্র.)।

এর উত্তরে ইন্দ্র, যম ও বরুণ যা বলেন (শ্লোক ৮৪-১০৬), তাতে মূলত শেষ তিনটির ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, বর্ণভেদের সপক্ষে ইন্দ্র বলেন : বর্ণসঙ্কর (বিভিন্ন বর্ণর মধ্যে অবাধ মিলন ও সন্তানের জন্ম) কখনোই সমর্থন করা যায় না। তার কারণ একটিই : বেদ-এ যেসব পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে (জলে পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি) তাতেই বর্ণসঙ্কর ধরা পড়ে যায় (শ্লোক ৮৭-৮৮)।

অদৃষ্টর সপক্ষে তাঁর বক্তব্য : সহবাস করলেও সন্তানের জন্ম অনিশ্চিত, সুতরাং অদৃষ্টর ভূমিকা মানতেই হবে (শ্লোক ৮৯)।

আত্মা (প্রেতাত্মা, সাদা বাঙলায় ভূত) যে আছে তার প্রমাণ : জীবিত লোকের ওপর ভর করে প্রেত গয়ার শ্রাদ্ধ প্রার্থনা করে। নানাদেশের লোক একথা জানেন (শ্লোক ৯০)। নামের ভুলে যমদূতে নিয়ে যাওয়ার পর কেউ কেউ ফিরে এসে পরলোকের কথা বলেন। এটাই পরলোকের অস্তিত্বের প্রমাণ (শ্লোক ৯১)। (এই দুটি যুক্তি বরুণের মুখেও শোনা যায়। শ্লোক ১০৫ ও ১০৬ দ্র.)।

বেদের মাহাত্ম্য বিষয়ে অগ্নি বলেন : মহাপরাক নামে একটি ব্রত করলে (এই ব্রত-য় উপোস করতে হয়) মানুষ না খেয়েও বেঁচে থাকে (শ্লোক ৯৩)।

পুত্রলাভ, শত্রুনাশ ও বৃষ্টিপাতের জন্যে যজ্ঞ করলে তার ফল চোখে দেখা যায় (শ্লোক ৯৪)।

স্বাধীন বিচারের বিপক্ষে যম বলেন : বেদ ও তার অনুগামী শত শত মতে যা স্থির হয়েছে লোকে কেন লোকায়ত-র কথায় তা (= পরলোকে বিশ্বাস) ছেড়ে দেবে (শ্লোক ৯৭)?

ইহলোকে সমানজ্ঞানী দু-দল পথিকের মধ্যে পথ নিয়ে মতভেদ হলে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠর মতই মেনে নেওয়া হয়, পরলোকের ক্ষেত্রেও তা-ই মেনে নেওয়া উচিত (শ্লোক ৯৮)।

নিজের মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময়ে লোকে সকলের অনুমতি মতো চলে। পরলোকের বিষয়েও সেইভাবেই (সকলের বা অন্তত বেশির ভাগ লোকের মত নিয়ে) ঠিক হওয়া উচিত (শ্লোক ৯৯)।

বেদ-এ পরস্পর-বিরোধী কথা আছে—এর বিরুদ্ধে যমের বক্তব্য : সব মতকে যারা পরিত্যাগ করে, তারা যদি দেখে তার মধ্যে একটি মতও সত্য, তবেই তারা পরাস্ত হয়। কোথাও অনর্থ ঘটলেই বুঝতে হবে : কর্মর ভুলে অমন হয়েছে, ধর্মর দোষে নয় (শ্লোক ১০০)। সুতরাং, সমাজে সকলের মতের মিল আছে—কোথাও এই দেখে, আর তার অন্যথা হলে সমাজে পতিত হতে হবে—কোথাও বা এই দেখে, সকলকেই বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অনড় হয়ে থাকতে হবে (শ্লোক ১০১)।

শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য দেখিয়ে বরুণ বলেন : যে-পাথরের গর্ভে কচ্ছপ ইত্যাদির চিহ্ন আছে, মানুষ যা তৈরি করতে পারে না, সেই পাথর দেখেও তোমাদের কেন শ্রদ্ধা হয় না (শ্লোক ১০৩)?

বেদের সত্যতা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য : ইন্দ্রকে শতক্রতু (শতযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী) বলে, সৃষ্টিকর্তার উরু থেকে বৈশ্যর জন্ম—লোকসমাজ কথিত এই কাহিনীগুলি বৈদিক বৃত্তান্তর সঙ্গে মিলে যায়। এগুলো কি তোমাদের চমৎকৃত করে না (শ্লোক ১০৪)?

গয়ার শ্রাদ্ধ ও নামের ভুলে প্রেতলোক থেকে ফিরে আসা মানুষের দৃষ্টান্তটিও (শ্লোক ৯০-৯১) আবার উল্লেখ করা হয়েছে (শ্লোক ১০৫-১০৬)।

আগেই বলেছি, *নৈষধ*-এ চার্বাকমত বলে যা লেখা হয়েছে তা শ্রীহর্ষ-র মনগড়া। তার দেড়খানি শ্লোক (৩৯ ও ৬৯ গঘ) *স-দ-স*-য় পাওয়া যায় (অল্প পাঠভেদ আছে)। বাকি বক্তব্যর কিছু কিছু (যেমন, প্রত্যক্ষই প্রমাণশ্রেষ্ঠ, শ্লোক ৪৫), যাগযজ্ঞর ব্যর্থতা (শ্লোক ৫৫), শ্রুতিস্মৃতি ইত্যাদির প্রামাণিকতায় অবিশ্বাস (শ্লোক ৬০, ৬৩), পুনর্জন্ম ও আত্মায় অনাস্থা (শ্লোক ৭২-৭৪), তপস্বীদের নিয়ে ব্যঙ্গ (শ্লোক ৮০)—এগুলি নিঃসন্দেহে চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে।

কিন্তু শ্রীহর্ষ-র সব কথাই যে চার্বাকদর্শনের শ্লোকরূপ—এমন না-হওয়াই সম্ভব। আসলে সায়ণ-মাধব-এর মতোই, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাক যা বলেছেন এবং যা বলতে পারতেন—দুটিকেই মিশিয়ে শ্রীহর্ষ তাঁর বক্তব্য সাজিয়েছেন।[৫] অন্যান্য পরোক্ষ সূত্রর সঙ্গে যদি তা মেলেও, তাতেও প্রমাণ হবে না যে, এগুলিই ছিল চার্বাকের আসল মত। বড়জোর বলা যায় : চার্বাকের প্রতিপক্ষ চার্বাকমত বলতে এগুলিই বুঝতেন।

কিন্তু লক্ষ্য করা বিষয় হলো, চার্বাককে এখানে হাজির করা হয়েছে আপসহীন যুক্তিবাদী হিসেবে। যেমন, *নৈষধ*-এ চার্বাক বলেন, শ্রুতি ও স্মৃতির মানে বোঝার

ব্যাপারে মহাবুদ্ধিমানরাও কি একমত হয়েছেন? ব্যাখ্যা নির্ভর করে বুদ্ধির জোরের ওপর। যে-ব্যাখ্যা মানুষকে সুখের প্রতি উন্মুখ করে তোলে তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় (শ্লোক ৫১)।

এর বিরুদ্ধেই ইন্দ্র, যম, বরুণের যাবতীয় আপত্তি। 'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা'—একথা তাঁদের কানে বড় মারাত্মক শোনায়। তাঁরা বলেন : বহু লোকে যা বিশ্বাস করে তা-ই মেনে চলা ভালো, নিজের বুদ্ধি খাটানোর কোনো দরকার নেই। তার জন্যে যাবতীয় অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে হবে (যেমন, জ্যান্ত লোকের ওপর ভর করে ভূতরা গয়ায় পিণ্ডি পেতে চায়), বিশ্বাস করতে হবে : আমাদের পুলিশ বিভাগের মতো যমের দফ্‌তরেও কাজেকর্মে গলদ হয়, একজনকে আনতে গিয়ে যমদূতরা ভুল করে সেই নামের অন্য লোককে ধরে আনে; ভুলটা ধরা পড়লে লোকটিকে বাঁচিয়ে মর্ত্যে ফেরত পাঠানো হয়—অর্থাৎ লোকে মরে গিয়ে আবার বাঁচতে পারে। শালগ্রাম শিলার গায়ে দাগ দেখে লোকে তাকে কূর্ম অবতারের চিহ্ন বলে ভাবে। মানুষ এরকম পাথর বানাতে পারে না। এর থেকেই নাকি প্রমাণ হয়ে যায় : প্রচলিত ধর্মই সত্য!

বর্ণভেদের বিরুদ্ধে চার্বাকের যে-জেহাদ : নির্দোষ জাতি (= জন্ম) কোথায় আছে?—এর উত্তরে ইন্দ্র বারে-বারে বেদবিশ্বাসেরই দাবি করেন, সঠিক উত্তর দিতে পারেন না। তেমনি চার্বাক বলেন, যজ্ঞ করে প্রার্থিত বস্তু পেলে ধূর্তরা বলে, এর কারণ আমাদের মন্ত্র সফল হয়েছে; আর তা না পেলে বলে যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়েছিল। যজ্ঞ করলে হয় অঙ্গহানি হবে, নয় হবে না। ধূর্তরা এই সুযোগ নিয়ে লোককে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করে (শ্লোক ৫৫)।[৬] এর উত্তরে যম দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি একেবারেই এড়িয়ে যান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যজ্ঞ করলে ফল হবেই। সর্বদাই নাকি তা-ই হতে দেখা যায় (শ্লোক ৯৪)।

নিজের অজান্তেই শ্রীহর্ষ একটা উপকার করেছেন। চার্বাকমত খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি একটিও সুযুক্তি বা প্রমাণ হাজির করতে পারেন নি, বরং "সব্বাই করে বলে সব্বাই করে তাই"—এই নির্ঝঞ্ঝাট পথটিই বেছে নিয়েছেন। এতে চার্বাকমতের শ্রেষ্ঠত্বই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—যদিও ইহসুখবাদ বাবদে চার্বাককে নিতান্ত নীচ ও ভোগসর্বস্ব বলে দেখানোর চেষ্টায় তিনি কসুর করেন নি। সেই সঙ্গে এও দেখবার : চার্বাকদর্শনের একটি দিকই তাঁর লেখায় এসেছে—তার সামাজিক ও ধর্মীয় মতামত। বস্তু ও চেতনা সম্পর্কে চার্বাকের ধারণা, জ্ঞানের উৎস ও প্রমাণ সম্পর্কে তার মতামত ইত্যাদি কথা একেবারেই ওঠে নি (একবার মাত্র প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ এসেছে)। কিন্তু *নৈ-চ*-র মতো কাব্যে অত কথা আশাও করা যায় না। যেটুকুও এসেছে সেটুকুও অবান্তর। তার জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ।

আগেই বলা হয়েছে, *নৈ-চ*-র এই বিতর্কটিকে কাওয়েল খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, শ্রীহর্ষ-র সহানুভূতি ছিল আক্রমণকারী (কলি)-র দিকে। সঙ্ঘাতটা সত্য আর মিথ্যার মধ্যে নয়, সংশয়ের দুটি সমভার বিকল্পর মধ্যে। বস্তুবাদও তাঁর চোখে সম্ভাব্য বহু মতের একটি মত মাত্র।[৭]

কাওয়েল-এর এই বক্তব্য মানা শক্ত। শ্রীহর্ষ-র নিজের দার্শনিক ধ্যানধারণা[৮] যা-ই হোক, বেদপ্রামাণ্যে তিনি নিশ্চয়ই আস্থাবান ছিলেন। নাস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি সেই নিয়েই। যাবতীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস, অলৌকিক-অতিলৌকিক 'ঘটনা'র আশ্রয় নেওয়া—এগুলোও তারই অঙ্গ। বেদবাহ্য (= বেদ-এর বাইরে) যুক্তিকে তিনি এর জন্যেই মানতে অপারগ। চার্বাককে তিনি যতই হেয় করার চেষ্টা করুন, প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদে মুক্তবুদ্ধির দিকটি তাতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

---

১. *C/L* (১৯৯০)।

২. কাওয়েল (১৮৬২), ৩৭১-৩৯০।

৩. নীলকমল ভট্টাচার্য মনে করতেন, শ্রীহর্ষ বাঙালি ছিলেন। সুশীলকুমার দে কিছুতেই সে-কথা মানতে পারেন নি। দাসগুপ্ত ও দে (১৯৭৫), ৩২৬ টী. দ্র.। ওড়িশার জনৈক পণ্ডিত দেখিয়েছেন, নীলকমল ভট্টাচার্য যেসব প্রথা ও আচারের ভিত্তিতে শ্রীহর্ষ-র বাঙালি উৎস অনুমান করেছিলেন সেগুলি (উলুধ্বনি, হাতে শাঁখা পরা, আলপনা ইত্যাদি) ওড়িশাতেও প্রচলিত ছিল। মহাপাত্র, ২০৫-০৬ দ্র.।

৪. উদ্ধৃতি ও উল্লেখের ক্ষেত্রে নারায়ণ রাম আচার্য কাব্যতীর্থ-সম্পা. *নৈষধচরিতম্* ব্যবহার করা হয়েছে। শ্লোকসংখ্যাও ঐ সং. অনুযায়ী। পরিশিষ্ট-য় উদ্ধৃত বাঙলা অনুবাদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পা. *নৈ-চ* থেকে। শ্লোকসংখ্যায় কিছু তফাত আছে।

৫. *নৈ-চ*-র টীকাকার ও অনুবাদকরা এই সহজ কথাটি খেয়াল করেন না। যেমন, কলি-র বক্তব্য ব্যাখ্যা করেই হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সন্তুষ্ট হন নি, সেই সঙ্গে তা খণ্ডনেরও চেষ্টা করেছেন। বিদ্রূপ করে চার্বাক বলেন : গরুর কাছে নত হয়ে দেবতা ও ব্রাহ্মণরা কি নিজেদের গরুর চেয়েও খাটো করেন নি (শ্লোক ৬৭)? সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর টীকায় যোগ করেছেন : স্তন্যদান করে পরিপোষণ করেন বলে গরুও মা, তাঁকে নমস্কার করা ন্যায্য (২৭৬)।—*নৈষধ*-এর ইংরিজি অনুবাদে কৃষ্ণকান্ত হন্দিকৈ মাঝে মধ্যেই বলেন : (শ্লোক ৪৯ প্রসঙ্গে) "চার্বাক মনুর অপব্যাখ্যা করেছেন...", (শ্লোক ৬৬ প্রসঙ্গে) "চার্বাক মহাভারতের অপব্যাখ্যা করেছেন...", (শ্লোক ৭৪ প্রসঙ্গে), "অদ্বৈত বেদান্ত-র বিরুদ্ধে চার্বাক-এর আক্রমণ ঠিক নয়"। হন্দিকৈ (১৯৫৬), ২৫০ টী. ২১, ২৫২ টী. ৩২, ২৫৩ টী. ৩৫। হালের বাঙলা অনুবাদে শ্রীকরুণাসিন্ধু দাসও একবার টীকায় যোগ করেছেন (শ্লোক ৬১ প্রসঙ্গে) : 'এটি অপব্যাখ্যা' (সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ১৪, ২৫১)। কিন্তু অপব্যাখ্যার দায়িত্ব কার—চার্বাক-এর না শ্রীহর্ষ-র?

৬. এই শ্লোকটি প্রসঙ্গে কাওয়েল (১৮৬২) লিখেছিলেন : "cf. the Bengali proverb, আমার হাতযশ ও তোমার কপাল" (মূলেই বাঙলা হরফ ছিল)। ৩৮৫, টীকা।

৭. টী. ২, ৩৮৯-৯০।

৮. *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য* ও *নৈ-চ*-র লেখক যদি একই শ্রীহর্ষ হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই অদ্বৈত বৈদান্তিক ছিলেন। প্রথম বইটিতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, "কোনো কোনো অংশে লোকায়ত মতের সঙ্গে আমাদের মিল আছে।" এ প্রসঙ্গে শ্রীহেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত : "এই মন্তব্যটি স্মরণ করলে দার্শনিক এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। **অদ্বৈত বেদান্ত ও লোকায়ত দর্শন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত হলেও একটি জায়গায় বিস্ময়কর ঐক্য রয়েছে।** জানি না একে Unity of opposites বলা যাবে কিনা। লোকায়ত ও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদী কেউই কিন্তু আত্মা এবং অনাত্মা (জীবদেহ সহ জড় বস্তুজগৎ) এ রকম দুটি স্বতন্ত্র মূল সত্তা স্বীকার করে না। দুটির মধ্যে কোনো একটিকে মূল সত্তা বলে বেছে নিয়েছে। অপরটি এই মূল সত্তার বিকশিত বা বিবর্তিত রূপান্তর।" *চার্বাকদর্শন* (১৯৯৩), ৩৬। মূলেই মোটা হরফ ছিল।

দুটি দর্শন দুটি বিপরীত প্রান্তে রয়েছে—এইটুকু নিঃসন্দেহে মিলের জায়গা। কিন্তু এতে Unity of the Opposites (ঠিকমতো বললে Unity and Conflict of the Opposites)-এর শর্ত পূরণ হয় না। অদ্বৈত বেদান্তে চেতনাই একমাত্র সত্য, বস্তুজগৎ মায়া (খুব বেশি হলে, 'প্রাতিভাসিক সত্তা' নামক সোনার পাথর বাটি); কিন্তু লোকায়তমতে বস্তুর এক বিশেষ বিন্যাসে চেতনার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ চেতনার আগে বস্তু থাকলেও, অচেতন ও চেতন দুরকমের বস্তুই মানা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে এক নির্বিশেষ আত্মা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব মানা হয় না।

পরিশিষ্ট

(বন্ধনীর মধ্যের শ্লোকসংখ্যা নির্ণয়সাগর সংস্করণের)

যজ্ঞের ফল পাথর ভাসার ন্যায় হইলেও, বেদবাক্যের সত্যতা থাকে কি? (কখনোই না)। সুতরাং সে বেদবাক্যে আর বিশ্বাস কি? যাহা হইতে স্বেচ্ছাচার পদ্ধতি রুদ্ধ হইয়াছে ।। ৩৬।। (৩৭)

যে হেতু, মাতা ও পিতা এবং তাহাদেরও আবার মাতা ও পিতা এই ক্রমে দুই বংশের শুদ্ধি থাকিলেই পুত্রের শুদ্ধি হইতে পারে; সেই হেতু, অসংখ্য বংশের শুদ্ধি আবশ্যক বলিয়া শুদ্ধ কোন্ জাতি আছে? ।। ৩৯।। (৪০)

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই কামান্ধতা সমান হইলেও, ঈর্ষ্যাবশতঃ স্ত্রীদিগকে রক্ষা করে, কিন্তু সেভাবে পুরুষদিগকে রক্ষা করে না। সুতরাং বংশের নির্দোষতা রক্ষার বিষয়ে কপটাচারী সেই লোকদিগকে আমি নিন্দা করি ।। ৪১।। (৪২)

পাপ হইতে মৃতব্যক্তির দুঃখ হয় এবং পুণ্য হইতে তাহার সুখ হয় ইহা শুনা যায়; কিন্তু উহার বিপরীত ভাবটা প্রত্যক্ষ ও নিশ্চিত। সুতরাং আগম ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন্টা প্রবল, কোনটা বা দুর্ব্বল তাহা তোমরাই বল ।। ৪৪।। (৪৫)

মরণের পর অন্য দেহপ্রাপ্তির সন্দেহ থাকিলেও, যদি পাপ পরিহার্য্যই; তাহা

হইলে হে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ! তোমরাও পশুহিংসা-পাপের সন্দেহবশতঃ অশ্বমেধাদিযজ্ঞ পরিহার কর ।। ৪৫।। (৪৬)

হে আস্তিকগণ! পুণ্যেই বা তোমাদের শ্রদ্ধা হয় কেন? রমণেই বা তোমাদের শ্রদ্ধা না হয় কেন? দেখ—মানুষ সেই কার্য্যই করিবে, যাহাতে কার্য্যের পরই অধিক পরিমাণে সুখ অনুভয় [তথৈব] হয় ।। ৪৭।। (৪৮)

শ্রুতি ও স্মৃতির অর্থবোধ বিষয়ে ঐকমত্য কোথায়? কারণ, বুদ্ধিশক্তি অনুসারেই ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। সুতরাং সুখের অনুকূলে ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নহে ।। ৫০।। (৫১)

যে দেহে 'অহম্' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, দাহ করায় সেই দেহ নষ্ট হইয়া গেলে আর পাপ তোমাদের কি করিবে? তারপর, পাপের ফল পুত্রাদির উপরে বর্ত্তিবে ইহাও বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে চৈত্রের পাপফল মৈত্রেরও কেন হয় না? ।। ৫১।। (৫২)

যে ব্যক্তি 'আমি' এইভাবে দেহকেই আত্মা বলিয়া জানিতেছে, অত্যন্ত ধূর্ত্ত বেদ 'এই দেহ তুমি নহ' এইভাবে দেহকে তাহার আত্মজ্ঞান হইতে ছাড়াইয়া দিতেছে, এবং অন্য আর একটাকে (ব্রহ্মকে) আত্মা বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। কি আশ্চর্য্য! ।। ৫৩।। (৫৪)

হে মীমাংসকগণ! বেদের অংশ হইলেও মন্ত্র, নামধেয় এবং অর্থবাদগুলিকে তোমরা যদি অনর্থক বলিয়া মনে কর; তবে কোন্ দুর্ভাগ্যবশতঃ দুঃখকর বেদের বিধিগুলিকে সেইরূপ অনর্থক বলিয়া মনে কর না? ।। ৫৯।। (৬০)

সম্মুখযুদ্ধে নিহত লোকেরা স্বর্গে যাইয়া যদি ক্রীড়াই করে; তবে, যুদ্ধে নারায়ণ কর্ত্তৃক সম্মুখভাবেই নিহত সেই দৈত্যেরাও, স্বর্গেও নারায়ণের সহিত যুদ্ধ করুক? ।।৭২।। (৭৩)

সংসার অবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম দুই থাকে; কিন্তু মুক্তি অবস্থায় একমাত্র ব্রহ্ম থাকে। অতএব, জীবের উচ্ছেদই মুক্তি, এই রূপ উক্তিতে বেদান্তীদিগের পাণ্ডিত্যই আছে বটে ।। ৭৩।। (৭৪)

যিনি সচেতন লোকদিগের শিলাসদৃশ মুক্তির জন্য, ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাকে তোমরা গোতম বলিয়া জান। অথবা যেমন বোঝ, তেমনই তিনি ছিলেন [অর্থাৎ গো-তম, শ্রেষ্ঠ গরু] ।। ৭৪।। (৭৫)

বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির ভার্য্যা লক্ষ্মী ও দুর্গা প্রভৃতি, সর্ব্বদাই তাঁহাদের 'প্রতি নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন; তথাপি কেন তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন না, প্রত্যুত কামের কারাগারেই অবস্থান করেন ।। ৭৫।। (৭৬)

যদি সর্ব্বজ্ঞ, দয়াশীল এবং অমোঘবাক্যে ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি কেবল বাক্য উচ্চারণ দ্বারাই, প্রার্থী আমাদিগকে চরিতার্থ করেন না কেন? ।। ৭৬।। (৭৭)

সংসারিগণের আপন আপন কর্ম্ম অনুসারেই দুঃখ হইয়া থাকে; তথাপি ঈশ্বর নিমিত্তরূপে সেই দুঃখের সম্পাদক হইয়া আমাদের সংসারিদিগের অকারণশত্রুই হইয়া পড়েন; আর অন্য লোক কারণবশতই শত্রু হয় ।।৭৭।। (৭৮)

তর্কের শেষ না থাকায় সমস্ত দার্শনিক মতই সমান এবং সেগুলি পরস্পর পরস্পরকে খণ্ডন করিয়া থাকে। সুতরাং পরস্পর-বিরুদ্ধ অনুমানদ্বয়ের ন্যায় কোন্ দার্শনিক মতের অপ্রামাণ্য হইবে না? ।।৭৮।। (৭৯)

স্বয়ং ক্রুদ্ধস্বভাব যে সকল মুনিরা অন্যকে শমগুণ শিক্ষা দেন; তাঁহারা ধনলাভের জন্য ধাতুনির্ম্মাণ বিদ্যোপদেশী নির্দ্ধনস্বরূপই বটেন ।।৭৯।। (৮০)

হে দাতৃগণ! এই লক্ষ্মী কৃপণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন; আবার নির্ব্বোধ বলিরাজা সমস্ত ধন দান করিয়া বদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং তোমরা ধন দান কর কেন? ।।৮০।। (৮১)

অধ্যায় ২৪

সায়ণ-মাধব। *সর্বদর্শনসংগ্রহ*

চার্বাক/লোকায়ত দর্শন বিষয়ে এখন আমরা যেটুকু জানি তার সূচনা হয়েছিল সায়ণ-মাধব-এর *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, প্রথম অধ্যায় দিয়ে। ১৮৫৩-য় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বইটির গোড়ার কয়েকটি অধ্যায় ছাপিয়ে বার করেন। ১৮৫৮-য় পুরো বইটি ছাপার কাজ শেষ হয়।[১] এর থেকেই বিশ্বের যাবতীয় ভারতবিদ্ চার্বাকদর্শনের মোটামুটি একটা পরিচয় পেলেন। তার আগে অবধি এ সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বিদ্বান্‌দের জ্ঞান ছিল নামমাত্র। কিছু ভুল ধারণাও চালু ছিল।[২]

স-দ-স-র পরে ঐ ধরণের আরও কয়েকটি দর্শনসার, digest বেরিয়েছে;[৩] চার্বাকদর্শন বিষয়ে নানা উৎস জানা গেছে। তবু সায়ণ-মাধব-এর বইটিই এখনও সবচেয়ে পরিচিত ও প্রচলিত। এই অধ্যায়টির একাধিক বাঙলা অনুবাদ পাওয়া যায়; অনেককটি ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইংরিজি, জার্মান ও ফরাসি তর্জমাও হয়েছে।[৪] এখানে আর নতুন করে অনুবাদ করছি না; চার্বাকদর্শনকে তিনি যেভাবে হাজির করেছেন, শুধু তার একটি বিশ্লেষণ হাজির করা হচ্ছে।

সায়ণ-মাধব-এর ব্যাখ্যানকে চারভাগে ভাগ করা যায় :

০. সূচনা

১. চার্বাকদর্শনের মূল বক্তব্য

২. প্রতিপক্ষর সঙ্গে বিতর্ক

   (ক) দুঃখবাদের বিরোধিতা

   (খ) বেদপ্রামাণ্যর বিরোধিতা

   (গ) ব্যাপ্তিজ্ঞান (Universal proposition)-এর বিরোধিতা

   (ঘ) যদৃচ্ছাবাদ, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদির বিরোধিতা—স্বভাবকে জগৎ-কারণ বলে মানা

৩. চার্বাকদর্শনের বক্তব্য-সূচক কিছু শ্লোক।

সূচনা

০. সায়ণ-মাধব-এর শুরুটি বেশ চমৎকার। সংস্কৃত-য় যে-কোনো বই-এর গোড়াতেই মঙ্গলাচরণ শ্লোক থাকে, অর্থাৎ এক বা একাধিক দেবতার বন্দনা করে বই শুরু হয় (কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্য আছে। যেমন, *কামসূত্র*। সেখানে নমস্কার করা হয়েছে ধর্ম, অর্থ আর কাম-কে!) সায়ণ-মাধব-ও যথারীতি শিব-বন্দনা দিয়ে শুরু করেছেন। তারপরেই প্রশ্ন তুলেছেন : পরমেশ্বরকে কেন 'মুক্তিদাতা' এই নাম দেওয়া হচ্ছে? চার্বাক তো মুক্তিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন। চার্বাক যা চেষ্টা করেছেন তাকে উচ্ছেদ করা কঠিন। প্রায় সব প্রাণীই এই লোকগাথা অনুসরণ করে চলে :

> যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচো, মৃত্যুর অগোচর কিছু নেই।
> ছাই হয়ে যাওয়া দেহ আবার কোথায় (বা, কোথা থেকে) ফিরে আসে?

'লোকগাথা' মানে প্রবচন। এই দিয়েই চার্বাক-আলোচনা শুরু। চার্বাকদর্শনে মুক্তি বা মোক্ষ-র কোনো জায়গা নেই; মৃত্যুর পরে আত্মার সদ্‌গতি বা দুর্গতি বলে কিছু হতে পারে না, কারণ মৃত্যুতেই সব শেষ। এই কথাগুলো প্রথমেই বলে নেওয়া হলো।

গৌতম-এর *ন্যায়সূত্র* (২।১।৫৭)-য় (পূর্বপক্ষ হিসেবে) ও তার অনুসরণে সায়ণ-মাধব-এর বিবরণেও বেদ-এর প্রামাণ্য বিষয়ে তিনটি আপত্তির কথা বলা হয় : অনৃত (মিথ্যে কথা), ব্যাঘাত (স্ববিরোধ) আর পুনরুক্ত (এক কথা বারবার বলা)। সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক-বিবরণের বিরুদ্ধেও শেষ দুটি অভিযোগ আনা যায়। তাঁর আলোচনায় পুনরুক্তি বড় বেশি ঘটেছে। গদ্যে যা বলেছেন, তা-ই আবার বলেছেন শ্লোক-আকারে। তাও আবার সব কথা ঠিক জায়গায় পরপর আসে নি। পুরো আলোচনাটিই বেশ এলোমেলো। একটি ক্ষেত্রে (অর্থ ও কাম প্রসঙ্গে) স্ববিরোধও বেশ প্রকট। জেনে-বুঝে না করে থাকলেও চার্বাকমত বিকৃতির অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে আনা যায়।

এ-সব অভিযোগের প্রমাণ দেওয়ার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। সায়ণ-মাধব নিজে ছিলেন অদ্বৈত বৈদান্তিক, শঙ্করাচার্য-র অনুগামী। চার্বাক সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ থাকার কথা নয়। *স-দ-স*-র পরিকল্পনাও সেই রকম : চার্বাক থেকে শুরু করে, আরও চোদ্দোটি বিখ্যাত-অখ্যাত দর্শন পেরিয়ে, অদ্বৈত বেদান্তে গিয়ে শেষ। সায়ণ-মাধব কোনো পক্ষপাত দেখাতে চান নি। প্রতিটি দর্শনকেই তিনি তাঁর মতো করে, যথাসাধ্য নিরপেক্ষভাবে, উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। তবে, যথেষ্ট তথ্য হাতে ছিল না বলে, বিশেষ করে চার্বাকদর্শনের ক্ষেত্রে, তাঁকে নিজস্ব বোধ ও প্রবাদ-প্রবচনের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। খ্রি চোদ্দো শতকে চার্বাক সম্পর্কে নির্ভেজাল কোনো তথ্যসূত্র ভারতে আর ছিল না—এই সত্যটিও তাঁর লেখা থেকে বেরিয়ে আসে।

স্ববিরোধের দিকটাই প্রথম চোখে পড়ে। চার্বাকমত প্রসঙ্গে সায়ণ-মাধব লিখেছেন : এতে নীতি (= অর্থশাস্ত্র বা দণ্ডনীতি, এখনকার ভাষায় রাজনীতি/রাষ্ট্রবিজ্ঞান) ও কামশাস্ত্র অনুসারে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ (= জীবনের লক্ষ্য) বলে মনে করা হয়। এর কয়েক পঙ্‌ক্তি পরেই তিনি আবার লিখেছেন : চার্বাকমতে, নারী প্রভৃতিকে আলিঙ্গন ইত্যাদি থেকে যে-সুখ জন্মায় তা-ই পুরুষার্থ (আরও কয়েক পঙ্‌ক্তি পরে, শ্লোক-আকারে এরই পুনরুক্তি দেখা যায়)।

এখানেই একটা স্ববিরোধ ঘটে গেল। প্রথমে বলা হলো : চার্বাকের মতে পুরুষার্থ দুটি, অর্থ ও কাম (ইহজগতের সুখ)। পরে আবার বলা হচ্ছে : সুখই পুরুষার্থ।

এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। এ ব্যাপারে চার্বাক-এর মত ঠিক কী ছিল তা কারুরই জানা নেই। *কামসূত্র*, ১।২।২৫-এ বাৎস্যায়ন লৌকায়তিকদের দিয়ে বলিয়েছেন : "ধর্ম-আচরণ করবে না।" কিন্তু সেখানে বলা হয় নি, তাহলে লোকে কী করবে : কাম ও অর্থ—দুই-এর সেবা করবে, না শুধু কাম-এর সেবা করবে। এর থেকে কেউ ধরে নিয়েছেন, লোকায়তিকরা ধর্ম বাদে আর দুটি বর্গকে স্বীকার করতেন (*গীতা*, ১৬।১১-র ভাষ্যে নীলকণ্ঠ এমনই লিখেছেন); কেউ বা ধরে নিয়েছেন, এঁরা শুধু কাম-কেই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করতেন, কৃষ্ণমিশ্র ও সদানন্দ কাশ্মীরক তা-ই লিখেছেন।[৫] সায়ণ-মাধব-এর মতো আধুনিক কালের বিদ্বান্, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীও দুটি মতকেই তাঁর 'বার্হস্পত্য সূত্রম্'-এ স্থান দিয়েছেন। নামাই কিন্তু লোকায়তিকদের একবর্গবাদী ('কামই একমাত্র পুরুষার্থ') বলে মনে করেন।[৬]

আসলে দুটি মতই সমান সন্দেহজনক। চার্বাক যে আদৌ ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা অনুযায়ী পুরুষার্থ-র নিরিখে ভাবতেন—এরই কোনো প্রমাণ নেই। মোক্ষ-রও যেমন তিনি পরোয়া করতেন না, পুরুষার্থ-ও তাঁর কাছে তেমনই অবান্তর। অথচ এর থেকে সায়ণ-মাধব চলে গেছেন অর্থশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে।[৭]

চার্বাকদর্শনের মূল বক্তব্য

১. এর পরে চার্বাকদর্শনের মূল কথাগুলি সায়ণ-মাধব নিজের ভাষায় লিখেছেন : পৃথিবী ইত্যাদি চারটি ভূত (মাটি, জল, আগুন আর বাতাস) আছে। সেগুলি দেহ-আকারে পরিণত হয়, আর তার থেকে, মদের বিভিন্ন উপাদান। (ভাত, গুড় ইত্যাদি) থেকে নেশা লাগানোর শক্তির মতো, উপজাত হয় চৈতন্য। সেই ভূতগুলির বিনাশ হলে চৈতন্যেরও বিনাশ হয়। চৈতন্যবিশিষ্ট (সচেতন) দেহই আত্মা। দেহছাড়া আত্মার কোনো প্রমাণ নেই। চার্বাকরা প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ (= সঠিক জ্ঞানের উপায়) বলে মনে করেন। অনুমান ইত্যাদি তাঁরা স্বীকার করেন না। কারণ সেগুলি অপ্রামাণ্য (= প্রমাণ বলার যোগ্য নয়)।

এই কথাগুলোই আবার কয়েক পঙ্‌ক্তি পরে, অন্য প্রসঙ্গর শেষে, যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনভাবে, শ্লোক-আকারে লেখা আছে।

চারটি ভূত, দেহ, আত্মা—এ সম্পর্কে যে-মতামত দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে নিঃসন্দেহে খাঁটি চার্বাকমত বলে ধরা যায়। সায়ণ-মাধব-এর আগে ও পরে, লোকায়ত দর্শনের মূল কথা হিসেবে, সূত্র আকারে এগুলিরই উল্লেখ করা হয়। শান্তরক্ষিত, কমলশীল, হরিভদ্র, শঙ্করাচার্য, কৃষ্ণমিশ্র—সকলে এই কথাই লিখেছেন।

তবে চার্বাকরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানতেন, না লৌকিক বিষয়ে অনুমানকেও স্বীকার করতেন—এ নিয়ে অন্য মতও আছে।[৮]

সায়ণ-মাধব যে-শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন সেগুলি তাঁর নিজের লেখা, না অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়া—তা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, অধ্যায়টির শেষের কয়েকটি শ্লোক কোত্থেকে পাওয়া তা জানা যায়। এক্ষেত্রে গদ্য-অংশ সায়ণ-মাধব-এর নিজের, শ্লোক অন্য কোনো উৎস থেকে নেওয়া—এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আত্মাকে খারিজ করতে গিয়ে সায়ণ-মাধব আর-এক কাণ্ড করেছেন। চারটি ভূত থেকেই চেতনা দেখা দেয়, দেহ-র নাশ হলে তারও নাশ হয়, আত্মা বলে আলাদা কিছু নেই-এর সপক্ষে তিনি উদ্ধৃত করেছেন *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর একটি বচন (২।৪।১২)। উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-র এই উক্তিটি ('বিজ্ঞানঘন আত্মা এই ভূতগুলি থেকে সমুত্থিত হয়ে সেইগুলির সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, প্রেত্যসংজ্ঞা নেই') নিয়ে শঙ্করাচার্য-র মতন ভাববাদী টীকাকার খুবই অস্বস্তিতে পড়েন। এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। শুধু একটা প্রশ্নই তোলা যায় : লোকায়তিকরা কি তাঁদের বক্তব্যর সমর্থনে বেদান্তকে সাক্ষী মানবেন? তাঁরা তো বেদপ্রামাণ্য-র ধার ধারতেন না। বোধহয়, পূর্বপক্ষকে জোরদার করার উৎসাহেই সায়ণ-মাধব অভ্যাসবশে এটি করে বসেছেন; চার্বাক প্রসঙ্গে এটি যে বেমানান তা আর খেয়াল করেন নি।[৯] (একটি শ্লোকের পুনরুদ্ধৃতির সময়েও তিনি এই একই ভুল করেছেন)।[১০]

প্রতিপক্ষর সঙ্গে বিতর্ক

২. চার্বাকদের মূল বক্তব্য উপস্থিত করার পর শুরু হয় বিতর্ক। তার বিষয় চারটি :

ক. জীবন কি সত্যিই দুঃখময়? (যাবতীয় ভাববাদীর যা বক্তব্য)

খ. বেদ কি প্রামাণিক? (যাবতীয় আস্তিকদের মতে : হ্যাঁ)

গ. অনুমান, শব্দ (= আপ্তবাক্য) ও উপমানকে কি প্রমাণ বলা যায়? (নৈয়ায়িকরা তা-ই মনে করেন)

ঘ. এই জগতের কি কোনো নিয়ম (= কার্যকারণ সম্বন্ধ) আছে, নাকি হঠাৎই যার যেদিকে গতি ('যদৃচ্ছা') বা অদৃষ্ট-র বশে সবকিছু ঘটে?

চার্বাকদের পক্ষ নিয়ে, এই বিতর্কে নেমে সায়ণ-মাধব লোকায়ত দর্শনের চারটি দিককে উপস্থিত করেছেন; (১) ইহসুখবাদ, (২) বেদ-অপ্রামাণ্যবাদ, (৩) প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ ও (৪) স্বভাববাদ।

দুঃখবাদের বিরোধিতা

২ক. যাবতীয় আস্তিক (বেদপ্রামাণ্যবাদী ও পরলোকবিশ্বাসী) দর্শনেই বলা থাকে : দর্শনচর্চার মূল উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। এর জন্যেই জীবনের তিন বর্গ, ধর্ম-অর্থ-কাম-এর সঙ্গে যোগ হয় : মোক্ষ। মোক্ষ বা মুক্তি বলতে বোঝায় : সব দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়া। জন্ম হলেই দুঃখ পেতে হবে, সুতরাং পুনর্জন্ম-র চাকা থেকে বেরতে পারলে তবেই সত্যিকারের মুক্তিলাভ হয়। এই একটি ব্যাপারে, সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-মীমাংসা-বেদান্ত-এই ষড়্‌দর্শনের সঙ্গে অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও একমত।

যেন এদেরই বিরুদ্ধে, দুঃখবাদের বিরোধিতা করে চার্বাক বলছেন : জীবনে সুখ দুঃখ দুই-ই আছে। মাছ থাকলেই আঁশ-কাঁটা থাকবে, ধানের সঙ্গে তুষ। দুঃখের ভয় আছে বলে সুখকে ত্যাগ করা উচিত নয়। হরিণ আছে বলে কেউ কি শালিধান বোনে না? ভিখিরি আছে বলে কেউ কি হাঁড়ি চড়ায় না? চোখে-দেখা সুখকে যে ত্যাগ করে, সে পশুর মতো বোকা।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সায়ণ-মাধব এখানে কয়েকটি লৌকিক 'ন্যায়' বা 'লোকোক্তি' (প্রবাদ-বচন) ব্যবহার করেছেন। 'ন্যায়' বলতে বোঝায়, একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কোনো নির্বিশেষ সাধারণ সত্যকে উপস্থিত করা। সায়ণ যে-চারটি লৌকিক ন্যায় উল্লেখ করেছেন, তার শেষ দুটি (হরিণ ও ভিখিরির দৃষ্টান্ত) *কামসূত্র*, ১।২।৪৮-এ পাওয়া যায়। লোকোক্তি হিসেবে এ দুটি বেশ প্রাচীন। পতঞ্জলি-র *মহাভাষ্য*-য় এ দুটি পাওয়া যাচ্ছে।[১১] *সমরাইচ্চ কহা* (*সমরাদিত্য কথা*) নামে প্রাকৃত-য় লেখা গল্প-সঙ্কলনে হরিভদ্র-ও দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গেই এ দুটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন।[১২]

মাছ খাওয়ার দৃষ্টান্তটি খুবই কৌতূহল জায়গায়। কোনো লোকোক্তি-সংগ্রহে এটি চোখে পড়ে নি। ধান আর তুষ-বিষয়ক দৃষ্টান্তটি সায়ণ-মাধব পুনরুক্তি করেছেন *প্র-চ*-র একটি শ্লোক (২।১৩) উদ্ধৃত করে।

বেদপ্রামাণ্যর বিরোধিতা

২খ. জীবনে সুখ ও দুঃখ দুই-ই আছে—এর থেকে সায়ণ-মাধব চলে গেছেন পরলোক প্রসঙ্গে। এর আগেই দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে।

এবার বেদবিশ্বাসীর পক্ষ থেকে তর্ক তোলা হলো : পরলোকে সুখ না-থাকলে পণ্ডিত লোকজন অত টাকাকড়ি খরচ করে, শরীরকে কষ্ট দিয়ে, অগ্নিহোত্র ইত্যাদি নিত্য কর্ম করেন কেন? পরলোকে সুখের জন্যেই তো?

উত্তরে চার্বাক বলেন : বেদে এইসব যাগযজ্ঞ করতে বলা হয়েছে, তাই লোকেও এসব করে, কিন্তু বেদ-কে প্রমাণ বলে মনে করার কোনো হেতু নেই। যজ্ঞ করতে উদ্যোগ নেওয়া তাই কোনো প্রমাণই নয়।

এর থেকেই ওঠে আর-এক প্রশ্ন : বেদকে কেন প্রমাণ বলে মানা হবে না? সায়ণ-মাধব এবার বেদপ্রামাণ্যর বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি হাজির করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, *ন্যা-সূ* (২।১।৫৭)-তে পূর্বপক্ষ হিসেবে এই তিনটি যুক্তি খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিগুলি এই : ১. মিথ্যে কথা বলা, ২. স্ববিরোধ, আর ৩. পুনরুক্তি। সায়ণ-মাধব এর সঙ্গে যোগ করেছেন : বেদকে যাঁরা প্রমাণ বলে মানেন তাঁরাও একে অপরকে খণ্ডন করেন। যেমন, মীমাংসকরা কর্মকাণ্ডর পক্ষপাতী, বৈদান্তিকরা জ্ঞানকাণ্ডর। তাহলে দু দলকে দিয়ে কর্ম ও জ্ঞান—দুই কাণ্ডই খণ্ডিত হলো। দু পক্ষই ধূর্ত বক, আর বেদ ধূর্তর প্রলাপ মাত্র। অগ্নিহোত্র ইত্যাদি যাগ (পুরোহিতদের) জীবিকার প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে।

এই গেল বেদপ্রামাণ্য-অস্বীকার। এরপর সায়ণ-মাধব একটি আভাণক (= প্রবাদ) উদ্ধৃত করেছেন।

> অগ্নিহোত্র (= প্রতিদিন বাড়িতে যাগযজ্ঞ), তিনবেদ, তিনদণ্ড (=সন্ন্যাসীরা যা ধারণ করেন) আর গায়ে ছাই মাখা—বৃহস্পতি বলেন, যাদের বুদ্ধি ও পৌরুষ নেই এগুলো তাদের জীবিকা

অবিকল একই চেহারায় এটি *প্র-চ*-য় পাওয়া যায় (২।২৬)। বেদপ্রামাণ্য নিয়ে প্রশ্ন-উত্তরটিও *প্র-চ*-য় চার্বাক ও তাঁর শিষ্যের সংলাপের অনুসরণে (অঙ্ক ২)। চার্বাকদর্শন অধ্যায়ের শেষে সায়ণ-মাধব এটি একটু অন্য আকারে উদ্ধৃত করেছেন। যথাস্থানে তার কথা বলা হবে।

প্রথমে সায়ণ-মাধব সুখের কথা তুলেছিলেন—জীবনে সুখ-দুঃখ দুইই আছে; শুধু দুঃখহীন সুখ হয় না। এবার এল দুঃখর কথা। সুখও যেমন ঐহিক (স্বর্গসুখ বলে কিছু নেই), দুঃখও তা-ই। গায়ে কাঁটা ইত্যাদি ফুটলে যে-দুঃখ হয়, সেটিই দুঃখ। এ-ই হলো নরক (মৃত্যুর পরে আলাদা কোনো নরক নেই)। ইহলোকে যাঁকে রাজা বলে, তিনিই পরমেশ্বর (এর বাইরে সুখ-দুঃখ স্বর্গ-নরকের আর কোনো বিধাতা নেই)। দেহ উচ্ছেদ হলেই (= প্রাণ চলে গেলেই) মোক্ষ। অর্থাৎ, মৃত্যুতেই জীবনের শেষ, পরকাল ও মোক্ষ বলে কিছু নেই।

এরপর সায়ণ-মাধব একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন : দেহাত্মবাদ, অর্থাৎ দেহই আত্মার আশ্রয়। আত্মা বলতে এখানে চৈতন্য, প্রবৃত্তি, প্রাণ ইত্যাদি সবেরই আশ্রয় বোঝায়। প্রশ্ন উঠল : লোকে যখন বলে 'আমি মোটা', 'আমি রোগা', 'আমি কালো'—তখন 'আমি' বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে—দেহ না আত্মা? চার্বাকের বয়ানে সায়ণ-মাধব বলেছেন : এ ধরণের কথা নেহাতই উপচার বা গৌণ অর্থে প্রয়োগ। 'রাহুর মাথা' বলতে যেমন মাথা আর রাহু আলাদা করে বোঝায় না (কারণ রাহু মানে শুধুই মাথা), তেমনি 'আমার শরীর' ইত্যাদি বলতে একই জিনিস বোঝায় : 'আমি' বলতে যে-শরীরকে বোঝায়, সেই শরীরই 'আমি'। একটি অন্যর 'সমান-অধিকরণ'।[১৩]

'আমি'-র স্বরূপ প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন বেদান্ত, ন্যায়-বৈশেষিক ও জৈন দর্শনেও এসেছে। সেখানে কোথাও অবশ্য চার্বাক / লোকায়ত / বৃহস্পতি বা অন্য কোনো নাম করে দেহাত্মবাদ খণ্ডন করা হয় নি। আত্মাকেই তাঁরা 'আমি'-জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁদের মতে, 'আমার শরীর' আর 'আমার চাকর'—দুটি ক্ষেত্রেই 'আমি'-র মুখ্য অর্থ ধরতে হবে (যে-'আমি' শরীর থেকে আলাদা কিছু), কোনোটির ক্ষেত্রেই গৌণ অর্থ নিলে চলবে না।[১৪]

তবে 'আমি' নিয়ে এই বিরোধে চার্বাক যা বলেন, *স-সি-স* আর *স-বে-সি*-সা-তেও একই ভাবে সেই কথাই বলা হয়েছে। তাই এই উত্তরটি চার্বাকমতের কোনো খাঁটি উৎস থেকেই নেওয়া হয়েছে—এমন ধরা যায়।

চার্বাকদর্শনের মূল বক্তব্য : পুনশ্চ

এরপর সায়ণ-মাধব ওপরের সবকটি বিষয়কে চারটি শ্লোকের আকারে রেখেছেন।

> নারীকে আলিঙ্গন করলে যে সুখ হয়, তা-ই স্বর্গ। কাঁটা ইত্যাদির ব্যথা থেকে যে দুঃখ হয় তাকেই নরক বলে ।।১।।
>
> লোকসিদ্ধ রাজাকেই পরম ঈশ্বর বলা হয়। আর কোনো (পরমেশ্বর) নেই। দেহর নাশই মুক্তি। জ্ঞান থেকে মুক্তি (= সব দুঃখের নিবৃত্তি) প্রার্থিত নয় ।।২।।
>
> মাটি জল আগুন আর বাতাস—এই চারটি-ই ভূত (= বস্তু)। এই চারটি ভূত থেকেই চৈতন্য উপজাত হয়। মদ তৈরির উপকরণগুলি সমবেত হলে যেমন (উপজাত হয়) মদশক্তি (= মত্ত করার ক্ষমতা) ।।৩।।
>
> আমি মোটা, আমি রোগা (= আমি ও দেহ) এক বলেই (একথা বলা হয়)। দেহর মোটা ইত্যাদি সম্বন্ধ বশেই সেই দেহ-ই আত্মা, অন্য কিছু নয়। 'আমার দেহ'—এই উক্তি উপচার (= আলঙ্কারিক বা গৌণ অর্থ) হিসেবে করা হয় ।।৪।।

এই শ্লোকগুলি তাঁর নিজের লেখা, না অন্য কোনো জায়গা থেকে জোগাড় করা—তা জানা যায় না। তবে দ্বিতীয়টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।[১৫] এক্ষেত্রেও শ্লোকের ক্ষেত্রে পরম্পরা ঠিক থাকে নি। আলোচিত বিষয়ের ক্রম অনুযায়ী রাখলে, তৃতীয় শ্লোকটি প্রথমে আসা উচিত ছিল, তারপরে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ। কিন্তু এ যাবৎ পাওয়া সমস্ত পুঁথিতেই শ্লোকগুলি উল্‌টো-পাল্‌টা হয়ে আছে : সমস্ত ছাপা সংস্করণেও তাই বহাল রয়েছে।

ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিরোধিতা

২গ. এ পর্যন্ত চার্বাক-এর তরফে দুটি মত খণ্ডন করা হলো : ১. জীবন দুঃখময় (তাই পুনর্জন্ম মানে আবার দুঃখভোগ, তার থেকে মুক্তি পাওয়াই মোক্ষলাভ), ২. বেদ-ই সবচেয়ে বড়-প্রমাণ (সুতরাই বেদে যা যা বলা হয়েছে, তা-ই করলে মোক্ষলাভ হবে)। এরপর সায়ণ-মাধব এমন একটি প্রসঙ্গে গেছেন যা নিয়ে আর কেউ এত বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। *স-দ-স* ছাড়া আর কোথাও সে-বিষয়ে চার্বাক-এর মত পুরোপুরি জানার কোনো উপায় নেই। সেটি হলো : নির্বিশেষ সত্য স্থির করার মতো কোনো প্রমাণ কি আছে? (ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় এর নাম 'ব্যাপ্তি')।

চার্বাককে সাধারণত 'প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী' বলা হয়। কথাটা কতদূর ঠিক সে-নিয়ে সন্দেহ আছে। কমলশীল-এর *পঞ্জিকা*-য় লেখা হয়েছে : পুরন্দর কিন্তু বলেছেন লোকায়তিকরা লৌকিক ক্ষেত্রে অনুমানের ভূমিকা মানেন, অ-লৌকিক (অর্থাৎ, আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি) বিষয়ে নয়। পুরন্দর-কে বলা হয়েছে 'চার্বাকমতে গ্রন্থকর্তা', তাঁর লেখা একটি বৃত্তি-র কথাও পুষ্পদন্ত-র *মহাপুরাণ*-এ আছে।[১৬] এ ছাড়া জয়ন্তভট্ট লিখেছেন, চার্বাকদের মতে প্রমাণ অসংখ্য (*ন্যা-ম*-র অন্যত্র তিনি কিন্তু চার্বাকদের প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী হিসেবে উল্লেখ করেন।)।[১৭] এর থেকে কিছু আধুনিক বিদ্বান্ চার্বাকদের একাধিক সম্প্রদায় বা উপ-সম্প্রদায়ের কথা কল্পনা করেছেন।

সায়ণ-মাধব চার্বাকমতকে এই প্রসঙ্গে যে-ভাবে হাজির করেছেন, তাতে ব্যাপারটা আরও গোলমেলে হয়ে গেছে। বিশেষ বা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে চার্বাক প্রত্যক্ষকে স্বীকার করেন, কিন্তু তার থেকে, কার্যকারণ সম্পর্ক বুঝে, কোনো সামান্যীকরণ, অর্থাৎ নির্বিশেষ সত্যে পৌঁছতে তিনি রাজি নন। এখানে চার্বাক-এর মূল প্রতিপক্ষ হলো ন্যায়দর্শন। সে-দর্শনে প্রমাণের চারটি উপায় মানা হয় : প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ (= আপ্তবাক্য, বেদ বা প্রামাণিক লোকের কথা) ও উপমান। চার্বাক-এর তরফে সায়ণ-মাধব এখানে এই মত খণ্ডন করেছেন। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ঐ চারটি ছাড়া আরও চারটি প্রমাণের কথা বলতেন (অভাব, অর্থাপত্তি, সম্ভব, ঐতিহ্য)। *ন্যা-সূ,* ২।২।১-১২-য় সেগুলি খণ্ডন করা হয়েছে। সায়ণ-মাধব-এর

চার্বাক তাই শুধু নৈয়ায়িকদেরই মোকাবেলা করেছেন।

এই চার্বাক মনে করেন : সব দেশে, সব কালে, সব অবস্থায় সত্য, এমন কোনো নির্বিশেষ জ্ঞান পাওয়ার কোনো উপায় নেই। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-এ সব ক্ষেত্রেই ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকবে—তা জানা যাবে কী করে? প্রত্যক্ষ দিয়ে নয়, কারণ, অতীত-ভবিষ্যৎ দুরস্থান, বর্তমানে সব জায়গায় ধোঁয়া থাকলেই আগুন আছে—এ কথা কেউ বলতে পারেন না (কারণ, সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়)।

নৈয়ায়িকরা বলেন, প্রত্যক্ষ দুরকমের—বাহ্য প্রত্যক্ষ (চোখ দিয়ে যে বাইরের জিনিস দেখা যায়) ও আন্তঃপ্রত্যক্ষ (অন্তঃকরণ বা মন দিয়ে যা জানা যায়)। দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক মধ্ব-র *তত্ত্ববিবেক* থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সায়ণ বলেছেন, চোখ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল বলে মন স্বতন্ত্র নয়, সুতরাং আন্তঃপ্রত্যক্ষ দিয়েও ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না।[১৮]

অনুমান দিয়েও ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে না। অনুমান দিয়ে যা জানা গেল, তার পেছনে একটি অনুমান করতে হবে, তার পেছনে আর-একটি...। এইভাবে অনুমান-এর পর অনুমান আসবে (এর নাম 'অনবস্থা দোষ', infinite regress। সায়ণ-মাধব এখানে কোনো দৃষ্টান্ত দেন নি, তাই আমিও দিলুম না)।

উপমান-এর বেলায়ও একই সমস্যা। তা দিয়ে একটি বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে, ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে না (এ ক্ষেত্রেও সায়ণ-মাধব কোনো দৃষ্টান্ত দেন নি)।

এইভাবে, এক-একটি বাক্যে প্রত্যক্ষ-অনুমান-উপমানকে বাতিল করে দেওয়া হলো। শব্দ, অর্থাৎ আপ্তবাক্যকে খারিজ করা হয়েছে এই বলে : স্বয়ং মনুর কথাতেই বিশ্বাস হয় না, যে কেউ বললে তাহলে কেন বিশ্বাস করব : ধোঁয়া থাকলেই আগুন আছে?

সব মিলিয়ে ব্যাপার দাঁড়াল এই : কোনোভাবেই ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না। ধোঁয়া থাকলে আগুন যদি থাকেও, আগুন থাকলেই ধোঁয়া থাকে না। যেমন, গরম লোহা। অন্যদিকে ভিজে কাঠে আগুন দিলে ধোঁয়া হয়। অর্থাৎ ধোঁয়া থাকার ব্যাপারটা শর্তসাপেক্ষ, কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞান নিঃশর্ত হওয়ার কথা (শর্ত-র পারিভাষিক নাম 'উপাধি'; ব্যাপ্তি সম্পর্কে ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয় এটিকে 'নিরুপাধিক' হতে হবে)।

এইভাবে সায়ণ-মাধব ন্যায়-এর কৌশলেই ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আলোচনা ক্রমেই পরিভাষাবহুল হয়ে উঠেছে। তিনি অভিযোগ করেছেন : ব্যাপ্তিজ্ঞান আর উপাধিজ্ঞান—এ দু-এর পরস্পর-আশ্রয় দোষ ঘটছে, অর্থাৎ উপাধিজ্ঞান হতে গেলে ব্যাপ্তিজ্ঞান চাই, কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্যেও চাই উপাধিজ্ঞান।

চার্বাক-এর প্রতিপক্ষ এতে আপত্তি করতে পারেন। তিনি বলতে পারেন : ব্যাপ্তিজ্ঞান যদি সম্ভব না হয়, তবে ধোঁয়া দেখলেই লোকে আগুন দেখতে ছোটে কেন? চার্বাক-এর উত্তর : এ হলো অতীতে আগুন দেখার ফল (অর্থাৎ একটি ক্ষেত্রে

তার সঙ্গে ধোঁয়া ছিল বলে, লোকে ভাবে এ-ক্ষেত্রেও তা থাকবে)। অথবা, ভুল করে মানুষ ভাবে : ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকবে। কিন্তু ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে 'অ-বিনা-ভাব' (একটা থাকলে অন্যটা না-থাকলেই নয়) কোনোভাবেই প্রমাণ হয় নি।

বোঝাই যায়, প্রশ্নটা শুধু 'প্রমাণ' নিয়ে নয়, কোনো 'প্রমাণ' দিয়েই ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় কিনা—এই হলো মূল সমস্যা। সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক এখানে একজন আদর্শ বৈতণ্ডিক—নিজের মত স্থাপন করাটা তাঁর কাজ নয়, পরের মত খণ্ডন করাই একমাত্র লক্ষ্য। জয়রাশিভট্ট তাঁর *ত-উ-সি* বইটিতে এই কাজই করেছেন। শ্রীহর্ষও *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য*-য় একইভাবে প্রত্যক্ষ-অনুমান ইত্যাদির দাবি নাকচ করে দেন। কোনো 'প্রমাণ'-ই তাঁরা মানেন না, কিন্তু তার জন্যে অন্য প্রমাণবাদীদের মত খণ্ডনে কোনো বাধা নেই। শ্রীহর্ষ বলেছেন, সুরগুরু (বৃহস্পতি), তথাগত (বুদ্ধ) ও বাদরায়ণ (*ব্র-সূ*-কার)-ও তাই করেছেন।[১৯] এর থেকেই সুখলাল সংঘবী ও রসিকলাল পরীখ, দুই জৈন বিদ্বান্ ধরে নিয়েছিলেন : চার্বাকদের অন্তত একটি সম্প্রদায় এমনকি প্রত্যক্ষ-প্রমাণেও বিশ্বাস করতেন না, আর জয়রাশিভট্ট তারই প্রতিনিধি।[২০]

কথাটা মানতে কিছু অসুবিধে আছে। সায়ণ-এর বিবরণ যদি ঠিক হয়, তবে দেখা যাবে : প্রশ্নটা সব তত্ত্বকে উড়িয়ে দেওয়া নয় ('তত্ত্বোপপ্লব' বলতে তা-ই বোঝায়)। মাটি, জল, আগুন, আর বাতাস—এই চারটি তত্ত্ব চার্বাক অবশ্যই মানেন। এগুলিই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। কথা উঠেছে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব কিনা তা-ই নিয়ে। সে-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষও নাকচ হতে বাধ্য। অনুমান-এর আশ্রয় না নিয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে পারে না। কিন্তু অনুমান, তার আগের অনুমান, তারও আগের অনুমান-এর থেকে 'অনবস্থা দোষ' হবেই—এটাও ঠিক নয়। *ন্যা-সূ*, ১।১।৫-তে অনুমান-এর সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে : তৎ (= প্রত্যক্ষ) পূর্বকম্, অর্থাৎ আগে প্রত্যক্ষ থাকলে, তবে অনুমান সত্য হবে। আসলে, চার্বাককে দিয়ে সায়ণ-মাধব যা বলিয়েছেন, তাতে চার্বাক নিজেই স্ববিরোধের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েন। জগতে যদি কোনো ব্যাপ্তিজ্ঞানই সম্ভব না হয়, তবে চারটি মাত্র ভূত-এর তত্ত্ব, এই নির্বিশেষ সত্যটি চার্বাক পেলেন কী করে? অনুমান দিয়েই তো? পৃথিবীর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-এর সব সজীব ও নির্জীব বস্তু কি তিনি দেখেছিলেন?

প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ-জ্যেষ্ঠ ও-শ্রেষ্ঠ—শূন্যবাদী ও মায়াবাদী (বিশেষ করে দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদী সম্প্রদায়, জর্জ বার্ক্‌লি-র (১৬৮৫-১৭৫৩) আগেই যাঁরা বার্কলি-র কথা বলেছিলেন) ছাড়া আর কোনো দর্শনতন্ত্রে তা অস্বীকার করা হয় নি। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাই মনে করতেন : বৌদ্ধ যোগাচার ও মধ্যমক আর অদ্বৈত বেদান্ত বাদে ভারতের কোনো দর্শনকেই পুরোপুরি ভাববাদী বলা যায় না।[২১] সাংখ্য, মীমাংসা, ন্যায়-বৈশেষিক—সব দর্শনেই একাধিক 'প্রমাণ' মানা হয়, কিন্তু সবার আগে আসে প্রত্যক্ষ। বৈভাষিক বৌদ্ধ ও জৈনদের ক্ষেত্রেও তা-ই। অর্থাৎ আর সব

দর্শনতন্ত্রই বাস্তববাদী, realist।

সায়ণ-মাধব একদিকে চার্বাককে প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী বলেন, অন্যদিকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের সূত্রে প্রত্যক্ষকেই খারিজ করিয়ে দেন। তিনি যে-ভাবে চার্বাকের মত হাজির করেন তা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। উলটে মনে হয়, জয়রাশির মতো কোনো সর্ব-প্রমাণ-অনাস্থাবাদীর বক্তব্য তিনি চার্বাক-এর ঘাড়ে চাপিয়েছেন।

অনিবার্যভাবেই তাই প্রশ্ন ওঠে : এর পুরোটাই সায়ণ-মাধব-এর নিজের মাথা থেকে বেরয় নি তো? রিস্ ডেভিড্স্ অন্তত তা-ই ভেবেছিলেন।[২২] লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আন্তঃপ্রত্যক্ষ নাকচ করার সময়ে সায়ণ-মাধব উদ্ধৃতি দিয়েছেন দ্বৈত বেদান্ত-র বই *তত্ত্ববিবেক* থেকে; শব্দ-র অনিত্যতা প্রসঙ্গে সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক অনুসরণ করেছেন কণাদ-এর মত; আর সবশেষে যে-শ্লোকটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে একটি বচন ('সমাসম' ইত্যাদি) পাওয়া যায় *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য*-র একটি টীকায়।[২৩] ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে একটিও বৃহস্পতিসূত্র, এমনকি আভাণক ও লোকগাথাও তিনি উদ্ধৃত করেন নি—এও দেখবার।

চার্বাক বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় পুরন্দর ছাড়া আরও কয়েকজনের নাম পাওয়া গেছে: ভাবিবিক্ত, (দ্বিতীয়) অবিদ্ধকর্ণ ও ভট্ট উদ্ভট (বা উদ্ভটভট্ট)। প্রথমজন ও তাঁর মতো চার্বাকপন্থীদের বলা হয়েছে 'চিরন্তন চার্বাকাচার্য', অর্থাৎ প্রথাগত চার্বাক; শেষ জন ছিলেন প্রথাবিরোধী।[২৪] উদ্ভটভট্ট চার্বাকমতকে নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলেন, ধ্রুপদী চার্বাকমতের সঙ্গে যা মেলে না। *স্যা-বা-র* নামে বইটিতে বাদিদেব সূরি এই উদ্ভট-র কথা বলেছেন। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় : ন্যায়শাস্ত্রেও উদ্ভট-র রীতিমতো ব্যুৎপত্তি ছিল, *তত্ত্ববৃত্তি* (বা *তন্ত্রবৃত্তি*) বলে ন্যায়-এর একটি বইও তিনি লিখেছিলেন। কমলশীল ও প্রভাচন্দ্র বৃহস্পতিসূত্রর একাধিক বৃত্তির কথা বলেছেন।[২৫] অনুমান করা যায় উদ্ভট এইরকম একজন বৃত্তিকার। তিনিই প্রথম বলেছিলেন চারটি ভূত থেকে চৈতন্য জন্মায়, অর্থাৎ এটি একটি নতুন বিষয়। চিরন্তন-চার্বাকরা বলতেন : চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ মদ তৈরির উপকরণগুলোর ভেতরেই মদশক্তি নিহিত থাকে, একটি বিশেষ সমবায়ের ফলে সেটি প্রকাশ পায়। ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় উদ্ভটকে বলা হবে সৎকার্যবাদী, আর চিরন্তন-চার্বাকদের, অসৎকার্যবাদী।

অনুমান খণ্ডন বিষয়ে যে আলোচনা সায়ণ-মাধব করেছেন হয়তো তা উদ্ভট (বা তাঁর মতো কোনো বৃত্তিকারের লেখা) থেকে নেওয়া।

তেমনি ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হিসেবে অনুমান ও উপমানকে খারিজ করার সময়ে সায়ণ-মাধব দুটি দোষের কথা বলেছেন : অনবস্থা দোষ ও পরস্পরাশ্রয় দোষ। প্রভাচন্দ্র-র *প্র-ক-মা*-তেও, পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকমত হাজির করার সময়ে, এই দুটি দোষের কথাই বলা হয়েছে।[২৬] শুধু 'পরস্পরাশ্রয়'-এর বদলে তিনি লিখেছেন,

'ইতরেতরাশ্রয়' (অন্যোন্যাশ্রয়-এর মতো এটিও পরস্পরাশ্রয়-এর অন্য নাম)।

চক্রধর সম্ভবত এগারো শতকের ভাষ্যকার, অন্তত বারো শতকের পরের নন। বাদিদেব সূরি-র কাল জানা যায় : ১০৮৬-১১৩০। প্রভাচন্দ্র-র কর্মজীবন ১০২৫-৬০। পুরন্দর নিঃসন্দেহে আট শতক বা তারও আগের লোক, আর ভট্ট উদ্ভট হয়তো জয়ন্তভট্ট-রই সমসাময়িক, অর্থাৎ ন শতক। বাদিদেব সূরি তাঁকে 'প্রাচীন মহানুভব ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করেছেন ('জরদ্-দ্বিজন্মা-মহানুভাবঃ')। অনিবার্যভাবেই আমাদের মনে আসে : জয়ন্তভট্ট-কেও গঙ্গেশ উপাধ্যায় (তেরো-চোদ্দো শতক) 'জরন্-নৈয়ায়িক' (প্রাচীন নৈয়ায়িক) বলে উল্লেখ করেন।[২৭]

সারকথা দাঁড়াল এই : ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় সায়ণ-মাধব হয়তো বৃহস্পতিসূত্রর অভিনব ভাষ্যকার উদ্ভট ও/বা প্রভাচন্দ্র-কে অনুসরণ করেছেন। এর চেয়ে বেশি বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের হাতে নেই। এও দেখবার যে 'ভূতগুলি থেকেই চৈতন্য' এই সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়ণ-মাধব 'উপজাত হয়' (উপজায়তে)—এই ক্রিয়াপদটি দিয়েছেন, 'অভিব্যক্ত হয়' নয়।

দুঃখের বিষয়, সায়ণ-মাধব তাঁর গোটা আলোচনায় এক বৃহস্পতি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির নাম করেন নি। তবে অনুমান করি : ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি ভট্ট উদ্ভট-এর ভাষ্যই অনুসরণ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে বলতে হবে : তাঁর বিবরণে চার্বাকমতের ধ্রুপদী ('চিরন্তন') ও অভিনব (উদ্ভটভট্ট-র ব্যাখ্যা-অনুগামী)—দুটি ধারাই মিশে আছে, ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনায় দ্বিতীয়টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

এ ছাড়াও বৌদ্ধ দর্শনবিদ্ কর্ণকগোমী জনৈক অবিদ্ধকর্ণ-র কথা বলেছেন (ইনি সাত শতকের নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণ নন)।[২৮] এই দ্বিতীয় অবিদ্ধকর্ণ মনে করতেন লৌকিকভাবে অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করলেও, তা গৌণ; প্রমাণের হওয়া উচিত অগৌণ (= মুখ্য)।[২৯] উদ্ভটভট্ট-র মতের সঙ্গে এই ধারণা মেলে। সায়ণ কিন্তু এরও কোনো উল্লেখ করেন নি।

ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে একটি কথার সঙ্গেই সরাসরি চার্বাকমতের মিল আছে। আপ্তবাক্য খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে : মনু-র কথাই আমরা বিশ্বাস করি না, অন্যে পরে কা কথা। নির্বিচারে কারও মত মানতেই চার্বাক-এর আপত্তি ছিল। তাই যে-মনুর সব বাণীকেই ওষুধের মতো উপকারী বলা হয়,[৩০] তাকেই নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। এই দুঃসাহস শ্রীহর্ষ দেখাতে পারতেন না। ব্যাবহারিক দিক দিয়ে বেদ ও স্মৃতিকে মায়াবাদীরাও অভ্রান্ত বলে শ্রদ্ধা করতেন, তার দোহাই পেড়েই শঙ্করাচার্য সাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিক, এমনকি মীমাংসাকেও খণ্ডন করেছেন (কারণ, তাঁর মতে, এইসব দর্শন বেদ মানলেও, আসলে এরা পুরোপুরি বেদবিরোধী বা 'অর্ধবৈনাশিক')।[৩১]

যদৃচ্ছা বনাম স্বভাব

২ঘ. ব্যাপ্তিজ্ঞান মানেই কার্য-কারণ সম্পর্ক। চার্বাক-এর বিরুদ্ধে শেষ আপত্তি উঠেছে : মণি (জ্যোতিষীর কথামতো রত্নধারণ), মন্ত্র ও ওষুধের ফল যেমন অনিশ্চিত, কখনও কাজে দেয়, কখনও দেয় না—কার্যর পেছনে কি তাহলে কোনো নির্দিষ্ট কারণ থাকে না? তাহলে কি অদৃষ্ট ইত্যাদিও নেই?

মন্ত্র ও ওষুধের কথা *ন্যা-সূ,* ২।১।৬৮-তেও পাওয়া যায়। সেখানে কিন্তু ধরা হয়েছে, ঝাড়ফুঁক আর ওষুধের ফল পাওয়া যাবেই। বেদ কেন প্রামাণ্য—তার পক্ষে দৃষ্টান্ত হিসেবে এই দুটি লৌকিক ঘটনার কথা বলে দাবি করা হয়েছে : ওগুলো যেমন প্রামাণ্য, বেদও তা-ই।

সায়ণ-মাধব অবশ্য একটু কাণ্ডজ্ঞান দেখিয়েছেন। তিনি দাবি করেন নি : রত্ন, ঝাড়ফুঁক ও ওষুধ দিয়ে সর্বদা সব রোগ সারে (নৈয়ায়িকরাও অবশ্য অস্বীকার করেন নি যে, কখনও কখনও এগুলো ফল দেয় না; তাঁরা প্রাণপণে বোঝাতে চেয়েছেন, সফল না-হওয়ার পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকে)। কখনও হয়, কখনও হয় না (এর পারিভাষিক নাম 'কাদাচিৎকত্ব')—এই সমস্যা থেকে সায়ণ-মাধব চলে গেছেন বহু প্রাচীন ও লুপ্ত কয়েকটি দার্শনিক মতে। যেমন যদৃচ্ছাবাদ। বিরুদ্ধপক্ষের প্রশ্ন : তাহলে কি অদৃষ্ট (জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল)-কেও কারণ বলা যাবে না?

উত্তরে চার্বাক বলেন, অদৃষ্টকে না-মানলেই জগৎকে যাদৃচ্ছিক (= যথাগতি) বলতে হবে, এও ঠিক নয়। স্বভাব থেকেই সব কিছু ঘটে। এর সমর্থনে তিনি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন :

> আগুন গরম, জল ঠাণ্ডা, বাতাস না-গরম
> না-ঠাণ্ডা। কে এগুলির বৈচিত্র্য (সৃষ্টি) করেছে?
> (উত্তর :) সেই স্বভাব থেকেই এই বিশেষ অবস্থা
> (অর্থাৎ, আগুন স্বভাবতই গরম, জল স্বভাবতই ঠাণ্ডা, ইত্যাদি)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (১।২, ৫।৫) থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন রচনায় জগতের উৎপত্তি ও কারণ সম্বন্ধে মুখ্যত ছটি মতের কথা জানা যায় : কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পুরুষ (= আত্মা) ও (চারটি) ভূত। পঞ্চমটি বাদে, আর সবকটিই কার্যত নিরীশ্বরবাদী। চার্বাকমতের পূর্বধারণা হিসেবে ভূতবাদই সবচেয়ে উপযুক্ত হতো। কিন্তু সায়ণ-মাধব ও তাঁর আগে উৎপলভট্ট লোকায়ত-কে জুড়েছেন স্বভাববাদের সঙ্গে।[৩২] 'অদৃষ্ট ইত্যাদি' বলতে নিশ্চয়ই স্বভাব ছাড়া বাকি পাঁচটিকে বোঝাবে। সেগুলি খারিজ করে সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক শুধু স্বভাবকেই বেছে নিলেন কেন? মনে রাখা ভালো, চোদ্দো শতকে স্বভাববাদ বলে কোনো আলাদা দার্শনিক মত আর চালু ছিল না। 'স্বভাব' বলতে কী বোঝায়—এ বিষয়ে দুটি

পরস্পরবিরোধী ধারণাও চোখে পড়ে। *মহাভারত*-এর কোনো কোনো অংশে, বৌদ্ধদের লেখায় স্বভাববাদ বলতে বোঝায় অহেতুবাদ, আকস্মিকত্ববাদ, হঠবাদ—যা কিনা যদৃচ্ছাবাদেরই রকমফের। অন্যদিকে অমলানন্দ স্বভাব আর যদৃচ্ছার মধ্যে একটা স্পষ্ট তফাত করেছেন। যদৃচ্ছা কোনোরকমের কার্যকারণই মানে না, কিন্তু স্বভাববাদী স্ব-ভাব (বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বা সংস্থান)-কেই কারণ বলে মনে করেন।[৩৩] তার মানে, ঈশ্বর বা নিয়তি কোনোটিরই আশ্রয় নিতে হয় না, কিন্তু কার্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়।

সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক ব্যাপ্তিজ্ঞান তথা কার্য-কারণ সম্পর্ককেই অস্বীকার করেন। তাহলে তাঁর পক্ষে স্বভাববাদী না-হয়ে যদৃচ্ছাবাদী হওয়াই উচিত ছিল। স্বভাব-কে কারণ হিসেবে মানলে 'প্রকৃতির নিয়ম' বলে একটা মতও মানতে হয়। আগুন থাকলে ধোঁয়া না থাকুক, গরম ভাব তো থাকবেই।

মনে হয়, এ ক্ষেত্রে সায়ণ-মাধব, খুব একটা ভাবনাচিন্তা না-করেই, চার্বাককে একই সঙ্গে ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিরোধী ও স্বভাববাদী করে দিয়েছেন। এতেও যে আরও একটা স্ববিরোধের জায়গা তৈরি হলো—সেটা ধরেন নি।

বা এর অন্য কারণও থাকতে পারে। চার্বাকমত যে আসলে স্ববিরোধী ও অসঙ্গতিতে ভরা—এইভাবেই তাকে হাজির করা ছিল সায়ণ-মাধব-এর আসল উদ্দেশ্য। প্রথম অংশে চার্বাকমতের যে মূলকথাগুলি বলা আছে, সেইটুকুই আদি বৃহস্পতিসূত্র ও তার প্রথাগত ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্যের সঙ্গে মেলে। সংক্ষেপে বললে, সেগুলি হলো : ভূতচৈতন্যবাদ (দেহাত্মবাদ), বেদপ্রামাণ্য-অস্বীকার, পরলোক-অস্বীকার। এর বাইরে চার্বাককে দিয়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও স্বভাববাদ বিষয়ে যা বলানো হয়েছে তা নব্য চার্বাকমত অনুসারে। সেখানে সায়ণ-মাধব তাঁর নিজস্ব কথাও যোগ করেছেন।

চার্বাক-শ্লোকমালা

৩. *স-দ-স*-র চার্বাকদর্শন অধ্যায় শেষ হয় এগারোটি শ্লোক দিয়ে। সেগুলিও আভাণক ও লোকগাথা-র মতো। সায়ণ-মাধব অবশ্য বলেছেন, সব কটিই বৃহস্পতির বচন। ঘটনা হচ্ছে, সাধারণভাবে সব নাস্তিকমতেই এর অনেক-কটি কথা বলা হয়। নাস্তিক বলতে, অন্তত মনু-র সময়েই 'বেদনিন্দক' বোঝাত (মনু ও পাণিনি-র ব্যাখ্যাকারদের মতে, 'নাস্তিক' মানে বেদ-নিন্দক ও যারা বলে 'পরলোক নেই')।[৩৪] সে-হিসেবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের লোকেরা চার্বাক ছাড়াও বৌদ্ধ ও জৈনদেরও নাস্তিক বলে থাকেন। ফলে বেদনিন্দা (সেই সঙ্গে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও স্মৃতি-অনুযায়ী যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান, যেমন শ্রাদ্ধ ইত্যাদির নিন্দা) তিনটি নাস্তিক উৎস থেকেই পাওয়া যায়। সায়ণ-মাধবও এখানে সব নাস্তিকমতের কথাই জড়ো

করে বৃহস্পতি-র মুখে বসিয়েছেন। *বি-পু* ইত্যাদি পুরাণ-উপপুরাণেও তা-ই করা হয়েছে।[৩৫] তবে পরলোক ও দেহছাড়া আত্মা নিয়ে যেখানে বিদ্রূপ করা হয়, সেখানে লোকায়তমতই প্রকাশ পেয়েছে, জৈনমত নয়।

শ্লোকগুলি এই :

১. স্বর্গ নেই, অপবর্গ (= মোক্ষ) নেই বা পারলৌকিক আত্মাও নেই। বর্ণ-আশ্রম ইত্যাদির ক্রিয়াও কোনো ফল দেয় না।।

২. অগ্নিহোত্র, তিন বেদ; ত্রিদণ্ড (সন্ন্যাসীর উপকরণ), ছাই দিয়ে গা ঢাকা—বুদ্ধি ও পৌরুষহীনদের (এই) জীবিকা ধাতা (= ঈশ্বর)-র তৈরি।।

৩. জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যাবে, যজমান কেন তার নিজের বাবাকে হত্যা করে না? [তিনিও তাহলে নির্ঘাত স্বর্গে যেতেন]।

৪. মৃত জীবদের শ্রাদ্ধ করলে যদি (সেটি তাঁদের) তৃপ্তির কারণ হয়, তবে নিভে-যাওয়া প্রদীপেও তেল দিলে তার শিখা বড় হয়ে যাবে।।

৫. ইহজগৎ ছেড়ে যে প্রাণীরা চলে গেছেন, তাঁদের পাথেয় (= পিণ্ড) কল্পনা করা বৃথা, কারণ গৃহস্থের করা শ্রাদ্ধে (তাহলে) পথেই পথিকের তৃপ্তি হতো।।

৬. দান করলে যদি স্বর্গবাসী ব্যক্তির তৃপ্তি হতো, তবে প্রাসাদের ওপরে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের (খাবার) কেন এখানেই (মাটিতেই) দেওয়া হয় না?

৭. যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; ধার করেও ঘি খাবে। ছাই-হয়ে-যাওয়া দেহ আবার কোথায় (বা, কোথা থেকে) ফিরে আসে?

৮. দেহ থেকে বেরিয়ে কেউ যদি পরলোকে যায়, বন্ধুর প্রতি স্নেহে প্রচণ্ড আকুল হয়ে কেন সে বারবার (ইহলোকে ফিরে) আসে না?

৯. ব্রাহ্মণদের বাঁচার উপায় হিসেবেই মৃতদের এই প্রেতকার্য (= শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান)-র বিধান দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া (এর মধ্যে) আর কিছু নেই।।

১০. তিন বেদের কর্তা (= রচয়িতা) — ভণ্ড, ধূর্ত আর নিশাচর (রাক্ষস)। 'জর্ভরী'-'তুর্ফরী' [ঋগ্‌বেদ, ১০।১০৬।৬] পণ্ডিতদের বচন বলে পরিচিত (যদিও শব্দগুলি একেবারেই আবোল-তাবোল)।।

১১. (অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানের) স্ত্রী ঘোড়ার লিঙ্গ ধরবেন—এমন বলা হয়েছে। তেমনি ভণ্ডরা এমন অন্য জিনিসও ধরতে বলে। রাক্ষসরাই বলে মাংস খাওয়ার কথা।।

এরপর সায়ণ-মাধব-এর চার্বাক উপসংহার টেনেছেন এই ঘোষণা করে : "তাই বহু প্রাণীর অনুগ্রহের জন্যে রমণীয় চার্বাকমতই আশ্রয়ের যোগ্য।"

এক-এক করে শ্লোকগুলি বিচার করা যাক।

প্রথম তিনটি শ্লোক *বর্ণাশ্রমধর্ম, সন্ন্যাস* ও *যাগযজ্ঞ*-র বিরুদ্ধে। কিছু পাঠভেদ সমেত তিনটিই পাওয়া যায় *প্র-চ* (অঙ্ক ২), *বি-পু* (৩।১৮।২৮), *নৈ-চ* (১৭।৩৯) ইত্যাদি জায়গায়। দ্বিতীয়টি সায়ণ-মাধব এই অধ্যায়ের গোড়াতেই অন্যরূপে (সঠিক রূপে) উদ্ধৃত করেছিলেন।[৩৬]

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্লোকে *শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের অসারতার কথা* বলা হয়েছে। *রামায়ণ,* অযোধ্যাকাণ্ডে জাবালির নাতিদীর্ঘ ভাষণ, *নৈ-চ*-য় কলির শিষ্য চার্বাকের বক্তৃতা (সর্গ ১৭) ও *প-পু* (সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।৩২৯)-য় অন্য ভাষায় একই কথা আছে। কিন্তু এই কটি শ্লোক, বিশেষ করে চতুর্থ শ্লোকটি জৈন উৎস থেকে পাওয়া—এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।[৩৭]

সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে *দেহছাড়া আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার* করা হয়েছে। এর প্রথমটি পাঠভেদসহ এই অধ্যায়ের গোড়াতেই উদ্ধৃত হয়েছিল (সেটিই সঠিক পাঠ, এটি বিকৃত)। দ্বিতীয়টিতে রাজা পায়াসি-র ও অজিতকেসকম্বল (কেশকম্বলী)-এর প্রতিধ্বনি শোনা যায় (একমাত্র বৌদ্ধ ও জৈন উৎসে এঁদের কথা পাওয়া গেছে, যদিও প্রথমটিতে পায়াসি-কে তর্কে হারান বৌদ্ধ শ্রমণ, কস্সপ; দ্বিতীয়টিতে এক জৈন শ্রমণ, কেসি)।[৩৮]

নবম থেকে একাদশ শ্লোকে *বেদ ও বৈদিক পুরোহিতদের বিদ্রূপ* করা হয়েছে। লোক ঠকিয়ে খাওয়া, যজ্ঞে অস্বাভাবিক আচরণ করানো (যেমন, অশ্বমেধ-এ যজমানের স্ত্রীকে মরা ঘোড়ার লিঙ্গ ধরতে হয়) ও মাংস খাওয়া—এই তিন উদ্দেশ্যেই ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর (রাক্ষস)-রা এসব বিধিবিধান তৈরি করেছে।[৩৯]

একাদশ শ্লোকটি বৃহস্পতিসূত্র থেকে পাওয়া—এমন ভাবা শক্ত। নিরামিষ খাওয়া কি লোকায়তিক জীবনধারার অঙ্গ ছিল? এতে বরং জৈনদের মতের ছাপ পড়েছে। *প-পু,* সৃষ্টিখণ্ডেও বৃহস্পতির মুখ দিয়ে এই কথাই বলানো হয়েছে।[৪০] সেখানেও আপত্তিটা ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিয়ে। বৃহস্পতি জানতে চান : এত পশুহত্যা করে, কাদা আর রক্ত মেখে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে নরকে যাবে কে? *প-পু*-এই দেখা যায়, বৃহস্পতি সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্যেরও প্রবক্তা, দেবদেবীদের বিয়েতেও তাঁর আপত্তি আছে। (*সাংখ্যকারিকা*-র *মাঠরবৃত্তি*-তে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হয়েছে)।[৪১]

যজ্ঞে পশুবলি সম্পর্কে বৌদ্ধদেরও তীব্র আপত্তি ছিল। একাদশ শ্লোকটির বক্তব্য *শার্দূলকর্ণাবদান*-এও পাওয়া যায়। কাওয়েল ও মাক্স্ ম্যূলর বহু আগেই এটি লক্ষ্য করেন।[৪২]

জৈনদের লেখায় চার্বাকমতকে চূড়ান্ত ইহসুখবাদী বলে দেখানো হয়।[৪৩] তার সঙ্গে এই শাকাহার ও ব্রহ্মচর্যপ্রীতি কি মিলবে? সায়ণ-মাধব অবশ্য *প-পু* (সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ১৩) থেকে সরাসরি কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করেন নি। তাতে ইহসুখবাদের অপপ্রচারটি কেঁচে যেত।

সব মিলিয়ে বলা যায় : এই এগারোটি শ্লোকও বিভিন্ন সূত্র থেকে জড়ো করা—মূল বৃহস্পতিসূত্র-য় এগুলি ছিল এমন সম্ভাবনা কম।

সায়ণ-মাধব-এর বহুগ্রাহিতা (এক্লেক্টিসিজম্)

হারিয়ে যাওয়া *চার্বাকসূত্র* পুনর্গঠন ও সঙ্কলনের চেষ্টা করেছেন দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ও মামোরু নামাই। তাঁদের সব কটি সূত্র ও শ্লোককে প্রামাণিক বলে মানতে অসুবিধে আছে। কিন্তু, তাঁদের সঙ্কলিত মোট ৬৩টি সূত্রকে নিখাদ বলে ধরে নিলেও একটা কথা স্পষ্ট : এর সব কটিই নেওয়া হয়েছে আট থেকে বারো শতকের মধ্যে লেখা ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ রচনা থেকে। ঘটনা এই যে, বারো শতকের পর থেকেই *চার্বাকসূত্র* ও তার বৃত্তিগুলি উধাও হয়ে যায়। সায়ণ-মাধব-ও তার হদিশ পান নি। তাঁকে তাই আভাণক, লোকগাথা, কাব্য-নাটক-পুরাণের বচন—এই সবের ওপর ভরসা করতে হয়েছে।

চার্বাকদর্শন অধ্যায়ের সুখ্যাতি করে *স-দ-স*-র অনুবাদক, শ্রীসত্যজ্যোতি চক্রবর্তী লিখেছেন :

> অনুমান প্রমাণের বিরুদ্ধে চার্ব্বাকের পক্ষ হইতে মাধব যে বুদ্ধিদীপ্ত তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সম্ভবত অধুনালুপ্ত বহুগ্রন্থের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। আর যদি এই যুক্তিজাল আচার্যের বুদ্ধি হইতে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয় যে, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ শক্তির তুলনা নাই। চার্ব্বাক দর্শনের কোন প্রবক্তা যদি এই যুক্তিগুলির উদ্ভাবন করিয়া থাকেন, তবে বলিতে হয়, সেই সুদূর অতীতে, তিনি যে বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণ শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।[৪৪]

প্রথম সম্ভাবনাটি যে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না তা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু অনুমানের বিরুদ্ধে যুক্তি দিলেই যে তিনি চার্বাকপন্থী হবেন এমন কোনো কথা নেই। জয়রাশিভট্ট-র মতো তত্ত্বোপপ্লববাদী বা শ্রীহর্ষ-র মতো অদ্বৈত বৈদান্তিকও এ কাজ করেছেন।[৪৫]

ভারতীয় দর্শনে একমাত্র চার্বাক/লোকায়ত-কেই অনুমান-প্রমাণের বিরোধী বলে হাজির করা হয়। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ও প্রমাণৈকবাদী ছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ-র বদলে তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করতেন শুধুই আগম অর্থাৎ বেদ-কে।[৪৬] তাঁদের তাই আগমৈক-প্রমাণবাদী বলা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, অনুমান খণ্ডনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের মুখ দিয়ে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের প্রধান ভর্তৃহরি-র কথাই বলানো হয়েছে। *বা-প* থেকে হুবহু উদ্ধৃতি দিয়ে বৌদ্ধ, জৈন ও

ব্রাহ্মণ্য লেখকরা সেটি খণ্ডন করেছেন।[৪৭] আসলে তাঁরা খণ্ডন করছেন ভর্তৃহরি-র মত, কিন্তু চাঁদমারি রাখছেন চার্বাককে!

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি তুলনায় প্রবল। আবার 'তদেতৎ সর্বং সমগ্রাহি', এই সব (শ্লোকে) তা সংগৃহীত হয়েছে—এই বাক্যটি থেকে বোঝা যায়, সায়ণ-মাধব এখানে তাঁর আগের অন্যান্য দর্শন-সার-সংগ্রহ থেকে এই শ্লোকগুলি পেয়েছিলেন। 'অঙ্গনালিঙ্গনাজ্জন্য...' থেকে 'অহং স্থূল:' ইত্যাদি চারটি শ্লোকও এই ধরণেরই কোনো উৎস থেকে নেওয়া—এমনই মনে হয় (গদ্য-অংশটি অবশ্যই সায়ণ-মাধব-এর নিজের)। এ ছাড়া, আগেই দেখানো হয়েছে, সায়ণ-মাধব-এর প্রধান উৎস : *কামসূত্র, বি-পু, প্র-চ* ও *নৈ-চ*। নিশ্চয়ই আরও বহু বই তিনি পড়েছিলেন, কিন্তু চার্বাক-আলোচনায় তার কিছুই কাজে লাগে নি। ফলে প্রচুর অবান্তর পুনরুক্তি ঘটে, একই কথার ভাবসম্প্রসারণ করতে হয়।

প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ—চার্বাক প্রসঙ্গে সায়ণ-মাধব এই চালু কথাটিরই পুনরুক্তি করেছেন। পুরন্দর বা জয়ন্তভট্ট-র অন্য মতের কথা কি তিনি জানতেন না? এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি চূড়ান্ত বহুগ্রাহিতার প্রমাণ দিয়েছেন। চার্বাকরা কি পরের ধনে পোদ্দারি করতেন? তাই এমন সন্দেহ হতেই পারে : এই সব যুক্তি সায়ণ-মাধব নিজেই খাড়া করেছেন; কোনো প্রামাণ্য লোকায়ত সূত্র বা বৃত্তি থেকে জোগাড় করেন নি। এখানে তিনি আদর্শ বৈতণ্ডিক—একে দিয়ে ওকে খণ্ডন করিয়েই খুশি—নিজের মত স্থাপন করার কোনো দায় নেই।

চার্বাক সম্প্রদায় বলতে কি একটি মাত্র সম্প্রদায় বোঝাত, না ব্যাখ্যাভেদ অনুযায়ী একাধিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল? জয়ন্তভট্ট-র লেখা থেকে অনেকে ধরে নিয়েছেন : তাঁর সময়েই ভারতে একাধিক চার্বাক সম্প্রদায় ছিল। এই চার্বাকধূর্ত, সুশিক্ষিত চার্বাক ও সুশিক্ষিততর বলতে কি তিনটি আলাদা সম্প্রদায় বা বিকাশের তিনটি স্তর বোঝায়? চক্রধর কিন্তু তাঁর টীকায় প্রথম দুটির ক্ষেত্রেই উদ্ভট-এর নাম করেছেন।[৪৮]

চার্বাকদের এমন নির্বিকল্প প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী মার্কা মারা ঠিক নয়। সায়ণ-মাধব কিন্তু তা-ই করেছেন (যেমন করেছেন যাবতীয় জৈন ও অনেক বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য লেখক)।

প্রথমেই বলা হয়েছে, চার্বাকদর্শন অধ্যায়টি শুরু হয় বেশ নাটকীয়ভাবে। এরপরে দ্বিতীয় অধ্যায় হিসেবে আসে বৌদ্ধদর্শন। সেখানে প্রথমেই চার্বাকদর্শন খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়—আর কোনো দিক থেকে নয়, শুধু ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিচারে। প্রথম অধ্যায়ে বিতর্ক হচ্ছিল নৈয়ায়িক বনাম চার্বাকের। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিতর্ক হয় চার্বাক

বনাম বৌদ্ধর। কেন ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব তার সপক্ষে বৌদ্ধ তাঁর নিজের যুক্তিগুলি হাজির করেন। খানিক পরে তর্ক বাধে নৈয়ায়িকের সঙ্গে বৌদ্ধর। তৃতীয় অধ্যায়ে আবার বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে আসে জৈনদের যুক্তি। একইভাবে চতুর্থ অধ্যায়ে রামানুজদর্শন শুরু হয় জৈনখণ্ডন দিয়ে, পঞ্চম অধ্যায়ে পূর্ণপ্রজ্ঞ (মধ্ব) দর্শন রামানুজ-এর মত অস্বীকার করে। এই রচনারীতি সায়ণ-মাধব অনেকদূর টেনে নিয়ে গেছেন, শেষ করেছেন একেবারে শঙ্করাচার্য-র অদ্বৈত বেদান্ত-য় গিয়ে, তিনি নিজেও ছিলেন যার অনুগামী।

সায়ণ-মাধব-এর এই রচনারীতি *স-সি-স*-তেও দেখা যায়। সেখানেও গোড়ায় আসে চার্বাকদর্শন, শেষে অদ্বৈতবেদান্ত। তবে চার্বাকের পরে বৌদ্ধদর্শন আসে নি, এসেছে জৈনদর্শন। এই অধ্যায়েও চার্বাক খণ্ডন করে জৈনমতের বিবরণ শুরু হয়।

সব মিলিয়ে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই :

চার্বাকদর্শনের ব্যাপারে, ১৮৫৩ থেকেই সায়ণ-মাধবই সবচেয়ে পরিচিত উৎস, কিন্তু এটি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। তাঁর বিবরণের প্রথম অংশ বাদে বাকি সবই অ-লোকায়ত উৎস থেকে পাওয়া ও/বা নিজের মনগড়া। তাঁর হাতে যে মূল *চার্বাকসূত্র* বা তার কোনো বৃত্তি ছিল না—এ কথা ঠিক। আবুল ফজল তাঁর *আইন*-এ *আকবরী*-তে, পণ্ডিতদের মুখে যা শুনেছিলেন সেইটুকুই লিখেছেন।[৪৯] সায়ণ-মাধবও যদি প্রচলিত ধারণাগুলোই লিখতেন, তাতে কিছু বলার ছিল না (অন্যান্য দর্শনসংগ্রহ-য় তা-ই করা হয়েছে)। তাতেও কিছু ভুল থাকত; কিন্তু এমন গোলমেলে অবস্থা তৈরি হতো না। নিজের মতো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চার্বাকমতকে তিনি একই সঙ্গে অত্যন্ত খেলো জীবনদর্শন ও (অনুমান ইত্যাদির আলোচনায়) অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম তর্কশাস্ত্র হিসেবে হাজির করেছেন। দুটি শ্লোকের পাঠ ইচ্ছেমতো বিকৃত করে তিনি যে অন্যায় করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। আর সেই সঙ্গে অবান্তর পুনরুক্তি করে শুধু পাতা বাড়ানো হয়েছে। *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায়টিই সবচেয়ে দুর্বল ও অগোছালো।

---

১. এইটিই *স-দ-স*-র সর্বাদি সংস্করণ, *editio princeps*। পটার-এর *গ্রন্থপঞ্জি*-তে তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সম্পা. সংস্করণকে ভুল করে (প্রকাশকাল ১৮৫১ ধরে) এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (১৯৯৫), ১ : ১, ৫১০; ৮০৯.১৭.১ দ্র.। তারানাথের সংস্করণ বেরয় ১৭৯৩ শকে অর্থাৎ ১৮৭২-এ, কলকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তার কপি আছে।

২. এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৩), ২৪১-৪৯ দ্র.।

৩. কামেশ্বরনাথ মিশ্র এরকম তেইশটি বই (মুদ্রিত ও অমুদ্রিত)-এর কথা বলেছেন (*স-দ-স*, প্রস্তাবনা, (১৭)-(২১))। এর সংখ্যা আরও বেশি হবে।

৪. এই বই-এর অধ্যায় ২ দ্র.।
৫. *প্র-চ,* অঙ্ক ২; *অ-ব্র-সি,* ৯৯।
৬. শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০ (সূত্র ৫ ও ২৭); নামাই (১৯৭৬), ৩৯ (সূত্র A15)।
৭. *স-ম-স-*য় বলা হয়েছে : অর্থ আর কামই পুরুষার্থ, ধর্ম নয়; সেই বিষয়ক অর্থ আর গন্ধর্ববেদ [সঙ্গীতশাস্ত্র ইত্যাদি]-ই দুই বেদ! (১৫)।
৮. *ত-স-প,* ৫২৮-এ উদ্ধৃত। পরে এ নিয়ে আরও আলোচনা করা হবে।
৯. *বৃহদারণ্যক* উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সায়ণ-মাধব হয়তো জয়ন্তভট্ট-কে অনুসরণ করেছেন। এই বই-এর অধ্যায় ১৯ দ্র.।
১০. 'অগ্নিহোত্র, তিন বেদ' ইত্যাদি শ্লোকটির প্রথম পাঠের শেষ পাদ-য় আছে : 'জীবিকা-ইতি বৃহস্পতি:', *স-দ-স* (১৯৭৮), ৫, দ্বিতীয় পাঠে (ঐ একই অধ্যায়!) 'জীবিকা ধাতৃনির্মিতা' (ঐ, ১৩)। আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৩২ দ্র.।
১১. জেকব (১৯৮৩), ১ : ৪৪ দ্র.।
১২. ইআকবি-সম্পা., ১৬৬।
১৩. *বৈশেষিকসূত্র,* ৩।২।৯-১৮; প্রশস্তপাদ-ভাষ্য; *ব্যোমবতী,* ভাগ ১, ১৩৫; *ন্যা-ম,* ২০৪-০৫; *প্র-ক-মা,* ১১২।
১৪. *স-ম-স-*য় বলা হয়েছে : 'আমি মানুষ', 'আমি মোটা', 'আমি রোগা'—এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও চৈতন্যগুণের আশ্রয় (-স্বরূপ) দেহই প্রমাতা (=যথার্থ জ্ঞানের কর্তা)। টী. ৭, ১৫। *স-সি-স,* শ্লোক ৬, ৫; *স-বে-সি-সা,* শ্লোক ৫৩৫-৩৬, ২৩৯-এও একই কথা আছে। সদানন্দ যতি-র *বেদান্তসার-*এ চার রকমের চার্বাকের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় বলেন : 'আমি মোটা', 'আমি রোগা' ইত্যাদি অনুভব হয়ে থাকে বলে 'স্থূল শরীরই আত্মা' (১৩৭৫), ১৪৬। এ ছাড়া দাসগুপ্ত। (১৯৭৫), ৩ : ৫৪৬-৪৮ দ্র.।
১৫. দাসগুপ্ত মনে করেন, 'লোকায়তসূত্র' ও তার একাধিক ভাষ্য ছাড়াও চার্বাকদর্শনের মূল কথাগুলি ছন্দোবদ্ধ রূপেও (অন্তত একটি) চালু ছিল। সায়ণ তার থেকেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন (৫৩২)। এ অনুমানের ভিত খুব শক্ত নয়, এই বই-এর অধ্যায় ৬ টী. ৫৪ দ্র.।
১৬. *ত-স-প,* ৫২৮; ধনপাল, *ভবিসয়ত্তকহা,* ভূমিকা, ৪২; *মহাপুরাণ* (১৯৩৭), ১ : ৩২৮। বাদিদেব সূরি একটি পৌরন্দর-সূত্র-র কথাও বলেছেন। *স্যা-বা-র,* ২৬৫ দ্র.।
১৭. *ন্যা-ম*। এই বই-এর অধ্যায় ১৯ দ্র.।
১৮. এই উদ্ধৃতিটি দ্বৈত-বৈদান্তিক মধ্ব বা আনন্দতীর্থ-র *তত্ত্ববিবেক* থেকে নেওয়া—বলেছেন অভ্যংকর (সূত্র ৯, ৯)। বইটি দেখার সুযোগ এখনও হয় নি। কিন্তু পঞ্চানন শাস্ত্রী বইটির নাম লিখেছেন *তত্ত্ববিন্দু* (পৃ. ট)। এই নামে কোনো বই-এর হদিশ পাওয়া যায় না।
১৯. শ্রীহর্ষ, *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য,* ১৫। 'তথাগত' বলতে শ্রীহর্ষ বুঝিয়েছেন মধ্যমক দর্শনকে।
২০. *ত-উ-সি* (১৯৪০), ভূমিকা, তিন। এ বিষয়ে সমালোচনার জন্যে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন* (১৯৬৯), ১৮-৪১।
২১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৩৬৮ ব), ১৮৭ দ্র.।
২২. রিস ডেভিড্‌স্ (১৮৯৯), *C/L,* ৩৭৫।
২৩. এটিও শনাক্ত করেছেন অভ্যংকর (১১ টী.)। আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর-এর *খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-*টীকা *বিদ্যাসাগরী-*তে 'সমাসম' ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে (৭০৭)। কাওয়েল

লিখেছিলেন, এটি উদয়নাচার্য-র একটি 'obscure *śloka*' (*C/L*, ২৫৬ টী. ১৯)। তিনি কোনো বই-এর নাম করেন নি। 'আচার্য' বলতে অবশ্যই উদয়নকে বোঝাতে পারে। কিন্তু সায়ণ-মাধব ও আনন্দপূর্ণ একই সময়ের লোক। তাঁরা দুজনেই মূল শ্লোকটি আগের কোনো উৎসে পেয়ে থাকবেন। 'অব্যাপ্তসাধন' ইত্যাদি শ্লোকটির উৎস এখনও শনাক্ত করা যায় নি।

২৪. *ন্যা-ম*, ২ : ২৫৭।

২৫. *ত-স-প*, ৬৩৩-৩৪; *ন্যা-কু-চ*, ৩৪২।

২৬. *প্র-ক-মা*, ১৭৭-৭৮ দ্র.।

২৭. বাদিদেব সুরি (টী. ১৬)। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর *উপমানচিন্তামণি*-তে জয়ন্তভট্ট প্রমুখকে 'জরন্-নৈয়ায়িক' (= প্রাচীন নৈয়ায়িক) বলে উল্লেখ করেছেন। ফণিভূষণ (১৯৭৮), ৪১-৪২।

২৮. মহেন্দ্রকুমার জৈন (অনন্তবীর্য, *সি-বি-টী*, ভাগ ১, ভূমিকা, ৭৬) ও ভি. রাঘবন (*NCC* (১৯৬৮), ১ : ৪২৬-২৭) দুজন অবিদ্ধকর্ণ-র কথা বলেছেন। কেউ কেউ (যেমন, এলি ফ্রাঙ্কো) এঁদের একই লোক বলে মনে করেন।

২৯. *প্র-বা-স্ব-টী*, ২৫।

৩০. "মনুর্ বৈ যৎ কিঞ্চিদ্ অবদৎ তদ্ ভেষজং ভেষজতায়াঃ।" উক্তিটি *ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ* ও অন্যত্র পাওয়া যায় বলে কথিত আছে। কিন্তু *Vedic Concordance*-এ এটির সন্ধান পাই নি।

৩১. *ব্র-সূ-শা-ভা*, ২।২।১৭-১৮ দ্র.।

৩২. বরাহমিহির-এর *বৃহৎ-সংহিতা*, ১।৭-এর টীকা।

৩৩. অমলানন্দ সরস্বতী, *কল্পতরু-পরিমল* (*ব্র-সূ*, ২।১।৩৩ প্রসঙ্গে); *শা-ভা*, ৪৮১।

৩৪. মনু. ২।১১ প্রসঙ্গে। এ ছাড়া *অষ্টাধ্যায়ী*, ৪।৪।৬০ প্রসঙ্গে বামন-জয়াদিত্য, *ন্যাস* ও *পদমঞ্জরী* দ্র.।

৩৫. এই বই-এর অধ্যায় ১২ দ্র.।

৩৬. এই বই-এর অধ্যায় ৩২ দ্র.। এখানে 'ধাতা'-র কথা এনে সায়ণ-মাধব তাঁর নিজের বক্তব্যরই বিরোধিতা করেছেন।

৩৭. এই বই-এর অধ্যায় ৩৩ দ্র.।

৩৮. হরিভদ্র-র *সমরাইচ্চ কহা*-তেও কাহিনীটি সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রদের দিয়ে বলানো হয়েছে। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৯৯৭), ১২-১৩ দ্র.।

৩৯. সোক্রাতেস-পূর্ব গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিতাস-এর লেখায় এর সমান্তরাল একটি বচন পাওয়া যায় : ''Night-ramblers, magicians, Bacchants, Maenads, Mystics : the rites accepted by mankind in the Mysteries are in unholy performance.'' রচনাংশ, ১৪। ফ্রীম্যান, ২৫।

৪০. এই বই-এর অধ্যায় ১২ দ্র.।

৪১. *মা-বৃ*, *সাংখ্যকারিকা* ২ প্রসঙ্গে।

৪২. বিস্তৃত তথ্যসূত্রর জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (২০০৩), পৃ. ২৪৭ টী. ১৯ দ্র.।

৪৩. *সূ-কৃ-সূ*, ২।১।১৭ থেকেই এর সূচনা। যদি অজিত কেসকম্বল (কেশকম্বলী)-কে লক্ষ্য

করে এই সুখভোগের কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে তা আরও অদ্ভুত। অজিত-এর জীবন ছিল চূড়ান্ত কঠোর ও কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ (বিস্তৃত বিবরণের জন্যে *NCC* দ্র.)। পরবর্তীকালে আরও কেউ কেউ একইভাবে চার্বাকদের ইহসুখবাদী হিসেবে হাজির করেছেন। এতে বিপথচালিত হয়েছেন পরবর্তীকালে বহু বিদ্বান্।

ইহসুখবাদের অভিযোগ সাংখ্য-র বিরুদ্ধেও আনা হয়েছিল। *মা-বৃ*-তে তেমন একটি শ্লোকও উদ্ধৃত হয়েছে (*সাংখ্যকারিকা* ২৭ প্রসঙ্গে। টী. ৪১, ১৪৯ দ্র.)। অর্থাৎ, বিপক্ষকে নিন্দেমন্দ করার জন্যে এই অভিযোগটি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হতো। কিন্তু তার জন্যে সাংখ্যদর্শনকে ইহসুখবাদী বলা হয় না, বলা হয় শুধু চার্বাকদর্শনকে!

৪৪. *স-দ-স* (১৯৮৩), (খণ্ড ১), এগারো-বারো।

৪৫. ভাল্‌টের রুবেন, কৃষ্ণকুমার দীক্ষিত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই দিকটির ওপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। *C/L*, ৫০৫-৩০; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৯), ৯-৪১ দ্র.।

৪৬. ভর্তৃহরি, *বা-প*, ১।৪১। এ ছাড়া এই বই-এর অধ্যায় ১৯ দ্র.।

৪৭. *ত-স*, শ্লোক ১৪৫৯-৬১ (৫২১-২২)-তে; *বা-প*, ১।৩২-৩৪ উদ্ধৃত হয়েছে। কমলশীল-ও ভর্তৃহরি-র নাম উল্লেখ করেছেন। কথাগুলি আছে 'অনুমানপরীক্ষা'-অধ্যায়ে। শ্লোক ১৪৫৫ থেকে ১৪৬৬ অবধি 'কেচন' (কেউ কেউ) বলে অনুমান-অপ্রামাণ্যবাদী মতকে পূর্বপক্ষ হিসেবে হাজির করা হয়। ভর্তৃহরি-ই এখানে শান্তরক্ষিত-এর লক্ষ্য হওয়ার কথা। কিন্তু কমলশীল 'কেচন'-এর ব্যাখ্যা করেন 'বার্হস্পত্যাদয়ঃ', অর্থাৎ বৃহস্পতিমত (চার্বাকমত)-এর অনুসারী ও অন্যরা। এখানে 'আদয়ঃ' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জয়ন্তভট্ট-ও *ন্যা-ম*-তে *বা-প*, ১।৩২ ও ১।৪২ উদ্ধৃত করেছেন একই প্রসঙ্গে (১৭৭, ১৭৯)। *সূ-কৃ-সূ*, ১।১।৮-এর বৃত্তি-তে শীলাঙ্ক ও *স্যা-বা-র* এ বাদিদেব সূরি-ও প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন (২৬২)। এর থেকে বোঝা যায়, কেন জ্ঞানশ্রীভদ্র *প্রমাণবিনিশ্চয়টীকা*-য় বার্হস্পত্য (= চার্বাক) ও ভর্তৃহরি-কে এক বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন। অনুমানকে প্রমাণ বলে প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি লেখেন, "এই ক্রমে বার্হস্পত্যেরও অনুমানপ্রামাণ্য স্বয়ং অঙ্গীকারযোগ্য। প্রত্যক্ষ-অনুমান দু-এর প্রামাণ্য ভর্তৃহরিরও অঙ্গীকারযোগ্য।" জ্ঞানশ্রীভদ্র-র মূল সংস্কৃত টীকাটি এখনও পাওয়া যায় নি। তিব্বতী থেকে সংস্কৃত রূপ পুনরুদ্ধার করেছেন শ্রীসঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (১৯৯০/১৯৯১, ৫৮ দ্র.)।

৪৮. এই বই-এর অধ্যায় ১৯ দ্র.।

৪৯. *আইন-এ-আকবরী*, ৩ : ২২৭-২৮ দ্র.।

অধ্যায় ২৫

মাধব সরস্বতী। *সর্বদর্শনকৌমুদী*

আনুমানিক ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ (মতান্তরে ১৫১৫) নাগাদ *সর্বদর্শনকৌমুদী* লেখা হয়েছিল।[১] সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-র মতোই এটি নানা দার্শনিক মতের সার-সঙ্কলন। মাধব-সরস্বতী নিজেই বলেছেন, অল্পবয়েসি ছেলেদের বোঝার সুবিধের জন্যে বইটি লেখা হয়েছে :

> পদ-বাক্য-প্রমাণজ্ঞো মাধবাখ্য-সরস্বতী।
> কুরুতে বাল-বোধায় সর্বদর্শন-কৌমুদীম্।।

বইটিতে চার্বাকদর্শন সম্বন্ধে একটি ছোটো অধ্যায় আছে। বাঙলায় কোনো লেখক—আমি যতদূর জানি—বইটির উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। একটি ইংরিজি প্রবন্ধে অধ্যাপক ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বইটির নাম করেছেন, আর কোনো বিশ্লেষণের মধ্যে যান নি।[২] সেখানেও বইটির প্রস্তাবনা-অংশের কথাই বলা হয়েছে, পরে যে "চার্বাকদর্শন-সংক্ষেপে" দেওয়া আছে তার উল্লেখ নেই। পটার-সঙ্কলিত *ভারতীয় দর্শনসমূহের বিশ্বকোষ*-এর প্রথম (গ্রন্থপঞ্জি) খণ্ডেও চার্বাক/লোকায়ত প্রসঙ্গে *স-দ-কৌ*-র নাম নেই।

সব মিলিয়ে মনে হয়, মাধব-সরস্বতীর বিবরণটি বাঙালি পাঠকদের কাছে রাখা দরকার।

বইটির গোড়ায় খুব সাঁটে প্রতিটি দার্শনিক মতের মূল বৈশিষ্ট্যটুকু দেওয়া আছে। চার্বাক-প্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে :

> কিন্তু চার্বাক-এর মত : চারটি ভূত (= আগুন, জল, বাতাস, মাটি)-রূপী দেহই আত্মা। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। পরলোক নেই।[৩]

পরে, আরও বিস্তৃতভাবে লেখা আছে :

> এইভাবে বৈদিক দর্শনগুলির কথা সংক্ষেপে বলা হলো। এখন অবৈদিক দর্শন নিরূপণ করা হচ্ছে। সেখানে, চার্বাক-এর (মতে), প্রত্যক্ষই প্রমাণ

(= সত্যজ্ঞানের উপায়)। শরীর-আকারে পরিণত পৃথিবী (= মাটি) ইত্যাদি চারটি ভূতই চেতন। এক-একটি ভূত চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক না হলেও, সবকটি মিললে (তার) ব্যঞ্জকতা আসে। যেমন, এক-একটি সুপুরি ইত্যাদি ফলে মদশক্তি (= নেশা ধরানোর ক্ষমতা) থাকে না, কিন্তু তার পাতা ও ফল গুঁড়ো করলে সেই শক্তি হয়, তেমনি। অতীন্দ্রিয় (= ইন্দ্রিয়ের অতীত) কিছু নেই। স্বর্গ ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ মালা-চন্দন ইত্যাদিরই মতো। নারী স্বর্গ, চন্দন স্বর্গ এই ধরণের প্রয়োগ থেকেই (তা বোঝা যায়)। শরীর ত্যাগই (= মৃত্যুই) মোক্ষ (= মুক্তি)। কারুরই পাপপুণ্য নেই। চতুর্ভুজ ইত্যাদি প্রতিমাই দেবতা (= মূর্তির বাইরে আর কোনো দেবতা নেই)। বেশি আর কী বলব, প্রত্যক্ষর অসিদ্ধ কিছু নেই (যা চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না ইত্যাদি তা সিদ্ধ নয়)। যেমন পছন্দ হয় তেমনই আচরণ করা উচিত।

> "যতদিন জীবন আছে, সুখে বাঁচবে; মৃত্যুর অগোচর (= নজরের বাইরে) কিছু নেই।
>
> ছাই-হয়ে-যাওয়া দেহ কোথায় (বা, কোথা থেকে) আবার ফিরে আসে?"

এই তাঁদের সিদ্ধান্ত। ইতি চার্বাকদর্শন-সংক্ষেপ।[৪]

চার্বাক সম্পর্কে অন্যান্য সূত্র থেকে যা জানা যায়, তার বাইরে কোনো নতুন কথা এখানে নেই। এর তুলনায় সায়ণ-মাধব আরও বিস্তৃতভাবে প্রমাণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু মাদকশক্তির দৃষ্টান্ত হিসেবে সুপুরির কথাটা নতুন।

আরও একটি ব্যাপার দেখার আছে। *স-দ-স*-য় 'বৃহস্পতিও এই সব বলেছেন' বলে এগারোটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হলো :

> যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[৫]

মাধব-সরস্বতী যে-শ্লোকটি শেষে উদ্ধৃত করেছেন তাতে কিন্তু 'ধার করে ঘি খাওয়া'র কথা নেই। তার বদলে আছে : 'নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ'। সায়ণ-মাধব-ও চার্বাকদর্শন আলোচনার গোড়ায় এই পাঠটিই দিয়েছেন।[৬] শেষে আবার দিয়েছেন পাঠান্তরটি। তার থেকেই মনে হয়, প্রথমটিই মূল ও আদি পাঠ। পরে, চার্বাকমতকে খেলো করার মতলব নিয়েই, একটি মাত্র অংশ বদলে, ঘি খাওয়ার কথা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১. শাম্বশিব শাস্ত্রী-সম্পা., ভূমিকা, পৃ. চার; পটার, ১:১, ৫৪৭।
২. ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৭৫), ১৩৯।
৩. *স-দ-কৌ*, ৪।
৪. ঐ, ১০৮।
৫. *স-দ-স* (১৯৭৮), ১৪।
৬. বিস্তৃত আলোচনার জন্যে এই বই-এর অধ্যায় ৩১ দ্র.।

অধ্যায় ২৬

সদানন্দ কাশ্মীরক। *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি*

কাল অনুসারে চার্বাকসূত্রগুলি সাজালে একটি জিনিস ধরা পড়ে। 'সূত্র' নাম দিয়ে পাঁচটি বচন প্রথম উল্লেখ করেছেন বাৎস্যায়ন তাঁর *কামসূত্র*-য়। সেগুলি কতটা প্রামাণিক তা নিয়ে সন্দেহ আছে।[১] এ ছাড়া বেশির ভাগ সূত্র ও শ্লোক পাওয়া যাচ্ছে খ্রি আট শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যে লেখা ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ রচনায়। তারপর থেকেই *বৃহস্পতিসূত্র* বা *লোকায়তসূত্র* বইটি যেন উধাও হয়ে গেল। বারো শতক থেকে একই ধরণের কয়েকটি সূত্র শুধুই পুনরুদ্ধৃত হয়। একেবারে লাফ মেরে সতেরো শতকে এসে আবার দুটি সূত্র পাওয়া গেল *মহাভারত*-এর নীলকণ্ঠ-টীকায় ও *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি*-তে। বার্হস্পত্যসূত্র বলে উদ্ধৃত করলেও সেগুলি কি যথেষ্ট প্রামাণিক? এখানে তারই বিচার করা হবে।

সদানন্দ কাশ্মীরক লিখেছেন : "তাই এই বার্হস্পত্য সূত্রগুলিও (রয়েছে)—

[১] চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ (= আত্মা)।

[২] কামই একমাত্র পুরুষার্থ (= জীবনের লক্ষ্য)।

[৩] মরণই অপবর্গ (= মুক্তি বা মোক্ষ)।"[২]

এ যাবৎ সকলেই (শাস্ত্রী, নামাই প্রমুখ) এই তিনটি সূত্রকে খাঁটি বলেই মেনে নিয়েছেন। প্রথমটি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। শঙ্করাচার্য-র *শা-ভা* (৩।৩।৫৩)-য় হুবহু একই ভাষায় এটি আছে। সদানন্দ বোধহয় সেখান থেকেই এটি পেয়ে থাকবেন।[৩]

দ্বিতীয়টি *প্র-চ*-য় ও শ্রীধর-এর *গী-ভা* (১৬।১১ প্রসঙ্গে)-তে পাওয়া যায়।

তৃতীয় সূত্রটিও নতুন নয়। *প্র-চ*-য়ও চার্বাক-এর মুখ দিয়ে এটি বলানো হয়েছে।[৪] পুনরুক্তি হচ্ছে জেনেও, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী সেটি নিয়েছেন; নামাই যথারীতি নিয়েছেন শুধু সদানন্দ-র সূত্রটিই (*প্র-চ* থেকে তিনি কিছুই নেন নি)। বক্তব্যটি নিশ্চয়ই চার্বাকমতের বিরুদ্ধে যায় না। লোকায়তিকরা মৃত্যুর পরে স্বর্গ-

নরক-পুনর্জন্ম ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতেন না। সুতরাং মৃত্যুতেই সব শেষ— এ কথা তাঁরা বলতেই পারেন। আপত্তি 'অপবর্গ' শব্দটি নিয়ে। জৈন বইপত্রে চার্বাকমতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় : নির্বৃতি (= মোক্ষ) নেই, জীব (= আত্মা) নেই, পরলোক নেই, পুণ্য নেই, পাপ নেই।[৫] ত্রিবর্গ-র মতো মোক্ষর ধারণাও তাঁদের কাছে অবান্তর। ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় যেসব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়, খুব বেশি হলে আলঙ্কারিক অর্থে তাঁরা ওসব শব্দ ব্যবহার করে থাকতে পারেন। কিন্তু তা-ও সন্দেহজনক। 'মৃত্যুই মোক্ষ'-র চেয়ে 'মোক্ষ নেই'— এই ধরণের কথাই উপযুক্ত হতো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সদানন্দ আদৌ মূল *চার্বাকসূত্র* থেকে ঐ তিনটি সূত্র পান নি। শঙ্করাচার্য প্রমুখের লেখার তিনটি বচনকে তিনি চার্বাকসূত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন, আর সরল বিশ্বাসেই সেগুলি উদ্ধৃত করেছিলেন।

সদানন্দ থেকে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী আরও তিনটি সূত্র সঙ্কলন করেছেন।[৬] সেগুলো হলো :

[৪] 'দেখছি', 'শুনছি' ইত্যাদি মনে হওয়ায় মরণ পর্যন্ত যে ইন্দ্রিয়গুলি (টিকে) থাকে, তারাই আত্মা। (অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গুলিই আত্মা)।

[৫] অন্য ইন্দ্রিয় না থাকলেও মন থাকে বলে মনই আত্মা।

[৬] প্রাণই আত্মা।

এই কথাগুলিও আছে চার্বাকখণ্ডন অধ্যায়ে। এগুলি চার্বাকসূত্র, এমন কথা বলা হয় নি, তবে 'কেউ কেউ', 'অপরে' ও 'অন্যে'— এইভাবে আত্মা সম্পর্কে তিনটি মত হাজির করা হয়েছে।

চার্বাকের মতকে বলা হয় দেহাত্মবাদ, অর্থাৎ, দেহই আত্মা (অন্য কথায়, দেহ ছাড়া আত্মা বলে কিছু থাকতে পারে না)। আর এই তিনটি মতের মধ্যে মিল একটাই : জীবিত প্রাণীকে বাদ দিয়ে 'আত্মা' নামের কোনো সত্তাকে স্বীকার করা হচ্ছে না।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে, "এই তিনটি পদ বার্হস্পত্যগণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।"[৭] নামাই অবশ্য এই শেষ তিনটিকে তাঁর পুনর্গঠনে স্থান দেন নি।

আমার মনে হয়, এ-ক্ষেত্রে নামাই-ই ঠিক কাজ করেছেন। অদ্বৈত বৈদান্তিকরা বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকেই আত্মা সম্পর্কে এমন কিছু ধারণা জোগাড় করেছিলেন, তারপর সেগুলি চাপিয়েছিলেন নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের ঘাড়ে। এর সূচনা অবশ্যই শঙ্করাচার্য-র *ব্র-সূ,* ১।১।১-এর ভাষ্য থেকে।

শঙ্করের টীকাকাররা ধরে নিলেন : দেহ, ইন্দ্রিয়, মন— এই তিনটিকে যাঁরা আত্মা বলে ভাবেন, তাঁরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লৌকায়তিক,[৮] অর্থাৎ লৌকায়তিকদেরও বিভিন্ন শাখা আছে। এর ফলেই আর-এক সদানন্দ, সদানন্দ যতি

বা যোগীন্দ্র তাঁর *বেদান্তসার*-এ চার ধরণের চার্বাকের কথা বলেছেন— দেহাত্মবাদী, ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, মন-আত্মবাদী ও প্রাণাত্মবাদী। এই প্রত্যেকটি মতের সপক্ষে তিনি উদ্ধৃত করেছেন উপনিষদের বচন।[৯]

শঙ্করাচার্য-র নামে *স-বে-সি-সা* বলে একটি বই পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত আদি শঙ্করের লেখা নয়। কোন্ সময়ে এটি লেখা হয়েছিল তাও বলা যায় না। তবে এখানেও আত্মা সম্পর্কে এরকম নানা মতের কথা আছে। কিন্তু শুধু দেহাত্মবাদকেই চার্বাকের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।[১০] ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণকে যাঁরা আত্মা বলে ধরেন, তাঁদের অন্য সম্প্রদায়ের চার্বাক বলা হয় নি।

এই আলোচনা থেকে একটিই সিদ্ধান্ত করা যায়। সদানন্দ কাশ্মীরক মূল *চার্বাকসূত্র* বা আরও পরের কোনো সূত্রগ্রন্থ (যেমন, *পৌরন্দরসূত্র*) থেকে চার্বাকমতের পরিচয় পান নি। শঙ্করাচার্য, কৃষ্ণমিশ্র ও এই ধরণের অদ্বৈত বৈদান্তিক উৎস ছাড়া তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন *বি-পু* থেকে। চার্বাকদর্শন সম্পর্কে সদানন্দ কাশ্মীরক-এর সব ধারণাই হাতফেরতা উৎস থেকে পাওয়া। ফলে, তার প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দেহ থাকবেই।

---

১. এই বই-এর অধ্যায় ৬ দ্র.।

২. *অ-ব্র-সি*, ৯৯ (দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), সূত্র ৭, ৫, ৮; নামাই (১৯৭৬), A 10, 15, 12)।

৩. চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ— এই বচনটি *ব্যোমবতী*-তেও পাওয়া যায়। এই বই-এর অধ্যায় ১৭ দ্র.।

৪. অঙ্ক ২, ৪০ : 'মৃত্যুরেবাপবর্গঃ'।

৫. *উ-ভ-প্র-ক*, চতুর্থ প্রস্তাব, ৬৬৮।

৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ২০০, সূত্র ৩৬, ৩৭, ৩৮।

৭. ঐ, ২০২-০৩।

৮. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ধরে নিয়েছেন, এই তিনটি মতের লোকই 'একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত', তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে 'কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন'। *শা-ভা*, ১ : ৫২-৫৩।

৯. *বে-সা* (১৯৬৮), ১৪৬-৪৯ দ্র.।

১০. *স-বে-সি-সা*, শ্লোক ৫৩৫-৩৬।

অধ্যায় ২৭

চিরঞ্জীব শর্মা। *বিদ্বন্‌মোদতরঙ্গিণী চম্পূ*

চার্বাক প্রসঙ্গে বাঙালি পণ্ডিত-কবি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য-র *বিদ্বন্‌মোদতরঙ্গিণী চম্পূ* (=গদ্য পদ্য মেলানো রচনা) নিয়ে আলোচনা তেমন দরকার ছিল না। আস্তিক, নাস্তিক, দেহাত্মবাদী ইত্যাদি শব্দ নিশ্চয়ই চিরঞ্জীবের জানা ছিল; গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এঁদের সম্পর্কে সত্যি-মিথ্যে মেশানো কিছু কথাও তিনি শুনে থাকবেন। কিন্তু কোনো জীবিত বৌদ্ধ, জৈন বা চার্বাকপন্থী তিনি বোধহয় দূর থেকেও চোখে দেখেন নি। ফলে আঠেরো শতকে লেখা এই বই থেকে কীই বা জানা যাবে?

তবু *বি-ত* সম্পর্কে দু-চার কথা বলতেই হয়, কারণ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর *চার্বাকষষ্টি*-তে এই বইটি থেকে একটি শ্লোক বেছে নিয়েছিলেন, আর সর্বানন্দ পাঠক তাঁর বইটির একটি পরিচ্ছেদ ('চার্বাক-সাহিত্য') শেষ করেছেন *বি-ত*-র প্রাসঙ্গিক অংশর উদ্ধৃতি ও তার হিন্দী তর্জমা দিয়ে।[১] চার্বাকমতকে চিরঞ্জীব কীভাবে হাজির করেছেন তার বিচার না-করলে লোকায়ত দর্শনের সমীক্ষা অপূর্ণ থেকে যাবে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই বইটির এক সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন।[২] প্রথমে তার থেকেই কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক :

> এক প্রভুর বাড়ীতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথমে আসিলেন বৈষ্ণব — নাক হইতে মাথা পর্য্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীর শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হল্‌দে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরিনাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, — 'নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।' তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তারপর শাক্ত আসিলেন — মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক — নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক।

তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জল পণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্ব্বিদ, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলঙ্কারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট-পতঙ্গ মারা যায় এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত — চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন, — বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে — দেবতাদের অর্চ্চনা কর, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য কর, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা কর। এই সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের এই বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, — এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল, — আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা, আর তোমরা ভারী পুণ্যশীল — কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন, — যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়, — যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল, — কি ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন, — এ কি, বেদ- পুরাণশাস্ত্রে যে সমস্ত জিনিযের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক — বেদ ত বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কি? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কি? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক — কর্ম্ম যদি না থাকে, কি কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক — কর্ম্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম্ম অর্জ্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম্ম, তবে তাহার প্রমাণ কি? সুখ-দুঃখাদি তো প্রবাহধর্ম্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুতঃ জগৎটাই অসৎ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন, — ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন, — বেশ, বেশ, তুমি আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী — তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্ব্বগামী, তেজঃস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক — তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কি করিবে?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্ব্বভরে বলিলেন, — তুমি আপনার

মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বল, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কাণা, সে যদি বলে — তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে কেবল হাসিবে।

এইবার তর্ক শুরু হয় তার্কিক (= নব্যনৈয়ায়িক)-এর সঙ্গে নাস্তিকের। সারাংশ ছেড়ে তার অনুবাদই দেওয়া যাক :

> ইহা শুনিয়া নাস্তিক (স্বগতভাবে) "আঃ যুক্তিধারা বর্ষণ করিয়া এই ব্যক্তি [তার্কিক] প্রচণ্ড প্রভঞ্জনের ন্যায় আমার সম্মুখে উপস্থিত" ইহা চিন্তা করিলেন ও বলিলেন, "আমাদের মত শোন, মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদ, যোগাচারগণের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের বাহ্য-পদার্থের ক্ষণিক জ্ঞানরূপে প্রকাশবাদ, বৈভাষিকগণের বাহ্যপদার্থের ক্ষণিক সত্তাবাদ, চার্ব্বাকদিগের দেহাত্মবাদ, দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দৈহিক পরিমাণবাদ — এই ছয়টি পত্র। তাহাদের সিদ্ধান্ত —
>
> স্বর্গ জন্মান্তর নরক ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই নাই। এ জগতের কোনও অধীশ্বর পালনকর্ত্তা বা সংহারক নাই, প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ অথবা সকল ফলভোগী দেহব্যতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই। জীব মূঢ়তাবশতই এই মিথ্যাভূত জগতে সত্যবৎ আচরণ করিয়া থাকে।
>
> এবং অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আত্মার কষ্ট সাধনই পাপ, পরাধীনভাবে না থাকাই মোক্ষ, কাম্য বিষয়ের ভোগ করাই স্বর্গ।
>
> স্বকীয় ও পরকীয় কলত্রে (স্ত্রীতে) যথেচ্ছভাবে বিহার করিবে, এবং স্বহিতসাধন করতঃ গুরুশিষ্যভাব বর্জ্জন করিবে।"[৩]

এ বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য : "এই বইএ চিরঞ্জীব শর্ম্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়তদের জৈনদের মত পথ ঝাঁট দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনও করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরকাল মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরকাল মানে পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভাল হয় নাই। যদি বল, উহারা সকলেই নিরীশ্বর, সেই জন্য নাস্তিক বলিব, — তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন — যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।"

বোঝা যায়, চিরঞ্জীবের কাছে 'নাস্তিক' বলতে একটা খিচুড়ি মতবাদ বোঝাত। বৌদ্ধ ও জৈনদের সঙ্গে চার্বাকদের যে কত বিরোধ ছিল তার কিছুই তিনি জানতেন না। ফলে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' — এই জৈনমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মধ্যপথ ('মজ্ঝিমা পটিপদা')-এর ধারণা মিশে গেছে। এগুলিকে চার্বাকমতের অংশ বলে ধরা যায় কিনা — এ প্রশ্ন উঠবেই। তবে 'অপরাধীনতাই মুক্তি' — এই কথাটি নজরে পড়ার

মতো। খুব প্রাচীন কোনো দর্শনসংগ্রহে চার্বাকের নামে এ ধরণের কোনো বচন পাওয়া যায় না। হরিভদ্র থেকে মধুসূদন সরস্বতী — কেউই এমন কথা লেখেন নি। একমাত্র *আইন-এ-আকবরী* আর *স-দ-শি*-তে এমন উক্তি পাওয়া যায়।

যে পণ্ডিতদের কাছ থেকে আবুল ফজল চার্বাকমতের বিবরণ জোগাড় করেন, তাঁরা জানান : "স্বর্গ বলতে তারা (চার্বাকরা) বোঝে এমন অবস্থা যেখানে মানুষ যেমন পছন্দ তেমনি বাঁচে, অন্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকে, আর নরক হলো সেই অবস্থা যেখানে মানুষ অন্যের অধীন।"[৪]

স-দ-শি-তে আছে : "অত্র সুখং স্বর্গঃ। দুঃখং নরকঃ। পরতন্ত্রতা বন্ধঃ। স্বতন্ত্রতা মুক্তিঃ। দেহনিবৃত্তি পরামুক্তিঃ।"[৫]

এখানে অবশ্য স্বতন্ত্রতা-পরতন্ত্রতার কোনো রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই। এ হলো স্ববশে থাকা আর 'পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী' (= পরের ভাত খায় আর পরের বালিশে শোয়) — এ দু ধরণের অবস্থার তফাত।[৬] চার্বাক যেন বলছেন : মুক্তি বলে কিছু নেই, কারণ পুনর্জন্ম বলেই কিছু নেই। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখই স্বর্গ-নরক, এই পৃথিবীতে আত্মনির্ভর থাকতে পারা না-পারাই মুক্তি আর বন্ধন। নির্বাণ বা কৈবল্য বা মোক্ষ বলতে যাঁরা পরামুক্তি নামে আরও কোনো উচ্চস্তরের মুক্তির কথা ভাবেন, তাঁদের ঠাট্টা করে চার্বাক বলছেন : মৃত্যুতে তো একদফা মুক্তি হলোই, তারপর সেই দেহ যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখন তাকে পরামুক্তি বলা যেতে পারে, কারণ তার পরে আর কিছুই পড়ে থাকে না। এর আগে দেহ চৈতন্যহীন হয়ে ছিল, এবার সেই দেহও গেল!

এর পরের ঘটনাবলি আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংক্ষিপ্তসার থেকেই বলা যায় :

> তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন, — যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক; কেন না, বিদেশগত আর মৃত, এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।
>
> নাস্তিক বলিলেন, — মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে, তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।
>
> তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন, — কিরূপে সম্ভাবনা আছে? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশী। তাহা হইলে কেন শোক না হইবে?
>
> নাস্তিক — পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে?
>
> তার্কিক — তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে ত? তবে অনুমানও ত প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কি?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, — মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কি করিয়া?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই ত তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহাকে দিয়া আরও কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন — তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন, — যোগীকে মুক্তি দিবার কর্ত্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন, — না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন, — রাম। তখন তিনজনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর একজন আসিয়া বলিলেন, — না, না, মুক্তি তো রাধা দিবেন। এইরূপে চার পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। এমন সময় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন, — হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ ...।

তার্কিকের সঙ্গে নাস্তিকের বিচারে নাস্তিককে (১) অনীশ্বরবাদী, (২) প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী (= অনুমান-অপ্রমাণবাদী), (৩) ইহলোকবাদী, (৪) স্বভাববাদী, ও (৫) অনিত্যবাদী বলে দেখানো হয়। আগেই বলা হয়েছে, চিরঞ্জীব আদৌ বৌদ্ধ-জৈন-চার্বাকদের তফাত বুঝতেন না। নাস্তিক বলতে তিনি প্রধানত বৌদ্ধদেরই বুঝতেন। তার্কিক এক জায়গায় নাস্তিককে বলেন :

> এই রূপে যদি স্বর্গ বা নরক প্রভৃতিও না থাকে, তবে তুমি কেন চৈত্যবন্দনাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হও, হিংসায় ভীত হও? আকাঙ্ক্ষা বা ভয় ছাড়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না। এবং চৈত্যবন্দনাদি জনিত ফল ইহকালে উপলব্ধ হয় না বলিয়া তাহা ঐহিক নহে। অতএব তাহারও ফল পারলৌকিক।[৭]

নাস্তিক তর্কে হেরে গেলে, চিরঞ্জীব লেখেন, "... অনন্তর বৌদ্ধ নিরানন্দ বিস্মিত এবং বুদ্ধশাস্ত্রতত্ত্বে ভ্রান্ত হইলে সভাস্থিত ব্যক্তিবর্গ সোল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন।"[৮]

তাহলে দেখা যাচ্ছে আঠেরো শতকে বাঙলায় চার্বাকমত বা সাধারণভাবে নাস্তিকমত সম্পর্কে বিদ্বান্‌দের ধারণাও কত আবছা ছিল, তার নমুনা হিসেবেই *বি-ত*-র যেটুকু গুরুত্ব। তার চেয়ে বেশি কিছু এর থেকে পাওয়া যাবে না।[৯]

---

১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী [১৯২৮], ৫৬ সংখ্যক শ্লোক। এ ছাড়া *বি-ত* থেকে আরও দুটি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে (৫১); *চা-শা-স*, ২০০ দ্র.।

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (১৩৩৭)। [১৩৬৩ ব], ১ : ১৪৮-৫৭। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, (১৯৮৪), ৩ : ৩৩-৪৫ দ্র.। হরপ্রসাদের বিবরণের একটি ভুল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধরে দিয়েছিলেন (১৩৩৭)। হরপ্রসাদ লিখেছিলেন, কালীকৃষ্ণ দেব *বি-ত* র 'একটী বাঙ্গালা তর্জমা' করেছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ জানান, তর্জমাটি ছিল ইংরিজিতে। *হরপ্রসাদ-রচনাবলী*-র সম্পাদকরাও সেটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আর একটি ভুলের কথা কেউ বলেন নি। চিরঞ্জীবের বাবা, 'শতাবধান' রামচন্দ্র ছিলেন নব্যনৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র। এই ভবানন্দ সম্পর্কে হরপ্রসাদ লিখেছিলেন, "... তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয় — অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন" (অন্যত্রও তিনি একই কথা লিখেছেন)। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কিন্তু দেখিয়েছেন, ভবানন্দ ছিলেন বৈষ্ণব, নন্দকিশোর-উপাসক ((১৩৫৮), ১ : ১৪৭)। ফলে, তান্ত্রিকদের সম্পর্কে হরপ্রসাদের মন্তব্যটি সাধারণভাবে সত্যি হলেও ভবানন্দ-র বেলায় সেটি খাটে না। চিরঞ্জীব প্রসঙ্গে আরও খবরের জন্যে দীনেশচন্দ্র, ২৮০ দ্র.। সুশীলকুমার দে-ও তাঁর বইতে ((১৯৬০), ১ : ২৭৯-৮০) চিরঞ্জীবকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া দাসগুপ্ত ও দে ((১৯৭৫), ১ : ৪৩৯), দেশপাণ্ডে, ১৭৩-৭৮, ৩২৮-২৯ দ্র.।

৩. *বি-ত* বহুবার ছাপা হয়েছে। রেভারেন্ড জেমস লং-এর সঙ্কলিত গ্রন্থাবলি (১৮৫২)-তে বইটির উল্লেখ আছে, যদিও লং ভুল করে এটিকে 'ব' (অর্থাৎ 'বেদ (বা) বেদান্ত') বিষয়ক বলে শনাক্ত করেছেন (যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ১:৮ দ্র.)। কালীকৃষ্ণ [দেব] বাহাদুর (১৮৩২) ও রাধামোহন সেন দাস (১৮২৪, ১৮২৫, ১৮৪৭) সম্পাদিত / অনূদিত সংস্করণের কথাও জানা যায় (ঐ, ৩৩, ৮৫)। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা-র গ্রন্থাগারে চারটি আলাদা সংস্করণ আছে। এখানে জানকীনাথ কাব্যতীর্থ-সম্পা. ও অনূ. সংস্করণ, ২২-২৩ থেকে উদ্ধৃত করা হলো। দরকার মতো কিছু ছেদচিহ্ন যোগ করা হয়েছে।

৪. *আইন-এ-আকবরী*, ২২৮। "Paradise they regard as a state in which man lives as he chooses, free from the control of another, and hell the state in which he lives subject to another's rule."

৫. *স-দ-শি*, ২।

৬. চাণক্য-র নামে প্রচলিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে:

> রোগী চিরপ্রবাসী পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী।
> যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ।।
> (রোগী, চিরপ্রবাসী, পরান্নভোজী জন।
> পরগৃহবাসী ধরে বৃথাই জীবন।।

নাহি যে বিশ্রাম তাঁর অতি অভাজন।
যতদিন বেঁচে থাকে সমান মরণ।।)

হরিচরণ দেবশর্ম্মা, ৩৯।

৭. "এবং যদি স্বর্গনরকাদিকঃ নাস্তি, তদা ভবান্ অপি কুতশ্ চৈত্যবন্দনাদৌ প্রবৃত্তঃ হিংসা তৌ বিভেতি? ..."। *বি-ত,* ৩১।

৮. "বৌদ্ধে পুনঃ শুদ্ধিবিহীনবুদ্ধাবারিস্মিতে বিস্মৃতবুদ্ধশাস্ত্রে...।" ঐ, ৩২।

৯. বইটির সুখ্যাতি করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন:

> দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে যে সমস্ত কথা আছে, তাহা দর্শনশাস্ত্রের চটি বইএর অপেক্ষা অনেক বেশী। চটি বইএ এক এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়— অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুইই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসাল ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। ... এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইএর এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্য পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না (১৫৭)।

কথাগুলো অংশমাত্র সত্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিজেও এর আগে বলেছেন, চিরঞ্জীবের নাস্তিক-ব্যাখ্যানে বৌদ্ধ-জৈন-চার্বাক সব একাকার হয়ে গেছে। গুপ্তিপাড়ার নব্যনৈয়ায়িক হিসেবে চিরঞ্জীব হয়তো বেদান্ত ইত্যাদি আরও কিছু আস্তিক দর্শন ও নানা ধর্মসম্প্রদায়ের কথা জানতেন। কিন্তু নাস্তিক দর্শনগুলি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই সেগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় না (এ ছাড়া দেশপাণ্ডে, ১৭৮ দ্র.)।

অধ্যায় ২৮

সর্বমতসংগ্রহ

সর্বমতসংগ্রহ বইটি মহামহোপাধ্যায় ত. গণপতি শাস্ত্রী ১৯১৮-য় ত্রিবান্দ্রম থেকে ছাপিয়ে বার করেন। দুঃখর বিষয়, এর লেখক, রচনাকাল ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। দুটি মাত্র পুঁথির ভিত্তিতে বইটি সম্পাদনা করা হয়েছিল। পুঁথিতে ভুলও ছিল বিস্তর। আপাতত তার থেকেই চার্বাকমতের অংশটি নিচে অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

> প্রত্যক্ষকেই যাঁরা একমাত্র প্রমাণ বলেন, সেই লোকায়ত-শাস্ত্রর প্রবর্তক চার্বাক-এর মতে, 'আমি মানুষ', 'আমি মোটা', 'আমি রোগা', এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও চৈতন্যগুণের আশ্রয় দেহই (একমাত্র) প্রমাতা (=জ্ঞাতা)। মাটি, জল, আগুন, ও বাতাস— এই লক্ষণযুক্ত চারটি তত্ত্ব (মূল বিষয়)। উঁচু নিচু দেহরূপে পরিণামের ফলেই এগুলি দেহের গঠন ও আবার বিনাশ লাভ করে। এই চারটিই প্রমেয় (= প্রমাণের, অর্থাৎ নিশ্চিত জ্ঞানের বিষয়)।
>
> অর্থ আর কামনা — পুরুষার্থ (= জীবনের লক্ষ্য) এই দুটি, ধর্ম নয়। অর্থ ও কামনার সঙ্গে যুক্ত অর্থশাস্ত্র গান্ধর্ববেদ (= সঙ্গীতশাস্ত্র) — এই দুটিই বেদ (অর্থাৎ, ঋক্, সাম ইত্যাদি বেদ নয়)। ধর্মর অভাবে কখনও অধর্ম হয় না। অতএব তার পরিণামে স্বর্গ-নরকও নেই। স্বর্গ-নরক না থাকলে দেহীর (= মানুষ ইত্যাদি প্রাণীর) নির্মাতা কোনো পরমেশ্বরও নেই। আর মরণই মোক্ষ (= মৃত্যুতেই মুক্তি, তারপরে আর কিছু নেই)। অর্থ- ও কাম-শাস্ত্রও প্রত্যক্ষমূলক বলে লোকয়তশাস্ত্রেরই অন্তর্গত।
>
> অন্নত্ব আছে বলে এই অন্ন খিদে মেটায়, গতকালের অন্ন যেমন মিটিয়েছিল— এই ধরণের অনুমানও লোকায়তশাস্ত্রর অন্তর্গত, যদিও এটি প্রত্যক্ষমূলক নয়। অভ্যুদয় (= পার্থিব সুখ) ও নিঃশ্রেয়স (= মোক্ষ)-রূপ ফল আর ধর্ম ও ব্রহ্ম-বিষয়ক বেদ অতীন্দ্রিয় (= ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে) বলেই অপ্রমাণ (= নিশ্চিত জ্ঞান নয়)— এই হলো সিদ্ধান্ত।

[এর পর কটি শ্লোকে বলা হয়েছে:]

> অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিপুণ্ড্র (= কপালে তিনটি রেখা আঁকা), ছাই দিয়ে গা

ঢেকে রাখা — বৃহস্পতি বলেছেন, এগুলো বুদ্ধিহীন ও পৌরুষহীন (=ক্লীব)-দের বাঁচার উপায়। ॥১॥

মুনি, ভণ্ড আর নিশাচর (= রাক্ষস) — এই তিনজনই বেদের কর্তা (=রচয়িতা)। ॥২ক-খ॥

(যজ্ঞ) - কর্তা, ক্রিয়া (= যজ্ঞ) ও জিনিসপত্র নষ্ট করে যদি যজমানের স্বর্গলাভ হতো, তবে দাবানলে পুড়ে গাছেরও প্রচুর ফল হতে পারত। ॥৩॥

প্রত্যক্ষ ইত্যাদি নিশ্চিত জ্ঞান দিয়ে প্রমাণিত বিষয়ের বিরুদ্ধ অর্থ যে প্রতিপাদন করে সেই বেদান্ত যদি শাস্ত্র হয়, তবে বৌদ্ধরা কী অপরাধ করল? ॥৪॥

তত্ত্বর দিক থেকে *স-ম-স*-য় কোনো নতুন কথা নেই ঠিকই। তবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো।

১. লোকায়তশাস্ত্রর প্রবর্তক হিসেবে গোড়ায় চার্বাক-এর নাম করা হয়েছে। খ্রি আট শতকের আগে লোকায়তিক দেহাত্মবাদী হিসেবে চার্বাক-এর নাম পাওয়া যায় না। সুতরাং *স-ম-স* নিশ্চয়ই তার পরের লেখা।

২. লোকায়তশাস্ত্র বলতে শুধু বিশেষ একটি দার্শনিক মত বোঝানো হয় নি। ইহলোকে মানুষের আচরণ নিয়ে যেসব শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় (অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, এমনকি সঙ্গীতশাস্ত্র), তার সব কিছুকেই লোকায়তশাস্ত্রর অন্তর্ভূত করা হয়েছে। কারণ : এসবই এই জগতের ব্যাপার।

৩. ধর্ম-অধর্ম, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর— সব অলৌকিক ব্যাপারকেই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে একটাই কারণে— এগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। অর্থাৎ যা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় না— তা-ই নাকচ। এ নিয়ে আর কোনো যুক্তিজাল ছড়ানো হয় নি।

৪. প্রত্যক্ষ-র দিকে এই ঝোঁক থাকলেও, অনুমানকে একেবারে বাতিল করা হয় নি। লৌকিক ক্ষেত্রে তাকে স্বীকার করা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি বেশ ভালো। অন্ন-র অন্নত্ব কী? খিদে মেটানোর ক্ষমতা। গতকাল খাওয়ার পর খিদে মিটেছিল— এর থেকে অনুমান করা যাবে : আজও তা খিদে মেটাবে। অর্থাৎ, লৌকিক অভিজ্ঞতা দিয়ে যা জানা যায় বা গেছে, তার ভিত্তিতে অনুমানে কোনো আপত্তি নেই। শুধু অ-লৌকিক ব্যাপারে অনুমানের বেলায়ই আপত্তি। যজ্ঞ করলে বা ব্রহ্মবিদ্যা চর্চা করলে ইহকালে সুখ ও পরকালে মোক্ষ লাভ হয়— অভিজ্ঞতায় এমন দেখা যায় না। সুতরাং অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে অনুমান অচল।

এই অংশটি খুবই দরকারি। চার্বাকমতের বিরুদ্ধে ভাববাদীদের প্রধান অভিযোগ হলো : প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনো উপায় এতে মানা হয় নি। কিন্তু পুরন্দর ('লোকায়তমতে গ্রন্থকার') ও জয়ন্তভট্ট বলেছিলেন : চার্বাকরা লৌকিক বিষয়ে অনুমানকে স্বীকার করে, অলৌকিক বিষয়ে করে না।[১] *স-ম-স*-য় তার সমর্থন পাওয়া গেল।

৫. শেষের শ্লোক কটি *স-ম-স*-কারের রচনা নয়। সায়ণ-মাধব যাকে আভাণক (= প্রবাদ) ও লোকগাথা (= প্রবচন) বলেছিলেন, এগুলি আসলে তা-ই।[২] প্রথম শ্লোকটি *প্র-চ*-তেও একই আকরে পাওয়া যায় (তৃতীয় ও চতুর্থটিও তা-ই)। এ ছাড়া *নৈ-চ* এবং *স-দ-স*-য়-ও পাঠভেদ সহ শ্লোকটি দেখা যাচ্ছে।[৩]

দ্বিতীয় শ্লোকের শুধু প্রথম চরণটি *স-ম-স*-য় পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয়, লিপিকরদের অসাবধানতার ফলে দ্বিতীয় চরণটি বাদ গেছে। *স-দ-স*-য় পুরো শ্লোকটাই আছে; তাই পরের চরণটি অনায়াসে পূরণ করে নেওয়া যায় ["জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি (অর্থহীন কথা) পণ্ডিতদের বচন বলে পরিচিত"]।[৪]

শেষ দুটি শ্লোক (৩ ও ৪ সংখ্যক) *প্র-চ* থেকে নেওয়া (যথাক্রমে ২।১৯ ও ২।৪)। ৩ সংখ্যক শ্লোকটি সেখানেও চার্বাক-এর উক্তি। কিন্তু পরের শ্লোকটি (২।৪) আছে অহঙ্কার বলে একটি চরিত্রর মুখে। এই অহঙ্কার কিন্তু চার্বাকপন্থী নয়, সে একজন মীমাংসক। তার উক্তিকে লোকায়তমতের সঙ্গে যুক্ত করা সমীচীন হয় নি।[৫]

এ ছাড়াও *প্র-চ*-য় মহামোহ-র মুখ দিয়ে কৃষ্ণমিশ্র যা বলিয়েছেন (২।১৮-র পরের গদ্য-সংলাপ) *স-ম-স*-কার তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। এর থেকে মনে হয়, দ্বিতীয়জনই কৃষ্ণমিশ্র-র কাছে ঋণী। তার মানে, *স-ম-স* শুধু যে আট শতকের পরে লেখা তা-ই নয়, সম্ভবত এগারো শতকেরও পরে এটি সঙ্কলিত হয়েছিল।

৬. সবচেয়ে বড় কথা হলো : জৈন আচার্য হেমচন্দ্র বা কৃষ্ণমিশ্র-র মতো *স-ম-স*-কার কোথাও চার্বাকমতকে যথেচ্ছ যৌনসম্ভোগ ও ইন্দ্রিয়সুখের মতবাদ বলে প্রচার করেন নি। একটি আপসহীন বস্তুবাদী দর্শন হিসেবেই তিনি লোকয়তমতের পরিচয় দিয়েছেন। ঈশ্বর, পরলোক, মোক্ষ ইত্যাদি অলৌকিক ধারণার বিরোধী, বস্তু থেকেই চেতনার উদ্ভব হয়— এই মতে বিশ্বাসী একটি অ-বৈদিক নাস্তিক দর্শন রূপেই তিনি লোকায়তশাস্ত্রকে দেখেছেন, তাকে হেয় করার চেষ্টা করেন নি।

শুধু জানতে ইচ্ছে হয় : সঙ্গীতশাস্ত্রও লোকায়তশাস্ত্র-র অন্তর্ভূত, লৌকিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান গ্রাহ্য— এই ধারণাগুলি তিনি কোথা থেকে পেলেন। কৃষ্ণমিশ্র প্রমুখ লোকায়ত-বিরোধীরা কোথাও এসব কথা লেখেন নি।

---

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭), ৬২, ৬৬-৬৭ দ্র.। এ ছাড়া এই বই-এর অধ্যায় ১৯ দ্র.।

২. *স-দ-স*, ২, পঙ্‌ক্তি ১৯ও ৫, পঙ্‌ক্তি ৪৯ দ্র.।

৩. *প্র-চ*, অঙ্ক ২, শ্লোক ২৬। *নৈ-চ*, ১৭।৩৯; *স-দ-স*, ১৩, শ্লোক ২। শঙ্করাচার্য-র নামে প্রচলিত *স-সি-স*, ২। ১৫-তেও শ্লোকটির পাঠান্তর দেখা যায়।

৪. *স-দ-স*, ১৪, শ্লোক ১০। জর্ফরী তুর্ফরী ইত্যাদি ঋক্‌টি আছে *ঋগ্বেদ*, ১০।১০৬।৬-এ (মূলে আছে : 'জর্ভরী'। গণপতি শাস্ত্রী যেভাবে শ্লোকগুলি সাজিয়েছেন, আমি তা অনুসরণ করি নি)।

৫. অহঙ্কার একজন প্রভাকরপন্থী মীমাংসক, তাই প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান, আপ্তবাক্য, উপমান ও অর্থাপত্তি (= এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের জ্ঞান)-কেও সত্যজ্ঞানের উপায় বলে সে স্বীকার করে। 'প্রত্যক্ষাদি' বলতে এই পাঁচটি প্রমাণকেই বোঝাবে। চার্বাক কিন্তু প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষপূর্বক (= লৌকিক) অনুমান ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানেন না। এই অর্থেই তাঁকে 'প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী' বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অহঙ্কার-এর উক্তি বেদান্ত ও বৌদ্ধ শূন্যবাদ- বা বিজ্ঞানবাদ-বিরোধী হলেও, তাকে চার্বাকমত বলা যায় না। প্রসঙ্গত, *ন্যা-সূ,* ১।১।৫-এও অনুমানকে বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষপূর্বক' (= যার আগে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে)। *চরক-সংহিতা* (১।১১। ২১-২২)-য়ও একই কথা পাওয়া যায়।

অধ্যায় ২৯

সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ

শঙ্করাচার্য-র নামে *সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ* বলে, একটি বই পাওয়া যায়।[১] শঙ্কর কেন সব দর্শনের (জৈন-বৌদ্ধ সমেত) এমন সারসঙ্কলন তৈরি করবেন তা বোঝা যায় না। এটি অন্য কারও কাজ বলেই মনে হয়। বইটিতে এগারোটি নাস্তিক (বেদ-বিরোধী) ও আস্তিক (বেদ-অনুগামী) দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[২] প্রথমেই (অধ্যায় ২) আছে লোকায়ত দর্শনের কথা। নিচে তার অনুবাদ দেওয়া হলো :

> লোকায়তিক মতে, তত্ত্ব [= মূল বিষয়] হলো চারটি ভূত — মাটি, জল, আগুন ও বাতাস; এ ছাড়া আর কিছু নয়। ১॥
>
> যা প্রত্যক্ষ করা যায় তারই অস্তিত্ব আছে। যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। যাঁরা অদৃষ্টবাদী তাঁরাও অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলেন না। ২॥
>
> যা কখনও দেখা যায়, কখনও দেখা যায় না, কী করে তাকে অদৃষ্ট বলা যাবে? যা সর্বদাই অদৃষ্ট থাকে তা খরগোশের শিং ইত্যাদির মতো (= অবাস্তব), সেটি যে আছে কী করে তা বলা যাবে? ৩॥
>
> সুখ ও দুঃখর হেতু ধর্ম-অধর্মর কথা এখানে (= ইহলোকে) কল্পনা করা ঠিক নয়। স্বভাবের কারণেই লোকে সুখী ও দুঃখী হয়, অন্য কারণে নয়। ৪॥ [অর্থাৎ, ধর্ম-আচরণ করলে সুখ পাওয়া যায়, অধর্ম করলে দুঃখ— এই ধারণার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই]
>
> কে ময়ূরকে রাঙিয়েছে, কে কোকিলকে দিয়ে কূজন করায়? স্বভাব ছাড়া এখানে আর কোনো কারণ নেই। ৫॥
>
> আমি মোটা, আমি তরুণ, বৃদ্ধ, যুবক ইত্যাদি বিশেষণ দিয়ে যে দেহকে বিশিষ্ট করা হয়, সেই দেহই আত্মা : তার থেকে আলাদা কিছু নেই। ৬॥
>
> জড় (= নিষ্প্রাণ) ভূতগুলির (= মাটি, জল, আগুন ও বাতাস) বিকারেই (= নানা পরিবর্তনে) চৈতন্য দেখা যায়। যেমন, পান, সুপুরি ও চুনের মিলনে দেখা দেয় লাল রঙ (= পিচ)। ৭॥

এই লোকের (= জগতের) অতিরিক্ত অন্য স্বর্গ নেই, নরকও নেই। শিব-লোক ইত্যাদি কল্পনা করে অন্য মূঢ় প্রতারকরা। ৮॥

স্বর্গের অনুভূতি হলো মিষ্টি, ষোড়শী বৌ, সূক্ষ্ম কাপড়, সুগন্ধি মালা, চন্দন ইত্যাদির উপভোগ। ৯॥

নরকের অনুভূতি হলো শত্রুর অস্ত্র, ব্যাধি ইত্যাদির উপদ্রব। মোক্ষ হলো মৃত্যু আর তা হলো প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়া। ১০॥

অতএব তার (মোক্ষ-র) জন্যে পণ্ডিত কোনো চেষ্টা করবেন না। তপস্যা, উপবাস ইত্যাদি করে বোকা লোকরাই শুকিয়ে যায়। ১১॥

পাতিব্রত্য (= স্বামীর সেবাই স্ত্রীর একমাত্র ব্রত), ইত্যাদি নিয়ম বুদ্ধিমান দুর্বলরাই তৈরি করেছেন। সোনা, ভূমিদান ইত্যাদি, আর আমন্ত্রণ ও আহারের নিয়ম করেছেন গরিব লোকেরা, যাঁদের পেট খিদেয় দুর্বল। ১২-১/২॥ [অর্থাৎ, ভালো-মন্দ খাওয়ার জন্যেই ব্রাহ্মণরা এসব বিধান দিয়েছেন]।

দেবালয়, জলসত্র, কূপ, আরাম (= বাগান) ইত্যাদি কাজের সুখ্যাতি পথিকরা নিত্য করে, আর কেউ করে না। ১৩-১/২॥ [এগুলি করে কোনো অলৌকিক পুণ্য হয় না]।

অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, তিন দণ্ড, ছাই দিয়ে গা ঢাকা— বৃহস্পতি বলেছেন: (এসব) বুদ্ধি ও পৌরুষহীনদের জীবিকা। ১৪-১/২॥

কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি (= রাষ্ট্র পরিচালনা) ইত্যাদি বাস্তব উপায় দিয়ে বুদ্ধিমান লোকে ভোগ অনুভব করেন— এই দেখে (অন্য) বুদ্ধিমান লোকও (তা-ই করবেন)। ১৫-১/২॥

স-সি-স-র এই বিবরণ থেকে লোকায়তদর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত কথাগুলোই আবার জানা যায়। যেমন,

১. চারটি ভূতই পৃথিবীর মূল বিষয়, তার বাইরে আত্মা, পরলোক ইত্যাদি নেই।

২. প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় (যেমন, অদৃষ্ট অর্থাৎ নিয়তি) তার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

৩. ঈশ্বর বা কোনো অলৌকিক শক্তি (যেমন, কর্মফল)-র বদলে স্বভাব বা প্রকৃতিকেই সুখ-দুঃখ ও প্রাণীর রূপভেদের কারণ বলে মনে করা হয়।

৪. দেহ ছাড়া অশরীরী আত্মা বলে কিছু নেই। তবে জীবিত প্রাণী ছাড়া অন্যান্য বস্তুতে চেতনা থাকে না কেন? সেখানেই আসে চারটি ভূতের এক বিশেষ সমবায়ের কথা। তার জন্যে লোকায়তিকরা অন্যত্র মদশক্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যে সব উপাদান দিয়ে মদ তৈরি হয় তার কোনোটির মধ্যেই মত্ত করে তোলার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এক ধরণের মিশ্রণে সে-ক্ষমতা দেখা যায়। *স-সি-স*-য় বলা হয়েছে পানের পিচের কথা।[৩]

৫. স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, ধর্মীয় আচার মেনে চলা— এর সবই অবাস্তব ও উদ্ভট বলে নাকচ করা হয়েছে।
৬. একইভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে ধর্মশাস্ত্রকার ও পুরোহিতদের। সৎকর্ম করে ইহলোকে পথিকদের প্রশংসা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনো অলৌকিক পুণ্য অর্জন করা যায় না।

উনশেষ শ্লোকটি অন্যান্য সূত্রেও পাওয়া যায়।[৪] এটি আদতে কার রচনা তা বলা সম্ভব নয়। আর শেষ শ্লোকটি পড়ে মনে হয়, লেখক এখানে বৃহস্পতির *অর্থশাস্ত্র*-র কথা ভাবছিলেন। সে বইটি অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নি।[৫] তবে *কৌ-অ*-য় বলা হয়েছে : বার্হস্পত্য (= বৃহস্পতির অনুসারী অর্থশাস্ত্রবিদ)-দের মতে বিদ্যা দু রকমের : বার্তা (= কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য) ও দণ্ডনীতি (১।১।৪)।[৬] লোকায়তমত বলতে বার্হস্পত্য নামটিও সম্ভবত পুরাণের সূত্রে চালু হয়েছে। লেখক এখানে অর্থশাস্ত্রকার বৃহস্পতি আর দার্শনিক বৃহস্পতি-কে একই লোক বলেই ধরে নিয়েছেন, যদিও তার কোনো প্রমাণ নেই।

সব মিলিয়ে একটা সন্দেহ থেকেই যায় : *স-সি-স*-র লেখক বোধহয় মূল (এখনও পর্যন্ত লুপ্ত) *চার্বাকসূত্র* বইটি কখনোই পড়েন নি। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় দেহাত্মবাদ, ভূতচৈতন্যবাদ, স্বভাববাদ ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব ধারণা চালু ছিল, সেগুলিকেই তিনি ছন্দোবদ্ধ রূপে হাজির করেছেন। স্বভাববাদের ধারণাকেও এখানে লোকায়ত-র অংশ হিসেবেই দেখানো হয়।[৭] কিন্তু আদতে এ দুটি মত এক ছিল না। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*-এ পাঁচটি নিরীশ্বরবাদী মতের কথা আছে : কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (= আকস্মিকতা, অহেতুবাদ), ও ভূতানি (= চার বা পাঁচ ভূত)।[৮] শেষেরটির সঙ্গেই লোকায়ত-র মিল থাকার কথা। কিন্তু পরে, কোনো এক সময়ে, স্বভাববাদও লোকায়ত-র অন্তর্ভূত হয়ে যায়।[৯]

স-সি-স-য় লোকায়ত-মতের পরেই এসেছে জৈনদের কথা (সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-য় অবশ্য চার্বাক-এর পরে এসেছিল বৌদ্ধদর্শন)। জৈনমত উপস্থিত করার সময়ে প্রথমেই তাঁদের পক্ষ থেকে চার্বাকমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানেও স্বভাববাদ বিষয়ে একটি শ্লোক দেখা যায়। সেটি অন্য ভাষায় ২।৫ সংখ্যক শ্লোকটির পুনরুক্তি।

> আগুনের উষ্ণতা, জলের শীতলতা, কোকিলের মধুর স্বর।
> এই ধরণের ঘটনা স্বভাব (-এর ফলেই ঘটে), আর কিছু নয়। (৩।২)

এটিকে কিন্তু খণ্ডন করা হয় নি। অন্যদিকে, দৃষ্ট-অদৃষ্ট-র ব্যাপারে জৈনমতে বলা হচ্ছে : যা অদৃষ্ট (= দেখা যায় নি) তা আগম (= জৈন শাস্ত্র) দিয়ে সিদ্ধ হয় (৩।

৪)। তেমনি *স-সি-স*-র বিবরণে জৈনমত অনুযায়ী প্রত্যক্ষ ছাড়া অনুমান ও আগমকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে (৩।৬)। লোকায়তিকদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তোমরা নিশ্চয়ই ধোঁয়া দেখে অদেখা আগুনের অনুমান স্বীকার কর, সুতরাং অনুমানকে অগ্রাহ্য করবে কী করে (৩।৫)।

লোকায়তিকদের বিরুদ্ধে এটি একটি চালু অভিযোগ। কিন্তু কমলশীল পরিষ্কার বলেছিলেন: লৌকিক বিষয়ে অনুমান-প্রমাণে লোকায়তিকদের কোনো আপত্তি নেই, অলৌকিক বিষয়ে তাঁরা অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে মানতে রাজি নন।[১০] কমলশীল লোকায়তমতের বিরোধীই ছিলেন। তবু, অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনবিদরা একই ভঙ্গিতে লোকায়তিকদের সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষৈকবাদী (= একমাত্র প্রত্যক্ষ-কেই যাঁরা প্রমাণ বলে মানেন) হিসেবে উপস্থিত করেন ও তার খণ্ডনে একই কথা বলেন।[১১]

অন্যদিকে, লোকায়ত প্রসঙ্গে আর একটি দিক লক্ষ্য করার মতো। ২।১১-য় তপস্যা, উপবাস ইত্যাদিকে নিষ্ফল বলা হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে যথেষ্ট আহার-বিহারের পরামর্শ দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, অন্যান্য সূত্রে যেমন উদ্দাম ইহসুখবাদকে লোকায়তমত বলে বর্ণনা করা হয়, এখানে তা বলা নেই।

প্রমাণ হিসেবে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম— এই তিনটির উল্লেখ থেকে আরও একটি কথা বোঝা যায়: *স-সি-স* বইটি খ্রি আট-শতকের পরে লেখা। উমাস্বাতি-র আগে জৈনরা প্রমাণ-এর কথা বলতেন না। অকলঙ্ক-ই প্রথম ছটি প্রমাণ-এর নাম করেন: প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা ও তর্ক।[১২] শঙ্করাচার্য-র সমকালীন এই দার্শনিক তিনটি মাত্র প্রমাণ-এর তালিকা দেন নি। সুতরাং *স-সি-স* শঙ্কর-এর লেখা হতে পারে না।[১৩]

---

১. এ. রঙ্গাচার্য (সম্পা.), ১৯০৯। রাধাকৃষ্ণ ও মুর-সম্পা. (১৯৫৭)-য় এটি শঙ্করের লেখা বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা ছেপেছেন প্রেমসুন্দর বসুর ইংরিজি অনুবাদটি (কলকাতা, ১৯২৯)।

২. নাস্তিক দর্শন— লোকায়তিক, আর্হত (জৈন), বৌদ্ধ;
আস্তিক দর্শন— বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, প্রভাকর (মীমাংসা), ভট্টাচার্য (কুমারিল মীমাংসা), সাংখ্য, পতঞ্জলি (যোগ), বেদব্যাস, বেদান্ত।

৩. *শা-ভা,* ৩।৩।৫৩; *ত-স,* শ্লোক ১৮৫৯; *য-দ-স,* শ্লোক ৮৪; *ব্র-ভা,* ৩।৩।৫৩ ইত্যাদি। *য-তি-চ*-তে দুটি দৃষ্টান্তই একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। উত্তরখণ্ড, ২৫৩।

৪. যথা, *প্র-চ,* ২।২৬; *নৈ-চ,* ১৭।৩৯; *স-দ-স,* অধ্যায় ১; *মহাভারত,* শান্তিপর্ব, ২১৮। ২৫ (প্রচলিত সং.) প্রসঙ্গে নীলকণ্ঠ; *অ-ব্র-সি* দ্বিতীয় মুদ্গর প্রহারঃ, ২ চার্বাকখণ্ডন, ১০০।

৫. টমাস-সম্পা. *বার্হস্পত্য সূত্রম্ অর্থাৎ বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রম্* বইটি অনেক পরবর্তী কালের রচনা, তার সঙ্গে কৌটিল্যর বিবরণ মেলেও না। *কৌ-অ,* কঙ্গলে সম্পা., ২ : ৬ টীকা ৪ দ্র.।

৬. *কৌ-অ,* ১ : ৪।

৭. *বি-পু,* ৩।১৭-১৮; *প-পু,* সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ১৩; ঐ, উত্তরখণ্ড, অধ্যায় ২৬৩।৬৯-এ লোকায়তমতের সঙ্গে (নাম করে বা না-করে) বৃহস্পতিকে যুক্ত করা হয়েছে।

৮. *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্,* ১।২।

৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী (১৯৮২), ১০৬-১১৪ দ্র.।

১০. *ত-স-প,* শ্লোক ১৪৮১ প্রসঙ্গে।

১১. *ত-বো-বি,* ৭০ ও *প্র-চ,* অঙ্ক ২-এ বার্হস্পত্যসূত্র হিসেবে একটি বচন উদ্ধৃত হয়েছে : প্রত্যক্ষ-ই একমাত্র প্রমাণ। *ত-বো-বি-*তে আরও বলা হয়েছে, বার্হস্পত্যমতে অনুমান কোনো প্রমাণ-ই নয় (ঐ)। এই ভিত্তিতেই *ন্যা-ম,* আহ্নিক ২, ২৬; *অ-ব্য-দ্বা,* শ্লোক ২০; *ভামতী, ব্রহ্মসূত্র* ৩।৩।৫৪ প্রসঙ্গে অনুমানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করে চার্বাকমত খণ্ডনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু চার্বাকমতে যে সব অনুমানকে অস্বীকার করা হয় নি সে-কথাও *ন্যা-ম-*য় অন্যত্র বলা হয়েছে (আহ্নিক ২, ১১৩)।

১২. দীক্ষিত (১৯৭১), ১৪৬; (১৯৭৫), ৪৫ দ্র.।

১৩. কৃষ্ণমূর্তি শর্মা (১৯৩০-৩১), ৯৩-৯৬-এ অন্য কারণেও বলা হয়েছে, বইটি কোনো 'শঙ্কর-উত্তর অদ্বৈতবাদী'-র লেখা।

স-বে-সি-সা নামে একটি বইও শঙ্করের নামে চলে। কিন্তু ভি. রাঘবন প্রমুখ বিদ্বান্ মনে করেন : এটিও ভুল করে শঙ্করের নামে আরোপ করা হয়েছে। এই বই-এর অধ্যায় ৩০ দ্র.।

অধ্যায় ৩০

সর্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ

শঙ্করাচার্য-র নামে যত বই প্রচলিত আছে, তার একটি হলো *সর্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ*। বইটির ভাষা-ভঙ্গি ইত্যাদি দেখে সকলে এটিকে শঙ্করের লেখা বলে মনে করেন না। তবু শৃঙ্গেরী মঠ থেকে তাঁর নামেই বইটি বেরিয়েছিল। মৈসূর থেকেও অন্য একটি সংস্করণ বেরয়। বাঙলায় বইটির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম (এর্ণাকুলাম, কেরল) থেকেও স্বামী তত্ত্বানন্দ *The Quintessence of Vedanta* নামে এর ইংরিজি তর্জমা করেছেন (১৯৬০, ১৯৭০)। এঁরা অবশ্য সকলেই বইটিকে শঙ্করের রচনা বলেই মেনে নেন। তবে অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী জানাচ্ছেন, "এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রন্থখানির প্রচার ছিল না, কেহই এ গ্রন্থ বিষয়ে সংবাদ রাখেন না...।"[১]

যিনিই বইটি লিখে থাকুন, নিঃসন্দেহে তিনি অদ্বৈত বৈদান্তিক ছিলেন। নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করলেও, নিজের মত প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দেহাত্মবাদ প্রসঙ্গে এখানে একটি অধ্যায় আছে। তার জন্যেই এটি নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি। আত্মা বলে আলাদা কিছু নেই— জীবিত মানুষের দেহে যে চেতনা (বা চৈতন্য) দেখা যায়, তাকেই আত্মা বলে— এই মতকে ভূত-চৈতন্যবাদ-ও বলা হয়। তবে, এসব নাম চার্বাকদের নিজেদেরই দেওয়া, না তাঁদের বিরোধীরা দিয়েছেন তা জানা যায় না।

স-বে-সি-সা-য় দেহাত্মবাদকে কীভাবে হাজির করা হয়েছে এবার তা দেখা যাক। প্রথমেই আটটি শ্লোকে (৫২৭-৩৪) আত্মা সম্পর্কে একটি মত খণ্ডন করা হয়েছে। সেটির নাম পুত্রাত্মবাদ। এই মতে, পুত্র-ই আত্মা। নিজের ছেলে বাড়লে মানুষও বাড়ে, তার নাশ হলে মানুষেরও নাশ হয়। একটি প্রদীপ থেকে যেমন অন্য প্রদীপ জ্বলে, অঙ্কুরে যেমন বীজের গুণ দেখা যায়, তেমনি আত্মা বলতে পুত্রকেই বোঝায়।

এই উদ্ভট মতের পরে, দুটি মাত্র শ্লোকে দেহাত্মবাদীদের বক্তব্য রাখা হয়েছে

এইভাবে:

> দেহই আমি (অহংপদবাচ্য) এরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ষ নিশ্চয় আছে, এই পুরুষ [দেহ] অন্নের সারাংশের বিকারভূত, ইহা শ্রুতি [*তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ২।১।১] বলিয়া থাকেন। ৫৩৫।।
>
> শ্রুতি এই শরীরকে পুরুষ বলিয়া থাকেন [ঐ, ২।৩।৪], অতএব পুরুষই আত্মা, এই দৃশ্যমান শরীরই আত্মা— এই চার্ব্বাক কর্তৃক অবধারিত হইয়াছে। ৫৩৬।।

এখানে কয়েকটি জিনিস দেখার আছে। প্রথম কথা, লেখক এখানে দুটি দিক থেকে দেহাত্মবাদকে উপস্থিত করেছেন: ১. বেদ-এ কী আছে, ২. চার্বাক কী বলেছেন। দৃশ্যমান শরীরই আত্মা— এ কথা চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে। কিন্তু তার সপক্ষে শ্রুতির বচন উদ্ধৃত করা চার্বাকদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তাঁরা বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাস করতেন না। শুধু পুত্রাত্মবাদ কেন, আত্মা বলে কিছুই তাঁরা মানতেন না।

ছেলেকে যে শ্রুতিতেও আত্মা বলা হয়েছে (*কৌষীতকি উপনিষদ্*, ২।১১)— *স-বে-সি-সা*-র লেখকও তা অস্বীকার করেন নি।[২] তিনি বোঝাতে চেয়েছেন : এটি নেহাতই উপচার, অর্থাৎ আরোপ করা গৌণ প্রয়োগ। সেটি তার মুখ্যা বৃত্তি বা অভিধা নয়, অর্থাৎ পুত্র মানেই আত্মা নয় (শ্লোক ৫৩৩)।

এ ধরণের যুক্তি কোনো চার্বাকপন্থী দেবেন না। বরং যিনি প্রতিটি বেদবাক্যকেই অভ্রান্ত বলে মনে করেন, বেদ-এর মর্যাদা রাখার জন্যে তাঁকেই এমন ব্যাখ্যা দিতে হবে।

দ্বিতীয় কথা, বইটির লেখক ছিলেন বৈদান্তিক। আত্মা সম্পর্কে তাঁর ধারণা এই যে, কোনো কিছুর সঙ্গেই আত্মাকে এক করা যায় না। তা সবকিছুর ঊর্ধ্বে, বাক্ মন দেহ ইন্দ্রিয় ইত্যাদির অতীত। এর জন্যেই পরপর কয়েকটি মত খণ্ডন করে তিনি নিজের মত স্থাপন করার দিকে এগিয়েছিলেন। সেরকম কয়েকটি খণ্ডনীয় মত হলো : পুত্রই আত্মা, দেহই আত্মা, ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইত্যাদি।[৩] প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরের মত দিয়ে আগের মত খারিজ করা হয়েছে। যেমন, আত্মা হলো অজ্ঞান— এটি নাকি প্রভাকরপন্থী মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদের মত। আলোচ্য বইটিতে তাঁরা প্রথমে 'বুদ্ধিই আত্মা'— এই তথাকথিত বৌদ্ধমত খণ্ডন করেছেন (শ্লোক ৫৫৮-৬৫)। এরপরে অজ্ঞানাত্মবাদকে খণ্ডন করা হয়েছে জ্ঞানাজ্ঞানাত্মবাদ (= জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই আত্মা) দিয়ে (শ্লোক ৫৬৬-৬৮)। এটিকে বলা হয়েছে ভাট্টমত, অর্থাৎ কুমারিলপন্থী মীমাংসকদের মত।

এইভাবে এক মত দিয়ে আগের মত খণ্ডন করতে করতে লেখক পৌঁছেছেন শূন্যবাদ-এ। সেটিকে খণ্ডন করে তিনি এসেছেন 'তৎ ত্বম্ অসি' [তুমি-ই সেই (আত্মা)] ইত্যাদির আলোচনায়।

তাহলে *স-বে-সি-সা* থেকে দেহাত্মবাদের নামমাত্র পরিচয় পাওয়া গেল : দেহই আত্মা। এটিও আদতে অতিসরলীকরণ। চার্বাকরা বলতেন, আগুন বাতাস মাটি ও জল দিয়ে গড়া দেহে ঐ ভূতগুলির এক বিশেষ পরিণামের ফলে চেতনা দেখা যায়। আত্মা বিষয়ে অন্যান্য মতকে বইটির লেখক অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন (সেগুলিও যথাযথ কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না)। তবে আত্মাকে যাঁরা ইন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন বলে শনাক্ত করেন তাঁদের তিনি চার্বাক / লোকায়তিক বলেন নি। খ্রি ষোলো শতকে সদানন্দ যতি বা যোগীন্দ্র কিন্তু এই তিনটি মতকেও চার্বাকমত বলে উপস্থিত করেছেন।[৪] সদানন্দ কাশ্মীরক-এর মতো তিনি কোনো বার্হস্পত্য সূত্র উদ্ধৃত করেন নি।[৫] কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন— চারটিকেই আত্মা বলার সপক্ষে তিনি বিভিন্ন উপনিষদ্ থেকেই বচন উদ্ধৃত করেছেন (বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, প্রভাকর ও কুমারিলপন্থী মীমাংসক, আর নৈয়ায়িকদের প্রসঙ্গেও উপনিষদের বচনই উদ্ধৃত হয়েছে)। সবশেষে সদানন্দ যোগীন্দ্র যথারীতি আত্মা সম্পর্কে বৈদান্তিক ধারণাই হাজির করেন : আত্মা হলো নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব।

আত্মা বিষয়ে *স-বে-সি-সা*-র সঙ্গে *বেদান্তসার* ও *অ-ব্র-সি*-র উপস্থাপনার মিলটুকু লক্ষ্য করার মতো। মনে হয়, শঙ্করের *শা-ভা* (১।১।১ প্রসঙ্গে) থেকেই এই ধারার সূচনা।[৬] তবে সদানন্দ যোগীন্দ্র যে চার রকমের চার্বাকপন্থী কল্পনা করেছিলেন, *স-বে-সি-সা*-র লেখক সে-ভুল করেন নি।[৭]

এর থেকে একটি ব্যাপার বোঝা যায়। কী *স-বে-সি-সা*, আর কী *বে-সা*— কোনোটির লেখকই মূল *চার্বাকসূত্র* পড়েন নি। গুরুশিষ্য পরম্পরায় বৈদান্তিকদের মধ্যে চার্বাক/লোকায়ত সম্বন্ধে যে সব ধারণা চালু ছিল, সেগুলোই তাঁরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাই কোনোটির ব্যাখ্যানই নির্ভরযোগ্য নয়।

পরিশিষ্ট

(সদানন্দ-র *বেদান্তসার* থেকে)

১. স্থূলদেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মতে আত্মা

"সেই এই পুরুষ অন্নরসের বিকার" ইত্যাদি শ্রুতি [*তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ২।১।১]; প্রজ্বলিত গৃহ হইতে নিজের পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজে বাহির হইয়া যায় ইহা দেখা যায় এবং 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে বলিয়া, 'স্থূল শরীরই আত্মা' এই কথা চার্ব্বাক বলে। ৯৮।।

২. ইন্দ্রিয়বাদী চার্ব্বাকের মতে আত্মা

অপর চার্ব্বাক বলেন— "সেই প্রাণাদি, পিতা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিল", ইত্যাদি শ্রুতি [*ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৫।১।৭] প্রমাণবশত ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর চলে

না বলিয়া এবং 'আমি কাণা', 'আমি বধির' ইত্যাদি অনুভববশত ইন্দ্রিয়ই আত্মা। ৯৯।।

৩. প্রাণাত্মবাদী চার্ব্বাকের মতে আত্মা

অপর চার্ব্বাক বলেন— "অন্য অন্তর আত্মা প্রাণময়", ইত্যাদি শ্রুতি [*তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ২।২।১] প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয় চলে না বলিয়া এবং 'আমি ক্ষুধার্ত', 'আমি তৃষ্ণার্ত' ইত্যাদি অনুভববশত প্রাণই আত্মা। ১০০।।

৪. মন-আত্মবাদী চার্ব্বাকের মতে আত্মা

আর এক চার্ব্বাক বলেন— "মনোময়, অন্য একটি অন্তর আত্মা", ইত্যাদি শ্রুতির [*তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ২।৩।১] বলে, মন সুষুপ্ত হইলে প্রাণাদির অভাববশত এবং 'আমি সঙ্কল্পবান্, 'আমি বিকল্পবান' ইত্যাদি অনুভববশত 'মনই আত্মা'। ১০১॥

---

১. *স-বে-সি-সা*, ১৭৩৫ (তথৈব; এটি অবশ্যই ১৮৩৫ শক হবে। শক ১৭৩৫ (= ১৮১৩ খ্রি)-এ অনুবাদকের জন্মই হয় নি), ১, [ষোলো]। পরে এখান থেকেই প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর্ণাকুলাম সংস্করণের সঙ্গে সর্বত্র শ্লোকসংখ্যা মিলবে না।

২. *কৌষীতকি উপনিষদ্*, ২।১১-র প্রচলিত পাঠ হলো : আত্মা ত্বং পুত্র মা'বিথ (*অষ্টাদশ-উপনিষদঃ*, ৩১০)। এটির পাঠভেদ আছে : আত্মা বৈ পুত্রনামাসি (ঐ, ৩১১ টী. ২)। *শতপথ ব্রাহ্মণ*, কাণ্বশাখা, ১৪।৯।৪।৯ ও মাধ্যন্দিন শাখা, ১৪।৯।৪।২০ তুলনীয়। সদানন্দ যতি ভিন্ন পাঠটিই উদ্ধৃত করছেন। পুত্রাত্মবাদ প্রসঙ্গে *বে-সা*-র টীকাকার রামতীর্থ যতি *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*-এর একটি বাক্যর (১।৪।৮) উল্লেখ করেন ((১৩৭৫), ১৪৭)।

৩. আত্মা সম্পর্কে নটি বিপক্ষ মত হাজির করা হয়েছে : পুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, জ্ঞানাজ্ঞান ও শূন্যবাদ (শ্লোক ৫২৩-৫৮৬)।

৪. *বে-সা* (১৩৭৫), ১৪৬-১৫৫ দ্র.। এখানেও আত্মা সম্পর্কে নটি মতের উল্লেখ আছে। পরিশিষ্ট-য় চার্বাকদের নামে যে-চারটি মতের কথা বলা হয়েছে তার অনুবাদ এই সংস্করণ থেকেই দেওয়া হলো।

৫. *অ-ব্র-সি* (দ এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-র বিব্লিওথেকা ইন্ডিয়া-য় ১৮৯০ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ), ৯৯ দ্র.। (এই অধ্যায়টির নাম 'দ্বিতীয় মুদ্গর প্রহারঃ', চার্বাক খণ্ডন)। উদ্ধৃত সূত্র তিনটি হলো : চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ (=আত্মা), কাম (=সুখ)-ই একমাত্র পুরুষার্থ (=লক্ষ্য), মৃত্যু-ই অপবর্গ (=মুক্তি)।

সদানন্দ কাশ্মীরক-ও আত্মা বিষয়ে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মনআত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদের উল্লেখ করেছেন (ঐ, ১০১-০২)। কিন্তু তিনি কোনো সম্প্রদায়ের নাম করেন নি, 'কেউ কেউ', 'অপরে', 'অন্যে' বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। সদানন্দ যতি-ই এদের চার রকমের চার্বাক বলে ধরে নেন।

৬. এই বই-এর অধ্যায় ৬ দ্র.।

৭. এই ভুল কোলব্রুক-কেও বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। *বেদান্তসার* ও রামতীর্থ-র টীকা পড়ে তিনি অনুমান করেন : চার্বাকদেরই চারটি আলাদা সম্প্রদায় ছিল, যাঁরা যথাক্রমে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনকে আত্মা বলে মনে করতেন। কোলব্রুক (১৮৩৭), ১ : ৪০৪ দ্র.।

অধ্যায় ৩১

'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' — কথাটা কার?

হেমচন্দ্র কানুনগো ছিলেন বাঙলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী। তিনি একবার লিখেছিলেন :

> গত মহাযুদ্ধের [প্রথম মহাযুদ্ধ, ১৯১৪-১৮] পূর্বে সোশিয়ালিজম বলতে জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যে কি, তার খোঁজ আমাদের দেশে খুব কম লোকই রাখত। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই এক কথাতেই যেমন সমস্ত চার্বাক দর্শনের বিশদ তাৎপর্য আমাদের বুঝিয়ে রাখা হয়েছে, সেই রকম 'সমস্ত লোকের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেবার' নাম যে সোশিয়ালিজম, সেই ধারণাই আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে তখন প্রায় বদ্ধমূল হয়েছিল।[১]

চার্বাক সম্পর্কে এখনও অনেকেরই ধারণা ঐরকমই। লোকায়ত দর্শন মানে যেন — খাও দাও মজা লোটো; একটাই তো জীবন।

ধার করে ঘি খাওয়া-র কথাটা এল কোথা থেকে? সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায়ে এই শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায় :

> যাবজ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্ *ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।*
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[২]

> যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; ধার করে ঘি খাবে।
> ছাই-হয়ে-যাওয়া দেহ কোথায় (বা কোথা থেকে) আবার ফিরে আসে?

সায়ণ-মাধব বলেছেন : কথাটা বৃহস্পতির। কে এই বৃহস্পতি? কবে কোথায় তিনি এসব বলেছিলেন? কেউ তা জানে না। সায়ণ-মাধব নিজেই কিন্তু *স-দ-স*-র গোড়ায় এই শ্লোক একটু অন্যভাবে উদ্ধৃত করেছেন। সেটি এইরকম :

> যাবজ্ জীবং সুখং জীবেন্ *নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ।*
> ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[৩]

এখানে সায়ণ-মাধব কিন্তু বৃহস্পতির নাম করেন নি, বলেছেন : এটি একটি *লোকগাথা*, অর্থাৎ জনসমাজে প্রচলিত উক্তি। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশটি। এখানে আর ফিচলেমি করে *জীবেৎ*-এর সঙ্গে মিল দিয়ে *পিবেৎ*-এর কথা আসে নি, বরং একটি দার্শনিক মতের কথা বলা হয়েছে : মৃত্যুর নাগালের বাইরে কিছুই নেই।

এমন সন্দেহ করার কারণ আছে যে, লোকগাথাটির পাঠই প্রামাণিক; সায়ণ-মাধব সেটি দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করার সময়ে ইচ্ছে করেই বিকৃত করেছিলেন। তার কারণটা দেখা যাক।

শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায় *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ* নামে একটি উপপুরাণে। পুরাণের সন তারিখ ঠিক করা প্রায় অসম্ভব। তবে রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা এটিকে খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকের রচনা বলে শনাক্ত করেছেন।[৪] তার মানে, *স-দ-স*-র প্রায় হাজার বছর আগে *বি-ধ-ম-পু* রচনা করা হয়েছিল। সেখানেই পাওয়া যাচ্ছে :

> মুগ্ধা এবং প্রতার্যন্তে ধূর্তৈর্ ধন-জিহীর্ষয়া।
> যাবজ্ জীবং সুখং জীবেন্ নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরম্।।
> ভস্মীভূতস্য শান্তস্য পুনরাগমনং কুতঃ।
> নাস্তি দত্তং হুতং চেষ্টং ন দেবা ঋষয়ো ন চ।।[৫]
>
> ধন হরণ করার ইচ্ছায় ধূর্তরা এই ভাবে মোহিত লোকদের প্রতারণা করে। যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচবে; মৃত্যুর অগোচর কিছুই নেই। ছাই-হয়ে-যাওয়া প্রাণহীন দেহ কোথায় (বা কোথা থেকে) আবার ফিরে আসে? দান, আহুতি, আচার, দেবতা, ঋষি কিছুই নেই।

এই হলো শ্লোকটির আসল পাঠ। *ত-স-প-য়* এর দ্বিতীয় চরণটি (ভস্মীভূতস্য শান্তস্য, ইত্যাদি) উদ্ধৃত হয়েছে। তবে *ন্যা-ম*-তেই প্রথম 'যাবজ্ জীবং... পুনরাগমনং কুতঃ' — এই দুটি চরণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোক হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে।[৬] *য-তি-চ, পরিশুদ্ধি, মুগ্ধবোধিনী* (*নীতিবাক্যামৃতব্যাখ্যা*) ও *দোহাকোষ*-এর অদ্বয়বজ্র-কৃত ভাষ্যে *নাস্তি মৃত্যোর্ অগোচরঃ* বা *তাবৎ মৃত্যোর্ অগোচরঃ*-র পাঠই পাওয়া যায়।[৭] জৈন লেখক অভয়দেব সূরি-ও *ত-বো-বি*-তে সম্ভবত জয়ন্তভট্ট-র পাঠই অনুসরণ করেছেন।[৮] *স-দ-স*-র সমসময়ে *স-দ-কৌ*-তে *ন্যা-ম*-র পাঠই উদ্ধৃত হয়েছে; শুধু 'শান্তস্য'-র বদলে আছে 'দেহস্য'।[৯] তবে *ন্যা-ম*-র কোনো কোনো পুঁথিতে, 'জীবং'-এর জায়গায় 'জীবেৎ' আর 'শান্তস্য'-র জায়গায় 'দেহস্য' পাওয়া যায়।[১০]

বারো শতক থেকে আলোচ্য শ্লোকটির বিকৃতি শুরু হলো। জৈন দার্শনিক

হেমচন্দ্র লিখলেন :

> যাবজ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ তাবৎ বৈষয়িকৈঃ সুখৈঃ।
> ন তাম্যেদ ধর্ম-কার্যায় ধর্মাধর্ম-ফলং ক্ব তৎ।।[১১]
>
> যতদিন বাঁচবে সুখে বাঁচবে; ইন্দ্রিয়ের সুখ নিয়ে, ধর্মকর্ম নিয়ে (বৃথা) ভাবনা করবে না। ধর্ম-অধর্ম-র ফল কোথায়?

আর এক জৈন লেখক, গুণরত্ন প্রথম চরণটিকে বিকৃত করে লিখলেন :

> যাবজ্ জীবেৎ সুখং জীবেৎ তাবদ্ বৈষয়িকং সুখম্।[১২]
> যতদিন ইন্দ্রিয়ের সুখ আছে ততদিন সুখে বাঁচবে।

দ্বিতীয় চরণের ক্ষেত্রে তিনি আবার *ন্যা-ম*-র পাঠই উদ্ধৃত করেছেন।

শুধু জৈনরাই নন, ব্রাহ্মণ্য ধারার কবি শ্রীহর্ষ একই দোষে দোষী। *নৈ-চ*-তে তিনি লিখেছেন :

> কঃ শমঃ ক্রিয়তাং প্রাজ্ঞাঃ প্রিয়াপ্রীতৌ পরিশ্রমঃ।
> ভস্মীভূতস্য ভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[১৩]
>
> হে প্রাজ্ঞগণ (প্র + অজ্ঞ অর্থে), তোমাদের শম (শান্তি) কী? প্রিয়ার প্রীতির জন্যে চেষ্টা করো। ছাই-হয়ে যাওয়া বস্তু আবার কোথায় (কোথা থেকে) ফিরে আসে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, *বি-ধ-ম-পু*-র মূল শ্লোকটিকে অন্যান্যদের সঙ্গে সায়ণ-মাধব-ও বিকৃত করেছেন। আর ঐ উপপুরাণটিই যদি শ্লোকটির আদি উৎস হয়, তাহলে এটাও পরিষ্কার যে, কোনো খাঁটি চার্বাক উৎস থেকে শ্লোকটি পাওয়া যায় নি। *বি-ধ-ম-পু*-র যে অধ্যায়ে শ্লোকটি আছে সেখানে রাজা বেন-কে ঘোরতর অধার্মিক হিসেবে দেখানো হয়েছে। মৈসূর হিরিয়ান্না বলেছেন, মূলে এই শ্লোকটি ছিল বৈদিক বিধানের ব্যঙ্গরূপ (প্যারডি); যাবজ্ জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যতদিন লোকে বাঁচে, সে অগ্নিহোত্র (=নিত্য হোম) করে — এরই উল্‌টো পিঠ।[১৪] তার ওপরেও কলম চালিয়ে ব্যঙ্গরূপটিকে আরও খেলো করা হয়েছে। যতজন লেখকের রচনা থেকে শ্লোকটির নানা রূপ ও রূপান্তর উল্লেখ করা হলো, তাঁরা সকলেই ছিলেন সচেতন বস্তুবাদ-বিরোধী, তবু সায়ণ-মাধব-এর আগে অন্তত দশজন ও পরে অন্তত দুজন *বি-ধ-ম-পু*-র পাঠই আশ্রয় করেছেন। হয়তো তাঁদের অব্যবহিত উৎস ছিল *ন্যা-ম*। কিন্তু তাঁদের কেউই ধার করে ঘি খাওয়ার কথা লেখেন নি। একা সায়ণ-মাধব-ই সে-কাজ করেছিলেন। তিনিও আবার প্রথমবার উদ্ধৃত করার সময়ে সঠিক পাঠটি রেখেছেন। সুতরাং প্রচলিত বিকৃত পাঠটি অনায়াসে বাতিল করা যায়।

১. কানুনগো, ১২৭-২৮।
২. *স-দ-স,* ১৪।
৩. ঐ, ২।
৪. হাজরা (১৯৫৮), ১ : ১৪৩।
৫. *বি-ধ-ম-পু,* ১।১০৮।১৮-১৯।
৬. *ত-স-প,* ১৭; *ন্যা-ম,* আহ্নিক ৭; মৈসূর সং., ৩৪৮; বারাণসী সং., ২৫৭। প্রথমটিতে 'শান্তস্য'-র জায়গায় 'দেহস্য' আছে।
৭. *য-তি-চ,* ভাগ ২, ২৫৩; *পরিশুদ্ধি,* ১১৩ (শুধু প্রথম চরণ); *মুগ্ধবোধিনী,* ১৪; *দোহাকোষ*-টী., ৮৬।
৮. *ত-বো-বি,* ৫০৫। জয়ন্তও শ্লোকটিকে শুধু প্রথম পাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আহ্নিক ৪, বারাণসী সং., ৩৮৮।
৯. *স-দ-কৌ,* ১০৮।
১০. প্রসঙ্গত বলা যায়, জয়ন্ত এই শ্লোকের রচয়িতা হিসাবে বৃহস্পতির নাম করেন নি; 'যথাহ', যেমন বলা হয়েছে— এই বলেই ছেড়ে দিয়েছেন।
১১. *ত্রি-শ-পু-চ,* ১।৩৪৫।
১২. *ত-র-দী,* ২০২।
১৩. *নৈ-চ,* ১৭।৬৯।
১৪. হিরিয়ান্না (১৯৭৩), ১৯৪ টী. ২। 'যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি'— এই বিধি রয়েছে কৃষ্ণ যজু-র *মীমাংসা পরিভাষা,* ৪৩-এ।

অধ্যায় ৩২

'জীবিকা ধাতৃনির্মিতা'

সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায়েই আছে চার্বাকদর্শনের কথা। আলোচনার শেষে, বৃহস্পতির বচন বলে, তিনি এগারো (বা সাড়ে দশ)-টি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় শ্লোকটি এই :

> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা।।[১]

> অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ও ভস্মলেপন— এইগুলি বুদ্ধি ও শারীরিক শক্তি-শূন্য ব্যক্তিদের জন্য বিধাতা-নির্দিষ্ট জীবিকা।[২]

শ্লোকটি পড়ে একটু খটকা লাগে। বৃহস্পতি, অর্থাৎ চার্বাকমতের স্রষ্টা তো বিধাতা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তিনি 'ধাতা'-র কথা তুলবেন কেন?

স-দ-স অনুবাদের সময়ে ই. বি. কাওয়েল-ও এটি বুঝেছিলেন। তিনি তাই তর্জমা করেন :

> The Agnihotra, the three Vedas, the ascetic's three staves, and smearing one's self with ashes.
> Were made by nature as the livelihood of those destitute of knowledge and manliness.[৩]

'নেচর' (প্রকৃতি) শব্দটি প্রসঙ্গে একটি টীকায় তিনি যোগ করেন :

> 'ধাতৃ' বলতে আমি বুঝি = ঈশ্বর বা চলতি কথায় প্রকৃতি। ড. হল্ (ক্যাটালগ, পৃ. ১৬২) ধাতৃ-কে কোনো এক লেখকের নাম বলে ধরেছেন এমন মনে হয়। 'ধাতৃ' বলতে কখনও কখনও বৃহস্পতিও বোঝাতে পারে।[৪]

ফিট্স্এডওয়র্ড হল্ ও কাওয়েল-এর মত মানা যায় না। 'ধাতৃ' বলতে কোনো লেখক বা বৃহস্পতি ধরলে শ্লোকটির কোনো মানেই হবে না। সংসারী বা সন্ন্যাসী—

কারও জীবিকা ঠিক করে দেওয়ার মালিক এঁরা নন। 'ধাতৃ'-র এমন অর্থ আর কোথাও (বা কোনো অভিধানে) পাওয়া যায় না।

তার মানে, শ্লোকটির পাঠ-এই কোনো গোলমাল আছে।

সুখের কথা, সায়ণ-মাধব নিজেই ঐ একই অধ্যায়ের গোড়ায় শ্লোকটির অন্য একটি পাঠ উদ্ধৃত করেছেন :

> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
> বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ।।[৫]
>
> বৃহস্পতি বলিয়াছেন, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড বা সন্ন্যাস ও নিজের দেহকে ভস্মের দ্বারা আবৃত করা— এইগুলি বুদ্ধি ও শারীরিক ক্ষমতারহিত ব্যক্তিদের জীবিকা।[৬]

এই পাঠ অনেক বেশি সঙ্গত। তাহলে, দ্বিতীয়বার শ্লোকটি উদ্ধৃত করার সময়ে সায়ণ-মাধব শেষ পাদ-টি পাল্‌টে দিলেন কেন?

এর উত্তর পেতে হলে শ্লোকটির আদি উৎস খোঁজা দরকার।

শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায় ন শতকে শালিকনাথ-এর *ঋজু-বিমল-পঞ্চিকা*-য়। এখানে 'জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ' পাঠই আছে।[৭]

তারপর শ্লোকটি পাওয়া যায় কৃষ্ণমিশ্র-র *প্র-চ* নাটকে (অঙ্ক ২, শ্লোক ২৬)। সেখানেও শেষ পাদ-য় আছে 'জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ'।[৮]

শ্রীহর্ষ-র *নৈ-চ*-য় (১৭।৩৯) শ্লোকটি অন্য রূপে দেখা দেয় :

> অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্।
> প্রজ্ঞাপৌরুষনিঃস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকা।।
> অগ্নিহোত্র যাগ, বেদত্রয় পাঠ, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন, তপস্যারূপে কায়িক দণ্ড, এবং মানসিক দণ্ড এই ত্রিবিধ দণ্ড স্বীকার এবং ভস্মের তিলক ধারণ এই সকল বুদ্ধি ও পুরুষকার শূন্য লোকদিগের জীবিকানির্বাহের উপায়; এই কথা বৃহস্পতি [=জীব] বলিয়াছেন।[৯]

নৈষধ-এর টীকাকার, নারায়ণ এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবার *প্র-চ*-র পাঠটিই উদ্ধৃত করেছেন (শুধু 'ভস্মগুণ্ঠনম্'-এর জায়গায় আছে 'ভস্মপুণ্ড্রকম্')।[১০]

এ ছাড়াও শ্লোকটি পাওয়া যায় জয়ন্তভট্ট-র *ন্যা-ম*-র *গ্রন্থিভঙ্গ* টীকায়। টীকাকার চক্রধর *প্র-চ*-র পাঠই রেখেছেন, শুধু 'ভস্মগুণ্ঠনম্'-এর বদলে আছে 'ভস্মমুণ্ডনম্', অর্থাৎ ছাই (মাখা) ও (মাথা) মোড়ানো।[১১]

মহাভারত, শান্তিপর্বর একটি শ্লোকের (প্রচলিত সং., ২১৮।২৫; প্রামাণিক সং., ২১১।২৪) টীকায় নীলকণ্ঠ আবার *প্র-চ*-র পাঠেই ফিরে গেছেন (শুধু প্রথম পাদ-য় আছে : 'ত্রয়ী-ধর্মাঃ' অর্থাৎ বেদবিহিত ধর্মগুলি)।[১২]

ঐ একই সময়ে *অ-ব্র-সি*-তে সদানন্দ কাশ্মীরক-এর পাঠ একটু আলাদা :

> অগ্নিহোত্রঞ্চ পীতঞ্চ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মধারণম্।
> প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্।।[১৩]
>
> অগ্নিহোত্র, পীত (=গেরুয়া বাস), কপালে তিলক ও ছাই— প্রজ্ঞা ও পৌরুষহীনদের (এই) জীবিকা— জল্পনা করেন (বলেন) জীব (বৃহস্পতি)।

এই পাঠের দ্বিতীয় চরণটি *নৈ-চ* থেকে নেওয়া— 'নিঃস্বানাম্'-এর জায়গায় এসেছে আদি পাঠ-এর 'হীনানাম্' আর 'জীবিকা'-র বদলে 'জীবিকাম্'।

সন-তারিখ জানা যায় না এমন দুটি বইতে, *স-সি-স* আর *স-ম-স*-য়, *প্র-চ*-র পাঠই প্রায় হুবহু উদ্ধৃত হয়েছে।[১৪]

সোমদেব সূরি-র *নীতিবাক্যমৃতম্*, সূত্র ৩২-এর টীকায় কোনো অনামা পণ্ডিতও এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন। ছাপা বইতে প্রচুর ভুল আছে। তবে দ্বিতীয় চরণের শেষে আছে : জীবিতে দো (!) মতং গুরুঃ। গুরুঃ-র জায়গায় 'গুরোঃ' পাঠই সমীচীন হতো। গুরু বলতে বোঝায় সুরগুরু বৃহস্পতিকে। এখানেও ধাতা-র কথা বলা হয় নি।

মোট দশটি উৎস থেকে দশটি পাঠ মিলিয়ে শ্লোকটির মূল রূপ সম্পর্কে কি কোনো সিদ্ধান্ত করা যায়? প্রথম চরণের পাঠভেদগুলি গৌণ। আসল সমস্যা শেষ পাদটি নিয়ে। 'জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ' না 'জীবিকা ধাতৃনির্মিতা'? 'জীবো জল্পতি জীবিকা' পাঠটি বাদ দেওয়া যায়। মূল শ্লোকটি নতুন করে লেখার সময়ে শ্রীহর্ষ এটির ঐ রূপ দিয়েছিলেন। সদানন্দ কাশ্মীরক ছাড়া আর কেউ সেটি গ্রহণ করেন নি। এ ছাড়া সব পাঠেই আছে : 'জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ'। মনে হয়, এটিই সঠিক পাঠ।

তবে দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করার সময়ে, সায়ণ-মাধব সেটি পাল্টে দিলেন কেন? এই পাঠ তো আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

এর কারণ বোধহয় এই : প্রথমবার উদ্ধৃত করার সময়ে সায়ণ-মাধব নিজেই এটিকে 'আভাণক' (=লৌকিক প্রবচন) বলেছেন।[১৫] তার মানে শালিকনাথ-ই এর রচয়িতা না-ও হতে পারেন। কোনো মুখ-ফেরতা উৎস থেকে তিনি এটি পেয়ে থাকবেন। সায়ণ-মাধব সমেত অনেকেই তাই 'জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ' পাঠটিই জানতেন। দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করার আগে সায়ণ-মাধব ভূমিকা-স্বরূপ একটি বাক্য লিখেছেন : 'এই সবই বৃহস্পতিও বলেছেন'। তার পরেই দ্বিতীয় শ্লোক হিসেবে এসেছে 'অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাঃ' ইত্যাদি। তাই তক্ষুনি আবার বৃহস্পতির নাম না-দিয়ে তিনি শেষ পাঠ-টি বদলে দিলেন। এতে ছন্দ বাঁচল, কিন্তু মূল পাঠটি গেল উল্‌টে। আর তার থেকে একটি বিভ্রান্তি তৈরি হলো : নিরীশ্বরবাদী মতের মধ্যে ঢুকে গেলেন ঈশ্বর।

১. *স-দ-স,* ১৩, পঙ্‌ক্তি ১১২-১৩।
২. সত্যজ্যোতি চক্রবর্তীর তর্জমা, ১ : ১৭।
৩. কাওয়েল (১৮৬২), ৩৮১। এই তর্জমাটি পরে কাওয়েল ও গফ অনূ. *স-দ-স* (১৮৮২)-র অন্তর্গত হয় (কোলব্রুক (১৮৭৩), পরিশিষ্ট গ, ৪৫৬-৬০, ও কাশীর *পণ্ডিত* (১৮৭৪) পত্রিকাতেও এর আংশিক ও সম্পূর্ণ অনুবাদ বেরিয়েছিল। কাওয়েল-এর আগে *স-দ-স*-র প্রথম অধ্যায়ের একটি জার্মান তর্জমা বেরিয়েছিল (*ZDMG*, ১৪ : ১৮৬০, অনুবাদকের নাম নেই); শেষ অংশের শ্লোকগুলির প্রথম ইংরিজি তর্জমা করেছিলেন জে. মিউঅর (১৮৬১)। দুটি তর্জমায় 'ধাতৃনির্মিতা'-র অনুবাদে আছে যথাক্রমে 'den Vaetern angeordent' (পরমপিতার বিহিত) ও 'ordained by the Creator'। অর্থাৎ, এই দুজন অনুবাদকের মনে কোনো খটকা লাগে নি।
৪. কাওয়েল (১৮৬২), ৩৮৫ টী. [৩]। কাওয়েল-গফ (১৮৮২)-এ এই টীকাটি বাদ পড়েছে। মাক্‌স্ ম্যুলর (১৮৯১) মন্তব্য করেছিলেন : স্বভাব-এর বদলে ধাতৃ শব্দটি শুধু ব্যঙ্গ করার জন্যেই এখানে ব্যবহার হতে পারে (১০১ টী.)। হল্ (১৮৫৯), ১৬২-তে বলা হয়েছে : চার্বাকদর্শন অধ্যায়ে সায়ণ-মাধব দুজন লেখকের নাম করেছেন : বৃহস্পতি ও ধাতৃ।— কাওয়েল এর কথাই উল্লেখ করেছেন, শুধু *Index*-এর জায়গায় বইটির নাম লিখেছেন 'Catalogue'।
৫. *স-দ-স,* ৫, পঙ্‌ক্তি ৫০-৫১।
৬. সূত্র ২, ৬।
৭. *ঋ-বি-প,* ২৮৫।
৮. *প্র-চ* (১৯৭১), ৪৪। শ্লোকটি বলার আগে চার্বাক (এই নাটকের চরিত্র) ঘোষণা করেন : 'আচার্য যেমন বলেছেন', যথাহাচার্যঃ।
৯. *নৈ-চ,* ৬৩৫; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের তর্জমা, ২৬৪ (এখানে শ্লোকসংখ্যা ১৭।৩৮)।
১০. *নৈ-চ,* ৬৩৫।
১১. *ন্যা-ম,* ১:২২৮।
১২. *মহাভারতম্,* প্রচলিত সং., ১৬১৪।
১৩. *অ-ব্র-সি,* দ্বিতীয় মুদ্‌গর-প্রহারঃ (চার্বাক খণ্ডন), ১০০।
১৪. *স-সি-স,* ৬, শ্লোক ১৪; *স-ম-স,* ১৫।
১৫. সূত্র ১, ৫, পঙ্‌ক্তি ৪৯।

অধ্যায় ৩৩

'মৃতানামপি জন্তূনাং...'

সায়ণ-মাধব-এর *স-দ-স*-র প্রথম সংস্করণ (১৮৫৩-৫৮) সম্পাদনা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তার চার্বাকদর্শন অধ্যায়টি শেষ হয়েছিল দশটি (বা সাড়ে দশটি) শ্লোক দিয়ে। চতুর্থটি এইরকম :

> মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
> গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।।

এর প্রথম বাঙলা অনুবাদ করা হয়েছিল এইভাবে:

> আর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলেই যদি মৃতের তৃপ্তি হইতে পারে তবে কোনস্থানে গমন করিতে হইলে পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন কি?[১]

পরে মূল *স-দ-স* আবার ছেপে বার করেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮৭১), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮৯), হরি নারায়ণ আপটে (১৯০৬) প্রমুখ।[২] তাঁদের সংস্করণে শ্লোকটির পাঠ একই রয়েছে। ১৯২৪-এ নিজের টীকা সমেত বইটি নতুন করে সম্পাদনা করেন বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যংকর। তিনি কিছু নতুন পুঁথি কাজে লাগালেন। ফলে শেষ অংশর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের পাঠ অনেখানিই পাল্‌টে গেল :

> মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
> নির্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েচ্ছিখাম্।।
> গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্।
> গেহস্থকৃত শ্রাদ্ধেন পথি তৃপ্তিরবারিতা।।

> মৃত মনুষ্যগণের শ্রাদ্ধ যদি তৃপ্তির কারণ হয়, তবে নির্বাপিত প্রদীপের স্নেহ (=তেল) সেই শিখাকে বৰ্দ্ধিত করিবে।
> এই পৃথিবীতে পর্য্যটনকারী মানববর্গের পাথেয়— পাথেয় সম্বল ভোজ্য দ্রব্যাদির প্রদান ব্যর্থ। গৃহস্থকৃত শ্রাদ্ধের দ্বারা তাহাদের পথে অবারিত তৃপ্তি উৎপন্ন হইবে।[৩]

অর্থাৎ, দুটি নতুন চরণ যোগ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের সংস্করণের চতুর্থ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণটি হয়ে গেছে পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণ, আর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকের ক্ষেত্রে দুটি নতুন দ্বিতীয় চরণ এসেছে। ফলে এই অংশে মোট চরণের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তেইশ, মোট শ্লোক হলো এগারোটি (বা সাড়ে এগারোটি)। প্রথম সংস্করণে এই অংশের চরণ ছিল একুশটি, শ্লোক দশটি (বা সাড়ে দশটি)।

অভ্যংকর ঠিক কোন্ পুঁথি থেকে এই বাড়তি চরণ পেলেন? দুঃখের বিষয় তিনি তা জানান নি। তবে বিদ্যাসাগর ও আপটে যে কটি পুঁথি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলিতে ঐ দুটি চরণ (৪ গঘ ও ৫ গঘ) ছিল না। তবে চতুর্থ শ্লোকের ক্ষেত্রে অভ্যংকর সংস্করণ-এর পাঠই যে যথার্থ, অন্যান্য উৎস থেকে তা বোঝা যায়। আবার তার থেকে কিছু সমস্যাও তৈরি হয়। আমাদের আলোচনা সেই নিয়ে।

অভ্যংকর সংস্করণে চতুর্থ শ্লোকটির যে-পাঠ দেওয়া হয়েছে, হুবহু সেটিই পাওয়া যাচ্ছে কৃষ্ণমিশ্র-র *প্র-চ* নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক-য় (২।২১)। এই শ্লোকটিই আবার পাওয়া গেছে জৈন বিদ্বান্ হেমচন্দ্র-র *যোগশাস্ত্র-স্বোপজ্ঞ* (=স্বরচিত)-*বিবরণ*-এ।[৪] কৃষ্ণমিশ্র-র পাঠের সঙ্গে তার প্রথম চরণে একটু তফাত আছে :

মৃতানামপি জন্তূনাং যদি তৃপ্তির্ভবেদিহ।
(শ্রাদ্ধ করলে) মৃত প্রাণীদেরও যদি এখানে (অর্থাৎ ইহলোকে) তৃপ্তি হয়।

স্যা-বা-ম-তে এই শ্লোকটিই একটু পাঠান্তর সমেত উদ্ধৃত করেছেন মল্লিষেণ সূরি। তার প্রথম চরণটির পাঠ কৃষ্ণমিশ্র-র সঙ্গে অবিকল এক; শুধু দ্বিতীয় চরণের গোড়ায় একটু গৌণ তফাত আছে :

তন্ নির্বাণপ্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্ধয়েচ্ছিখাম্।[৫]
তাহলে নিভে-যাওয়া প্রদীপের তেলও শিখাকে বাড়াতে পারে।

শ্লোকটির সবচেয়ে পুরনো পাঠ পাওয়া যাচ্ছে *প্র-চ*-তে। এটিই তাই এখনও পর্যন্ত সঠিক ও গ্রাহ্য পাঠ। হেমচন্দ্র ও মল্লিষেণ সূরির রচনায় এই পাঠেরই কিছু গৌণ রকমফের দেখা যায়। সায়ণ-মাধব অবশ্য কৃষ্ণমিশ্র-র পাঠটিই বজায় রেখেছেন।

অভ্যংকর-সংস্করণ-এর পঞ্চম শ্লোকটি এখনও অবধি আর কোথাও চোখে পড়ে নি। চতুর্থ শ্লোকটি সম্পর্কেও কোনো চার্বাক-বিশেষজ্ঞ, যেমন, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, মামোরু নামাই প্রমুখ, অন্য কোনো পুরনো উৎসর উল্লেখ করেন নি। কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। আসল কথা : শ্লোকটির তাৎপর্য নিয়ে একটু বিভ্রান্তি আছে।

এফ. ডবলু. টমাস বহুদিন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন : *স্যা-বা-ম*-র এই শ্লোকটি (মৃতানামপি জন্তূনাং...সংবর্ধয়েচ্ছিখাম্) চার্বাকমতের সঙ্গে মেলে।[৬] টমাস-এর কাছে

স-দ-স-র অভ্যংকর-সংস্করণটি ছিল না। তিনি তাই বলেছেন : *স-দ-স*-র পাঠের সঙ্গে *স্যা-বা-ম*-র পাঠের দ্বিতীয় চরণটিতে বেশ তফাত আছে। কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখিয়েছি, তফাত খুব সামান্য : নির্বাণস্য প্রদীপস্য-র জায়গায় 'তন্ নির্বাণপ্রদীপস্য'। তবে একথা ঠিক যে, *স-দ-স*-র তৃতীয় শ্লোক থেকেই পশুহত্যার বিরোধিতা শুরু হয়েছে। সেই শ্লোকটি হলো :

> পশুশ্চেন্ নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
> স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ ন হিংস্যতে।।
>
> জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে পশু নিহত হইয়া যদি স্বর্গে গমন করে, তবে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে যজমান কর্ত্তৃক নিজের পিতা কেন নিহত হন না?
>
> (পঞ্চানন শাস্ত্রীর তর্জমা)

এই শ্লোকটির আদি পাঠ পাওয়া যাচ্ছে *বি-পু*-এ (৩।১৮।২৬), তারপরে *প-পু* (সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।৩৬৭) ও সবশেষে *প্র-চ* (২।২০)-তে :

> নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে
> স্বপিতা যজমানেন কিংনু তস্মান্ ন হন্যতে।।

প-পু-র শেষ পাদটি একটু আলাদা : কিংবা তত্র ন হন্যতে। *প্র-চ*-র পাঠ-এ 'তস্মান্'-এর জায়গায় 'কস্মান্' আছে। সায়ণ-মাধব-এ 'কস্মান্'-ই আছে; শুধু 'হন্যতে'-র জায়গায় তিনি লিখেছেন 'হিংস্যতে'। আর প্রথম চরণটি অনেকটাই আলাদা।

সব মিলিয়ে তাই মনে হয় : সায়ণ-মাধব-এর মূল উৎস ছিল *প্র-চ*। সেখানে চার্বাক-এর মুখেই এই শ্লোকটি বসানো হয়েছে, যদিও দুটি পুরাণে চার্বাক-এর নাম পর্যন্ত আসে নি। এসেছে শুধু বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রসঙ্গ। সে-কথায় একটু পরে আসছি।

স-দ-স-র শেষ এগারোটি শ্লোকের মধ্যে পাঁচটি শ্লোকের উৎস পাওয়া যাচ্ছে:
শ্লোক ১ = *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।২৩
শ্লোক ২ = *প্র-চ*, ২।২৬[৭]
শ্লোক ৩ = *বি-পু*, ৩।১৮।২৬ = *প-পু*, ১৩।৩৬৭ = *প্র-চ*, ২।২০
শ্লোক ৪ = *প্র-চ*, ২।২১
শ্লোক ৭ = *বি-ধ-ম-পু*, ১০৮।১৮ গঘ- ১৯ কখ।
(প্রায় সর্বত্রই কিছু পাঠভেদ আছে)

বাকি ছটি শ্লোকের উৎস জানা যায় নি, তবু অন্য পাঁচটির সূত্রে বলা যায় : এগুলিও সায়ণ-মাধব কোনো-না-কোনো পূর্ববর্তী উৎস থেকে পেয়েছিলেন;

কোনোটিই তাঁর নিজের রচনা নয়। অবশ্য তেমন কোনো দাবিও তিনি করেন নি, বরং শ্লোকগুলির সূচনায় তিনি বলেই রেখেছেন : বৃহস্পতিও এসবই বলেছেন।

সমস্যা শুরু এইখান থেকে। যে পাঁচটি শ্লোকের উৎস পাওয়া গেল তার তিনটি *প্র-চ* থেকে নেওয়া। তার মধ্যে একটি পুরাণ ও *প্র-চ* দু-এতেই আছে। এ ছাড়া সায়ণ-মাধব *প্র-চ* থেকে আরও একটি শ্লোক *স-দ-স*, অধ্যায় ১-এর গোড়ার দিকে উদ্ধৃত করেছেন (ত্যজ্যং... *প্র-চ*, ২।২৩)। অর্থাৎ, সায়ণ-মাধব একই সঙ্গে *প্র-চ* ও দুটি পুরাণের কাছে ঋণী (কৃষ্ণমিশ্র-ও *বি-পু*-র কাছে ঋণী)। *প্র-চ* থেকে নেওয়া সবকটি শ্লোকই চার্বাক-এর মুখে বসানো হয়েছে। কিন্তু যে-দুটি শ্লোক পুরাণ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে (*প্র-চ*-তে নেই), সে-দুটি আদৌ বৃহস্পতি বা চার্বাক বা লোকায়তিক-এর উক্তি নয়। *বি-পু* এবং *প-পু*-তে আছে : অসুরদের ছলনা করার জন্যে মায়ামোহ বৌদ্ধ ও জৈন বেশ ধরে তাদের বেদবিরোধী মত শিখিয়েছিলেন। সেই শুনে অসুররাই বলতে শুরু করল : যজ্ঞে ও শ্রাদ্ধে পশুবলি দেওয়া উচিত নয়। এই মত বৌদ্ধ ও জৈনদের ক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক, চার্বাক-এর ক্ষেত্রে আদৌ তা নয়। *প-পু*-র আর একটি শ্লোক (সৃষ্টিখণ্ড, ১৩।৩২৩) উদ্ধৃত করেছেন মাঠর ও মল্লিষেণ,[৮] যদিও দুজনের কেউই (ও তাঁদের সম্পাদকরা) সেটির উৎস নির্দেশ করেন নি। দুজনের ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ হচ্ছে বেদ ও মীমাংসকদের বিরোধিতা। মাঠর অবশ্য বেদপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান, পূর্বপক্ষ হিসেবেই *প-পু*-র শ্লোকটি সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে। আর মীমাংসকদের সঙ্গে মল্লিষেণ-এর কোনো আপস নেই— বেদ-এ ও ধর্মশাস্ত্রে (যেমন *মনুসংহিতা*-য়) শ্রাদ্ধে যে পশুবলি ও মৃতের উদ্দেশে পশুমাংস উৎসর্গ করার বিধান দেওয়া হয়েছে (*মনু*, ৩।২৬৮), তার নিন্দায় তিনি পঞ্চমুখ। হেমচন্দ্রও একইভাবে পশুহত্যা ও মীমাংসকদের নিন্দা করেছেন।[৯] সেই সূত্রেই 'মৃতানামপি জন্তূনাং' শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে।

হেমচন্দ্র ও মল্লিষেণ কি জেনেশুনে চার্বাকমতের পোষক একটি শ্লোক ব্যবহার করেছিলেন? নাকি তাঁরা জানতেন : এটি জৈন উৎস থেকেই পাওয়া যায়? মীমাংসকদের মতো চার্বাকদেরও তাঁরা সমান বিরোধী। মল্লিষেণ শ্লোকটির কোনো উৎস উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু তিনি বলেছেন : এটি 'পরম ঋষি'-র অনুগামীদের উক্তি। কোনো জৈন দার্শনিকের পক্ষে চার্বাককে অমন আখ্যা দেওয়া অসম্ভব। এর থেকেও মনে হয় : কোনো জৈন উৎস থেকেই মল্লিষেণ শ্লোকটি পেয়ে থাকবেন। হেমচন্দ্র-র ক্ষেত্রেও একই কথা খাটবে।

স-দ-স-তেও দেখি, প্রথম অধ্যায়ের শেষে এগারোটি শ্লোকে মূলত আক্রমণ করা হয়েছে পশুহিংসা ও শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের (৩-৬); পরলোক নেই— একথা বলা হয়েছে দুটি শ্লোকে (৭-৮)। পরের তিনটি শ্লোকে (৯-১১) এসেছে পশুহিংসার সূত্রে ব্রাহ্মণনিন্দা আর বেদ ও যজ্ঞ নিয়ে বিদ্রূপ। সর্বশেষ চরণটিতে আবার আমিষাশীদের

'নিশাচর' অর্থাৎ রাক্ষস বলা হয়েছে। তার মানে, শেষের দুটি মাত্র শ্লোক (৭ ও ৮) বাদে বাকি সবকটিই সম্ভবত জৈন ও/বা বৌদ্ধ উৎস থেকে পাওয়া। *বি-পু* এবং *প-পু*-তে পশুহিংসার নিন্দা করা হয়, কিন্তু 'পরলোক নেই'—এমন কথা কোথাও বলা হয় নি। সে-কথা আছে একমাত্র *বি-ধ-ম-পু*-তে। রাজা বেণ সেখানে পরলোক, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি কিছুই মানতে রাজি নন। সুতরাং *স-দ-স*-র শেষ অংশের সপ্তম শ্লোকটি লোকায়তিকমতের সঙ্গে যুক্ত, অষ্টমটিও এসেছে তারই অনুষঙ্গে।

সব মিলিয়ে মনে হয় : 'মৃতানামপি জন্তূনাং' শ্লোকটিতে জৈনমত যতটা প্রকাশ পেয়েছে চার্বাকমত ততটা নয়। সেই কারণেই হেমচন্দ্র ও মল্লিষেণ সেটি উদ্ধৃত করেছেন। এই শ্লোকটিকে তাঁরা বৃহস্পতির উক্তি বলে মনে করেন নি। সায়ণ-মাধব তাঁর চার্বাকমত-বিবরণে জৈন ও চার্বাককে একাকার করে দিয়েছেন। আরও অনেকের মতো তিনিও উদোর পিণ্ডি চাপিয়েছেন বুধোর ঘাড়ে।[১০]

---

১. অনুবাদক অজ্ঞাত। প্রকাশক : মহেশচন্দ্র পাল। ১২।

২. *স-দ-স*-র বিভিন্ন সংস্করণ, অনুবাদ ইত্যাদির জন্যে পটার, ৫১০ দ্র.। এ ছাড়া এই বই-এর অধ্যায় ২ দ্র.।

৩. পঞ্চানন শাস্ত্রীর তর্জমা। তিনি অবশ্য অভ্যংকর সংস্করণটি ব্যবহার করেছেন।

৪. *যো-শা*, ২।৪৭-এর টী., ৯৮ খ।

৫. *স্যা-বা-ম*, ৬৯।

৬. টমাস, ৬৯ টী. ৩৬ : "This is clearly in the style of Cārvāka comments; but in the *Sarva-darśana-saṃgraha*, where the first line was given as such, the second line differs."

৭. শালিকনাথ-এর *ঋ-বি-প*, ২৮৫-তেই শ্লোকটি প্রথম পাওয়া যায়। পরে আরও অনেকেই (যেমন, চক্রধর, শ্রীহর্ষ, নীলকণ্ঠ, সদানন্দ কাশ্মীরক প্রমুখ) শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন।

৮. *বি-পু*, ৩।১৮।২৪-২৯; *প-পু*, সৃষ্টিখণ্ড, অধ্যায় ১৩।৩০৯-৩৩৩।

মা-বৃ, কারিকা ২ প্রসঙ্গে, ১১১; মল্লিষেণ, ৬৫-তে *প-পু*, সৃষ্টি, ৩।৩২৩ শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে :

> যজ্ঞং কৃত্বা (যূপং ছিত্বা) পশুং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
> যদ্যেব গম্যতে স্বর্গে নরকঃ কেন গম্যতে।।

> যজ্ঞ করে, পশুহত্যা করে, রক্তকাদা করে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, তবে কী করে নরকে যাবে?

শ্লোকটির উদ্ধৃতিতে যথারীতি কিছু গৌণ পাঠভেদ আছে। *প-পু*-র বিভিন্ন সংস্করণেও অল্প পাঠভেদ দেখা যায়।

৯. *যো-শা,* ২।৩৭-৪৯।

১০. বিভিন্ন পুরাণ-এও দেখা যায়, চার্বাকদের মত জৈনদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে (যেমন, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ)। দণ্ডেকর ১৯৯১-৯২ (১৯৯৩), ৭৫২-৫৩ দ্র.। তেমনি *স-দ-স*-র শেষ শ্লোকগুলির ক্ষেত্রে বুর্নুফ, কাওয়েল ও মাক্‌স্ ম্যুলর বৌদ্ধ উৎস অনুমান করেছিলেন বা তার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। অন্যত্র এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি (এই বই-এ অধ্যায় ১২ দ্র.)।

সংক্ষেপ সূচি

(প্রকাশস্থানের উল্লেখ না থাকলে কলকাতা বুঝতে হবে)

অ-চি	হেমচন্দ্র। *অভিধানচিন্তামণি*। *Collection of Sanskrit Ancient Lexicons*. Delhi: S. N. Publications, 1981.
অ-ব্য-দ্বা	হেমচন্দ্র। *অন্যযোগ-ব্যবচ্ছেদ-দ্বাত্রিংশতিকা*। মল্লিষেণ-এর *স্যাদ্‌বাদ-মঞ্জরী*-সমেত। এ. বি. ধ্রুব সম্পা.। পুণা : ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৩৩।
অ-ব্র-সি	সদানন্দ কাশ্মীরক। *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি*। গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ও পঞ্চানন তর্কবাগীশ সম্পা.। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।
আ-ড	জয়ন্তভট্ট। *আগমডম্বর (ষণ্মত নাটক)*। ব. রাঘবন ও অনন্তলাল ঠাকুর সম্পা.। দরভঙ্গা : মিথিলা বিদ্যাপীঠ, ১৯৬৪।
আ-ল-বৃ	জ্ঞানশ্রীভদ্র। *আর্যলঙ্কাবতারবৃত্তি* (তিব্বতী-তর্জমা)। নামাই দ্র.।
উ-ভ-প্র-ক	সিদ্ধর্ষি। *উপমিতিভবপ্রপঞ্চাকথা*। পিটার পিটারসন ও হেরমান ইআকবি সম্পা.। এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০১-১৪।
ঋ-বি-প	শালিকনাথ। *ঋজু-বিমলা-পঞ্চিকা*। এস.কে. রমানাথ শাস্ত্রী সম্পা.। মাদ্রাজ, ১৯৩৪।
কৌ-অ	*কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*।
গী-ভা	নীলকণ্ঠ, মধুসূদন সরস্বতী, বলদেব, বিশ্বনাথ, শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী। *গীতাভাষ্য*। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*। পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পা.। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৫ শক।
চা-শা-স	সর্বানন্দ পাঠক। *চার্বাকদর্শন কী শাস্ত্রীয় সমীক্ষা* (হিন্দী)। বারাণসী : চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯০ (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫)।
জৈ-সূ-ভা	শবরস্বামী। *জৈমিনীয়সূত্রভাষ্য*, খণ্ড ৪। পুণা : আনন্দাশ্রম, ১৯৩২।
ত-উ-সি	জয়রাশিভট্ট। *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ*। সুখলালজী সংঘবী ও রসিকলাল পরীখ সম্পা.। বরোদা : ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯৪০। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৮৭।
ত-কৌ	বাচস্পতিমিশ্র। *তত্ত্বকৌমুদী*। *সাংখ্যকারিকা* দ্র.।

ত-বো-বি অভয়দেব সূরি। *তত্ত্ববোধবিধায়িনী*। সুখলালজী সংঘবী ও বেচরদাস দোশী সম্পা.। অমদাবাদ : গুজরাত বিদ্যাপীঠ, ১৯২১-৩১।

ত-র-দী গুণরত্ন। *তর্করহস্যদীপিকা*। লুইজি সুআলি সম্পা.। দ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৫-১৪।

ত-শ্লো-বা বিদ্যানন্দী। *তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক*। মনোহরলাল ন্যায়শাস্ত্রী সম্পা.। মুম্বাপুরী: নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯৭৫ বিক্রম সংবৎ (১৯১৮ খ্রি)।

ত-স শান্তরক্ষিত। *তত্ত্বসঙ্গ্রহ*। এম্বর কৃষ্ণাচার্য সম্পা.। বরোদা : ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, ১৯২৬ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪)।

ত-স স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৬৮, ১৯৯১।

ত-স-প কমলশীল। *তত্ত্বসঙ্গ্রহপঞ্জিকা*। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৬৮।

ত্রি-শ-পু-চ হেমচন্দ্র। *ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত*। মুনি চরণবিজয় সম্পা.। ভাবনগর : শ্রীজৈন আত্মানন্দ সভা, ১৯৩৬।

নৈ-চ শ্রীহর্ষ। *নৈষধীয়চরিতম্*। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা. ও অনূ.। সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, ১৮৭১ শক (=১৯৪৯)।

নৈ-চ নারায়ণ-এর *নৈষধপ্রকাশ*-ভাষ্য সমেত। মম. পণ্ডিত শিবদত্ত সম্পা. ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণশীকর সংশোধিত। বোম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯২৮।

নৈ-চ নারায়ণ রাম আচার্য সম্পা.। মুম্বই : নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯৭২।

ন্যা-কু-চ প্রভাচন্দ্র। *ন্যায়কুমুদচন্দ্র*। পণ্ডিত মহেন্দ্রকুমার ন্যায়শাস্ত্রী সম্পা.। মুম্বই : শ্রী মানিকচন্দ্র দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, ১৯৩৮।

ন্যা-তা-প উদয়নাচার্য। *ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য-পরিশুদ্ধিঃ*। অনন্তলাল ঠাকুর সম্পা.। দিল্লি : ভারতীয় দার্শনিকানুসন্ধান পরিষৎ, ১৯৯৬।

ন্যা-দ-বা-ভা ফণিভূষণ তর্কবাগীশ দ্র.।

ন্যা-ম জয়ন্তভট্ট। *ন্যায়মঞ্জরী*। চক্রধর-এর *গ্রন্থিভঙ্গ*-টীকা সমেত। গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২-৮৪।

ন্যা-বি-বি বাদিরাজ সূরি। *ন্যায়বিনিশ্চয়বিবরণ*। মহেন্দ্রকুমার জৈন সম্পা.। কাশী : ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৪৯।

ন্যা-সূ *ন্যায়সূত্র*। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায় সম্পা.। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

প-পু *পদ্মপুরাণ*, সৃষ্টিখণ্ড। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা.। বঙ্গবাসী, ১৩২৬ ব।

প্র-ক-মা প্রভাচন্দ্র। *প্রমেয়কমলমার্তণ্ড*। মহেন্দ্র কুমার সম্পা.। মুম্বই : নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯৪১।

প্র-চ কৃষ্ণমিশ্র। *প্রবোধচন্দ্রোদয়*। সীতাকৃষ্ণ নাম্বিয়র সম্পা.। দিল্লি : মোতীলাল বনারসীদাস, ১৯৭১।

প্র-চ কৃষ্ণমিশ্র। *প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ম্*। অনিলচন্দ্র বসু সম্পা.। সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৭৯।

প্র-প — শঙ্করাচার্য। *প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য* (আনন্দগিরির টীকা সমেত)। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী সম্পা.। মাউন্ট আবু, বারাণসী : মহেশ-অনুসন্ধান-সংস্থানম্‌, ১৯৭৯।

প্র-বা-স্ব-টী — কর্ণকগোমী। *প্রমাণবার্ত্তিক-স্বোপজ্ঞবৃত্তি-টীকা*। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পা.। ইলাহবাদ : কিতাব মহল, ১৯৪৩।

বা-প — ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়*। কে. এ. সুব্রহ্মণ্য অয়্যর সম্পা.। পুণা : ডেকান কলেজ, ১৯৬৬।

বা-প — ভর্তৃহরি। *বাক্যপদীয়*। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য সম্পা. ও অনূ.। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫।

বি-ধ-ম-পু — *বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ*। মুম্বই : ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস, ১৮৩৪ শক।

বি-পু — *বিষ্ণুপুরাণ*। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা.। আর্য্যশাস্ত্র, ১৯৬৫-৬৬।

বি-ভা-স্বো-বৃ — জিনভদ্র। *বিশেষাবশ্যক-ভাষ্য ও স্বোপজ্ঞবৃত্তি*। দলসুখ মালবণিয়া সম্পা.। অমদাবাদ : লালভাঈ দলপতভাঈ ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, ১৯৬৬-৬৮।

বৃ-স — বরাহমিহির। *বৃহৎসংহিতা*। অবধবিহারী ত্রিপাঠী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, দু খণ্ডে, ১৯৬৮।

বে-দ — *বেদান্তদর্শনম্‌*। *শারীরকভাষ্য সমেত*। হরিপদ ভট্টাচার্য ও ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার সম্পা.। তারিখ নেই।

বে-সা — সদানন্দ যতি। *বেদান্তসার*। নিশিকান্ত সাংখ্যতীর্থ ও কালীপ্রসন্ন সাংখ্যতীর্থ সম্পা.। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৫৬ ব।

বে-সা — সদানন্দ যতি (যোগীন্দ্র)। *বেদান্তসারঃ*। ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য সম্পা.। রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ১৯৬৮ (১৩৭৫ ব)।

ব্র-সূ-ভা — ভাস্করাচার্য। *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য*। পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পা.। বারাণসী : চৌখম্বা, ১৯১৫।

ব্র-সূ-ভা — শঙ্করাচার্য। *ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্‌*। আচার্য জগদীশ শাস্ত্রী সম্পা.। দিল্লি : মোতীলাল বনারসীদাস, ১৯৮০।

ব্র-সূ-ভা — শঙ্করাচার্য। *ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্‌*। অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও ভার্গব শাস্ত্রী সম্পা.। বোম্বাই: নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯৩৮।

ম-অ-প — কমলশীল। *মধ্যমকালঙ্কার পঞ্জিকা*। নামাই, ১৯৭৬, পৃ. ৩৮ টী. দ্র.।

মা-বৃ — *মাঠরবৃত্তি* (ঈশ্বরকৃষ্ণ-র *সাংখ্যকারিকা* সমেত)। স্বামী দিবাকরানন্দ অনূ.। মতিলাল, মন্দিরবাজার, ২৪ পরগনা : জগন্নাথ বর্মন, ১৩৭৫ ব (১৯৬৮ খ্রি)।

য-তি-চ — সোমদেব সূরি। *যশস্তিলক চম্পূ* (*যশোধরমহারাজচরিত*)। পণ্ডিত শিবদত্ত ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব সম্পা.। মুম্বই : নির্ণয়সাগরপ্রেস, ১৯০৩।

যো-শা — *যোগশাস্ত্রম্‌*। হেমচন্দ্র। ভাবনগর : শ্রী জৈনধর্ম প্রসারক সভা, ১৯২৬।

লো-ত-নি — হরিভদ্র। *লোকতত্ত্বনির্ণয়*। আমেদাবাদ : শ্রী হংসবিজয়জী জৈন ফ্রী লাইব্রেরী, বিক্রম সংবৎ ১৯৭৮ (১৯২২ খ্রি)।

লো-দ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *লোকায়ত দর্শন*। দ্বিতীয় সং., ১৯৬৯।

শা-ভা শঙ্করাচার্য। [*ব্রহ্মসূত্র*-] *শারীরকভাষ্য*। *ভাষ্যরত্নপ্রভা*, *ভামতী* ও *ন্যায়নির্ণয়* সমেত। জগদীশ শাস্ত্রী সম্পা.। দিল্লি : মোতীলাল বনারসীদাস, ১৯৮৮।

ষ-দ-স হরিভদ্র। *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়*। লুইজি সুআলি সম্পা.। দ এশিয়াটিক সোসাইটি, বিব্লিওথেকা ইন্ডিকা, ১৯০৫-১৪।

ষ-দ-স *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়*। কামেশ্বর মিশ্র সম্পা.। মণিভদ্র-র *লঘুবৃত্তি* সমেত। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ১৯৭৯।

ষ-দ-স মহেন্দ্রকুমার জৈন সম্পা. (দলসুখ মালবণিয়ার ভূমিকা-সহ)। ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৬৯।

স-দ-কৌ মাধব সরস্বতী। *সর্বদর্শনকৌমুদী*। ক. শাম্বশিব শাস্ত্রী সম্পা.। ত্রিবান্দ্রম, ১৯৩৮।

স-দ-শি শ্রীকাংচী রামানুজাচার্য। *সর্বদর্শনশিরোমণিঃ*। প্রতিবাদিভয়ঙ্করম্ অনন্তাচার্য সম্পা.। শ্রী কাঞ্চী, তারিখ নেই।

স-দ-স সায়ণমাধবাচার্য্য। *সর্বদর্শন সংগ্রহ*। সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী সম্পা. ও অনূ.। সাহিত্যশ্রী, ১৩৮৩ ব ও ১৩৮৬ ব, দু খণ্ড।

স-দ-স সায়ণমাধবাচার্য। *সর্বদর্শনসংগ্রহ*। বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যংকর সম্পা.। পুণা : ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৭৮ সং।

স-দ-স *সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ*। তৃতীয় মুদ্রণ। বি.এল.চক্রবর্তী, ১৮৮৯।

স-দ-স নরনাথ মুখোপাধ্যায় অনূ.। অনুবাদক, ১৩৫৯ ব।

স-দ-স পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সম্পা. ও অনূ.। আগরপাড়া (২৪ পরগণা) : সাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ ব।

স-দ-স *সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ*। শ্রী মহেশচন্দ্র পাল, ১৯৫০ সংবৎ [১৮৯৩ খ্রি]।

স-দ-স হরিনারায়ণ আপটে সম্পা.। পুণা : আনন্দাশ্রম, ১৯০৬, দ্বিতীয় সং., ১৯২৮।

স-ম-স *সর্বমতসংগ্রহ*। ত. গণপতি শাস্ত্রী সম্পা.। ত্রিবান্দ্রম, ১৯১৫।

স-বে-সি-সা *সর্ব্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ*। প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী সম্পা.। লোটাস লাইব্রেরী, ১৮৩৫ শক।

স-সি-স *সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ*। এম. রঙ্গাচার্য সম্পা.। মাদ্রাজ, ১৯০৯।

সা-প্র-সূ *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র*। রিশার্ড গার্বে সম্পা.। Garbe (ed.) দ্র.।

সি-বি-টী অনন্তবীর্য। *সিদ্ধিবিনিশ্চয়টীকা*। মহেন্দ্রকুমার ন্যায়াচার্য সম্পা.। কাশী : ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ১৯৫৯।

সূ-কৃ-সূ *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র*। মুনি জম্বুবিজয় পুনঃসম্পা.। দিল্লী : মোতীলাল বনারসীদাস ইন্ডোলজিকাল ট্রাস্ট, ১৯৭৮।

সূ-কৃ-সূ-বৃ শীলাঙ্ক। *সূত্রকৃতাঙ্গসূত্রবৃত্তি*। মুনি জম্বুবিজয় পুনঃসম্পা.। দিল্লী : মোতীলাল বনারসীদাস ইন্ডোলজিকাল ট্রাস্ট, ১৯৭৮।

স্যা-বা-ম	মল্লিষেণ। *স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী*। এ.বি.ধ্রুব সম্পা.। বোম্বাই, ১৯৩৩।
স্যা-বা-র	বাদিদেব সূরি। *স্যাদ্‌বাদরত্নাকর*। মোতিলাল লাধাজী ওসবাল সম্পা.। দিল্লী: ভারতীয় বুক কর্পোরেশন, ১৯৮৮।

ABORI	*Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*
BORI	Bhandarkar Oriental Research Institute
EI	*Epigraphia Indica*
ERE	*Encyclopaedia of Religion and Ethics*
JAS (B)	*Journal of the Asiatic Society (Bengal)*
MLBD	Motilal Banarsidass
OUP	Oxford University Press
PTS	Pali Text Society
SBE	Sacred Books of the East
ZDMG	*Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesselschaft.*

রচনাপঞ্জি

অনুওগাদারাইং। মুনি পুণ্যবিজয় সম্পা.। বোম্বাই : শ্রীমহাবীর জৈন বিদ্যালয়, ১৯৬৮।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ঋষিযাত্রা'। *অবনীন্দ্র রচনাবলী*, খণ্ড ৬। প্রকাশ ভবন, ১৯৯১।

অভিধানপ্পদীপিকা। মোগ্‌গল্লান। দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : বৌদ্ধভারতী, ১৯৮১।

অমরকোষ। বোম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯৬৯।

অষ্টাদশ উপনিষদঃ, প্রথম খণ্ড। বি. প্র. লিময়ে ও র‍ং. দ. বাডেকর সম্পা.। পুণ্যপত্তনম্ : বৈদিক-সংশোধন-মণ্ডলম্, ১৮৮০ শক (১৯৫৮)।

অর্থশাস্ত্র। কৌটিল্য। ত. গণপতি শাস্ত্রী সম্পা.। ত্রিবান্দ্রম, ১৯২৪ (নতুন সং. দিল্লী : ভারতীয় বিদ্যাপ্রকাশন, ১৯৮৪)।

অর্থশাস্ত্র। আর. শামশাস্ত্রী সম্পা.। মৈসূর, ১৯৫৬ (পঞ্চম সং.)।

আর্যবিদ্যাসুধাকরঃ। যজ্ঞেশ্বর চিমণভট্ট। লাহোর : মোতীলাল বনারসীদাস, ১৯২৩।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। *বোধেন্দু বিকাস*। *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচনাবলী*, খণ্ড ২। দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮২।

কাদম্বরী। বাণভট্ট। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা.। ১৮৭২ শক (১৯৫০ খ্রি)।

কাদম্বরী। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ৮। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০।

কামসূত্র। বাৎস্যায়ন। *কামসূত্র* (*জয়মঙ্গলা* টীকা সমেত)। বারাণসী : চৌখম্বা, তারিখ নেই।

কামসূত্র। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা.। বঙ্গবাসী, ১৩৩৪।

কামসূত্র। মহেশচন্দ্র পাল সম্পা.। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০।

কামিল বুল্কে, এস.জে.। *রামকথা : উৎপত্তি ঔর বিকাস*। ইলাহাবাদ: হিন্দী পরিষদ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫০)।

কাশিকাবৃত্তি, ন্যাস ও পদমঞ্জরী। দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : প্রাচ্যভারতী প্রকাশন।

গণেশ থিটে সম্পা.। *চার্বাক-সমীক্ষা*। পুণে : বিশ্বকর্মা সাহিত্যালয়, ১৯৭৮।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য। *কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস*, খণ্ড ২, ১৮৮৫-৯৫। সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬১।

চক্রধর। *গ্রন্থিভঙ্গ* (জয়ন্তভট্ট-র *ন্যায়মঞ্জরী* সমেত)। গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

চরক সংহিতা। গঙ্গাসহায় পাণ্ডেয় সম্পা.। বারাণসী : কাশী সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৮৩।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চার্বাকবাদ ও আধুনিক ভারত', *দেশ*, ৮ এপ্রিল, ১৯৯৫।

জাতকমালা। আর্যশূর। পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য সম্পা.। দরভঙ্গা : মিথিলা বিদ্যাপীঠ, ১৯৫৯।
জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তরঃ। সুখময় ভট্টাচার্য সম্পা.। বিশ্বভারতী, ১৩৫৮ ব।
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। *চার্বাক দর্শন*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২ (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯)।
দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। 'চার্ব্বাক-পঞ্চাশিকা', *ভারতবর্ষ,* ৩২:১। আষাঢ় ১৩৫১।
দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পা.। *গী-ভা/শ্রীমদ্ভাগবতগীতা* দ্র.।
দীঘনিকায়। জগদীশ কাশ্যপ সম্পা.। পাটনা : পালি পাবলিকেশন বোর্ড, ১৯৫৮।
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান*। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৮।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *লোকায়ত দর্শন* (প্রথম সংস্করণ)। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬৩ ব।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ ও ভাববাদ খণ্ডন', *পরিচয়* শারদীয়, ১৯৬১।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *লোকায়ত দর্শন* (দ্বিতীয় সং.)। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬৯।
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*। অনুষ্টুপ, ১৯৮৭। দ্বিতীয় সং., ১৯৯৩।
দেবীভাগবত পুরাণ। বঙ্গবাসী, তারিখ নেই।
দ্যতিয়েন, ফাদার। 'বেহেস্তি সাহিত্যের কথা'। *রোজনামচা*। গ্রন্থালয়, ১৯৯১।
নীতিনির্ণীতি টীকা। আচার্য যোগ্‌ঘম (মুগ্ধবিলাস)। মুনি জিনবিজয় সম্পা.। বম্বই : সিংঘী জৈনশাস্ত্র শিক্ষাপীঠ/ভারতীয় বিদ্যাভবন, ১৯৫৯।
নীতিবাক্যামৃতম্। সোমদেব সূরি। অজ্ঞাত-পণ্ডিতকৃত টীকা সমেত। বম্বই : মানিকচন্দ্র দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা, বীরসংবৎ ২৪৪৯, বিক্রমাব্দ ১৯৭৯ (১৯৫৯ খ্রি)।
নীতিসার। কামন্দকী। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পা., শিশিরকুমার মিত্র সংশোধিত। দ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৮২।
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। উদয়ন। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড় সম্পা.। বারাণসী : চৌখম্বা সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯১২।
ন্যায়ভূষণ। ভাসর্বজ্ঞ। স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ সম্পা.। বারাণসী : ষড়্‌দর্শন প্রকাশন প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৮।
পঞ্চানন তর্কবাগীশ অনূ.। *ন্যায়মঞ্জরী*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।
পঞ্চানন শাস্ত্রী। *চার্বাকদর্শনম্*। আগরপাড়া (২৪ পরগনা) : সাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪ ব।
পরশুরাম। 'জাবালি'। *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* খণ্ড ২। এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮৮।
পরশুরাম। 'মহেশের মহাযাত্রা'। *পরশুরাম গ্রন্থাবলী,* খণ্ড ৩। এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৯২।
পরিভাষেন্দুশেখর। নাগেশ ভট্ট। রাজনারায়ণ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী, ১৯৪৩।
পায়াসিসুত্ত। *দীঘনিকায়* দ্র.।
প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 'বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার' (১৯০৯)। *আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী*। চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং., ১৯২৭।

প্রমাণ-পরীক্ষা। বিদ্যানন্দী। দরবারী লাল জৈন সম্পা.। বারাণসী, ১৯৭৭।

প্রমাণবার্ত্তিকালঙ্কার। প্রজ্ঞাকরগুপ্ত। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পা.। পটনা : কাশীপ্রসাদ জায়সবাল শোধ-সংস্থান, ১৯৫৩।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন* [ও] *বাৎস্যায়ন ভাষ্য*, খণ্ড ১-৫। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১-৮৯।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। *ন্যায়পরিচয়*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বেদে ঈশ্বরবাদ'। *বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ*, খণ্ড ১। গোপাল হালদার সম্পা.। সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৩।

বাল্মীকি-রামায়ণ। রাজশেখর বসু কৃত সারানুবাদ। এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৫৭ব (১৩৫৩ ব)।

বাল্মীকি-রামায়ণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনু.। ভারবি, ১৯৭৫ (প্রথম প্রকাশ ১৮৬৯-৮৪)।

বিদ্বন্‌মোদতরঙ্গিণী। চিরঞ্জীব শর্ম্মা ভট্টাচার্য। জানকীনাথ কাব্যতীর্থ সম্পা. ও অনূ.। ছাত্রপুস্তকালয়, ১৩২৩ ব।

বিদ্যানন্দ / বিদ্যানন্দী। *প্রমাণ-পরীক্ষা* দ্র.।

বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য। 'ন্যায়বৈশেষিক দর্শন/ (খ) পরবর্তী ন্যায়বৈশেষিক দর্শন'। সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পা., *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ১:১। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৬৬ ব।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। 'শ্রীমৎসায়ন-মাধবীয়ে সর্বদর্শন-সংগ্রহে চার্বাক-দর্শনম্', *Our Heritage*, 22. 1, 1974; 22. 2, 1974; 24. 2, 1976.

বেডেকর, প্রা. বি. ম.। 'মহাভারত আণি চার্বাক'। গণেশ থিটে সম্পা., *চার্বাকসমীক্ষা*-র অন্তর্গত।

ব্যোমবতী। ব্যোমশিবাচার্য। গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : চৌখম্বা, ১৯৩০।

ব্যোমবতী। গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩-৮৪।

ভবিসয়ত্তকহা। ধনপাল। সি. ডি. দালাল ও পাণ্ডুরঙ্গ দামোদর গুণে সম্পা.। বরোদা : ওরিএন্টাল ইন্‌স্টিটিউট, ১৯৬৭।

শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। *ভারতীয় দর্শন কোষ* ১। সংস্কৃত কলেজ, ১৩৮৩ ব।

ভামতী। বাচস্পতি মিশ্র। *ব্র-সূ-ভা*, নির্ণয়সাগর সং. দ্র.।

মধ্যমকশাস্ত্র। রঘুনাথ পাণ্ডেয় সম্পা.। অকুতোভয়, নাগার্জুন, বুদ্ধপালিত, ভাববিবেক ও চন্দ্রকীর্তির টীকা ও বৃত্তি সমেত। দিল্লী : মোতীলাল বনারসীদাস, ১৯৮৮-৮৯ (দু খণ্ড)।

মনুস্মৃতি। নটি টীকা সহ *মনুস্মৃতি*, খণ্ড ১-৬। জয়ন্তকৃষ্ণ হরিকৃষ্ণ দবে সম্পা.। বোম্বাই : ভারতীয় বিদ্যাভবন ১৯৭২-৮৪।

মহাদেবন, টি. এস. পি.। *শঙ্করাচার্য*। নয়া দিল্লী : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ১৯৭১।

মহাপুরাণ। পুষ্পদন্ত (পুপ্‌ফদন্ত)। পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য সম্পা.। মুম্বঈ : মানিকচাঁদ দিগম্বর জৈন গ্রন্থমালা সমিতি, ১৯৩৭।

মহাভারত। আর্য্যশাস্ত্র সংস্করণ।

মহাভারত। গীতা প্রেস সং.। গোরখপুর : গীতা প্রেস, তারিখ নেই।

মহাভারত। প্রচলিত সংস্করণ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা.। বঙ্গবাসী, ১৮৩২ শক (নীলকণ্ঠ-র টীকা সমেত)।

মহাভারত। প্রামাণিক সংস্করণ। বিষ্ণু সীতারাম সুকঠণকর প্রমুখ সম্পা.। পুণা : ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৩৩-৬৬।

মহাভারত (সারানুবাদ)। রাজশেখর বসু। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৭০ ব।

মহাভারত। বর্ধমান রাজবাড়ি সং.। ভারবি পুনর্মুদ্রণ।

মহাভারত। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পা., টীকা ও অনুবাদ সমেত। বিশ্ববাণী পুনর্মুদ্রণ।

মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদিত। সাক্ষরতা প্রকাশন পুনর্মুদ্রণ।

মানসোল্লাস সংগ্রহ। সুরেশ্বর আচার্য। স্বামী বশিষ্ঠানন্দ পুরি অনূ.। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির, [১৯৫২?]।

মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। *ন্যায়সূত্র*। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

মেঘনাদ সাহা। *মেঘনাদ রচনা সংকলন*। ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৮৮৭ শক (১৯৬৫ খ্রি)।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা*। প্রথম খণ্ড। এ. মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং, ১৯৯০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *জীবনস্মৃতি*। বিশ্বভারতী, ১৩৬৩ ব।

রমেশচন্দ্র দত্ত। *ঋগ্বেদ সংহিতা*। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পা.। জ্ঞান-ভারতী, ১৯৬৩।

রাজশেখর বসু। 'রস ও রুচি'। *লঘুগুরু*। *পরশুরাম গ্রন্থাবলী*, খণ্ড ১। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮০ ব।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। *কামারের এক ঘা*। পাভলভ ইনস্টিটিউট, ২০০৩।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। 'কৃষ্ণমিশ্র কি রাঢ়ের সন্তান ছিলেন?' [বঙ্গীয়] *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, বর্ষ ৮৬ সংখ্যা ১, ১৩৮৬, ২৮-৪৭।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। 'দর্শনের বর্ণপরিচয় : স্বভাববাদের উৎপত্তি', *অনুষ্টুপ*, বর্ষ ২৫ সংখ্যা ২, ১৯৯১।

রামায়ণ। প্রচলিত সংস্করণ। বোম্বাই : নির্ণয়সাগর প্রকাশন, ১৯১১।

রামায়ণ। চিন্নস্বামিশাস্ত্রী ও বা.হ. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী সম্পা.। মাদ্রাজ : এন. রামরত্নম্‌, ১৯৮৫।

রামায়ণ। কে. এস. বরদাচার্য সম্পা.। মৈসূর : ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, ১৯৬০।

রামায়ণ। প্রামাণিক সংস্করণ। অযোধ্যাকাণ্ড। পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য সম্পা.। বরোদা : ওরিয়েন্টাল ইনস্টিট্যুট, ১৯৬২।

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। পণ্ডিত রামলভায়া সম্পা.। লাহোর : দয়ানন্দ মহাবিদ্যালয়, ১৯২৮।

রামায়ণ। লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর *মনোহরা*-টীকা (ষোলো শতক) সমেত। অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পা.। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, তারিখ নেই।

রামায়ণ। মাদ্রাজ : বাবিল্ল রামস্বামিশাস্ত্রলু অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২৯।
রামায়ণ। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পা.। ১৭৯৪ শক = ১৮৭২ খ্রি.।
রামায়ণ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পা.। বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সং., ১৮১২ শক (১৮৯০ খ্রি)।
রামায়ণম্। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কট্টী সম্পা.। দিল্লী : পরিমল পাবলিকেশনস্, ১৯৮৩।
রায়পসেণইজ্জং। আর.সি. ত্রিপাঠী সম্পা.। আমেদাবাদ : আর. পি. কোঠারী, [১৯৩৬]
রাহুল সাংকৃত্যায়ন। *বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ*। কলকাতা/ইলাহাবাদ : আধুনিক পুস্তক ভবন/লোকভারতী প্রকাশন, ১৯৭৪।
লতিকা চট্টোপাধ্যায়। *চার্বাকদর্শন (রূপরেখা)*। নিউ এজ, ১৯৮২।
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অমরবৃন্দ'। *শরদিন্দু অমনিবাস*, খণ্ড ৭। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৮৭ ব (একাদশ মুদ্রণ)।
শার্দূলকর্ণাবদান। সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পা.। শান্তিনিকেতন : বিশ্বভারতী, ১৯৫৪।
শ্যামাপদ চক্রবর্তী। *অলঙ্কারচন্দ্রিকা*। কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, ১৯৮৮।
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, এম. আর. এস. সম্পা.। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৪৫ শক (১৯২৩ খ্রি)।
শ্লোকবার্ত্তিক। কুমারিল ভট্ট। পণ্ডিত দুর্গাধর ঝা সম্পা.। দরভাঙ্গা : কামেশ্বর সিংহ দরভঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯।
সঞ্জিত কুমার সাধুখানঃ। 'ধর্মকীর্তিপ্রণীতে প্রমাণবিনিশ্চয়ে প্রত্যক্ষানুমানেতিপ্রমাণদ্বৈবিধ্য-ব্যবস্থাপনপ্রকারঃ', *সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ* [পত্রিকা], খণ্ড ৭৩, এপ্রিল ১৯৯০-মার্চ ১৯৯১, ৫২-৬০।
সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী। *স-দ-স* দ্র.।
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'পরমেষ্ঠী', *তীর্থসলিল*। *সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ*। অলোক রায় সম্পা.। সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪।
সদ্ধর্মপুণ্ডরীকসূত্র। নলিনাক্ষ দত্ত সম্পা.। দ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭৬।
সর্বানন্দ পাঠক। সংক্ষেপসূচি-তে *চা-শা-স* দ্র.।
সমরাইচ্চ কহা। হরিভদ্র। হেরমান ইআকবি সম্পা.। দ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯২৬।
সরোজ আচার্য। *রচনাবলী*, খণ্ড ১। পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।
সাংখ্যকারিকা। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য সঙ্কলিত (*তত্ত্বকৌমুদী* সমেত)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩।
সাংখ্য-দর্শনম্। কালীবর বেদান্তবাগীশ ও দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পা.। দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৮৬ ব।
সাংখ্যসূত্রম্। রামশংকর ভট্টাচার্য সম্পা.। বারাণসী : ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৭৭।
সিদ্ধিত্রয়। যামুন। তি. বীররাঘবাচার্য সম্পা.। তিরুপতি, ১৯৪২।
সুখলালজী সংঘবী। 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ— চার্বাক দর্শন কা এক অপূর্ব গ্রন্থ', *ভারতীয় বিদ্যা*, খণ্ড ২:১, ১৯৪১।
সুখলালজী সংঘবী। *দর্শন এবং চিন্তন*। বড়োদারা : গুজরাত বিদ্যাসভা, তারিখ নেই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা', [বঙ্গীয়] *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৩, ১৩৩৭। *হরপ্রসাদ রচনাবলী,* প্রথম সম্ভার। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিল কাঞ্জিলাল সম্পা.। ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ১৩৬৩ ব। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ,* খণ্ড ৩। সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমুখ সম্পা.। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

হরিচরণ দেবশর্ম্মা। *সানুবাদ চাণক্য শ্লোক*। ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ১৩৬১ ব।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। নয়া দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৬৭।

হরিবংশ। প্রামাণিক সংস্করণ। পরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য সম্পা.। পুণা : ভাণ্ডারকর প্রাচ্যবিদ্যা সংশোধন মন্দির, ১৯৬৯। বঙ্গবাসী সং.। ১৮২৭ শক। আর্য্যশাস্ত্র সং.। ১৯৭৫-৭৯। কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন সং.। ১২৮৮ ব।

হর্ষচরিত। বাণভট্ট। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পা.। ১৯৩৯ (চতুর্থ সং.)।

হর্ষচরিত। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার ১৮। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৭।

হর্ষচরিত। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের তর্জমা। রূপা, ১৩৮৫ ব।

হেমচন্দ্র কানুনগো। *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*। চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৪।

হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। *চার্বাকদর্শন*। আকাদমিআ, ১৯৯৩।

ABC's of the Human Mind. New York: Reader's Digest, 1990.

ABORI. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.

Agrawala, Vasudev Saran. *India as Known to Panini.* Lucknow: University of Lucknow, 1953.

[*The*] *Ain-i Akbari,* of Abu-L-Fazl. Vol. III. Ed. Sir Jadu Nath Sarkar. Calcutta: The Asiatic Society, 1947.

Aiyangar, K.V.R. *Brihaspatismriti* (*Reconstructed*). Baroda: Oriental Institute, 1941.

Anuögādārāiṃ. Trans. Taiken Hanaki. Vaishali: Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, 1970.

Arthaśāstra-Vyākhyā/Jayamaṅgalā. Ed. G. Haridasa Sastri. Mylapur, Madras: Kuppuswami Sastri Research Institute, 1958.

Aṣṭādhyāyī of Pāṇini. Trans. Sumitra M. Katre. Delhi: MLBD, 1989.

Bacon, Francis. *Selected Writings.* New York: Modern Library, n.d.

Barua, Benimadhav. *A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy.* University of Calcutta, 1921.

Bhattacharya, B. 'Foreword', *Tattvasaṅgraha of Śāntarakṣita.* Ed. Embar Krishnamacharya. Baroda: Oriental Institute, 1926.

Bhattacharya, Ramkrishna. 'Was Kṛṣṇamiśra a Man of *Rāḍha*?' *Journal of the Asiatic Society* (Calcutta), Vol. XXVIII, No. 2, 1988.

Bhattacharya, Ramkrishna. 'Origin of Materialism in India: Patrician or Plebian?' *Bhartiya Samajik Chintan* (Allahabad), 20:1-2 (Old Series), 1997,12-23.

Bhattacharya, Ramkrishna. 'Svabhāvavāda vis-à-vīs Materialism: A Review

in the Light of Some *Mahābhārata* Passages', *Anvīkṣā,* Vol. XVIII, 1998 (1999), 92-101.

Bhattacharya, Ramkrishna. 'Ajita Kesakambala : Nihilist or Materialist?' *JAS(B),* Vol. XLI No. 1,1999, 74-83.

Bhattacharya, Ramkrishna. 'Cārvāka Fragments: A New Collection', *Journal of Indian Philosophy* (Dordrecht), Vol. 30 No. 6, December 2002, 597-640.

Bierce, Ambrose. *The Devil's Dictionary.* Ware: Wordsworth Reference, n.d.

Böhtlingk, Otto und Rudolf Roth. *Sanskrit-Wörterbuch* (1852-75), Delhi: MLBD reprint, 1990.

The Book of Gradual Sayings, Vol. 4. London: PTS, 1935.

The Book of Kindred Sayings, Vol. 2. London: PTS, 1917.

Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad with Śaṅkarācārya's Commentary. Trans. Swāmī Mādhavānanda. Advaita Ashrama, 1993.

Bṛhaspatismṛti (Reconstructed). See K.V.R. Aiyanagar.

Brown, Raymond K. *The New Jerome Biblical Commentary.* Bangalore: Theological Publications in India 1992.

Burnouf, E. (trans.). *Le Lotus de la Bonne Loi.* Paris: L'lmprimerie Nationale. MDCCCLII (1852).

Campbell, Keith. "Materialism" in *Encyclopedia of Philosophy,* Vol. 5. Ed. Paul Edwards (q. v.).

Chatterjee, Asoke. *Padma Purāṇa — A Study.* Sanskrit College, 1967.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *Indian Philosophy: A Popular Introduction.* New Delhi: People's Publishing House, 1964.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *Lokāyata.* New Delhi: People's Publishing House, 1973 (first pub. 1959).

Chattopadhyaya, Debiprasad. *What is Living and What is Dead in Indian Philosophy.* New Delhi: People's Publishing House, 1976.

Chattopadhyaya, Debiprasad (ed.). *Studies in the History of Indian Philosophy,* Vol. 2. K.P. Bagchi and Company, 1978.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *Knowledge and Intervention.* Firma KLM, 1985.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *In Defence of Materialism in Ancient India.* New Delhi: People's Publishing House, 1989.

Chattopadhyaya, Debiprasad. *History of Science and Technology in Ancient India,* Vol. II. Firma KLM, 1991.

Chattopadhyaya, K. 'A Peculiar Meaning of Yoga', *Journal of the Royal Asiatic Society,* 1927.

Chattopadhyay. K.C. 'The Lokāyata System of Thought in Ancient India', *Journal of the Ganganath Jha Research Institute,* Vol. 31, 1975.

Cherbatsky, Th. 'History of Materialism in India', *Indian Studies Past and Present,* No. 10 (1968-69).

Cherbatsky, Th. *Papers of Cherbatsky*. Indian Studies Past and Present, 1969.

C/L. Cārvāka/Lokāyata. Ed. Debiprasad Chattopadhyaya in collaboration with Mrinal Kanti Gangopadhyaya. New Delhi: ICPR/Ṛddhi India, 1990.

Colebrooke, H.T. *Miscellaneous Essays,* Vol. II. London: Wm. H. Allen and Co., 1837.

Colebrooke, H.T. *Miscellaneous Essays,* Vol. II. Ed. E. B. Cowell, London: Trübner & Co., 1873.

Cowell, E. B. 'The Chārvāka System of Philosophy', *JAS(B),* Vol. 31, No. 4, 1862.

Cowell, E. B. and A.E. Gough. *Sarva-darśana-sangraha of Madhavacharya.* London: Kegan Paul, Trench Trübner, 1882.

Craig, Edward (ed.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy.* London: Routledge, 1998.

(A) Crtical Pali Dictionary. Ed. V. Trenckner et al. Copenhagen: Commission Ejnar Mumksgaavd, Vol. II. Fascicule 3, 1965.

Dandekar, R.N. 'Heretical Doctrines in the Purāṇas', *ABORI,* Vols. LXXII and LXXIII, 1991-92 (1993),

Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy,* Vols. 1-3. Delhi: MLBD, 1975 (first pub. 1922,1932, 1940).

De, S.K. *History of Sanskrit Poetics,* Vol 1. Firma K.L. Mukhopadhyay, 1960.

De, S.K. in: S.N. Dasgupta and S.K De. *A History of Sanskrit Literature.* University of Calcutta, 1975.

Deshpande, C.R. *Studies in Campū Literature.* Delhi: Bharatiya Book Corporation, 1992.

Dhaky, M.A. (ed.). *Aspects of Jainology,* Vol. III. Varanasi : P.V. Research Institute, 1991.

Diogenes Laertius. *Lives of Eminent Philosophers.* London: William Heinemann, 1926.

Dixit, K.K. *Jaina Ontology.* Ahmedabad: L. D. Institute of Indology, 1971.

Dixit, K.K. *Indian Logic.* Vaishali: Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, 1975.

Edgerton, Franklin (ed.). *The Mahābhārata.* Sabhāparavan. Poona: BORI, 1944.

Edwards, Paul (ed.). The *Encyclopedia of Philosophy.* New York: Macmillan Publishing Co. 1967.

ERE. Encyclopaedia of Religion and Ethics. Ed. James Hastings. Edinburgh: T & T Clerk, 1953.

Franco, Eli. "Paurandarasūtra" in M.A. Dhaky (ed.).

Franco, Eli. *Perception, Knowledge and Disbelief.* Delhi: MLBD, 1994.

Franco, Eli. *Dharmakīrti on Compassion and Rebirth.* Wien: Arbeitkreis für Tibetische und Buddhistiche Studien, Universität Wien, 1997.

Franco, Eli [and] Karin Preisendanz. 'Indian School of Materialism' in Edward Craig (ed.), Vol. 6.

Frauwallner, Erich. *Geschichte der indischen Philosophie,* Band II. Salzburg: Otto Müller Verlag, 1956.

Frauwallner, Erich. *History of Indian Philosophy,* Vol. II. Delhi : MLBD, 1973

Freeman, Kathleen. *Ancilla to* the Presocratic Philosophers. Oxford : Basil Blackwell, 1962.

Gangopadhyaya, Mrinalkanti (trans.). *Nyāya. Gautama's Nyāya-Sūtra with Vātsyāyana's Commentary.* Indian Studies, 1982.

Ganguly, Hemantakumar. 'The Rational and the Irrational in Ancient Mīmāṃsa', *New Horizons of Research in Indology.* Pune, 1989.

Ganguly, Kishorimohan (trans.). *The Mahabharata.* Santi Parva. Vol. II. Bharat Press, 1891.

Garbe, Richard. "Lokayata" in *ERE,* Vol. VIII.

Garbe, Richard (ed.). *Sāṃkhyapravacanabhāṣya.* Cambridge, Mass.: Harvard University, 1895. (Harvard Oriental Series 2).

Ghatage, A.M. et al (ed.). *An Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles,* Vol. I. Poona: Deccan College Postgraduate and Research Institute, 1976-78.

Ghosh, Manmohon. *Essentials of Dharma.* Sribhumi Publishing, 1977.

Goonasekere, B. "Ajita Kesakambali" in *Encyclopaedia of Buddhism.* See Malalasekara.

Griffith, Ralph T.H. *The Rāmāyaṇa of Vālmīki.* Varanasi: The Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1977 (4th ed.).

Hacker, Paul. 'Śaṅkarācārya and Śaṅkarabhagavatpāda', *Kleine Schriften.* Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1978.

Halbfass, Wilhelm. *India and Europe.* New York: State University of New York, 1988.

Hall, Fitzedward. *Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems.* 1859. [Published by order of the Govt. N.W.P.]

Handiqui, Krishnakanta. *Yaśastilaka and Indian Culture.* Sholapur: Jaina Saṁskṛti Saṁrakshana Saṅgha, 1949.

Handiqui, Krishnakanta (trans.). *Naisadha-carita of Sriharsa.* Poona: Deccan College Post-graduate Research Institute, 1956.

The Harshacharita. MM. P.V. Kane (ed.). Delhi: MLBD, 1986 (1918).

Hastings, James (ed.). See *ERE.*

Hazra, R.C. *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs.* Delhi: Motilal Banarsidass, 1987 (1940)

Hazra, R.C. *Studies in the Upapurāṇas,* 2 Vols. Sanskrit College, 1958-63.

Hazra, R.C. "Introduction" to Wilson's trans. of the *Viṣṇupurāṇa* (q.v.), 1972.

Hemacandra. *Abhidhānacintāmaṇiḥ.* with an auto-commentary. Ed. Hargovindas-Behechardas. Bhavnagar: N.L. Vakil, Veer era 2441.

Hesiod. *Theogony.* Trans. Hugh G. Evelyn White. Cambridge, Mass: Harvard University Press, London: William Heinemann, MCMLXVIII, 1967 (1914).

Hiriyanna, M. *Outlines of Indian Philosophy.* Bombay: George Allen and Unwin, 1973.

Hiriyanna, M. *The Essentials of Indian Philosophy.* London: George Allen and Unwin, 1974.

Hopkins, E. Washburn. *The Great Epic of India.* Calcutta: Puthi Pustak, 1978 (first pub. 1901).

Jacob, Colonel G. A. *Laukikanyāyāñjaliḥ/A Handful of Popular Maxims.* Delhi: Niraja, 1983.

Jacobi, Hermann (1893). *Das Rāmāyaṇa, Geschichte und Inhalt.* Bonn: Verlag von Friedrich Cohen, 1893.

Jacobi, Hermann (1911). 'Zur Frühgeschichte der indischen philosophie', 1911. Reprinted in *Kleine Schriften,* ed. Bernhard Kölver, Teil 2. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, GmbH, 1970. First pub. in *Sitzunsberichte der Koniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften* (Berlin), Phil. hist. Kl. 1911 : 732-43.

Jacobi, Hermann (1918). 'A Contribution Towards the Early History of Indian Philosophy', *Indian Antiquary* 47 : 101-109. (trans. by V.A. Sukthankar of Jacobi 1911).

Jacobi, Hermann. *Jaina Sūtras,* Part II. SBE 45. Oxford: Clarendon Press, 1895. MLBD reprint 1980.

Jain, J.C. 'Acharya Hemachandra' in *Seers and Thinkers* (Cultural Leaders of India). V. Raghvan (ed.).

Jaytilleke, K.N. *Early Buddhist Theory of Knowledge.* Delhi: MLBD, 1980 (first pub. 1963).

Jha, Ganganath (trans.). *Tattvasaṁgraha.* Baroda: Oriental Institute, 1937-38 (MLBD reprint 1986).

Jha, Ganganatha. *The Nyāya-sutra* of *Gautama.* Delhi: MLBD, 1984.

Johnson, Helen M. (trans.). *Triṣaṣṭi-śalākāpuruṣa-carita.* Baroda: Oriental Institute LI (1931), LXXVII (1937), CVIII (1949).

Johnston. E.H. *Early Sāṃkhya* (1937). Delhi: MLBD, 1974.

Jolly and Schmidt. *The Arthaśāstra of Kauṭilya.* Ed. Jolly, J .and R. Schmidt. Lahore: The Panjab Sanskrit Book Depot / MLBD, Vols. I-II, 1923-24.

Journal of the Asiatic Society (Bengal). Vol. 16, October 1847.

Kādambarī. Bāṇabhaṭṭa. Trans. E.B. Cowell and F. W. Thomas. Delhi: MLBD, 1986 (1897).

KA. Kauṭilya Arthaśāstra, Parts 1-3. Ed. and trans. R.P. Kangle. Bombay: University of Bombay, 1965-72.

Kane, P.V. *History of Dharmaśāstra*. Poona: BORI, Vol. II, Part I, 1941, Vol. III, 1973.

Karve, Iravati, *Yuganta*. New Delhi: Sangam Books, 1974.

Kaviraj, Gopinath. *Aspects of Indian Thought*. Burdwan: The University of Burdwan, 1966.

Kaviraj, Gopinath. 'Lokayata and the Doctrine of Svabhāba' in *C/L*.

Keith, A. Berriedale. *The Sāṃkhya System. A History of the Sāṃkhya Philosophy*. London: OUP, 1924.

Kern, H. (trans.). *The Lotus of the True Law*. SBE 21. Oxford: Clarendon Press, 1884.

Kielhorn, F. (ed). *The Vyākaraṇa Mahābhāṣya of Patañjali*, Vol. 3. Bombay, 1909.

Konow, Sten. *Kauṭalya Studies*. Oslo: I Kommissjon Hos, Iacob Dybwad, 1945.

Laṅkāvatārasūtra. Ed. Bunyian Nanjio. Kyoto : Otani University Press, 1923.

Le Lotus de la Ban Loi. See Burnouf.

Lenin, V.I. *Philosophical Notebooks. Collected Works*, Vol. 38. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1961.

Ling, Trevor. *A Dictionary of Buddhism*. K.P. Bagchi & Co., 1981.

Mahapatra, K. N. 'Studies in the Naishadha Charita of Sree Harsha', *The Orissa Historical Journal*, Special Volume (Bhuvaneswar), 1982, 205-16.

Malalasekara. (ed,). *Encyclopedia of Buddhism*, Vol. I. Colombo: Government of Ceylone, 1984.

Manusmṛti. Ed. Ganganath Jha. Delhi: Parimal Publication, 1982.

Maugham, W. Somerset . *A Writer's Notebook*. London: Pan Books, 1978 (1947).

Mīmāṃsā-Paribhāṣā of Kṛṣṇa Yajvan. Trans. and anno. Swami Madhvananda. Advaita Ashrama, 1987.

Mittal, Kewal Krishan. *Materialism in Indian Thought*. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1974.

Monier-Williams, M. *A Sanskrit-English Dictionary* (1899). Delhi: MLBD, 2002.

Mukhopadhyay, Satkari. *The Buddhist Philosophy of Universal Flux*. Calcutta University, 1935.

Müller, Friedrich Max. *Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religions of India* (1878). London and Bombay: Longmans, Green and Com., 1901.

Müller, F. Max. *The Six Systems of Indian Philosophy* (1899, 1903), Varanasi: The Chowkhamba, Sanskrit Series Office, [1971].

Muir.J. 'Verses &c.', *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, Vol. XIX, 1861.

Namai, Mamoru (1976). 'A Survey of Bārhaspatya Philosophy', *Indological Review* (Kyoto), No. 2, 1976, 29-76.

Namai, C.M. 'On Śāntarakṣita's Refutation of *ahetuvāda', Journal of the Koyasan University,* Vol. 22, March 1987.

Namai, Mamoru (1989, 1991) 'Two Aspects of *Paralokasādhanā* in Dharmakīrtian Tradition' in : Ernst Steinkellner (ed.). *Studies in the Buddhist Epistemological Tradition.* Proceedings of the Second International Dharmakīrti Conference, Vienna, June 11-16, 1989. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1991.

NCC. New Catalogus Catalogorum. Ed. V. Raghavan et al. Madras: University of Madras. Vol. 1 (Revised Ed.) (1968), Vol. 2 (1966) and Vol. 12 (1982).

Pandeya, Jagadishwara. 'The Āmbhiyas: A Lokāyata *Sect', Journal of Bihar Research Society,* Vol. 62, 1976.

Pathak, Sarvanand. 'Cārvākaṣaṣṭi kā Dārśanika Viṣaya Vivecana', *The Nava-Nālandā, Mahāvihāra Research Publication,* Vol. II. Ed. Satkari Mookerjee, Patna, [1960], (Hindi Section).

Potter, Karl. H. *Encyclopedia of Indian Philosophies,* Vol. I. Delhi: MLBD, 1995.

Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy,* Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 1980 (first pub. 1940).

Radhakrishnan, S. and Ch. A. Moore. *A Source Book in Indian Philosophy.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973 [1957].

Raghavan, V. (ed.). *Seers and Thinkers* (Cultural Leaders of India). New Delhi: Publications Division, 1979.

Rāmāyaṇa. Ed. Gaspare Gorresio. Parigi: Brockhause Avenarius, 1844.

The Ramayana. Eng. trans. Makhanlal Sen. Firma KLM, 1976.

Randle, H.N. *Indian Logic in the Early Schools.* London: OUP, 1930.

Rhys Davids, T.W. *Dialogues of the Buddha,* Vol. I. London: OUP, 1899.

Rhys Davids, T.W. (1899-1990). "On Lokāyata" in *C/L.*

Rhys Davids, T.W. and William Stede (eds.). *Pali English Dictionary* (1921-25). New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1975.

Riepe, Dale. *The Naturalistic Tradition in Indian Thought.* Delhi, etc.: MLBD, 1964.

Ruben, Walter. *Die Nyāyasūtras.* Leipzig: Deutsche Morgenländiche Gesellschaft, 1928.

Ruben, Walter. *Studien Zur Textgeschicht. der Rāmāyaṇa.* Stuttgart : Verlag W. Kohlhaunt, 1936.

Ruben, Walter. 'The Minister Jābāli in Vālmīki's *Rāmāyaṇa* — The Portrait of One of the Indian Materialists' (1956) in *Studies in Ancient Indian Thought.* Indian Studies Past and Present, 1966.

Russell, Bertrand. 'The Road to Happiness'. *Portraits from Memory and Other Essays.* London : George Allen and Unwin, 1956.

Saddharmapuṇḍarīka-Sūtram. (ed.). U. Wogihara and C. Tsuchida Tokyo: The Seigokenkyūkai, Part I. 1934-III. 1936.

Saddharmapuṇḍarīkasūtram. Ed. P.L. Vaidya. Darbhanga: The Mithila Institute, 1960.

Saletore, B.A. 'Historical Notices of the Lokāyatas', *ABORI,* Vol. XXIII, 1942.

Sarma, B.N. Krishnamurti. 'A Note on the Authorship of Sarvadarśanasiddhāntasaṃgraha', *ABORI,* Vol. 12, 1930-31. 93-96.

Sārattha-Pakāsinī. Buddhaghosa. F.L. Woodward, ed. London: PTS/ Routledge and Kegan Paul, 1977.

Sastri, MM S. Kuppuswami. *A Primer of Indian Logic.* Mylapore, Madras: Kuppuswami Sastri Research Institute, 1951 (first pub. 1932).

SDS. Sarva-darśana-saṃgraha. Trans. E.B. Cowell and A.E. Gough (1892). London: Kegan Paul, Trench Trübner, 1914. Ed. K.L. Joshi, Ahmedabad, Delhi: Parimal Publications, 1981.

SDS. See Iswarchandra Vidyasagar.

Shah, N.G. Ed. *Nyāyamañjarīgranthibhaṅga* of Cakradhara. Ahmedabad: L.D. Institute of Indology, 1972.

Shama Shastri, R. *Arthaśāstra of Kauṭilya.* Mysore, 1909, revised ed. 1919.

Shastri, D.R. *Charvaka-Shashti.* Book Company, 1928.

Shastri, Haraprasad. 'Lokayata', *Dacca University Bulletin* 1, 1925. Also in *C/L.*

Solomon, E.A. 'Bhaṭṭa Udbhaṭa', *ABORI,* Vols. LVIII and LIX, 1978.

Sthavirāvalicarita or *Pariśiṣṭaparvan.* Hemacandra. Ed. Hermann Jacobi. The Asiatic Society, 1991 (1932).

Sthavirāvalicarita. Trans. Helen M. Johnson. Baroda: Oriental Institute, GOSLI (1931), LXXVII (1937), CVIII (1949).

Sukhthankar, V.S. 'Epic Studies VI. The Bhṛgus and the Bhārata: A Text-historical Study', *Critical Studies in The Mahābhārata,* Bombay: Karnatak Publishing House, 1944.

Thomas, F.W. (ed.). *Brihaspsati Sutra.* Introductory Remarks and Indexes by Bhagavad Datta. Lahore: The Punjab Sanskrit Book Depot, 1921 (first pub. 1916).

Thomas, F.W. (trans & anno.) *The Flower-Spray of the Quodammodo Doctrine.* Delhi: MLBD, 1968 (1958).

Trenckner, V. et al (ed.). See *A Critical Pali Dictionary.*

Tucci, G. 'A Sketch of Indian Materialism' (1925) in *C/L.*

Tucci, G. 'Linee di Una Storia el Materialismo Indiano' in *Opera Minora.* Parte 1. Roma : 1971.

Upanisad-bhāṣyam, Vol. I. Ed. S.Subrahmanya Sastri. Mt. Abu and Varanasi: Mahesh Research Institute, 1979.

Vasu, Srisa Chandra (ed.). *The Aṣṭādhyāyī of Pāṇini,* Vol. 1. Delhi: MLBD, 1980.

Vidyasagara, Iswarachandra (ed.). *Sarvadarsana Sangraha or An Epitome of the Different Systems of Indian Philosophy by Madhavacharya.* The Asiatic Society, 1853-58 (Reprinted in 1989).

Warder, A.K. *Outlines of Indian Philosophy.* Delhi: MLBD, 1971.

Weber, Albrecht. *History of Indian Literature.* Varanasi: Chowkhamba, 1961 reprint (First pub. 1852, 2nd ed. 1875).

Weber, Albrecht. *Über Das Rāmāyaṇas.* Berlin, 1876.

Weber, Albrecht. *Über ein Fragment der Bhagavatī.* Zweiter Theil, Berlin, 1866.

Wilson, H.H. 'A Sketch of the Religious Sects of the Hindus', *Asiatic Researches,* 16 (1828).

Wilson, H.H. *Works,* Vol. I. Ed. Ernst R. Rost. London: Trubner, 1862.